স্বরলিপি

স্বরলিপি

সাবিত্রী রায়

১৯৪৯-এর ২৭শে এপ্রিলের শহীদদের—

(লতিকা, অমিয়া, গীতা, প্রতিভা ও বাদল)

স্মরণে

লেখিকার কথা

উপন্যাস লেখার কাজে যে-সব সহৃদয় ব্যক্তির উৎসাহ ও সহায়তা পেয়ে চিরঋণী হ'য়েছি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঋণ শোধ করার নয়। তবু আজ বই বের হবার প্রাকালে শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা অনুভব না করে পারছি না আমার প্রথম কাণ্ডারী শ্রদ্ধেয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সস্নেহ উৎসাহের কথা স্মরণ করে। আর তারই সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অনুভব করছি সাংবাদিক শ্রীযুত শান্তি রায়, শ্রীযুত গোবিন্দ বিদ্যার্থী ও শ্রীযুত সুনীল সেন-এর সাগ্রহ সহায়তা ও উৎসাহের কথা।

কল্যাণাকাঙ্খী সমালোচক ও আগ্রহশীল পাঠকদের কাছে আমি ঋণী যাঁদের উপদেশ ও আগ্রহ আমাকে লেখার কাজে উৎসাহিত করছে অনুক্ষণ।

এছাড়া কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বইয়ের কম্পোজিটারদের যাঁদের অক্লান্ত ও অলক্ষ্য পরিশ্রমে আমার বই ছাপা সম্ভব হ'চ্ছে।

সুন্দর প্রচ্ছদ পটটির জন্য আর্টিষ্ট বন্ধু খালেদ চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাই।

সব শেষে একটি কথা লিখে আমার লেখ্য শেষ করছি। এ উপন্যাসেরও আমার পূর্ববর্তী উপন্যাস দুইটির মতই, কোনও চরিত্রই মিথ্যা নয়—বাস্তবেরই ছায়া, আবার কোনও চরিত্রই সত্য নয়—কল্পনারই প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

সাবিত্রী রায়

প্রকাশকের নিবেদন

যুদ্ধোত্তর ভারত উদ্বেল হয়ে উঠেছিল মুক্তির নেশায়। অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের দাবী প্রতিষ্ঠার দুর্জয় সংগ্রামের শপথ নিয়েছিল জাতীয় জনতা। সে নিশ্ছিদ্র বিক্ষোভের সম্মুখে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয় ইংরাজ শাসক। কুটিল ভ্রূকুটিভরা দুঃশাসনের জারজ উত্তরাধিকার পেল কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ। শোষিত ও নিপীড়িত জনতার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ক্ষণিকের জন্য হল স্খলিত। মুক্তির রক্তাহুতির পরিণতি হল ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে। মুক্তি আন্দোলনের শহীদ হতে পারতেন যাঁরা তাঁরাই হলেন সাম্প্রদায়িকতার বলি। কুৎসিত বীভৎসতায় মুখর ইতিহাসও হল স্তব্ধ।

কিন্তু জনতা অমর; তাই তার অগ্রাভিযানের গতি রুদ্ধ হল না তখনও। শাসকের শত বেয়নটের হুমকি উপেক্ষা করেই রচিত হল তেলেঙ্গানা। বালিয়া, কাকদ্বীপ, ডুবিরভেররী, সন্দেশখালির ধূসর মাটি রক্তিম হয়ে উঠল জঙ্গী কিসানের আর কিসানবৌ-এর বুকের তাজা খুনে! ক্ষিপ্ত শাসকশ্রেণী উন্মাদ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আন্দোলনের নেতা নিরস্ত্র বন্দীদের নিধনযজ্ঞে। সালেম, কলিকাতা, পুণা-জেলে তাই ব্রেনগান স্টেনগানধারী গতনিদ্র শাসকশ্রেণীর হিংস্র আক্রমণে কারাগারেই শহীদ হলেন কতজন! কলিকাতার তাপক্লিষ্ট রাজপথ পিচ্ছিল হল নারী রক্তে!

হয়ত জনতা ভুল করেছিলেন—মুক্তির নেশায় আচ্ছন্ন হয়েছিল পথের নিশানা। কিন্তু তবু তাঁদের অজেয় মানবতা বোধেরই গর্ব করবে আগামীকাল। সেই ভুল ত্রুটি ও অগ্রাভিযানের স্বাক্ষর হল স্বরলিপি।

রাজনীতিকে প্রধান উপজীব্য করেও অনাবিল জীবনালেখ্য রচনা যে সম্ভব তারই জলন্ত প্রমাণ লেখিকার পূর্বগামী সাহিত্যিক প্রচেষ্টা স্বজন ও ত্রিস্রোতা। বিপ্লবী বাস্তবতায় পরিপ্লুত "স্বরলিপি" হল মুক্তিকামী, শান্তি পিপাসু ভারতীয় আত্মার সংগ্রামী সাধনার অনুলেখ। জীবনকে বাদ দিয়ে সংগ্রাম নয়—তাই বৃহত্তর সংগ্রামের সাথে দেখি মিলিয়ে গেছে ব্যক্তিগত জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ-সংঘাত, দোলাচলচিত্ততা, প্রেম ও প্রয়োজনের শত সহস্র খুঁটিনাটি। ত্রিস্রোতা ছিল বাংলা সাহিত্যের এক অকর্ষিত পথে প্রথম পদক্ষেপ। স্বরলিপি হল সেই পথেই বলিষ্ঠ অভিযান।

•

স্বরলিপি

সূর্যের রশ্মিতে লাল পতাকাগুলি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। পতাকার নীচে 'ডায়াসে' দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন এক শ্রমিক নেতা :

"··· পৃথিবীর কোটি কোটি বুভুক্ষু জনতা আজ আমাদের সাথী। আসমুদ্রহিমাচলের জঙ্গী জনতা জেগে উঠেছে। আজ আমরা প্রতিক্রিয়ার শক্তি অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী। সাম্রাজ্যবাদ যে আজ আমাদের চেয়ে দুর্বল, সংকটের পর সংকট এসে যে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে,—এ সত্যটি আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমাদের নূতন পথের ডাক এসেছে··· ।"

বক্তা নীরবে লক্ষ্য করেন লক্ষাধিক মানুষের চোখের প্রতীক্ষা ; তারপর আবার শুরু করেন, "সম্মুখে আমাদের একমাত্র পথ—আপোসহীন শেষ সংগ্রাম। সে সংগ্রাম শুরু হ'যেছে তেলেঙ্গানায়, তাই তেলেঙ্গানার পথই আমাদের পথ।"

"তেলেঙ্গানার পথই আমাদের পথ—এই আওয়াজ নিয়ে আপনারা ফিরে যান শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে। গড়ে তুলুন শত শত তেলেঙ্গানা। আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে আমাদের অভিযান শুরু হলো। ইতিহাস আমাদের সাথে। জয় আমাদের হবেই।"···

লক্ষ কণ্ঠে গর্জে ওঠে মঞ্চস্থিত নেতার কণ্ঠের আওয়াজ মিলিয়ে— "তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ।"

ময়দানের এ প্রান্তে ও প্রান্তে, প্রতিধ্বনিত হয়ে সান্ধ্য আকাশের স্তরে স্তরে আছড়ে পড়ে সে গুরু গর্জন—"তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ।"

বক্তা বলে চলেছেন। তাঁর উদাত্ত গম্ভীর সুর যেন মহাসমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত আছড়ে পড়ছে শ্রোতাদের অন্তর্নিহিত আশার বেলাভূমিতে।

মাইকের ভিতর দিয়ে গর্জে উঠছে বক্তার কণ্ঠস্বর।

খোলা ময়দানের বুকে ঠাসাঠাসি করে বসা—শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রছাত্রী, লেখক, শিক্ষকের চোখগুলি জ্বলে জ্বলে উঠছে বক্তার কথার প্রতিটি ধ্বনির সাথে, প্রতিটি ব্যঞ্জনার সাথে। এতদিনে, হাঁ এতদিনে, সত্যিকারের পথের নির্দেশ তারা পেয়েছে। এরকম নেতাই চাই। ঠিক এরকমই বলিষ্ঠ কণ্ঠের আওয়াজে অতীতের ভুলের বোঝাকে পায়ের তলায় পিষে, দলে, গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আর টুকরো টুকরো করতে হবে ভুলের জোড়াতালি দেওয়া সকল সংস্কারবাদকে। এইত চাই। এই দৃঢ় আহ্বানের জন্যইত উন্মুখ ছিল এতদিন।

বিপ্লবী মনগুলি খাড়া হয়ে উঠে। প্রতি রোমকূপে রোমকূপে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিহিংসার অনিরুদ্ধ যন্ত্রণা। প্রতিহিংসাই। শুধু সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে নয়, এতদিনের ভুল পথ-ধরা আপোসী সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধেও।

কিছুক্ষণের জন্য বিরতি পড়ে বক্তৃতার। নূতন একজন শ্রমিক নেতা বক্তৃতা দিবেন। তিনি এখনও এসে পৌঁছাননি।

শ্রোতারা সোৎসুক অপেক্ষা করে। মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়—"একেবারে খাস শ্রমিক শ্রেণী থেকে নাকি এসেছেন ইনি।"

"নামটা কি যেন বল্লেন?"

"নাম দিয়ে কি করবে। খাঁটি শ্রমিক নেতা। তোমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের মেকি টেকি নয়।" অদূরাগত বিপ্লবের শিখা প্রতিবিম্বিত হয় ছেলেটির কথার সুরে।

একদল উঠে বেরিয়ে আসে বাইরে—গোপন পরামর্শ করে কড়া ভাষায়। ছোট ছোট দলে ময়দানের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আরও অনেকে।

পৃথ্বীও উঠে আসে, বুকষ্টলের বইগুলির উপর চোখ বুলিয়ে একটু দেখে। একজন প্রবীন জার্নালিষ্ট এগিয়ে আসেন পৃথ্বীর দিকে, "কি সাহিত্যিক, কেমন মনে হচ্ছে ? এবারত বিপ্লব এসে গেল।"

বিশ্বাস, না অবিশ্বাসের সুর স্পষ্ট বোঝা গেল না। পৃথ্বীও সংক্ষেপে উত্তর দেয়, "এসে যাওয়াটাইত চাই।"

কিছুদূরে এক মুড়ি-ছোলাভাজাওয়ালাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে একদল ছেলে। অদূরে পকেট থেকে চিনেবাদাম বের করে একমনে চিবুচ্ছে সন্দেহজনক একটি লোক। আধময়লা সার্ট গায়ে।

আবার চমকে ওঠে ময়দানের এলোমেলো ছড়ানো শ্রোতারা—আকাশের গা ফুঁড়ে গর্জে উঠেছে শ্রমিক নেতার গম্ভীর আওয়াজ "...বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। পুরানো সংস্কারবাদের ভণ্ড আবরণ ছিঁড়ে ফেলতে হবে একবিন্দু মমতা না করে।"

চিনেবাদাম খাওয়া থেমে যায় আধময়লা সার্ট-গায়ে লোকটির। আরও ক'জন এগিয়ে এসে জড়ো হয়। পুরানো আমলের আই-বির লোক সব। সেই পুরানো অক্ষয় বাবু। হোম-ইণ্টারনমেণ্টের সময় পৃথ্বীর সঙ্গে তার বাড়ী গিয়েছিল। মাথার চুলটি পর্যন্ত ঠিক তেমনি আছে। শুধু গায়ে আর্দ্দির পরিবর্তে খদ্দরের পাঞ্জাবীটি একমাত্র নূতনত্ব।

হাসে একটু পৃথ্বী আপন মনেই। এই খাঁটি খদ্দরের তলা থেকে নকল মানুষদের বাছাই করা সোজা কাজ নয়।

পৃথ্বীর দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জিত হাসি হাসেন অক্ষয়বাবু। সভার চারদিকে ঘিরে ভলান্টিয়াররা লাঠি হাতে প্রস্তুত রয়েছে, যে কোনও অবাঞ্ছিত মুহূর্তের জন্য। কিন্তু মনে হচ্ছে, প্রতিদ্বন্দ্বী দল বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়েছে লোকসংখ্যা দেখে।

বক্তার জোরালো কথাগুলি বায়ুতরঙ্গে কেঁপে কেঁপে ভেসে যাচ্ছে যেন এই ময়দানের সীমানা ছাড়িয়ে—বহুদূরে, গ্রাম গ্রামান্তরে, ক্ষেত খামারে,

গোলাবাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে। যেন সেই ধানকাটা জমির বুক থেকে উঠে এসেছে কৃষকশহীদের অপূর্ণ কামনার অন্তিম আহ্বান—যে ডাক আকুলিত হয়ে উঠেছে বেদনাক্ষুব্ধ সন্ধ্যাকাশের তলায়, জনাকীর্ণ ময়দানের প্রতিটি তৃণ শীর্ষে।

অগ্নিশিখার মত সূর্যাস্তের লাল রশ্মি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে 'ডাবাসের' লাল পতাকা লহরীর গায়ে। এক তেজোদ্দীপক রক্তিমাভায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে বক্তার দৃঢ়, অনমনীয় দেহভঙ্গী। অভিভূত জনতা শপথ গ্রহণ করে মনে মনে। আমরণ বিপ্লবের অঙ্গীকার। ক্ষমা নাই, ক্ষমা নাই আর।

শেষ বক্তা বলে চলেছেন, "এতকাল আমরা যা বলেছি, তা সবই ভুল। আজ থেকে যা বলছি, তাই একমাত্র ঠিক।

শ্রোতাদের চোখে চোখে নেমে-আসা শ্রদ্ধার ভাষা পড়ে নেন বক্তা ; আবার হারিয়ে ফেলেন নিজেকে কথার আড়ালে।

কি স্পষ্ট স্বীকৃতি ! কি নির্ভুল বিশ্লেষণ। শ্রোতাদের মনের জমানো কথাগুলিই যেন টেনে টেনে বের করে দিচ্ছেন বক্তা।

শ্রোতাদের চোখে মুখে ছাপিয়ে উঠেছে সমর্থনের রক্তাভা, লক্ষ্য করেন বক্তা। তারপর নেমে আসেন সভামঞ্চ থেকে।

সভা শেষ হয়। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ময়দানের একধারে দাঁড়িয়ে দেখে পৃথ্বী সভাভাঙ্গা জনতার সুপ্তিভঙ্গের উন্মাদনা : উত্তেজনার বীজাংকুরিত পোষ্টারের পর পোষ্টার, রাজপথ কম্পিত সংঘধ্বনি, "তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ।"

রাজপথের দুইধারের হাজার "পাওয়ারের" বিদ্যুৎ-আলো প্রতিফলিত হচ্ছে লক্ষ মানুষের প্রতিহিংসা কুঞ্চিত চোখে চোখে। ধনী-মানুষের এ সুখ তারা কেড়ে নেবেই। হাজার "পাওয়ারের" প্রতিহিংসার বৈদ্যুতিক তেজ ঠিকরে পড়ছে দৃষ্টির অতল থেকে।

পৃথ্বী মৌন হয়ে লক্ষ্য করে এ উত্তেজনা। বক্তাদের ওজস্বিনী বক্তৃতা একটা কড়া ওষুধের মতই একমুহূর্তে ক্রিয়া শুরু করেছে। অতিদ্রুত ক্রিয়া শুরু হয়েছে। নিজের মনে চিন্তা করতে করতে পাশেই একটা পরিচিত রেস্ট্রেণ্টে ঢোকে সে। কোণার দিকের একটি ছোট টেবিলের তিনটি আসন আগেই পূর্ণ হয়ে আছে। শিবশম্ভুবাবু, মহিমদা আর স্বরাজ সোৎসাহে আলোচনায় মত্ত। পৃথ্বীকে দেখে, খালি চেয়ারখানা নিঃশব্দে এগিয়ে দিয়ে পূর্বোক্ত আলোচনার জের টেনে বলেন মহিমদা, "এর কি অর্থ হয় ? এসব কথা খোলা ময়দানে কি না বল্লেই হোত না ?"

স্বরাজ কথা কেড়ে নিয়ে মুখের উপর একটা অবজ্ঞামিশ্রিত হাসির রেখা টেনে বলে, "এত কেবল শুরু। এখনি কি দেখলেন। ওঃ, আমি আমার আনন্দ আর চেপে রাখতে পারছিনা। আমি কিন্তু অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, ওর পতন একদিন আসবেই।"

শিবশম্ভুবাবু একটি চুরুট বার করেন। স্বরাজের কথার পিঠে জের টেনে বলেন, "হ্যাঁ, প্রতিক্রিয়াত হবেই, মহিমবাবু। শোহনলাল যা করেছেন এতদিন, তা' বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। ভাবুন দেখি একবার—উন-ত্রিশে জুলাইয়ের ধর্মঘটের প্লাবন—নৌ-বিদ্রোহ আর ভারতব্যাপী কিসান আন্দোলনের জোয়ার। কোথায় গেল সেসব। লেজুর মনোবৃত্তির অনিবার্য ফল হচ্ছে এই ব্যর্থতা। সংস্কারবাদে ঘূর্ণিপাক খেতে খেতে আমরা প্রায় তলিয়ে গিয়েছিলাম আর একটু হলে। তরুণবাবুর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এই ভুলের জাল খুলে ধরার জন্য।"

স্বরাজ শিবশম্ভুবাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে চাপা গলায়, "দেখুন শিববাবু, আমি আজ বলে দিচ্ছি, এই শোহনলালকে না তাড়িয়ে আমরা ছাড়বো না।" প্রতিহিংসার কুটিল কামনা উঁকি মেরে মিলিয়ে যায় চোখের কোণায়।

মহিমদা মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন, "এভাবে চিন্তা করাটা কিন্তু ঠিক হবে না। তাঁকে সুযোগ দেওয়া উচিত। বিশেষ, নিজের ভুল যখন তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছেন।"

স্বরাজের কাছে এ মৃদু আপত্তি অপ্রত্যাশিত। সে একটু চেঁচিয়েই বলে, 'সেদিন মাত্র এসেছেন কিনা, এখনও অনেক বুঝতে বাকী আপনার।'

মহিমদা ব্যথিত হন এ অন্যায় আক্রমণে। আর কিছু বলেন না। বোঝেন এদের কাছে কিছু বলে আর লাভ নেই।

পৃথ্বী সর্বক্ষণ মৌনই থাকে। ভিতরে ভিতরে বড় অস্বস্তি বোধ করে সে। পার্টির নীতি পরিবর্তনকে সমর্থন করেছে সে, কিন্তু স্বরাজের ধরনের কথাবার্তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না পৃথ্বী। স্বরাজের রাজনৈতিক জীবনের ধাপে ধাপে ক্রমোন্নতির পেছনের খবর এরা কেউ না জানলেও সে ত ভাল ভাবেই জানে।

মোহনলালের নাম ছাড়া আর মুখে কেউ কোনও কথা শোনেনি এতদিন পর্যন্ত। মোহনলালের সই নকল করা থেকে পান দোক্তা খাওয়াও সে শুধু নকলই করলো না, তার ভক্তমহলেও আমদানী করলো। এ না খেলে নাকি গলা পরিষ্কার হয় না। এখন আবার ঠাকুর ছাড়া আর কথা নেই। ঠাকুরের পাণ্ডিত্য, তার বলবার ভঙ্গি, মানসিক উৎকর্ষ, এমন নাকি আর হয় না।

এই রাতারাতি বদলে যাওয়াকে পৃথ্বী কোনমতেই বরদাস্ত করতে পারে না। একে নিছক সুবিধাবাদ বলতে চায় সে। কিন্তু কোন কথা না বলেই উঠে পড়ে, "উঠলাম, আরেক জায়গায় যেতে হবে।"

মহিমদা মৃদুহাস্যে বলেন একবার, "চললে?" স্বরাজ লক্ষ্যও করে না। নিজের আলোচনাতেই মত্ত।

পৃথ্বী বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। বন্ধুদের চোখে মুখের উত্তেজনা বারে বারে

ছায়া ফেলছে চোখের পর্দায়, কিন্তু মনের পর্দায় সাড়া দিচ্ছে না। কোথায় যেন মস্ত একটা খাদ লুকিয়ে আছে অন্ধকারে। গভীর চিন্তায় তলিয়ে যায় পৃথ্বী। হঠাৎ চিন্তার সুর একেবারে ছিঁড়ে যায় কাকে দেখে। পৃথ্বী অবাক হয়ে উচ্চারণ করে ওঠে, "ফল্গু!"

একেবারে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে থেমে পড়েছে দু'জনে রাস্তার মাঝে। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের বিহ্বলতা দুজনেরই চোখে মুখে। চোখ ছাপিয়ে খুশি ধরা দিয়েছে ফল্গুর। কিন্তু পৃথ্বী একটু ম্লান হয়ে যায় ভিতরে ভিতরে।

উল্লসিত হয়ে পৃথ্বীর হাতটা চেপে ধরে ফল্গু। পৃথ্বী আড়ষ্ট সুরে প্রশ্ন করে, "এখন কি করছো?"

ফল্গু অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকায়, এ কেমন ধারা প্রশ্ন পৃথ্বীদার মুখে এতদিন পর প্রথম সাক্ষাতে? পৃথ্বীরও কানে বেসুরো লাগে নিজের অবান্তর প্রশ্নের প্রতিধ্বনি। আরও বিভ্রান্ত বোধ করে সে।

ফল্গু জোর করেই যেন পৃথ্বীর এই আড়ষ্ট ভাবকে লক্ষ্য করে না। আন্তরিক সুরে বলে, "চলুন পৃথ্বীদা একটু বসা যাক। কতকাল পর দেখা। কত কথা জমে আছে। জেল থেকে বেরিয়ে আপনি যে কোথায় হারিয়ে গেলেন।" স্তিমিত হয়ে আসে ফল্গুর গলার স্বর, "কোলকাতায় যে ছিলেন না, সে খবর অবশ্য জানতাম, শুনেছিলাম বোম্বেতে আছেন আপনি। তারপর, কদিন যাবৎ এসেছেন এখানে। এই কংগ্রেস উপলক্ষেই বুঝি?" "না, প্রায় বছর খানেক হলো এইখানেইত আছি।" "বছর খানেক! আশ্চর্যত। তাও একবার খোঁজ করেন নি। কতদূরে সরে গিয়েছেন পৃথ্বীদা!" ফল্গুর কথায় গাঢ় বেদনা ফুটে উঠে। পৃথ্বী লজ্জিত হয়।

কি ভেবে নিয়ে ফল্গু বলে, "অথচ দিদিকে যদি গ্রহণ করতেন আপনি, কত আপনার জন হতেন আজ।"

চমকে উঠে পৃথ্বী। এসব কি বলছে ও। বহুদিনের পুরানো ক্ষত

নিয়ে আবার কেন নাড়া দিচ্ছে। 'দিদিকে যদি গ্রহণ করতেন আপনি!' দিদিকে অর্থাৎ শীতাকে ?

একি সুগভীর আলোড়ন অনুভব করছে পৃথ্বী বুকের ভিতরে! তীরের মত বিঁধছে ফল্গুর প্রতিটি কথা : "বিয়ের দিনে সারা দিন সারাটা রাত শুধুই কেঁদেছে দিদি। সবাই ভেবেছে বাপের বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার ব্যথায়ই এত কান্না। একমাত্র আমি শুধু চুপ করে ভেবেছি বিয়ে বাড়ীর কাজের ফাঁকে—যে ব্যক্তির জন্য এ কান্না, কারাপ্রাচীর ভেদ করে তার কানে এ কান্না পৌঁছুবে কি না। দিদিকে কত বুঝিয়েছিলাম, অন্ততঃ পৃথ্বীদা জেল থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। কিন্তু আপনিত চিনতেন তাকে; কি ভীষণ আত্মাভিমানী মেয়ে। কিছুতেই রাজী করাতে পারলুম না। অটল প্রতিজ্ঞা তার 'নিজেকে শেষ করে দেবো, তবু তার কাছে ভিক্ষে চাইতে পারবো না—সে যখন আমার মনকে জেনে, বুঝেও গ্রহণ করতে পারলো না। তবে একটা কথা বলে যাচ্ছি আমি যখন তাকেই ভালবাসি, সে আমাকে ভুলতে পারবে না কোনদিন।"

তারপর একটু অনুযোগভরা সুরে বলে ফল্গু, "আজও দিদি ভুলতে পারেনি আপনাকে। এখনও আপনার মত বোধ হয় সে কাউকেই শ্রদ্ধা করে না। আর আপনি জেল থেকে বের হয়েও একবার খোঁজ নিলেন না তার ?"

পৃথ্বী অনুভব করে, তার শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে এক অনির্বচনীয় বেদনার হিমস্রোত। সাত বছর ধরে যাকে ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারেনি পৃথ্বী, সেও তারই অজান্তে ভালবাসছে তাকেই! জেল থেকে বেরিয়ে—খোঁজ নিয়ে পৃথ্বী জেনেছে, শীতা আছে তার স্বামীগৃহের এক আধা-জমিদার-বনিয়াদী ঘরে। তারপর শুধু ভুলতেই চেয়েছে সে তাকে বহু তারাভরা রাত্রির নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে, বহু জ্যোৎস্নাপ্লুত ভাষাহীন নিস্তব্ধরাতে।

কিন্তু আজ একি আলোড়িত জটিল কাহিনী নিয়ে এলো ফল্গু এত বছর পর।

প্রায় সাতবছর আগের কর্মঠাসা একটি ধূসর সন্ধ্যায় লেখা তার শেষ চিঠি এমন করে আঘাত দেবে শীতাকে, জানতো না ত পৃথ্বী। দীর্ঘ ক'বছর পর আবার জ্বল জ্বল করে ওঠে তারই লেখা সেই ছোট্ট কয়টি অক্ষর—"ব্যক্তিগত জীবনের মায়ায়—আমার মহান আদর্শকে ঘিরে ফেলতে চাই না শীতা। একটি মাত্র গৃহ-কোণের মমতায় লক্ষ লক্ষ মানুষের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারিনা। তোমার সুখী জীবন কামনা করি গৃহান্তরে।"

ব্যক্তিগত জীবনের সুরকে নিশ্চিহ্ন করার দাবী উঠেছে তখন পৃথ্বীর সমাজ চেতনায়। উনিশ শ' চল্লিশ সালের মাঝামাঝি, দ্রুত তালে বেজে উঠেছে যুদ্ধের দামামা। সেই রুদ্র দামামার তালে ঝাঁপিয়ে পড়ে পৃথ্বীও—নির্বাসিত হয় সে কারাভ্যন্তরে।

তার শেষ চিঠির জবাব পায়নি সে শীতার কাছ থেকে। জবাবের আশাও রাখেনি। কিন্তু সত্যি কি কোনও আশা রাখেনি পৃথ্বী? দিনান্তের ক্লান্ত শয্যায় তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের পাতায় জড়িয়ে থাকেনি কি তার একটি সোনালী আশা? একটি মধুর প্রত্যাশা? অন্তরের লুক্কায়িত একটি রূপালী বাসনা—"শীতা অপেক্ষায় থাকবে তারই কামনায়।"...

বেদনায় বুকভাঙা সুরে বলে ফল্গু, "পৃথ্বীদা দিদিত, আপনাকে ভালবাসতো। সেই জোরেইত আপনিও পারতেন তাকে আপনার আদর্শের সাথী করে নিতে।"

সেই বালক ফল্গু! সেও বুঝেছিল, জীবনের মর্মকথা বিদায়ে নয়—গ্রহণে। আর পৃথ্বী? একি ভ্রান্তসুরে সে রচনা করেছিল জীবনের মহাদীক্ষা।

জিরিয়ে জিরিয়ে বলে চলে ফল্গু, "জামাইবাবুকে দিদি ভালবাসতে পারেনি, তবু তার মৃত্যুওত সে চায়নি। কিন্তু একেবারে শেষ সময়ে ধরা পড়েছে কঠিন যক্ষ্মারোগ। তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য কি ঐকান্তিক সেবা করছে সে এই দুই বছর ধরে! আকুল আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাকে ভাল করার জন্য। কৌশলিতে আছে দিদি এখন জামাইবাবুকে নিয়ে।"

রক্ত জমে জমে যেন ভারি হয়ে উঠেছে পৃথ্বীর হৃদযন্ত্রটা। শীতার এই নিষ্ঠুর আত্মনির্যাতনের পাণ্ডুর ছায়ায় ঢেকে ফেলেছে তারও সর্বাঙ্গ। আকুঞ্চিত অন্তরের অবশ চেতনা।

ফল্গু অন্ধকারের মধ্যে টের পায়না পৃথ্বীর এই অসাড় অবস্থা। অন্য কথা আরম্ভ করে সে। তার রাজনৈতিক জীবনের কবে থেকে এক, কি কত তার বিস্তৃতি। দীর্ঘ সাতবছরের পুরানো কথা। কত পুরানো বন্ধু সব গিয়েছে দূরে। আবার দূরে যারা ছিল, এসেছে নিকটে। কথা আর শেষ হয় না। নীরবে শুনে যায় পৃথ্বী।

ফল্গু উঠে পড়ে, "চলি পৃথ্বীদা। ডেলিগেটদের ক্যাম্প পাহারা দিতে হবে সারারাত। ক্যাম্প আক্রমণ করবে নাকি শুনছি বিপক্ষ দল। কাল একবার দেখা করতে চেষ্টা করবো। তারপর আমিও কিছুদিনের জন্য যাব দিদির কাছে। জামাইবাবুকে নিয়ে একা আছে সে।" ফল্গুকে বাসে তুলে দিয়ে এসে আবার বসে পৃথ্বী সেই শিওগাছতলায়। অবস মন। অবসন্ন দেহ।

রাত অনেক। সম্মুখের রাজপথে লোক চলাচল কমে এসে রাস্তার পুলিশগুলিকেই শুধু স্পষ্ট করে তুলেছে—আর গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়া ভিখারীদের।

বহুদূরে জ্যোৎস্নার গায়ে পাতলা কুয়াশার আবরণ। কুয়াশার ভিতর থেকে অস্পষ্ট আভাস দেখা যাচ্ছে দূর রাস্তার বাতিগুলির।

ময়দান একেবারে ফাঁকা। পৃথ্বী ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকায় দূরে, আকাশের দিকে। বায়োস্কোপের ছবির মত চিন্তার পর্দায় দ্রুত ছায়া ফেলে চলেছে অবিস্মৃত অতীতের বহু অসম্পূর্ণ অংক। ধীরে ধীরে পা চালায় পৃথ্বী। একটা অপেক্ষমান বাসে উঠে বসে যন্ত্রচালিতের মত। ময়দানের পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে বাস। মোহাবিষ্ট চোখের ছায়ায় বেদনার্ত শীতের রাত্রির কত অনুনয় বিনিয়ে বিনিয়ে ডাকে।

পৃথিবী, তোমার এই বিশাল ব্যাপ্তির অলক্ষ্য অন্তরালে লুকিয়ে আছে কত দুঃখ, কত সংগোপন বেদনার সকরুণ ক্রন্দন। সেই অনাদি অনন্ত ক্রন্দন ধারাই বয়ে বয়ে চলেছে কুয়াশা জড়ানো শীতার্ত রাত্রির বুকে বায়ু তরঙ্গের স্তরে স্তরে। পৃথিবীর এই অনন্ত কান্নার মাঝে শীতা, তোমারও কান্না বুঝি মিশে আছে। তাই বুঝি এই অশ্রুসিক্ত বায়ুকণিকার শীতস্পর্শ এমন করে অবশ করে দিয়েছে আজ পৃথ্বীকে।

শিথিল পদক্ষেপে বাস থেকে নামে পৃথ্বী। আবার দ্বিতীয় বাসে উঠে। শহরতলীর শেষ বাস। দুইধারের বিস্তীর্ণ শস্যকাটা জমির বুকেও বয়ে চলেছে সেই একই কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রির দীর্ঘশ্বাস।

তারপর সেই নিরাভরণ রিক্তা জমি হঠাৎ থেমে যায় নূতন ঐশ্বাবী বড়লোকদের বাড়ীর প্রাচীরের আভিজাত্যময় সীমানায়। পৃথ্বী পরিচিত চোখে তাকিয়ে দেখে কোন এক ধনীর প্রাসাদের বহির্দ্বারে বসা নেপালী দরওয়ানকে। তার ঘুমজড়ানো চোখে নেমে এসেছে ঘরোয়া জীবনের টুকরো ছবি। হয়তো কোনও ঘাগড়া পরা মেয়ের বিদায় চাউনি।

দরওয়ানটিকে চেনে পৃথ্বী। উল্টোদিকের বটতলার চায়ের দোকানে বসে চায়ের খুরিতে চুমুক দিতে দিতে বহু গল্পই শুনেছে সে তার মুখে—সুদূর পাহাড়ী নদীর গাঁয়ের এক সাহসী মেয়ের মোলায়েম কাহিনী। শুধু টাকা রোজগারের জন্যই নেমে এসেছে নেপালী ছেলে, সেই যাদু চাউনি ভুলে।

"টাকা না হলে কি সুখে ঘর করা যায় ?"

অতি সত্যি কথা। টাকা না হলে সুখে ঘর করা যায় ? তাইত পৃথ্বীও চলে এসেছে একান্ত বাঞ্ছিত গৃহ কোণের আহ্বান উপেক্ষা করে। কিন্তু শুধু তার একার প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্যই এ পথে বের হয়নি সে। কোটি কোটি মানুষের শাশ্বত প্রেমের মর্যাদা দিতেই ত, পৃথ্বী, তুমি এত দুঃখ দিয়েছ তোমার প্রেমকে।

ঐ প্রবাসী নেপালী দরওয়ানের রুক্ষ বক্ষ পঞ্জরেও বয়ে চলেছে যে সেই একই ব্যথার দীর্ঘ অনুনয়।

অসমান পথে ঠোক্কর খেতে খেতে বাস ষ্ট্যাণ্ডে পৌছায় শহরতলীর শেষ বাস।

পৃথ্বী মন্থর পায়ে হেঁটে চলে রেললাইন পেরিয়ে শহর ছাড়িয়ে মাটির রাস্তায়। ভাঙা মসজিদের ধারে কামিনী গাছটাকে ঘিরে ঘিরে অসংখ্য জোনাকি জ্বলে উঠেছে—আর মাথার উপরে জ্বলছে লক্ষ লক্ষ তারা।

পৃথ্বী মনে মনে আকুল স্বরে বলে, শীতা, আমার প্রেমের সাক্ষী আকাশের ঐ লক্ষ তারা। তোমার ঘুমভাঙা রাত্রির আকাশের ঐ অর্বুদ তারার ইশারায়ও কি তুমি টের পাও নাই আমার অন্তরের গভীরতম সত্যকে। বিবাহ বাসরের একটি মাত্র ধ্রুবতারা চিরন্তনী প্রেমের সাক্ষী। আর এই লক্ষ তারার সাক্ষ্যও কেন তোমার চোখে ধরা পড়লো না, শীতা!

ভ্রান্ত মুহূর্তে লেখা আমার আত্মছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে একি করেছ শীতা? ধূপের মত নিজেকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে তারপর ধরা দিয়েছো তুমি। শুধু অনুভব করতে হবে তোমার দেহহীন সত্তাকে, তোমার দেহকে নয়। কিন্তু হৃদয়। হৃদয়কে গ্রহণ করা যায় নাকি, পৃথ্বী। ভিতরের শাসন ঋজু হয়ে উঠে। না পৃথ্বী, তোমার কামনার জালবোনা হৃদয়েত আহ্বান করার পথ নেই হৃদয়ান্তরে গৃহীতা নারীকে।

শীতা, পৃথিবীর কাছে আমার দৃঢ় বাহুর প্রয়োজন বড় বেশী। আমাকে আর দুর্বল করোনা তুমি। তোমার স্বামীর আরোগ্য কামনা করি। স্বামী আর সন্তানদের নিয়ে সুখী হতে চেষ্টা করো তুমি। আর মুক্তি দাও আমাকে এই দুঃসহ রাত্রির অভিশাপ থেকে।

কিন্তু পৃথিবীর মানুষ, কি করে বোঝাব তোমাদের, কি তীব্র এই অনন্ত কামনাময় রাত্রির যন্ত্রণা।

শীতাকে দুঃখ দিয়েছি আমি, হৃদয়ের বান্ধবী রূপে একদিন গ্রহণ করেছি যাকে—অন্ধকার রাত্রির প্রহেলিকায় একি করুণ গুঞ্জন বয়ে চলেছে।

কিন্তু শীতা আজও ভোলে নাই তাকে। কামিনী ফুলের মৃদু গন্ধের মত অতনু প্রেমের একি সুরভিত ঘ্রাণ প্রাণ ভরে গ্রহণ করছে পৃথ্বী। রহস্যময় বেদনার শিহরণ জড়িয়ে ধরেছে অঙ্গে অঙ্গে। শীতা আজও ভোলে নাই তাকে।

না, না, আজকের এই তারাভরা রাত্রির গভীরতায় মুক্তি আমি চাইনা। ভালবাসি আমি তোমাকে শীতা, ভালবেসেছি সাতবছর ধরেই—একথা শুধু মাত্র আজকের এই নক্ষত্রময় রাত্রির কাছে বলতে দাও নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বিধায়। শুধু একটি রাত্রির জন্য এই প্রেমকে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করতে দাও আমার মনের নিভৃতে।

তারপর প্রতিরাতে ঐ আকাশের বুকে জ্বলবে লক্ষ লক্ষ তারা, আর পৃথ্বী তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে পৃথিবীর কোটি মানুষের মাঝে···।

রৌদ্রের স্নিগ্ধ ধারায় ঘুম ভেঙে যায় পৃথ্বীর। তৃষ্ণার্ত দুই চোখ ভরে গ্রহণ করে সে এই দীপ্ত রৌদ্রের আশীর্বাদকে। আকণ্ঠ পান করে এই নব কিরণামৃত। এই রোদকেই যেন সে কামনা করছিল তার দুর্বল রাত্রির অবেচেতন মনে। প্রাণের আশ্রয—এই নির্মল আলোর ধারায় উজ্জ্বল পৃথিবীর বলিষ্ঠ মানুষ।

প্রেমার্ত রাত্রির অবসাদ ধুযে গেছে তাপময় স্নিগ্ধ ধারায়। পরাজিত যৌবনের কান্না থেমে গেছে নবজীবনের সুরে। নীচে বন্ধুদের মুখর কলকণ্ঠ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভেসে আসছে মধুর আশার ধ্বনি।

গলা ছেড়ে সুকান্তর কবিতা আবৃত্তি করছে অরুণাংশু—"যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ—প্রাণপণ পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল।" পৃথ্বী মনে মনে বলে ওঠে—ঐত জীবনের ভাষা—আত্মার জয়গান। মুক্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে

সে মনে মনে, "শীতাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু পথভ্রষ্ট করতে পারবেনা আমাকে আমার এ প্রেম।"

পৃথ্বী বেরিয়ে আসে নীচে রোদবিছানো বারান্দায়। চা দিয়ে গিয়েছে ভীমার্জুন।

উল্টোদিকের ধোপাবাড়ীর উঠোনেও রোদ পোহাতে বসেছে ধোপাদের ছেলেমেয়েরা, কলাইকরা চায়ের গ্লাস আর আটার শক্ত বাসি রুটি একখানা করে হাতে নিয়ে।

ঢেলোর ঠাকুরদা কাশতে কাশতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে জীর্ণ মলিন কাঁথাখানা গায়ে জড়িয়ে।

গোবর দিয়ে মসৃণ করে লেপা আমগাছতলাটায় বসে রোদ পোহায় আর কাশে। সারাজীবন ধরে গাহেকদের কাপড় কেচে কেচে ফুসফুসের শক্তি নিস্তেজ হয়ে এসেছে এই পড়ন্ত বেলায়। বেঁক-যাওয়া বুড়ো হাড়গুলি আরও বেঁকে যায় এ ভয়ংকর কাশির চোটে।

ধোপা-বৌয়ের চার বছরের ছেলে, ঢেলো অতি কষ্টে চা ভর্তি একটা কলাই উঠে-যাওয়া গ্লাস, এনে দেয় ঠাকুরদার সামনে। "চা খাও।" শিশুকণ্ঠে মমতা ঝরে পড়ে, "চা খেলে কাশি কমে যাবে।"

"এই ঢেলো, বুড়োর রুটি নিয়ে গেলিনা?" ঘর থেকে ডেকে বলে ঢেলোর মা।

হাশিয়াও বসে, এসে রোদ ঐ একই নমুনার চায়ের গ্লাস হাতে। সবশেষে ঢেলোর মা এসে বসে চা রুটি নিয়ে।

প্রতি সকালেই ছাদ থেকে দেখে পৃথ্বী—ধোপাবাড়ীর এই প্রাতরাশ।

ঢেলোর বাপ চলে গিয়েছে 'কারবালা ট্যাঙ্কে' কাপড় কাচতে। প্রকাণ্ড কারবালা পুকুরের চারপাশ থেকে আছড়ে আছড়ে আসে কাপড়-কাচার শব্দ।

সবল পেশীর জীবন সংগ্রামের সেই প্রতিধ্বনিগুলি নিস্তরঙ্গ দীঘির বুক

ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত গ্রামে—রেললাইনের বুকে—ইউনিয়নবোর্ডের প্রান্ত সীমানায়।

পৃথ্বী চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ে রথীর খোঁজে। হাশিয়া তার ছাগলটাকে মাঠে দিতে চলেছে—পৃথ্বীকে দেখে অকারণে মুচকি একটু হাসে। এ অন্তরঙ্গ হাসির ছোঁয়াচ লাগে পৃথ্বীরও চোখে মুখে।

হাশিয়া ধোপাবৌয়ের আশ্রিতা।

ধোপারা দুই তিন পুরুষ ধরে এ অঞ্চলের বাসিন্দা। বিহারী মুসলমান। কিন্তু বহু বছর ধরে এদেশে থেকে কথাবার্তায় আচার ব্যবহারে সবই বাঙালীর মতই হয়ে গিয়েছে। আদিম দেশের বাড়ীর চিহ্নও নেই।

পৃথ্বীর বাড়ীর ঠিক উল্টোদিকে ধোপাদের বহু পুরানো টালির ঘরখানা বহুকাল ধরেই দাঁড়িয়ে আছে কোনমতে। লাউ-সীমের লতাগুলি সবুজ বাহু বেষ্টনে লতিয়ে লতিয়ে জড়িয়ে ধরেছে লাল টালির চালাখানাকে।

পৃথ্বীর সাথে আসতে যেতে যখন তখনই দেখা হয় হাশিয়ার। সব সময়ই খুশি খুশি ভাব। কে বলবে হাশিয়া ভিখারী কন্যা। দুর্ভিক্ষের বছর এই কারবালা পুকুরের ধারেই তার মা মারা গিয়েছে, পৃথিবীতে তাকে একেবারে একলা রেখে। বছর তের বয়স। হাবে ভাবে নিখুঁত পূর্ণ কিশোরী। জটার কাচতে-আনা কাপড়গুলি থেকে বাছাইকরা সুন্দর রংয়ের শাড়ি একখানা সব সময়ই আছে তার পরনে। একগোছা অব্যবহার্য চাবি আঁচলে বেঁধে টিপকল থেকে জল নিতে আসে হাশিয়া পৃথ্বীদের বাড়ীতে।

পৃথ্বী তাকিয়ে দেখে হাশিয়াকে—কেমন একটা মায়া লাগে মনে। পরের বাড়ীর বৌয়ের শাড়িখানাও কেমন সুন্দর গুছিয়ে পরিপাটি করে পরে বসেছে।

ভিখারী দুহিতা। কিন্তু কিশোরী কুমারীর সহজাত সাজসজ্জার কামনা যাবে কোথায়। পরগাছার মত লতিয়ে উঠতে চাইছে শুধু মাত্র জীবনের

আকর্ষণেই। এ ভঙ্গুর সমাজের মেয়ে বলেইত আজ এ বয়সের মেয়েকে পাতা কুড়িয়ে, গোবর কুড়িয়ে জীবনের রস পেতে হচ্ছে।

রথীকে বাড়ীতে না পেয়ে সুমিত্রার বাড়ী যায় পৃথ্বী। এক পাড়াতেই থাকে ওরা। শিবশম্ভুবাবুও থাকেন এ পাড়াতেই। সংবাদটা সুমিত্রাই পারবে ওদের কাছে পৌঁছে দিতে। আরেকদিন এসেছিল পৃথ্বী এ বাড়ীতে। সুমিত্রার ছোট বোন সাগরীর সাথেই প্রথম দেখা হয়। রথীর সাথে বিয়ে স্থির হয়ে আছে ওর। সাগরী স্কুলে কাজ করে, আর সুমিত্রা কাজ করে রথীদের কলেজে।

পৃথ্বী ঘরে বসে লক্ষ্য করে, ঘরের নিঁখুৎ পরিচ্ছন্নতা। দেখে মনে হয় ওদের জীবনধারাও এমনি পরিচ্ছন্ন গতিতেই বয়ে এসেছে চিরদিন, কোনও আবর্ত সৃষ্টি হয়নি কখনো।

কিন্তু তা নয়। পৃথ্বী জানে, এই দুই বোনের জীবনের ঘূর্ণীবাত্যার খবর। আগষ্ট আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে মারা যায় সুমিত্রার মা-বাবা একই মিছিলে। যে পতাকা খানি হাতে নিয়ে তার মায়ের শেষ নিঃশ্বাস পড়ে সেই পতাকার সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি সুমিত্রা। তার খদ্দরের বেশভূষায় সংযমে আর দৃঢ়তায় আজও সেই পূর্বেকার পরিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাগরী বের হবার জন্য আগেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। পৃথ্বীকে বলে, "আপনার কাছে আমাদের বর্তমান রাজনীতির আলোচনা শোনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমাকে বের হতে হচ্ছে এক্ষুনি, স্কুলের কাজে।"

কথার আন্তরিকতাটুকু লক্ষ্য করে বলে পৃথ্বী, "বাড়ী যখন চেনা রইলো— তখন মাঝে মাঝে এসে আলাপ আলোচনাত নিশ্চয় করবো"

সাগরী বের হতে হতে বলে, "সুমিত্রাদি টিউসনিতে গিয়েছে এখুনি আসবে। আপনি ততক্ষণ পত্রিকাটা দেখুন।"

দিনের পত্রিকাখানা দিয়ে চলে যায় সাগরী। কিন্তু পত্রিকা পড়েনা পৃথ্বী। ঘরখানাই দেখে বসে বসে। একখানা মাত্র ঘর—তাই প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য প্রতিটি জিনিসই রয়েছে ঘরে। কিন্তু এত সুন্দরভাবে গোছান, যে মনেই হয়না, এত কিছু জিনিস রয়েছে ঘরে।

দেয়ালে টাঙান তিনজন মনীষীর ছবি। ঘরের এক কোণায় একটি দেশী কুঁজোয় কিছু শ্বেতপদ্ম। কুঁজোর গায়ে তুলি, রং দিয়ে বিচিত্র নক্সা আঁকা। অনুমানেই বোঝে, এ নিজেদেরই হাতে আঁকা।

মনে মনে একটু কৌতূহলী হয়েই ভাবে পৃথ্বী, এরা কম্যুনিষ্ট হ'ল কি করে। নিজের মনেই আবার উত্তর খুঁজে নেয় সে,—গান্ধীজীর আরব্ধ অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তার সফলতা মিলতে পারে একমাত্র সাম্যবাদের পথেই, এ সত্যের সন্ধান পেয়েছে বলেই হয়তো এ পথে এগিয়ে এসেছে ওরা গান্ধীবাদ থেকে সাম্যবাদে।

সুমিত্রা মেয়ে পড়িয়ে ঘরে ফেরে। পৃথ্বীকে দেখে বিস্মিত হয়—"কোনও জরুরী খবর নিশ্চয়ই।" "অজরুরী সংবাদ নিয়ে এ বাড়ীতে আসা নিষেধ নাকি ?" সহাস্যে বলে পৃথ্বী।

ভিতরে ভিতরে একটু আরক্ত হয়ে উঠে সুমিত্রা কিন্তু বাইরে তার কিছু প্রকাশ পায় না।

প্রদীপ শিখার মত ধুম্র মৌন এক স্নিগ্ধ দীপ্তি ঝরে পড়ে সুমিত্রার অতলস্পর্শী চোখ দুটি হতে। পৃথ্বী মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারে না এ দীপ্ত দৃষ্টিকে।

সুমিত্রা তার স্বভাবসুলভ বিনীত হাসির সাথে বলে, "বিশেষ কোনও জরুরী কাজ ছাড়া আপনি আসবেন এ বাড়ীতে, বিশ্বাস হয় না।"

কণ্ঠস্বরের মধুর দৃঢ়তায় সজাগ হয়ে উঠে পৃথ্বী। যুগের পদবিক্ষেপের সাথে এগিয়ে চলা এই শাণিত মেয়েটির সামনে একটি মুহূর্তও অপব্যয় করা চলে না ব্যক্তিগত হৃদয়ের কথার আবরণ দিয়ে। পৃথ্বী নীরব হাস্যে জবাব

দেয়, "তাহলে জরুরী কাজের কথাটাই সেরে নেই যেজন্য আসা। কাল যেখানে প্রফেসারদের মিটিং হওয়ার কথা ছিল, সে বাড়ীতে হওয়া সম্ভব নয়, তাই আমার বাড়ীতেই সে মিটিং হবে স্থির হয়েছে। আপনাকেও জানান দরকার, তাছাড়া রথী আর শিবশম্ভুবাবুকেও এ সংবাদটা জানাবার ভার রইল আপনার উপর। ওদের এখন সারা কোলকাতায় খুঁজলেও ধরা যাবে না।"

বাধা দিয়ে হেসে বলে সুমিত্রা, তা' অবশ্য ঠিক। তবে রথীবাবুর ত আজ এখানেই আসার কথা। একটু অপেক্ষা করলে হয়তো এখানেই দেখা হয়ে যাবে। বলতে বলতেই রথী ঘরে ঢোকে। সঙ্গে শিবশম্ভুবাবুও।

"এই যে পৃথ্বীও রয়েছে। ভালই হল দেখা হয়ে। গান্ধী সম্বন্ধে মহিমদার লেখাটা দেখেছো নিশ্চয়। আচ্ছা এতটা উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন ছিল কি আমাদের?" গুছিয়ে বসে নিয়ে বলেন শিবশম্ভুবাবু।

পৃথ্বী প্রতিবাদ করে। "গান্ধীজীর যা পাওনা তা দিতে হবে বৈকি। তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে।" শিবশম্ভুবাবু সুমিত্রার পরনের খদ্দরের শাড়িখানা বাঁকা চোখে দেখে নিয়ে যেন ইচ্ছে করেই আরও অবজ্ঞা ফুটিয়ে তোলেন স্বরে, "গান্ধীকে সম্মান নিশ্চয়ই করবে গান্ধীর চেলারা। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের চোখে তার সত্যিকারের স্বরূপ প্রকাশিত হওয়াটাই উচিত।"

দেওয়ালে টাঙান গান্ধীজীর ফোটোখানায় চোখ বুলিয়ে বলে চলেন একই তাচ্ছিল্যের সুরে, "একশো বছর পিছিয়ে দিয়েছে মানুষটি এদেশকে। একি সোজা ক্ষতি?

সুমিত্রার চোখের তারায় একটা বেদনার ছায়া ঝলকে উঠেছে, লক্ষ্য করে পৃথ্বী। এ আলোচনার সাথে জড়িয়ে রয়েছে ওর জীবনের একটি ব্যথার স্মৃতি। আশৈশবের শ্রদ্ধা এত অনায়াসে ধুয়ে মুছে যেতে পারেনা। বেদনায় আর বিশ্বাসে যে দ্বন্দ্ব চলেছে ওর ভিতরে তা' হৃদয় দিয়েই অনুভব

করে পৃথ্বী। তবু সমস্ত বিবেক দিয়েই যে গ্রহণ করতে চাইছে সুমিত্রা শিবশম্ভুবাবুর কথার অন্তর্নিহিত সত্যকে, তাও লক্ষ্য করে সে। আর্ত্তনাদ উঠেছে রক্তের অণুপরমাণুতে, তবুও একথা সুমিত্রাকে মানতেই হবে, তার আশৈশবের পূজ্য গান্ধীজী গণবিপ্লবের এক মহান শত্রু। কারণ গান্ধীজী সাধারণ মানুষের চোখকে মোহজাল দিয়ে অন্ধ করে রাখতে নিপুণভাবে সক্ষম হয়েছেন। সুকোমল মুখশ্রীতে পাণ্ডুর ছায়া ঘনিয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। লক্ষ্য করে বলে পৃথ্বী, "কিন্তু গান্ধীজীকে এভাবে বিচার করাটা ত ইতিহাস সম্মত নয়। তিরিশ বছর আগের গান্ধীজীর বৈপ্লবিক দানকে ত অস্বীকার করা যায় না। একদিন এই গান্ধীজীই ছিলেন সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। তাঁকে কেন্দ্র করেই ভারতের মুক্তি আন্দোলন গণ আন্দোলনের পথে চালিত হয়েছিল। ১৯৩০ সালের পরে তিনিই আবার গণ আন্দোলনের পথকে রুদ্ধ করে দিলেন।"

শিবশম্ভুবাবু গম্ভীর সুরে বলেন, "এখন থেকে অতীরের কোনও মোহ-টোহ না রেখে লোকের কাছে শত্রুপক্ষকে চেনাতে চেষ্টা কর। তে-রঙ্গা নিশানের স্বরূপ ত বুঝতেই হবে; সাথে সাথে আরও বহু রঙ্গের নিশানকেই চিনতে হবে।"

সবাই চলে গিয়েছে। সুমিত্রা চুপ করে আবার একবার ভাবে ওদের প্রতিটি কথা। পৃথ্বীর কথা সমর্থন করে সেও। তবু কি যেন অনবরত বিঁধছে কাটার মত ভিতরে ভিতরে। থেকে থেকে মনে হয়, গান্ধীজী গণবিপ্লবের শত্রু! শিবশম্ভুবাবুর কথাকে ত অস্বীকার করা যায় না আজ।

তার আজকের আদর্শ আর আশৈশবের আদর্শের মাঝে এত বড় একটা ব্যবধান লুকিয়ে রয়েছে! তার মা বাবার আজীবন দেশসেবা, এ কি শুধু আত্মপ্রবঞ্চনাই মাত্র। ছদ্মবেশী দেশদ্রোহিতা! তাঁরাও তবে গণস্বার্থের চেতনাকে ঘুম পাড়িয়েই রেখেছেন আজীবন।

মায়ের শেষ রক্তমাখা পতাকাখানা বের করে দেখে সুমিত্রা। দুচোখ জলে ভরে উঠে—এ পতাকার মর্যাদাকে রক্ষা করবে সে কি করে?

মনে মনে আকুল সুরে বলে সে, "মা, তুমি আমাদের ভুল বুঝোনা। তোমার গুলিবিদ্ধ শেষ দেখা মূর্তিকে আমরা ভুলতে পারিনি বলেই ত আজ আমাদের এই মাতৃহন্ত্রীদের সাথে হাত মিলিয়েছে যারা, তাদের সাথে হাত মিলাতে পারলাম না। তোমার হাতের পতাকার গায়ের রক্তমাখা রংটি আমাদের চোখে আঁকা থাকবে চিরদিন—কিন্তু পতাকার রং নয়।" রাত্রিতে ঘুমের ঘোরেও বিনিয়ে বিনিয়ে বলছে সুমিত্রা, "মা, মাগো। অবিশ্বাস করোনা আমাদের।"

সাগরী ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয়—"স্বপ্ন দেখছো নাকি দিদি। ওঠ। উঠে জল খাও।" সাগরী উঠে সুইচ টিপে বাতিটা জ্বালিয়ে দেয়। সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়, "একি তুমি কাঁদছিলে?"

"মাকে স্বপ্ন দেখছিলাম। মা যেন দুঃখ পাচ্ছেন, আমরা মায়ের হাতের ফ্লাগটা আর টাঙিয়ে রাখিনি বলে।"

"তোমার মনে দুর্বলতা রয়েছে—তাই এমন স্বপ্ন দেখো। আর অত খুঁৎ খুঁৎ যদি থাকে মনে, তবে এক কাজ কর—কিছু লাল রং কিনে ফ্লাগটা রাঙিয়ে নিলেই ত হয়। তারপর আর তা টাঙাতেও কোনও আপত্তি থাকবে না।"

সুমিত্রা মনে মনে হাসে বোনের বুদ্ধি দেখে। ভাবে, কত সহজ উপায় বাৎলে দিল ও। কিন্তু এই সহজ রং বদলানর কাজটি করতে কত রক্তই না লাগবে।

সাগরী বলে, "বসে বসে হিজিবিজি কথা না ভেবে, সুকান্তর কবিতা পড়—যদি ঘুম নাই আসে। দেখবে মনে অনেক জোর পাবে।" সুমিত্রা মনে মনে ভাবে, "এক বিন্দু দ্বন্দ্ব নেই ওর মনে। যা কিছু গ্রহণ করবে যুক্তি দিয়ে—তাকে মন থেকেই গ্রহণ করতে পারে অনায়াসে।"

বাসর রাতে ক্রন্দনরতা শীতার অশ্রুসিক্ত দুটি চোখ, যেন ছায়ার মত অনুসরণ করছে পৃথ্বীকে।

কয়দিন ধরে শীতাকে একখানা চিঠি লেখার ইচ্ছা উঠেছে ভিতর থেকে। কিন্তু কলম নিয়ে থমকে চুপ হয়ে যায় পৃথ্বী। দীর্ঘ নীরবতার জন্য ক্ষমা চাওয়া আর তার স্বামীর আরোগ্য কামনা জানান—শুধু এই। এই জন্যই চিঠি লিখতে বসেছে সে এই সাত বছর পর? কলমের ডগায় জলপ্রপাতের মত হু হু করে বেরিয়ে আসতে চাইছে কত অসম্পূর্ণ অধ্যায়ের অসম্পূর্ণ উত্তর। অনুভূতির ভীড় নিবের মাথায়, কালির বিন্দুতে। কিন্তু লেখার আর কিছুই নেই পৃথ্বীর।

শীতাকে ভালবেসেছিল যে সেও, জানেনা তা' শীতা। গ্রেপ্তার হবার ঠিক পূর্বে একটা দীর্ঘ অনিশ্চয়তার মাঝে বাগদত্তা করে রেখে যেতে চায়নি পৃথ্বী সেদিন শীতাকে সেই রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতিপূর্ণ মুহূর্তে। কিন্তু সেকথা জানাবার উপায় নেই শীতাকে। নিজেকে প্রত্যাখ্যাত ভেবে দুঃখ পেয়েছে শীতা। ভুল বুঝেই থাকবে সে পৃথ্বীকে চিরদিন। থাকবে চির নীরব। তবু মূক হয়েই সহ্য করতে হবে পৃথ্বীকে শীতার এ আত্মক্ষয়ী নীরবতাকে। তবু তার সাথে নূতন করে আর জড়িয়ে জটিলতা বাড়াতে পারেনা পৃথ্বী শীতার জীবনে। স্বামীকে আরোগ্য করে তুলুক সে তার ঐকান্তিক সেবা দিয়ে। এই তার আশীর্বাদ, এই তার শুভকামনা। আরব্ধ চিঠিখানা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে পৃথ্বী।

পৃথ্বী জানে, ঝরাপাতার শোকে চিরদিন নিষ্পত্র থাকবেনা বৃক্ষ। প্রেমের শিকড় রস গ্রহণ করবে পৃথিবীরই মাটি থেকে—নূতন আশ্রয় থেকে। নব পল্লবিত বৃক্ষের মতই আবার নূতন পাতা গজাবে পৃথ্বীরও জীবনের শাখায় শাখায়। হৃদয়ের সরাইখানায় আশ্রয় নেবে একদিন নূতন বান্ধবী। কিন্তু শীতা? তার সুখদুঃখের কি কোন মূল্য নেই পৃথ্বীর কাছে? সুস্থ সমাজের কাছে?

স্বামীকে ভাল বাসে নাই সে। তবু প্রেমহীন নৈশ সঙ্গিনী হয়ে জন্ম দেবে তার স্বামীর সন্তানদের।

বেদনার মূক আর্তনাদে খান খান হয় সে। শীতা এ দুর্বিসহ জীবনের গ্লানিকে সহ্য করবে আজীবন, তাকে ভুল বুঝেই।

অনুতাপে বিদ্ধ হয় মন। শীতা এমন করে ভুল বুঝলো কেন তাকে। ছায়াচ্ছন্ন মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পৃথ্বী। মানুষের ছোট খাট ভুল ত্রুটি কত বিপুল সমস্যা এনে দেয় সমাজে। পৃথিবীর বৃহত্তর সমস্যার পাশে পাশেই বয়ে চলেছে ব্যক্তিগত মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা।

সকল সমস্যারই সমাধান আসবে একদিন। আজ তারই পথ সৃষ্টি করে যাও পৃথ্বী। কাজ, কাজ, শুধু কাজ করে যাও। যুগ যুগের পুঞ্জীভূত বেদনার কুয়াশায় দিগভ্রম করলে চলবেনাত, পৃথ্বী! এ কুয়াশার আড়ালেই রয়েছে যে তোমার আলোক প্রভাত, মনে মনে বলে পৃথ্বী নিজেকে।

পৃথ্বী বাস থেকে নেমে পার্কের ভিতর ঢুকে যায়। "মিটিং প্লেসটি" ভালই বেছেছে সুন্দরপ্রকাশ" মনে মনে ভাবে সে।

সকালের দিকে পার্কে লোকও বেশী থাকে না। রোদ খাওয়াতে আসা শিশুদের দু চারটি প্যারামবুলেটার। আর তাদের পরিচারিকাদের বিশ্রামালাপ চলেছে শেড ঘরের ছায়ায়। তাছাড়া জনা-দুই পরীক্ষার্থী ছেলে বই হাতে বেরিয়ে আসে নিকটেরই একটা গ্যারেজ থেকে।

পৃথ্বী করুণ চোখে তাকিয়ে দেখে—গৃহ সমস্যার ব্যাপক বিস্তৃতি মোটরহীন গ্যারেজে গ্যারেজে।

সুন্দরপ্রকাশ আসেনি এখনও। অগত্যা হাতের বই খানাই পড়তে শুরু করে সে।

বইয়ের ভিতরে ডুবে যায় কখন খেয়াল নেই। হঠাৎ চমকিত হয়ে উঠে কচি কণ্ঠের স্পষ্টএ কটি উদ্ধত জিজ্ঞাসায়—"পড়া শেখা হয়নি বুঝি"।

পৃথ্বী চোখ তুলে তাকায়। তারই উত্তরের অপেক্ষায় গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে একটি বছর চারেকের ফুটফুটে মেয়ে। বহু কথা জমে আছে তার ঘন পক্ষ্মাবৃত ছোট চোখ জোড়ায়। প্রাণাবেগের একটি জীবন্ত টুকরো যেন। আবারও প্রশ্ন করে সে আরও স্পষ্ট ও গম্ভীর সুরে "শাস্তি দিয়েছে দিদিমনি?"

পৃথ্বী হেসে ফেলে, জিজ্ঞেস করে "নাম কি তোমার?" এক নিশ্বাসে বলতে আরম্ভ করে সে, "আমার নাম মিঠু। আমার বন্ধুর নাম বুলু, উপরতলার বন্ধুদের নাম বাবুল, শিউলি।" একটু দম নিয়ে বলে "কুকুরের নাম জুয়েল, বিড়ালের বাচ্চা দুটো ছিল। একটা মরে গিয়েছে।"

হঠাৎ কি একটা আকর্ষণীয় ব্যাপারে দৃষ্টি পড়ায় মিঠু ছুটে চলে যায়, "ঐ ছোটমা এসেছে," বলে।

মেয়েটির কাণ্ড দেখে হাসে পৃথ্বী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুন্দরপ্রকাশ এসে পড়ে, "এরই মধ্যে এসে পড়েছেন?" "আধঘণ্টার উপর হ'ল বসে আছি। প্রায় চলেই যাচ্ছিলাম।" "কিন্তু এনগেজমেণ্ট ত আজ ফেল করলো। আবার খবর পাঠাব। আপনি কালও এখানেই আসবেন ঠিক এসময়েই। তারপর, নূতন কেন্দ্রীয় কমিটিতে কে কে আছেন শুনেছেন নাকি?"

"শুনছি শোহনলালকে নেওয়া হয়নি।"

সুন্দরপ্রকাশ বিস্মিত হয়। "রাতারাতি যে রকম সংস্কারবাদের খোলস ছাড়ছে সব, নৌকো আবার উল্টো দিকে কাৎ না হয়ে যায়।"

"ছাত্র মহলে ত খুব সাড়া পড়ে গিয়েছে।"

"সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। তবে একটা কথাই ভাবা উচিত ছিল, যে শোহনলাল একাই দায়ী নন এই সংস্কারবাদী বিচ্যুতির জন্য। অথচ আজ আমাদের ভিতরকার আবহাওয়ায় যা কাদা ছোঁড়া হচ্ছে, যা বিষ উদ্গীরণ

হচ্ছে তাঁর প্রতি, তা'তে মনে হচ্ছে যেন, একমাত্র তিনিই ব্যক্তিগত ভাবে এ ভুলের জন্য সম্পুর্ণ দায়ী।”

পৃথ্বীও ম্লান কণ্ঠে বলে, “ভুল ত্রুটীতে ক্ষতি অবশ্য খুবই হয়েছে। এ ক্ষতির কোনও পূরণ নেই। তবু তাঁর ব্যক্তিগত সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা মানতে পারি না।”

স্মিত হাস্যে বলে সুন্দরপ্রকাশ, “কিন্তু আমাদের প্রফেসার বন্ধুরা ত খুব উগ্র দেখলাম। বিকাশবাবুর সাথেও আলাপ হল। শোহনলালকে সরানোর ব্যাপারে খুবই আগ্রহশীল।”

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দেব পৃথ্বী, “এরা শুকুলের কাছে অনেক বেশী আশা করেছে। কিন্তু শুকুলের অতীত ইতিহাসত এরা জানে না।” আর কিছু বলে না পৃথ্বী। কিন্তু মনের তলায় গত কয়দিনের নিজেদের সব কয়টি আড্ডার আলোচনা কথাবার্তা, কানাকানি, ইঙ্গিত আর কটাক্ষের সুর তলিয়ে দেখে বারে বারে। মন থেকে গ্রহণ করতে পারছে না পৃথ্বী বন্ধুদের এত জ্বালামিশ্রিত অসহিষ্ণুতাকে। পরের দিনও আবার একই সময় উপস্থিত হয় সে বইখানা হাতে নিয়ে পার্কের সেই নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে। মিঠুও সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়ায়, “আজও পড়া শেখা হয়নি?”

তার চোখ মুখের ভাব দেখে হেসে ফেলে পৃথ্বী। লক্ষ্য করে দেখে, পার্কের প্রায় বেঞ্চিতেই মিঠুর কাকা, মামা, দাদা আছে। তবে ছোটমা তার একটিই। আজও মিঠুর ছোটমা ঘাসের উপর বসে উল বুনছে।

মিঠু কি মনে করে আচমকা প্রশ্ন করে, “তুমি লালসেলাম জান? ইন-ক্লাব জিন্দাবাদ?”

খুশির সুরে উত্তর দেয় পৃথ্বী, “নিশ্চয়ই জানি লালসেলাম, ইনক্লাব জিন্দা-বাদ। তুমি আর কি জান মিঠু?”

“আরও অনেক জানি। দাঁড়াও ছোটমাকে জিজ্ঞেস করে আসি।” পৃথ্বীর উত্তর শুনে অদূরেই বসা ছোটমা মুখ তুলে তাকায়। আন্তরিক চোখে,

চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় পৃথ্বীর হাতের বইয়ের প্রচ্ছদপটখানাস—পৃথ্বীও লক্ষ্য করে, মিঠুর ছোটমার লাজুক চোখ দুটিতে ধরা দিয়েছে আপন জনের মধুর স্বীকৃতি।

মিঠুর চোখ মুখ ঢাকা ঝাঁকড়া চুলগুলি একটু ঠিক করে দিতে দিতে প্রশ্ন করে পৃথ্বী, "তোমার বাবা কি করেন মিঠু?"

"বাবা ত চাঁদের কাছে চলে গিয়েছে। এখন ডাকলেও আসতে পারবে না।" আধাবোঝা ম্লান কণ্ঠে বলে যায় মিঠু। পৃথ্বী উত্তর শুনে ম্লান হয়ে যায়। এক মুহূর্তে একটা সুন্দর লতিয়ে উঠা সোনালী লতা যেন হঠাৎ এলিয়ে পড়ে। মিঠুর দিকে তাকায় পৃথ্বী অপরাধীর চোখে। এমন সুন্দর মিঠা মেয়েও বঞ্চিত হয়েছে পিতৃস্নেহ থেকে।

সুন্দরপ্রকাশ এসে পড়ে। পৃথ্বী মিঠুর মাথায় একটু স্নেহস্পর্শভরা হাত বুলিয়ে বলে, "চলি মিঠু।"

"আবার কাল এসো।"

সুন্দরপ্রকাশ পৃথ্বীর স্নেহপ্রবণতাটুকু লক্ষ্য করে মৃদু হাসে। পৃথ্বীও টের পায়, একটা স্নেহের বন্ধন পড়ে গিয়েছে মনে মনে এই চার বছরের মেয়েটির সাথে।

দিন কয়েক পরে আবার একদিন বাস থেকে মিঠুকে দেখে নেমে আসে পৃথ্বী। কিছুক্ষণের মধ্যে মিঠুর ছোটমাও আসে, তবে একা নয়। কোলে একটি নবজাত শিশু। মিঠুর মন মত হয়না তা'। ছোটমার কোলের এ নূতন শিশুটিকে যে পছন্দ করতে পারেনি সে, তা অস্পষ্টও রাখে না। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করে সে তার ছোটমাকে, "তুমি ওকে ভালবাস?"

ছোটমা মিষ্টি হেসে উত্তর দেয়, "বাসি।"

মিঠুর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠে, "কেন?"

মিঠুর ছোটমা মিঠুকে আদর করে বলে, "ওকেও ভালবাসি, তোমাকেও ভালবাসি।"

"উঁহু, ওকে ভালবাসতে পারবে না।" কঠিন আদেশ দিয়ে চলে আসে মিঠু পৃথ্বীর কাছে। বিমর্ষ মুখে বলে চলেছে সে, "ছোটমা মন্দ, ছোটমাকে আর ভালবাসি না আমি।"

হঠাৎ কি ভেবে সে তার নিজস্ব ভঙ্গীতেই প্রশ্ন করে পৃথ্বীকে, "তুমি ছোটমাকে ভালবাস ?"

অদূরেই বসা মিঠুর ছোটমা। মিঠুর এই অসামাজিক প্রশ্নে লাল হয়ে উঠে সে। পৃথ্বীও বিব্রত চোখে তাকায় মিঠুর দিকে, একজন অপরিচিত মহিলা সম্বন্ধে এ কি ধরণের প্রশ্ন মিঠুর! সমাজের রীতিনীতিও ত জানা উচিত তোমার, মনেমনেই হাসে পৃথ্বী মিঠুর কাণ্ড দেখে।

কিন্তু মিঠু আর উত্তরের অপেক্ষা না করেই হুকুম দিয়ে যায় "ভালবেসো না ছোটমাকে।"

দুপুরবেলা পৃথ্বীদের পেয়ারা গাছতলায় শুকনো পাতা ঝাড় দিতে এসে গাছেই উঠে বসে হাশিয়া। একাগ্র মনে ফুলকুড়ি পেয়ারা চিবুতে চিবুতে সুরটানে—একটা হিন্দি সিনেমার গান। পৃথ্বী তার ঘরের জানালার কাছে বসেছে কলম নিয়ে। কান সজাগ হয়ে উঠে আত্মভোলা গানের সুরে। মনে মনে ভাবে, বেশ মিষ্টি গলাত। বাইরে বেরিয়ে আসে পৃথ্বী। মনটা একটু ছলছল করে উঠে, বনফুলের মতই প্রাণের প্রাচুর্যেই বড় হয়ে চলেছে। পৃথিবীর চোখ পড়লো কি না পড়লো, কোনই খেয়াল নেই।

হাশিয়া পৃথ্বীকে দেখে' লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে গাছের ডালে টান লেগে পরনের শাড়িখানা ছিঁড়ে ফেলে খানিকটা। পৃথ্বী তাকিয়ে দেখে, ভয়ে কালো হয়ে উঠেছে মুখ।

"ঢেলোর মা বকবে বুঝি।" সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করে পৃথ্বী। "বকবে না আবার। গাহেকদের কাপড়।" শুকনো গলায় জবাব দেয় হাশিয়া।

"অন্তের শাড়ি পরিস কেন ?"

তাহলে পরবো কি ?"

একটি মাত্র জবাবে নীরব হয়ে যায় পৃথ্বী। সত্যিইত তাহলে পরবে কি। শুধু অঙ্গসজ্জা নয়। লজ্জা নিবারণই বা করবে কি দিয়ে এই পূর্ণ কিশোরী মেয়ে।

বাড়ী গিয়ে হাশিয়া শুকনো ঘুঁটেগুলি গুণে গুণে তুলে রাখে আমগাছটার গুঁড়ির চারিদিক থেকে। বামুন বাড়ীতে বিক্রী করতে যাবে বিকেলে। মনটা ভার হয়ে আছে তার। শাড়ি ছেঁড়ার জন্য অনেক গালি শুনেছে ধোপাবৌয়ের কাছে। তার উপর সোনাও ধোপাবৌয়ের পক্ষ নিয়ে কথা শুনিয়েছে তাকে। শাড়ি ত আর সে ইচ্ছে করে ছেঁড়েনি। দূর থেকেই দেখে হাশিয়া, ধোপাবৌ কেমন হাসি তামাসা করছে সোনার সাথে। সোনা তাদেরই প্রতিবেশী—সাইকেল-রিকসা চালায়। ঢেলোর মার সাথে সোনার এত হাসি মস্করা বিষ-বিষ লাগে হাশিয়ার।

ধোপাবৌ মাড় দেওয়া শুকনো কাপড়গুলি বের করে ডাক দেয় হাশিয়াকে, "একটু ধর দেখি হাশিয়া, কাপড়গুলো পাট করে রাখি। ঢেলোর বাপ বলে গেছে, ইস্তিরি করবে আজ।" হাশিয়া ঘরে বসেই উত্তর দেয়, "আমি তোমার চাকর নাকি।" এই সুযোগে একটু মনের জ্বালাটা জুড়িয়ে নিতে চায়। কিন্তু ধোপাবৌ কথা হজম করার মেয়ে নয়। সেও জ্বলে উঠে, "এত যে কথা শিখেছিস আজ, যে ঘরে বসে কথা বলছিস, সে ঘর কার? যে কাপড়খানা পরে আছিস সে কাপড় কার? আমারই গাহেকের কাপড় না?"

হাশিয়া আর জবাব দিতে পারেনা। তাকিয়ে দেখে, পরনের সুন্দর শাড়িখানা। স্নান করে এই গোলাপী রংয়ের শাড়িখানা পরেই বারে বারে নিজেকে তাকিয়ে দেখেছে সে খুশি খুশি চোখে। আর এখন এই শাড়িখানাই যেন কাঁটার মত বিঁধছে সর্বশরীরে।

অথচ নিজের ঘুঁটে বিক্রীর টাকায় কেনা একমাত্র কাপড়খানা এত পুরানো হয়ে গিয়েছে যে মনে হয় পরলেই বুঝি খসে পড়বে।

তবু সেই শতভালি দেওয়া ময়লা কাপড়খানাই পুটলী থেকে বের করে পরে হাশিয়া।

সোনাও যে ধোপাবৌকে সমর্থন করেছে এটাই আরও পীড়াদায়ক তার কাছে। বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করে হাশিয়া, "মাগো তুমি আমারে ফেলে কই গেলে গো।" এমন করে দীন দরিদ্র আত্মীয় সুহৃদহীন রিক্ত মূর্তিতে নিজেকে চেনে নাই সে কোনদিন। কিন্তু আজ এই যৌবনের প্রারম্ভে তারই প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটি মেয়ে মানুষের এই কটু কথার জবাব না দিতে পেরে ফুলে ফুলে কাঁদে হাশিয়া।

হাশিয়ার বিলাপ শুনে সোনারও মনটা ভিজে আসে, সত্যিত কেউ নেই ওর।

ঘরে গিয়ে বোঝায় সে, "কাঁদিস না হাশিয়া।—যা উঠে জল নিয়ে আয়। এদের আশ্রয়ে যখন থাকবিই, তখন আর ওদের সাথে ঝগড়া করিস কেন?"

চোখ মুছে বালতি নিয়ে জল নিতে আসে হাশিয়া। পৃথ্বী লক্ষ্য করে হাশিয়ার এ বেশ পরিবর্তন। তাকিয়ে দেখে—চোখমুখও ভার। মনে মনেই বোঝে, বকুনি খেয়েছে নিশ্চয় খুবই—নাহলে হাশিয়ার মত মেয়ের রঙিন শাড়ির মায়া ত্যাগ করা সোজা নয়। যতবার ঝগড়া হয়েছে, তত-বারই হাশিয়া ছেঁড়া কাপড়খানা বের করে পরে। কিন্তু কাপড় যে ক্রমশই ছিঁড়ে চলেছে, রাগের সময় খেয়াল থাকে না। যৌবনের মৃদু সাড়াকেও আর লুকানো সম্ভব নয় এ ছেঁড়া কাপড়ের তলায়।

আর এদেশেরই মেয়েরা কটাক্ষ করে প্রতীচ্যের মেয়েদের লজ্জাহীনা বলে। মনে মনে বিদ্রূপার্ত সুরে বলে পৃথ্বী, "একবার তাকিয়ে দেখো বধূরা, তোমাদের দীর্ঘ ঘোমটার ফাঁকে এইসব নির্বসনা অন্ত্যজ দুহিতাদের। তোমাদের দু'ধারের এই নগ্ন পৃথিবীর লজ্জাকে ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে রেখে, দেশের লজ্জাকে আর লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করোনা লজ্জাশীলা বধূরা!"

রাস্তায় চলতে চলতে হাশিয়ার কথাই ভাবে পৃথ্বী। হয়তো কালই আবার দেখবে একখানা সুন্দর বেগুনী রংয়ের শাড়ি পরে বসে বসে একাই গুটি খেলছে সে পৃথ্বীদের বারান্দায়। মুচ্‌কি একটু হেসে সরল প্রাণের পরিচয় জানাবে পৃথ্বীকে তার নোংরা দাঁতের ফাঁকে। তার সে হাসিকে গ্রহণ না করে পারেনা পৃথ্বী। কিন্তু তার পরিবর্তে কি দিয়েছে সে এই কিশোরী মেয়েকে। তার ন্যায্য ভাগের বখরায় শুধু ফাঁকিই দিয়েছে তাকে। রসস্রষ্টা বুদ্ধিজীবীর দল শুধু প্রতারণাই করেছে তোমাদের, কাব্যের উপেক্ষিতা তুমি, হাশিয়া।···

দিন কয়েক পর মিঠুর সাথে আবার পৃথ্বীর দেখা হয় পার্কে। সেই একই মিঠু। চোখ মুখ ঠিকরে কথা বের হয়ে আসছে। দেখে বোঝে পৃথ্বী, ছোটমার সাথে আবার ভাব হয়ে গিয়েছে তার। মিঠু তার নকল করা চিন্তিত সুরে প্রশ্ন করছে ছোটমাকে, "ছোটমা, মনিকাকা আসে না কেন? মনিকাকা তোমাকে ভালবাসেন না, তাই না ছোটমা।"?

"নারে মিঠু, মনিকাকা খুব ভালবাসে আমাকে। এখানে এলে যে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে তাকে।"

পৃথ্বী একটা ছিন্ন কাহিনী জোড়া দেয় মনে মনে মিঠুর টুকরো টুকরো কথার বাঁধুনি থেকে। সে তাকিয়ে দেখে, লাজুক বধূটির স্নিগ্ধ মুখশ্রীর আড়ালে লুকিয়ে আছে এক সুস্পষ্ট চিন্তার ছায়া।

মিঠুর ছোটমা উঠে চলে যায় ছেলে কোলে।

মিঠু একখানা কাগজ নিয়ে আসে—"নৌকো বানিয়ে দাও।"

পৃথ্বী কাগজে ভাঁজ দিতেই কাগজের জ্বলজ্বলে অক্ষরগুলিতে চোখ আটকে যায়, "কোথায় পেলে মিঠু এ কাগজ?"

"কেন ঐ যে ছোটমারা পড়ছিল বেণুকাকার সাথে। গুলি চলেছে—"

মিঠুর ভুলে যাওয়া বাকি কথাগুলি জ্বলে উঠে—ছাপার অক্ষরে। "গুলি

চলেছে চাষীকন্যার বুকে। দুধের শিশু ঢ'লে পড়েছে হাজং বধুর কোলে। বুকের দুধটুকু শিশুর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো ; জন্মের মত শেষ হল তার স্তন্য খাওয়া। স্তন্যপায়ী শিশুর বুকেও গুলি ছুঁড়তে দ্বিধা করেনি সাম্রাজ্য-বাদের অনুচরেরা।" পড়ে ফেলে পৃথ্বী সম্পূর্ণ লিফলেটখানা। বেদনার ছায়া নামে চোখের তারায়। মিঠু ততক্ষণে গুছিয়ে আনে তার বলতে চাওয়া কথা—"মনিকাকাকে ধরতে পারলে পাঁচশ টাকা।"

"তে-ভাগারই।" মনে মনে বলে পৃথ্বী। মিঠুর ছোটমার চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানা ভেসে উঠে চোখের সামনে। চুপ করে ভাবে পৃথ্বী, মিঠুর মনি-কাকার এ অজ্ঞাতবাস শেষ হবে কবে ? কবে আবার তার ছোটমা নবজাত শিশুকে নিয়ে সুখের সংসার পাতবে আর মিঠুরাণী মধুর খোরাক জুটাবে তাদের গৃহ আঙ্গিনায় !

মার্চের তাঁতানো হাওয়া সামনে ঠেলে ট্রাম এগিয়ে চলে এসপ্লানেডের দিকে। পৃথ্বী নেমে পড়ে। দুটোর সময় ৩১।বি তে অফিসে সাহিত্যিকদের একটা সভা ডাকা হয়েছে।

কিন্তু গলির মোড়ে আসতেই রথীর সাথে দেখা হয়। বাধা দিয়ে বলে রথী, "ওদিকে আর কোথায় চলেছো। লাল পাগড়িতে ভরে গিয়েছে চারদিক। পার্টি অফিস খানাতল্লাসী হয়ে গিয়েছে আজ। অফিসে আর প্রেসেও সিলমোহর দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। শুনছি আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে।"

দূর থেকেই দেখে পৃথ্বী, লাল পাগড়ি আর লরীর ব্যস্ততা। স্তূপীকৃত বইখাতা কাগজপত্র বস্তাবন্দী করে নিয়ে চলেছে লরীর পর লরী।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। দুজনে গলির মোড়ের রেঁস্তোরায় ঢোকে। রথীর মুখেই শোনে ছয়জন কমরেডকেও ধরে নিয়ে গিয়েছে অফিস থেকে। বুড়ো রহমানকেও।

পৃথ্বী কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। পার্টি অফিস তাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে ছিল। দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার এখানে না এসে পারতো না। এখানে এসেই যেন অনুভব করতো তাদের নিজেদের নাড়ীর সচলতা। "পাওয়ার" হাউসের মত এখান থেকে শিরায় শিরায় বহন করে নিত আশার উদ্দীপনা।

কিন্তু আজ সেই পরম আত্মীয়তার স্থান তাদের কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল।

রেঁস্তোরার ভিতরে আগেই বসে আছেন মহিমদা আরও দু' তিনজন কমরেড। সকলেই মনমরা।

"রহমানকেও সরাতে পারলো না?" বিমূঢ় ব্যথিত কণ্ঠে—বলেন মহিমদা। রথী অভিযোগের সুরে বলে, "সরাবে কি করে। যা টপ হেভি হয়ে উঠেছিল পার্টি। তলাকার সংগঠন কিছু ছিল নাকি যে রাতারাতি সব গুছিয়ে নিবে। রহমান কাকাত এই কিছুদিন আগেই দুঃখ করছিলেন, "আমাদের পার্টির অবস্থা হবে জার্মানীর পার্টির মত।"

মহিমদা দুঃখের হাসি হাসেন। "যাক একদিকে ভালই হয়েছে। যা একটা দরবারী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিন-তলা বাড়ী, টেবিল চেয়ারের ঠাসাঠাসি, মাথার উপর ফ্যান, ঘরে ঘরে রঙ্গিনপর্দা—সেক্রেটারিয়েট টেবিল—স্থানে স্থানে হুঁশিয়ারী আর প্রবেশ নিষেধের বাড়াবাড়ি। এ যেন এক অতি আধুনিক সওদাগরী অফিস।"

কমরেডী চোখে তাকিয়ে দেখে পৃথ্বী মহিমদাকে। দিন ঘনিয়ে এসেছে সকলেরই। তাই ব্যথিয়ে উঠেছে মন। পৃথ্বী উঠে পড়ে। মহিমদার দিকে তাকিয়ে বলে, "চলি, সাবধানে থাকবেন।"

স্মিত হাস্যে উত্তর দিল মহিমদা, "সাবধানে থাকার উপায় আছে নাকি।"

একটি মেয়ে কমরেড ঢোকে ভিতরে। "কি খবর। আপনিও এখানে?" মহিমদা প্রশ্ন করেন।

"না এসে উপায় কি ? সারাদিন খেটেখুটে ফিরে দেখি এই অবস্থা। রান্নাবান্না সবশুদ্ধ কম্যুনে তালা ঝুলছে।"

বেড়িয়ে পড়ে পৃথ্বী। নূতন করে আবার সাবধানী উপায়. নূতন কাজ, নূতন দায়িত্বের বোঝা সম্মুখে।

মোড়ের মাথায় টেলিগ্রামের হাঁকডাক, সান্ধ্য পত্রিকার প্রতিযোগিতা, ত্রস্ত ব্যস্ততা। বড় বড় কাল হরফে লেখা—কম্যুনিষ্ট পার্টি বে-আইনী।

ভাঙা অবশ হাতে যেন কিনে নেয় পৃথ্বী সান্ধ্য পত্রিকাখানা। ঘনীভূত অন্ধকার ঝুলে পড়ছে ভারতের আকাশে। প্রতিক্রিয়ার ঝটিকা-বাহিনী। ফ্যাসীবাদের দূর পদধ্বনি।

এক অশুভ-মুহূর্তের কালো ইঙ্গিত প্রতিটি অক্ষরে। ট্রাম কালীঘাটের ডিপোর কাছে এসে গিয়েছে। হঠাৎ কণ্ডাক্টার বলে উঠে, "ট্রাম আর যাবেনা।"

ট্রাম থেকে নেমে পড়ে পৃথ্বী। ট্রাম ডিপোর সামনে বহু গুর্খা পুলিশ জমা হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে। এক উর্দী-পরা ট্রামশ্রমিক দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিচ্ছে—"শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিকে যারা বে-আইনী করার স্পর্দ্ধা রাখে, ট্রাম শ্রমিকরা তার জবাব দাও। ট্রামের চাকা আর আজ চলবে না।"

হঠাৎ কোথা থেকে একটা ইঁটের টুকরো এসে পড়ে পুলিশের দিকে। সার্জেণ্ট অর্ডার দেয—"ফায়ার।"

জনতা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটতে থাকে—বন্দুকের আওয়াজ চলছে।

"গুলি—গুলি শুরু হয়েছে।"

গুলি নয় টিয়ার গ্যাস। চোখ জ্বলতে শুরু করে সবাই। পৃথ্বী রাস্তার টিউব-ওয়েল থেকে একটু জল দিয়ে নেয় চোখে। ভীড়ের স্রোতে চলতে শুরু করে সেও।

'ট্রাম তাহলে চলছেনা। ধন্য ট্রামের শ্রমিকরা।' মধ্যবিত্ত বিপ্লবী মনে শ্রদ্ধা আর রোমাঞ্চ ছুঁয়ে যায়। চারি দিকে চাপা উত্তেজনা। ঝড়ের পূর্বাভাষ এই কি। ঝড় তাহলে উঠলোই। গোধূলির অস্পষ্ট আলোতে তাকিয়ে দেখে পৃথ্বী ঘরে-ফেরা মানুষের মুখের দিকে। এই ঘর-বাঁধা মানুষদের কত গভীর ভাবে ভালবাসে পৃথ্বী। নিকট আত্মীয়ের মতই প্রতিটি মানুষের সুখ দুঃখের নাড়ীর সাথে এক সুদৃঢ় সংযোগ রয়েছে তার গ্রন্থিতে, গ্রন্থিতে।

এক ঘনায়মান দুর্যোগের মুখোমুখী মুহূর্তের অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করছে পৃথ্বী এই নীড়াশ্রয়ী মানুষের নীড় যে আজ কত প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন। কিন্তু এই ভয়াবহ সত্যকে টের পাচ্ছে কি এরা ? এই গৃহে-ফেরা মানুষেরা ?

চিন্তাস্রোতে তলিয়ে গিয়েছে পৃথ্বী।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সে সুমিত্রাকে দেখে। "এ দিকে কোথায় চলেছেন ?"

একই চিন্তার রেশ জড়িয়ে রয়েছে তারও চোখে, লক্ষ্য করে পৃথ্বী। সুমিত্রা ম্লানস্বরে উত্তর দেয়, "রথীর ওখানে গিয়েছিলাম—পেলাম না তাকে। শুনলাম সত্তের জায়গায় নাকি সার্চ হয়ে গিয়েছে আজ ভোরে। খবর কি সব ?"

হাতের পত্রিকা খানা দেখিয়ে বলে, "এইত খবর।"

তার চিন্তিত চোখের দিকে তাকিয়ে বলে সুমিত্রা "চলুন আমাদের বাড়ীই, বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এককাপ চা খেয়ে যান। দেখি সাগরী আবার কি খবর নিয়ে আসে।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে সুমিত্রা, "দ্বিতীয় কংগ্রেসের থিসিসত ফলে গেল। এবার জাতীয় সরকারের স্বরূপ ভাল করে ধরা পড়বে।"

পৃথ্বী উত্তর দেয় স্মিত কণ্ঠে, "থিসিসত ফলে গেল ঠিকই। কিন্তু

দুঃখের বিষয় শুধু থিওরীতেই প্রস্তুত ছিলাম আমরা। সংগঠনের দিক থেকে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। না হলে এভাবে পার্টি মেম্বারদের তালিকা শুদ্ধ ফাইলকে-ফাইল পুলিশের হাতে পড়ে!"

সুমিত্রা চা বানাতে যায়। মিঠুর ছোটমা ঘরে ঢোকে। পৃথ্বীকে দেখে নমস্কার জানায়। পৃথ্বীও প্রতি নমস্কার জানায় শ্রদ্ধার সাথেই। তাকিয়ে দেখে, এক গাঢ় উদ্বেগের ছায়া পড়েছে তারও চোখেমুখে। একই বিপদের ছায়াছন্ন আকাশের তলায় জড়ো হয়েছে আজ সবাই। তাই একই চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে সবারই মনের তলা দিয়ে। বিপদের এই একই উপলব্ধি, একই দায়িত্ব বোধ—এইত পরম যোগসূত্র তাদের আত্মায় আত্মায়।

সুমিত্রা ঘরে ঢোকে—"কি খবর পার্বতী?"

"খবর মনিকাকা আসছেন এখানে দুদিনের জন্য—তাঁর সাথে আমিও চলে যাচ্ছি।"

পৃথ্বীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে আর কিছু বলে না, বুঝতে পেরে বলে সুমিত্রা "এঁর সাথে পরিচয় নেই বুঝি?"

পৃথ্বী মৃদু হেসে বলে, "পরিচয় নেই, তবে একেবারে অপরিচিতাও নন অনুমানেই বুঝেছি, আমাদেরই একজন।"

পার্বতী সমর্থনের হাসি হাসে নীরবে।

সুমিত্রা বলে, "শুধু একজন নন। বিশেষ একজন। পাকিস্তানের একজন মহিলা কর্মী। এ ছাড়া আরেক পরিচয়, কমরেড নিখিলেশের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। ও অঞ্চলের বিখ্যাত মনিকাকা। তাঁর স্ত্রী। আর ইনি সাহিত্যিক পৃথ্বী রায়। কমরেডত নিশ্চয়ই।" মুঠী বদ্ধ হাত তুলে দ্বিতীয়বার সেলাম জানায় পৃথ্বী শ্রদ্ধাঝরা চোখে।

পৃথ্বী স্মিতহাস্যে বলে, "বড় দেরিতে পরিচিত হলাম। একেবারে বিদায়ের মুখে। আর বিপদের মুখেও। পাকিস্তানের কমরেড যখন—

ভুগতে হবে আরও বেশী। গণতন্ত্রের মুখোশেরও ত প্রয়োজন হয় না সেখানে।

পার্বতী উত্তর দেয়, "সেজন্য অনেকখানি দায়ীত আমরাই। পাকিস্তান মেনে নেওয়ার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবেত আমাদেরই।

পৃথ্বী বলে, "ভুলের প্রায়শ্চিত্তই করছি জীবন ভরে। আজকের খবর নিশ্চয়ই জানেন। রহমানও ধরা পড়েছেন। এওত ভুলেরই মাসুল ছাড়া আর কি। যাক্ আবার ইদুঁরের গর্ত খোঁজার কাজ পড়লো।"

পার্বতী মৃদু হেসে বলে, "তে-ভাগার কমরেডদের এ অধ্যায় বহু আগেই শুরু হয়েছে।"

সুমিত্রা চা নিয়ে আসে। কিছু খাবারও আনে সাথে। "এসবের আবার কি দরকার ছিল।" লজ্জিত স্বরে বলে পৃথ্বী। সুমিত্রা সুস্মিত চোখে বলে, "দরকার আছে।"

বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করে পৃথ্বী, সত্যি ক্ষুধার্ত সে। আর ধরা পড়েছে তা এরই মধ্যে সুমিত্রার চোখে? প্রীতির চোখে তাকায় একবার সুমিত্রার দিকে নীরবে। তারপর আবার হারিয়ে যায় কথার স্রোতে। খাওয়া শেষ হলে উঠে পড়ে পৃথ্বী। পার্বতীর দিকে তাকিয়ে বলে, "বড় অসময়ে বিদায় নিচ্ছেন, কিন্তু আশা রাখি, সুসময়ে আবার দেখা হবে।"

অনুভব করে পৃথ্বী, মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। হয়তো প্রীতির বন্ধন পড়ে গিয়েছিল, মিঠুর মধ্যস্থতায়, তাই আজ এ বিদায়ের ব্যথায় অনেকখানি শূন্য লাগছে মন।

আবার সুমিত্রার নীরব আতিথ্যটুকুও অনেকখানি জুড়িয়ে দিয়েছে সারাদিনের বিক্ষিপ্ত মনকে।

একজনের বিদায়ের শূন্যস্থানটুকু পূর্ণ করছে আরেকজনের প্রীতির

বাঁধুনি দিয়ে। এই হয়তো নিয়ম। ক্ষতস্থানকে পূর্ণ করে নেওয়াই দেহের মত মনেরও জৈবধর্ম্ম।

রাস্তায় চলতে চলতে আরেক স্বতন্ত্র চিন্তায় ডুবে যায় পৃথ্বী। সুমিত্রা —সাগরী—পার্বতী—এদেরই মাঝে স্থান করে নিতে পারতো হয়তো শীতাও। এমনি প্রতিজ্ঞাসুদৃঢ় জীবনের সচেতন পদক্ষেপে দীপ্ত হতে পারতো সেও।

ফল্গুর চিঠিতে শুনেছে সে কয়দিন আগে, শীতার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ। ফল্গু লিখেছে, কোনও একটা স্কুলে কাজ না পাওয়া পর্যন্ত দিদি তার শ্বশুর বাড়ীতে থাকবে।

শীতার শক্তিকে অবিশ্বাস করে, কত বড় ভুল করেছিল পৃথ্বী জীবনের পরমলগ্নে, আজ তা' তিল তিল করে অনুভব করছে সে। সুমিত্রার মত শত শত মেয়েরা যখন এগিয়ে চলেছে দৃঢ় পদক্ষেপে সংগ্রামের পথে, শীতা তখন তার বৈধব্যের নাগপাশে বাঁধা জীবনের চাকায় নিঃশেষ করে চলেছে নিজেকে শ্বশুর বাড়ীর সংকীর্ণ গণ্ডীর মাঝে। এক উপায় হীন বেদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠে মন।

বাড়ী এসে দেখে, সুদর্শন মনমরা হয়ে বসে আছে ঘরের দুয়ারে। "পার্টিত বে-আইনী হ'লই, সাথে সাথে চাকরিটিও খতম।" পৃথ্বীকে দেখে দুঃখের সুরে বলে। "এত কষ্টের রোটারী মেসিনটিও গেল।"

এ মাস আগে এই প্রেসে কম্পোজিটারের কাজ ঠিক করে দিয়েছিল পৃথ্বী। এই প্রেসের সাথেই তাদের জীবনের সুখ দুঃখ আশা বেদনার কথা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। একই ক্লান্তি তারও চোখে। যেন এক পরম আত্মীয়কে শ্মশানে রেখে ফিরে এসে বসেছে শ্মশান বন্ধুরা।

পৃথ্বী বেরিয়ে পড়ে সকালে উঠেই। ছোট বোন, কুমারী ডেকে বলে,

"চা খেয়ে গেলেনা দাদা। জলত ফুটে গেছে। দু' মিনিটেই হ'য়ে যেত।"

"চা খাওয়ার সময় নেই। শিবশম্ভুবাবুকে ধরতে হ'বে সাতটার আগে।" সাইকেল নিয়ে চলে যায় পৃথ্বী।

মিঠুর পার্কের সামনা দিয়ে চলেছে বহুদিনপর। একবার মিঠুর প্রত্যাশায় চোখটা বুলিয়ে আনে সকালবেলার খালি মাঠটার চারদিকে। মিঠু আসেনি এখনও। একটা পরিচ্ছন্ন রাস্তা চলে গিয়েছে অনেকদূর পর্যন্ত পার্কের পশ্চিম দিকে। রাস্তার দুইধারে ছোট ছোট বকুলগাছ থেকে মিঠা গন্ধ ভেসে আসছে। আর মাঝে মাঝে কৃষ্ণচূড়ার লাল আমন্ত্রণ। পৃথ্বী ঢুকে পড়ে রাস্তায়। হঠাৎ পেছন থেকে মিঠুর চেঁচিয়ে ডাকা কানে আসে, "কাকা এইতো আমাদের বাড়ী।"

থামতে হয়। উপায় নেই তার মিঠুর ডাককে উপেক্ষা করা। মিতালি ঘন হ'য়ে উঠেছে কাউকেই না জানিয়ে। মিঠু ছুটে এসে হাতটা ধরে' বলে, "আমাদের বাড়ী খুঁজতে এসেছো বুঝি। ঐ ত আমাদের বাড়ী। চল ঠাকুরমা তোমাকে বকবেনা।"

পৃথ্বী হেসে বলে, "আর তোমাকে বুঝি বকবেন।"

"ভীষণ। চিনি ছাড়া দুধ খেতে ভাল লাগে না আমার তাই। তুমি চিনি ছাড়া দুধ ভালবাস? ঐ যে আমার মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে—শীগ্‌গীর চল।"

মিঠুর মা দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়। সাগ্রহে তাকায় পৃথ্বী। হঠাৎ এক নিমেষে বুকের ভেতর যেন লক্ষ হাতুড়ির পিটুনি শুরু হ'য়ে যায়। কার এই নিশ্চল মূর্তি। শীতা! শীতা দাঁড়িয়ে আছে তার এত নিকটে! এত স্পষ্ট আলোর নীচে দাঁড়িয়ে দেখছে সে এই অবিশ্বাস্য মূর্তিকে? কত স্বপ্নশেষ রাত্রির অন্ধকারে অনিমেষ চোখে দেখছে সে তার প্রাণের সহচরী এই শীতাকে। আর কত ক্লান্ত

দিবাস্বপ্নে। সেই শীতা, ঐ কথার ঝরণা দুরন্ত মিঠুর মা। পৃথ্বীর পা দু'টো যেন মাটির সাথে আটকে যায় আকস্মিক বিহ্বলতায়।

মিঠুও লক্ষ্য করে এই ভাবান্তর। "ভিতরে চলো, মা কাউকে বকেনা। সবাইকে ভালবাসে।" কচিকণ্ঠের ছোট্ট একটুকরো আশ্বাসে যেন লক্ষ কণ্ঠের ধ্বনি উঠেছে পৃথ্বীর কানের পর্দায়। "মা সবাইকে ভালবাসে।" পৃথ্বীর চাইতে বেশী একথার নিহিত সত্য আর কেউ জানবে কি?

মিঠুর হাত ধরেই এগিয়ে আসে পৃথ্বী। শীতা তার আড়ষ্টতা লক্ষ্য করে সামলে নেয় নিজেকে। মিঠুর উচ্ছল কথার ঝরণা বয়ে চলেছে, "মা, কাকা ভুল করে বুলুদের বাড়ী চলে যাচ্ছিল।" মিঠুর মা ম্লান হাসি হাসে। মেয়ের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বলে ইঙ্গিত ভরা সুরে, "তোমার কাকা ভুল করেই চলে যান চিরদিন।"

"কালও বুঝি চলে গিয়েছিল? তোমাকে দেখতে না পেয়ে।" মিঠু একটা মোড়া নিয়ে আসে ঘর থেকে—কাকাকে বসতে দেয়। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, "মা, কাকাকে চলে যেতে দিওনা।"

পৃথ্বীর মৌনী চোখে বেদনার ছায়া লক্ষ্য করে' মেয়েকেই উত্তর দেয় শীতা, "তোমার কাকার কত কাজ। তোমার এখানে শুধু শুধু বসে থাকবেন কেন?"

বোঝে পৃথ্বী, মেয়ে মধ্যস্থ মাত্র। পুরানো ব্যথাকেই আঘাত দিতে চাইছে শীতা—তার সাত বছরের জমানো অভিমানের জবাব চাইছে সে মেয়েকে কথা শুনানোর ছলে।

কিন্তু কি উত্তর দেবে পৃথ্বী? সহস্র কথা দিয়েও বুঝি রচনা করতে পারবেনা সে আজ শীতার এই নির্মম কথার উত্তর। করুণ চোখে তাকায় পৃথ্বী শীতার দিকে। সেই শীতা। পদ্মার চরে শেষ

দেখা সেই শীতা। আশ্রয় চ্যুত লতার মত বিশীর্ণ একটি দেহ ভঙ্গিমাকে ম্লান চোখে দেখে পৃথ্বী। সাত বছর ধরে এই দেহের ভিতরে প্রাণ বয়ে চলেছে ক্ষীণধারায়। এই জীবন্ত শিশুটিই হয়তো একমাত্র সজীবতা ওর জীবনের। জীবনের একমাত্র শিকড়।

মিঠুর দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকায় পৃথ্বী। উত্তাপময় রোদ ঢালছে মিঠু ঐ শীর্ণলতার বুকে।

গলা টিপে ধরা মুহূর্তগুলির হাত থেকে রক্ষা করে মিঠু পৃথ্বীকে তার মায়ের কথার জবাব দিয়ে। "শুধু শুধু বসে থাকবে কেন। তোমার ইস্কুলের খাতাগুলি দাও পড়তে। কাকাত অনেক লেখাপড়া জানে।"

শীতা লক্ষ্য করে, একটাও কথা বলতে পারছেনা পৃথ্বী। সহজ করতে চায় শীতা এ আড়ষ্ট মুহূর্তগুলিকে, মেয়ের কথার উত্তর দিয়েই। "তাই নাকি? আমিত ভেবেছিলাম তোমার কাকা একেবারেই মূর্খ মানুষ। না হলে তোমার মাকেও তিনি চিনতে পারলেন না?"

লক্ষ্য করে পৃথ্বী শীতার প্রতিটি কথার ধ্বনি' প্রতিটি ব্যঞ্জনাকে —কথার লুকানো অর্থকে। তবু এতক্ষণে প্রথম কথা যেন হাতড়ে পায় পৃথ্বী। জিজ্ঞাসা করে, "কোন স্কুলে কাজ করছো শীতা?"

শীতাব কানেব পর্দায় অসহায় শিশুর কান্নার মত বেদনা ঢেলে দেয় যেন সাত বছরের আগেকার সেই ছোট্ট একটি স্নেহস্পর্শী সম্বোধন —"শীতা।"

সেই একই কণ্ঠস্বর। আর বুঝি স্থৈর্য রক্ষা করা সম্ভব নয় তার। শীতা শান্ত করতে চেষ্টা করে ভিতরের উত্তেজনাকে, সাত বছরের জমানো অভিমানের উদ্‌বেলিত আলোড়নকে।

"শান্ত হয়ে বসত মিঠু।" বলে সে নিজেকেই শান্ত করতে। শক্ত করে ধরে মিঠুর নরম হাতটা, তার দুর্দিনের পরম আশ্রয়।

করুণ চোখে দেখে, সেই পৃথ্বী—সেই চোখ, কান, মুখ, প্রশস্ত কপাল, চুলের বিন্যাস—তবু এই সেই পৃথ্বী নয়।

পৃথ্বী বোঝে, সাত বছরের বিদীর্ণ দুঃখকে কাটিয়ে উঠতে পারছেনা শীতাও।

একটি বিধবা মহিলা একবার উঁকি মেরে দেখে চলে যায় আগন্তুককে। মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় পৃথ্বীও। একটিও কথা বলে না মহিলাটি। তবু বিষ-ঝরা বহু কথা বলা হ'য়ে যায় তার ভ্রূকুটিময় চাউনিতে। এক নিমেষে এই কুঞ্চিত চোখের ভাষায় তার অপরিচ্ছন্ন মনের তলাটি পর্যন্ত দেখে নেয় পৃথ্বী।

শীতা বলে ম্লান হেসে, "আমার শাশুড়ী।"

পৃথ্বী বুঝেছে তা' অনুমানেই। ফল্গুর মুখে শুনেছিল সে শীতার সৎশাশুড়ীর কথা। বাল বিধবা।

তার চোখের কুটিল ছায়ার ভাষাকে এক নিমিষে পড়েও ফেলে পৃথ্বী।

পৃথ্বী মনে মনে আঁৎকে উঠে—এর সাথে কি করে কাটিয়েছে শীতা সাতটি বছর—কাটাবে আরও কত অনিশ্চিত দীর্ঘকাল। আর বসা হয়তো সমীচীন হবেনা। ভাবে, শান্তি যখন দিতে পাবেনি, অশান্তিই বা কেন আর বাড়াবে ওর পারিবারিক সংগ্রামের।

"উঠি আজ শীতা।" ব্যথামাখা উচ্চারণে সম্বোধন করে সে দ্বিতীয়বার তার পরমবাঞ্ছিতকে। আকণ্ঠ পিপাসাময় মনে উচ্চারণ করে যেন তার সমস্ত দুঃখকে লেহন করে করে, শীতা, এ দুঃখের জীবনকে আর কতকাল টানবে তুমি এই সাথীহীন পথে।

বাইরে বেরিয়ে আসে পৃথ্বী। শীতাও উঠে আসে বহির্দ্বার পর্যন্ত। নীরব চোখের অনিচ্ছুক বিদায় গ্রহণ করে পৃথ্বী নীরবে।

মিঠুই বারে বারে বলে, "আবার এসো কাকা। বুলুদের বাড়ী চলে যেওনা ভুল করে।"

শীতার জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি উপলব্ধি করে বলে পৃথ্বী, "আসবো মিঠু, আবার আসবো।"

মনে মনে বলে সে আর্তস্বরে, "না এসে উপায় নেই যে মিঠু! এত তিলে তিলে মৃত্যুর হাত থেকে তোমার মাকে বাঁচাতেই হ'বে।"

সাইকেলের মোড় ঘুরিয়ে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে যায় পৃথ্বী দুই জোড়া তৃষিত চোখের দৃষ্টিপথ থেকে।

শীতার সৎশাশুড়ীর স্নেহহীন রুক্ষ বাঁকাচোরা দৃষ্টিটা অনুসরণ করছে যেন তাকে অশুভ কায়ার মত।

আকুল স্বরে বলে সে মনে মনে, "মিঠু, তুমি তোমার মায়ের সব দুঃখকে হার মানিও তোমার মিঠা প্রাণের স্পর্শ দিয়ে।'

পৃথ্বী চলে গিয়েছে দৃষ্টির আড়ালে। শীতা অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূর শূন্যের দিকে। শাশুড়ী দু'বার এসে দেখে গিয়েছে শীতাকে তার ধারাল চোখে। ইচ্ছে করেই খেয়াল আনে না আজ শীতা, সে বাঁকা দৃষ্টিকে। এ দৃষ্টিকে মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয় এখন তার এ মুখর মুহূর্তে। কথা বলে উঠেছে যেন ফেলে আসা দূর অতীতের মুহূর্তগুলি। বেহালার দীর্ঘ আলাপের মতই টেনে টেনে আনছে যেন কোন্ সংগোপন সকরুণ সুর। কথা না বলে গাওয়া সুরের মতই যেন পৃথ্বীর শেষ কথা দুটি ঘিরে ফেলেছে তাকে—"আসবো মিঠু, আবার আসবো।"

নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার উপর ছড়ানো স্কুলের খাতাগুলির দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে শীতা, সাতবছর আগেও এরকমই খাতা দেখতো সে পদ্মাপারের সেই স্কুলে তার প্রথম শিক্ষিকা জীবনে। কিন্তু সেই জীবন আর আজকের জীবনের মাঝখানে ভাঙা সেতুটা আর কোনদিনই জোড়া লাগবে না।

অবিস্মৃত অতীতের স্মৃতি। পদ্মাপারের সেই দিনগুলি! আশা আর উদ্দীপনা ভরা শীতার প্রথম শিক্ষিকা-জীবনের।......কারেকসনের খাতা নিয়ে বসেছে শীতা। বারে বারে চোখ পড়ছে তার ধানী জমির ওপারে অবিরাম গতি পদ্মার দিকে। পেছন থেকে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় উর্মি, পাশের বাড়ীর সুন্দরী মেয়েটি। মিষ্টি হেসে বলে, "মেজদার তলব এসেছে, যেতে হবে এখুনি।"

বেশ ভাল লাগতো শীতার উর্মিকে। হালকা ডানায় ভেসে চলা আকাশ সঞ্চারী জীবন। আধা বড়লোকের বাপসোহাগী মেয়ে।

শীতার বোর্ডিং ঘরের জানালা দিয়ে ওদের জীবন যাত্রার অনেকখানি ছবিই চোখে পড়তো। খাতা দেখার ফাঁকে ফাঁকে চোখ তুলে তাকাতো শীতা। দেখতো, লেস বুনতে বুনতে মৃদুস্বর টানছে সুন্দরী মেয়েটি। কখনও বা খাঁচায় ভরা পোষা ময়নাকে খাবার দিচ্ছে ছড়া বলে বলে।

তারপর রাত্রিতে নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়তো যখন ছোট্ট মফস্বল শহরে, ঘুমিয়ে পড়তো বোর্ডিং বাড়ীর মেয়েরাও পড়া সাঙ্গ করে, ঠিক সেই সময়েই রোজই ওদের সিঁড়িতে বসে একটি গান শুনাতো উর্মি তার প্রিয় পরিজনদের।

সুরের বেশ আলতো ভাবে ছুঁয়ে যেতো শীতার ঘুমে-ভারী চোখের পাতায়—একটু মধুর আবেশ, একটি সুখী পরিবারের মৃদুস্বপ্ন।

উর্মির মেজদা রথী সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছে কয়দিন আগে। উর্মি এসে এক কপি 'গণশক্তি'র গ্রাহক হতে অনুরোধ জানায় শীতাকে। মাত্র এইটুকুই পরিচয়। আর তার ঘরের জানালা দিয়ে দুএকবার চোখ পড়েছে রথীর দিকে—ব্যস্ত পায়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঘরে ফিরছে—কিংবা বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে। দেখতেও সুন্দর। কিন্তু শুধু কি তাই। না আরও কোনও কারণ ছিল। আরও কিছু কারণ। কোনও এক যোগসূত্রের সন্ধান পেয়েছিল কি শীতা সেই

বিদেশে, সম্পূর্ণ অপরিচিতের মাঝে ঐ এক কপি 'গণশক্তির' গ্রাহক হতে বলার একটি অসামান্য ইঙ্গিতে। সারাটা দিন বড় ভাল লেগেছিল সেদিন শীতার। না, একেবারে বিভূঁই বিদেশ নয়। মাত্র একটা জানালার পরেই ছোট্ট প্রাঙ্গণ টুকুর পাশেই রয়েছে যেন এক পরম বান্ধব। মাত্র তিনদিন পরই ঊর্মি আবার এসে জানায়, "যেতে হবে এখুনি, তলব এসেছে।"

মস্ত বড় একটা আধা আধুনিক বোসবার ঘর। সোফা ফুলদানি—আর অর্গান। রথী নিমেষেব জন্য একবার দেখে নেয় নবাগতাকে। বিনীত, ঘনিষ্ঠ অথচ সংযত দৃষ্টি। প্রথম পরিচয়ের সম্ভাষণের বালাই নেই, ছোট্ট একটি নমস্কারও নেই। শুধু আত্মীয়তা ওদের চোখে চোখে।

একখানি চিঠি এগিয়ে দেয় রথী শীতার হাতে। অতি পরিচিত হস্তাক্ষব। এদের সাথে সংযোগ রেখে চলার নির্দেশ জানিয়েছে কোলকাতা থেকে পৃথ্বী।

একটা চাপা উত্তেজনায় ভারী হয়ে উঠে যেন শীতার বুকের ভিতরে। দায়িত্ব এসেছে, কাজের দায়িত্বের প্রথম শিহরণ।

আর সে নির্দেশ এসেছে পৃথ্বীর কাছ থেকেই! সবটুকু চাঞ্চল্য ভিতরে চেপে রেখে কথা বলে শীতা। রথী উঠে পড়ে, "চলি। পরিচয় যখন পেলামই, তখন কিছু কিছু মাস-হারা চাঁদা চাই কিন্তু আমরা। টাকাপয়সার বড় টানাটানি।"

ঊর্মি খোঁচা দিয়ে বলে, "একটু লজ্জাও করেনা তোদের। পরিচয় হতে না হতেই হাত পাতিস।" "শীতাদি, ওদের টাকা দিতে যদি একবার শুরু কর, তবে আর এখান থেকে না পালিয়ে উদ্ধার পাবে না।"

রথী স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বোনের দিকে সস্নেহে।

উর্মি চা নিয়ে আসে শীতার জন্য। রথী তাকিয়ে বলে, "শুধু চা দিলি। কি সব ভাজলি, তা দিলিনা।"

উর্মি লজ্জা পেয়ে বলে "তোমাকে দিলাম বলে? অতিথিকে ওসব দেওয়া যায়? ভুলে যাও কেন, আমরা বুর্জোয়া সভ্যতারই পদাংক ধরা লোক। বেগুনী ফুলুরি দিয়ে অতিথি এন্টারটেন্ করলে মধ্যবিত্তের ঢাকনা খুলে যাবে না!"

রথী হাসে বোনের কথায়। প্রীতিমাখা করুণার চোখেই দেখে যে ছোটবোন ও তাদের কাজের ধারাকে, বোঝে রথী। অভাব না থাকা ঘরের আদরিণী মেয়ের চোখে ঐ ক্ষেত খামারের চাষীদের দিয়ে দেশ উদ্ধারের কল্পনাটা, নিছক কল্পনাই। একমাত্র দাদাকে ভালবাসে বলেই সে তাদের যতটুকু সম্ভব সাহায্য করে—দৌত্যগিরি করে, মিটিংয়ে মেয়ে জুটায়। তবে তার অবিশ্বাস অপ্রকাশিতও রাখে না।

ঘরে ফিরে দেখে শীতা, শুক্লাদি সাজসজ্জা করে বসে আছে তারই অপেক্ষায়, চরে বেড়াতে যাবে। সঙ্গে মায়াদি, ছায়াদি। এ ভাললাগা দিনটিকে অপব্যয় করার একবিন্দু ইচ্ছা নেই শীতার। কিন্তু উপায় নেই।

"যাও শীতা শীগ্গীর কাপড় ছেড়ে নাও। আধঘণ্টা দেরি করিয়ে দিলে।"

ছায়াদি জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। "উর্মিদের বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি। উর্মির সাথে বুঝি কোলকাতায় আলাপ ছিল।"

"না এখানেই এসেই পরিচয়।" সহজ সুরে উত্তর দেয় শীতা।

"এখানে এসে। এরই মধ্যে এত ভাব?"

ছায়াদির এতক্ষণে খেয়াল হয় যেন, "উর্মির মেজদা জেল থেকে খালাস পেয়ে এসেছে না।"

জিজ্ঞাসু চোখের চাউনিতে কি কথা যেন বলা হয়ে যায়। বিরক্তি-কর ইঙ্গিত।

মাঝনদীতে পালতোলা নৌকোর সার বয়ে চলেছে। জ্যোৎস্নার বান নেমেছে নদীতে। চটুল পরিহাসের এক ফাঁকে হঠাৎ খেয়াল হয় ছায়াদির, শীতা একটাও কথা বলছেনা।

"এত চুপ যে। তোমার মনে আবার কার ধ্যান চলেছে। কোনও মহাকাব্য না মহাপুরুষের।"

শীতা মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে ভাবে চেষ্টাসাধ্য বেশবিন্যাস, আর লঘু পরিহাস এইতো ওদের চরে বেড়ানোর নিত্য ইতিহাস। তবু এর ব্যতিক্রম হ'তে পারবেনা একদিনও।

ঘরে ফিরে দেখে, রথীর ঘরে আলো জ্বলছে। টেবিলের উপর ঝুঁকে একাগ্রমনে কি লিখছে সে। কি লিখছে সে একাগ্রমনে? কোনও একটি আগামী দিনের কার্য্যসূচী না গতদিনের কাজের খতিয়ান ?

শুক্লাদির ঘরেও বাতি জ্বলছে। মোমাধারে মোম গলে গলে নিঃশেষ হ'য়ে যাচ্ছে রাত্রির অঙ্গরাগ আর প্রসাধন-সামগ্রীর উপর। তারই ধারে দাঁড়ান দর্পিতা শুক্লাদির চোখের কোণায় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে শেষ যৌবনের ম্লানিমা।...

পরের দিন স্কুল ছুটির পর উর্মি শীতাকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নদীর দিকে—নদীর ধারে খোলা মাঠের বুকে সভা ডেকেছে রথীরা। দূর থেকে দেখে, সভার কাজ শুরু হ'য়ে গিয়েছে। সূর্যের আভা লুটিয়ে পড়েছে লাল পতাকার গায়ে। বক্তৃতা দিচ্ছেন যিনি, তার চোখে মুখেও এসে পড়েছে পশ্চিম সূর্যের শেষ রশ্মি।

মোহমাখা চোখে তাকায় শীতা বহুদূর থেকে। বুকের ভিতরে যেন এক দুরাশা কম্পিত অস্থির স্পন্দন সুরু হ'য়ে যায়। কার

এই যাদুস্পর্শী দেহ ভঙ্গি! কে বক্তৃতা দিচ্ছে? পৃথ্বী! পৃথ্বী এসেছে এখানে এই পদ্মার চরে বক্তৃতা দিতে—অযুত মানুষের কামনার বার্তা নিয়ে এসেছে পৃথ্বী এই পদ্মানদীর পলিমাটির বুকে। সমস্ত রক্তপ্রবাহ যেন দ্রুত ধাবমান হ'য়ে উঠে। অনুভব করে শীতা, রাসায়নিক সংমিশ্রনের মত কি এক মধুর মিশ্রন রক্তের অণুতে অণুতে। মধুর উত্তেজনা—মধুর আলোড়ন। দূর থেকেই দেখতে পায় শীতা, ঘন ঘন সমর্থনের হাততালি পড়ছে শ্রোতাদের ভিতর থেকে।

দ্রুত এগিয়ে যায় দু'জনে। অকর্ষিত শক্ত 'ক্ষেতী' জমিতে পায়ের মেয়েলী চটি বারে বারে ঠোক্কর যায়। ওদিকে সভার শেষ কথা-গুলি কানে এসে বিঁধে—"আজকের মত সভার কাজ এখানেই শেষ।"

লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠে শীতা। উর্মি ফিস ফিস করে বলে, "বোসে পড় শীতাদি। মেজদা দেখে ফেল্লে আর রক্ষা নেই।"

কিন্তু রথীর চোখ এড়ায় না। চোখে চোখেই মৃদু ভৎসর্না জানায় দূর থেকে।

সন্ধ্যার ছায়া নামে চরের বুকে। এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ে সভা ভাঙ্গা মানুষেরা নিড়ানি হাতে। ঘরমুখী পা চালায় প্রাণভরা মনে।

অপ্রস্তুত উর্মি কৈফিয়ৎ তৈয়ার করে, "মেজদার কাছে বলবো, শীতাদির জন্যই দেরি।"

একেবারে ফাঁকা চর। চাঁদের আভা ছড়িয়ে পড়েছে সাদা চরে। রথী ও পৃথ্বী এগিয়ে আসে।

"কি, আমাদের সভায় কি জাতীয় লোক সংখ্যা হয়, তাই দেখতে এসেছিলেন? না চরে বেড়াতে?"

রথীর এ বিদ্রূপে এক পোচ কালি ঢেলে দেয় যেন শীতার

মুখে। তা' লক্ষ্য করে, মৃদুহেসে বলে পৃথ্বী, "তোর এই প্রলিটারিয়েট মেজাজই সব ডুবাবে।"

সেই স্নেহের সুরটুকু আজও যেন কানে লেগে আছে শীতার। কিন্তু রথী সূক্ষ্ম ভদ্রতার ধার ধারতো না। স্পষ্ট কথাকে অস্পষ্ট করে বলার বুর্জোয়া কায়দা কৌশলের ও অপেক্ষা রাখতো না। খোঁচা দিয়ে বলে সে, চাঁদনিরাতে চরে বেড়ানত, অনেকেই বেড়িয়েছেন। এবার একটু সত্যিকারের কাজ করুন ত। চলুন আমাদের বাড়ী। পৃথ্বীদার ঘরে বসে একটা ইস্তাহারের খসড়া তৈয়ার করে দিয়ে যান। বাংলার টিচার যখন—ভাষাটা দখলে আছে নিশ্চয়ই।"

মেয়েদের বোর্ডিং বাড়ীর পেছনে মাঠটার শেষে ছোট্ট একটি বাঁশের বাংলো ঘর। ঘরটা রথীর বাবা ভাড়া দেওয়ার জন্যই তৈয়ার করেছিলেন। কিন্তু ছেলের কৃপায় ও ঘরের ভাড়া আর তাকে পেতে হয় না কোনদিনই। সে সময়ে পৃথ্বীর থাকার ব্যবস্থা করেছে রথী সে ঘরে। কৃষকদের মধ্যে কাজের ভার নিয়ে ফিরে এসেছে পৃথ্বী।

রথী শীতাকে কাগজ কলম দিয়ে চলে যায়।

ঘণ্টাখানিক পর আবার ফিরে আসে পৃথ্বীকে নিয়ে। শীতার অর্দ্ধলিখিত খসড়ায় একটু চোখ বুলিয়ে তারই সামনে ছিঁড়ে ফেলে সেটা। "কিছুই হয়নি। বৃথাই বি-এ পাশ করেছেন। রাজনীতির অ-আ-ক-খ ও শেখেননি।" এক বিন্দু সংকোচ না করে বলে রথী।

লজ্জিত হয় শীতা। পৃথ্বী চোখ বুলিয়ে, কি যেন পড়ে নিল তার লজ্জিত মুখের বেদনায়, অনুভব করলো সেও তা। রথী আবার বলে, "এক কাজ করুন, পৃথ্বী দা যেকয়দিন আছে, তার কাছে এসে একটু রাজনীতির জ্ঞান নিয়ে যাবেন—না হ'লে ওবিদ্যা দিয়েত আর বেশীদিন মুখ দেখাতে পারবেননা।" আধাঠাট্টার সুরে বলে রথী।

সেই বাঁশের ঘর! অদৃশ্য নীড় রচনা করেছিল শীতা নিজের অজান্তে সেই বাঁশের ঘরে।............

বর্ষণশ্রান্ত মেঘের আমন্ত্রণ বয়ে চলেছে দিকে দিকে। মনের ঘুমানো কামনার ও বুঝি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল সেদিন প্রকৃতির নিমন্ত্রণে।......

সাতবছর আগের সেই অবিশ্রান্ত শ্রাবণের ধারা যেন বয়ে চলেছে শীতার চোখের সামনে এই জ্যৈষ্ঠমাসের সুনির্মল আকাশের তলায়।......

.........সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে—একটু জিরান পড়েত আবার দ্বিগুণ জোরে শুরু হয় বৃষ্টি। শীতা এসেছে পৃথ্বীর ঘরে একটা বই নিতে। পৃথ্বী নেই ঘরে। তাকিয়ে দেখে সে ঘরখানার করুণ অবস্থা। কতদিন যে ঘরে ঝাটা পড়েনি তার ঠিক নেই। বই খাতাপত্র কাগজ ছড়ানো ঘরময়।

পৃথ্বীকে একটু অবাক করে দেবে ভেবে' ঘরের কোণা থেকে ঝাঁটাটা বের করে তাড়াতাড়ি করে ঘরখানা ঝাড় দিয়ে ফেলে। তারপর শতরঞ্চির উপর বই খাতাপত্র সব গুছিয়ে রাখে সুন্দরভাবে। ঘরের সামনেই একসার দোপাটি ফুলের গাছে ফুল ফুটে রয়েছে অজস্র—লাল, সাদা, গোলাপী। মনে হয় যে, রংয়ের কমপিটিসন লেগে গিয়েছে! ফুলগুলি দেখে লোভ সামলাতে পারেনা শীতা। এক দুষ্টু বুদ্ধি চাপে মাথায়। বেছে বেছে কয়েকটা সুন্দর রংয়ের ফুল তুলে এনে রেখে দেয় পৃথ্বীর একখানা খাতার উপর। পাশেই এক টুকরো সাদা কাগজে প্রশ্ন চিহ্ন দিয়ে লিখে রাখে—"সৌন্দর্য-বিলাস ?" কিন্তু ঘর থেকে বের হ'বার আগেই আবার বৃষ্টি শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীও ঘরে ঢোকে আধাভেজা অবস্থায়।

এক মুহূর্তে ঘরখানার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় পৃথ্বী। ফুলগুলি ও তার পাশের লেখাটাও দেখে। হেসে বলে পৃথ্বী—"না; সৌন্দর্য বিলাস নয়। সুন্দর জিনিষকে আমরাও সুন্দর বলেই স্বীকার করি।"

শীতা এমন অসময়ে ধরা পড়ে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠতে থাকে। লজ্জা এড়াবার জন্য বলে, "এবার চলি।"

"যাবে মানে? দেখত বাইরে তাকিয়ে।" কি একটু ভেবে বলে পৃথ্বী, "আর এই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়েছিলে ফুল দিতেই?" কথাটা বড় ইঙ্গিত-ঘেষা মনে হয়—ধরাই পড়ে' গেল নাকি সে পৃথ্বীর চোখে। আরক্তিম হ'য়ে উঠে চোখমুখ। কিন্তু জবাব খুঁজে পায় না।

পৃথ্বী তাকিয়ে দেখে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে শীতাকে। হয়তো লক্ষ্য করেছিল তার রাঙিয়ে উঠা মুখের অর্থময় আভাটুকুও। তারপর নিবিড় অন্তস্পর্শী সুরে ডেকে বলে, "শীতা।"

একটু থেমে জড়তাহীন প্রগাঢ় স্বরে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা শীতা, কাউকে ভালবাসছো কি?"

আনত দৃষ্টি দিয়েও অনুভব করে শীতা, পূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে যে পৃথ্বী তারই উত্তরের অপেক্ষায়। কিন্তু উত্তর দিতে পারে না শীতা।

মধুর ব্যথার ছায়া থিতিয়ে উঠে শীতার চোখের পাতায়। মনে মনে বলে সে, "এ কথা কি মুখে বলে দিতে হ'বে?"

কিন্তু মুখে শুধু বলে, "চলি এবার। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে।"

পৃথ্বীর কথার জবাব না দিয়েই চলে এসেছিল সেদিনের সেই শীতা।

একটি সহজ প্রশ্নের সহজ জিজ্ঞাসা। তবু এর উত্তরের কোনও ভাষা নেই।

আজও ভাষাহীন এ উত্তর। ভাষা নেই—কোনও ভাষা নেই—যা দিয়ে বোঝাতে পারে সে, হৃদয়ে স্তরে স্তরে, বুদ্ধিতে, বেদনায় এ কা'কে সে অনুভব করছে দিনে, রাতে, প্রতিপলে, বসন্তে, বর্ষায়।

দুরন্ত মিঠু খেলা ফেলে চুমু খায় মায়ের কপালে—"মা, তুমি আমায় ভালবাস?"

"খুব ভালবাসি।" বলে শীতা মেয়েকে একটু আদর করে। মিঠু ছুটে চলে যায়।

"ভালবাসি, ভালবাসি।" আকণ্ঠ পিপাসাভরা উত্তর। তবু এ ক্ষুধিত উত্তরের কোনও ভাষা নেই।

আকাশে বাতাসে মাখা প্রাচীন পৃথিবীর সেই পুরাতন জিজ্ঞাসা—"তুমি আমায় ভালবাস?"

সেই একই জিজ্ঞাসা দেখেছে শীতা দেবজ্যোতির রুগ্ন চোখে অন্তিম শয্যায়—"শীতা, তুমি ভালবাস?"

কিন্তু সেদিনও সেই মৃত্যুর ছায়াগাঢ় স্বামীর মুখর চোখের নীরব জিজ্ঞাসাও সবোলা করতে পারেনি শীতাকে। কি জবাব দেবে সে? যে মানুষটি চলে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে, মিথ্যা ছলনা দিয়ে বঞ্চনা করা তাকে?

অথচ স্বেচ্ছায়ই এ বন্ধন গ্রহণ করেছিল সে দেবজ্যোতির কাছে। ফল্গু অনুরোধ জানিয়েছিল, "পৃথ্বীদার জেল থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর দিদি।"

কিন্তু শীতাও সেদিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—জেল থেকে ফিরে আসার আগেই সে তাকে তার নিষ্ঠুর চিঠির চরম উত্তর দেবে। জীবনের ভাষায়ই রূপ দেবে সে তার শেষ জবাবের।

ফল্গু খুশি হ'তে পারেনি—বিপক্ষ দলের ছেলেকে বিয়ে করছে দিদি। মন থেকে গ্রহণ করতে পারেনি তা' সে।

শীতাই কি পেরেছিল দেবজ্যোতিকে মন থেকে গ্রহণ করতে?

ছোট্ট একটি ঘটনা। কেমন করে উল্টে দিল তার জীবনকে। সেই একদিন দুপুর বেলা ছাদে বসে বই পড়ছে শীতা—সামনেই ঘুড়ি উড়াচ্ছে মামাত ভাইয়ের ছেলে সমীর। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে সে, "নিল, নিল।"

বই থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে শীতা, আরেকখানা ঘুড়ি ওর ঘুড়ি খানায় প্যাঁচ বসাবার চেষ্টায় ঘুরছে পাশ দিয়ে।

"দেত সমীর, তোর লাটাইটা।" বলে, শীতা তার দক্ষ হাতের টান শুরু করে সুতোর প্যাঁচে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপক্ষের ঘুড়িখানা লুটাতে থাকে তাদের ছাদে। সমীর মহানন্দে চেঁচাতে আরম্ভ করে, "কেমন জব্দ দেবুদা।"

"দেবুদা!" চমকে তাকায় শীতা এতক্ষণে নীচে মাঠের দিকে। চোখে চোখ মিলে যায়। লজ্জায় লাল হয়ে উঠে শীতা। কি ভাববে তাকে। অপরিচিত মানুষেব ঘুড়ির সুতোয়—ছেলে মানুষের মত পাক খাওয়ান! সমীর সমানে চেঁচিয়েই চলেছে, "কেমন জব্দ দেবুদা, শীতাদির কাছে হেরে গেলেন।"

তার কিছুদিন পরই দেবজ্যোতির পিসীমা বিবাহের প্রস্তাব ক'রে পাঠায় শীতার বাবার কাছে। সৎশাশুড়ীর মুখে বহুদিন বহু বিদ্রূপের সুরে শুনেছে শীতা, দেবজ্যোতিই নাকি পছন্দ করে বিয়ে করেছে তাকে। শাশুড়ীর মনের সেইত প্রধান জ্বালা—ভালবেসে বৌকে বিয়ে কবেছে ছেলে তার মাতৃত্বের অধিকারকে অমর্যাদা করে। পেটের সন্তান হ'লে কি আর এমন কাজ করতে পারতো দেবু।

কিন্তু তবু শীতা ভালবাসতে পারেনি তার বিবাহিত স্বামীকে। একথা পৃথিবীব কাছে বলার অধিকার তার নেই। কিন্তু নিজেকেত ফাঁকি দেওয়া যায় না নিজের কাছে। নিজের মনকে সে বুঝতে পেরেছিল বাসর রাত্রিতেই যে, পৃথ্বীকে ভোলা তার সম্ভব নয়। তখন আর সময় নেই। আত্মার আহুতি ছাড়া আব কোনও পথ নেই। নিজেকে ফাঁকি দিতে পারেনি শীতা—ফাঁকি দিতে পারেনি সে তার স্বামীকেও।

প্রথম মধু-যামিনীতেই টের পেয়েছিল দেবজ্যোতি, শীতা শুধু সহ্য

করছে স্বামীত্বের অধিকার, কিন্তু প্রেমের অধিকারকে স্বীকার করেনি তার হৃদয়।

চাঁদের অস্পষ্ট আলোতেও লক্ষ্য করলো দেবজ্যোতি, শীতার সেই প্রথম রাত্রির পাংশু বিবর্ণ মুখছায়া—দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে সে শুধু পুরুষের অধিকার, লক্ষ্য করলো যে তা দেবজ্যোতি, শীতাও টের পেল তা।

সেই প্রথম—সেই শেষ রাত্রি। আর কোনও দ্বিতীয় পূর্ণিমা রাত দুর্বল করতে পারেনি দেবজ্যোতির বলিষ্ঠ সংযমকে।

কৃতজ্ঞতা ধরা দিয়েছিল শীতার নীরব চোখে, লক্ষ্য করলো তাও দেবজ্যোতি।

দেবজ্যোতির এ উদারতায় মনে মনে অনুতাপে পুড়ে মরে শীতা—তার নিজের জীবনকে বলি দিতে একি করলো সে। বঞ্চিত করলো আরও একটি জীবনকে প্রেমের স্বাদ থেকে।

কিছুদিনের মধ্যে শুরু হ'ল আগষ্ট আন্দোলন—দেবজ্যোতিও আবার বেরিয়ে পড়লো সে ঘরছাড়ার ডাকে—তার পুরানো পথের ডাকে। মাস কয়েক পরই সংবাদ এলো, সে ধরা পড়েছে আরাকানের পথে, পুলিশের হাতে।

শীতার দেহে তখন ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রথম সন্তানের সাড়া। এক অপ্রকাশিত বেদনাকে নিঃশেষে নিজের ভিতরে গ্রহণ করলো শীতা।

তারপর দীর্ঘ কারাবাসের অন্তে মুক্তি পায় যেদিন দেবজ্যোতি, শীতা তার আড়াই বছরের শিশু কন্যার হাত ধরে, বহু ভীড়ের আড়ালে জেলদুয়ারে অপেক্ষা করে স্বামীর জন্য। চোখে তার বিবাহিত জীবনের প্রথম দীপ্তি ধরা দিয়েছে। প্রেম সে দিতে পারে নাই স্বামীকে—কিন্তু বঞ্চিত করেনি তাকে তার সন্তানের ভাগ্য থেকে। তিল তিল করে

দেহ দিয়েছে—প্রাণ দিয়েছে—নবজীবনের সুর দিয়ে গড়ে তুলেছে একটি জীবন্ত শিশুকে—তার মিঠুকে। সমস্ত ফাঁকির ঋণ শোধ করবে শীতা সেদিন সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে।

ভীড় ঠেলে এগিয়ে যায় শীতা—মেয়ের হাত দিয়ে ফুলের মালা পরিয়ে দেবে পিতার কণ্ঠে।

কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় শীতা—এক অপ্রত্যাশিত দুঃখের ভারে ভেঙে পড়ে সে। এ কোন দেবজ্যোতিকে বরণ করতে এসেছে সে এই মধুর প্রভাতে। এ কোন মৃত্যুপথ যাত্রীকে? ভগ্ন স্বাস্থ্যের এ কি নিদারুণ অভিশাপ কুড়িয়ে এনেছে সে এই শীর্ণদেহে, কারাগৃহের কোন মৃত্যুকুঠুরি হ'তে। হঠাৎ থেমে যায় শীতার অসহায় দৃষ্টি। তার শেষ সান্ত্বনাটুকুরও একবিন্দু অবশেষ নেই আর তার চির শূন্য দৃষ্টির অন্ধকারে। তবু শেষ চেষ্টা করে শীতা আপ্রাণ সেবা দিয়ে দেবজ্যোতিকে বাঁচিয়ে তুলতে। জীবনে প্রথম নারীহৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করেছিল হয়তো দেবজ্যোতি তার রুগ্ন শয্যায়। শিশু বয়সে মাতৃহারা সে। সেই অজ্ঞান বয়সের ঘুমিয়ে থাকা স্নেহ পিপাসাকে আবার বুঝি জাগিয়ে দিয়েছিল অন্তিম শিয়রে বসা নারীমূর্তি। তাই বুঝি দেবজ্যোতির মুমূর্ষু চোখেও ফুটে উঠেছিল প্রেমাকাঙ্ক্ষী হৃদয়ের সেই চিরন্তনী একই জিজ্ঞাসা।

শুয়ে শুয়ে শোনে শীতা, সংসারের কাজ-কর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে। ঘর বাড়ী ধোওয়ানর ঝাঁটার শব্দ। ঝাঁটা নাড়ার শব্দও যে এমন করে পীড়া দিতে পারে মানুষকে, কয়জন মানুষ জানে তা'।

উঠতেই হবে—আর শোওয়া চলে না। অথচ চোখের পাতায় জমে আছে স্বপ্নময় রাত্রির ক্লান্তি, একটা অসার গতিহীনতা রক্তের চাপে। আরও কিছুক্ষণ, আরও কিছু সময় একলা থাকতে চায় শীতা।

কিন্তু উপায় নেই। মৃদুহাতে ঘুমন্ত মিঠুর গায়ে একটু হাত বুলায়। পিতৃহীন অবোধ শিশু! বহু—বহু দূর অতীতের একটা টুকরো এসে জমা হয় চোখের কোণায়।

তখন মিঠু মাত্র জন্মেছে মাস খানিক হল। বেলা ঝিমিয়ে এসেছে তার মামাশ্বশুর বাড়ীর প্রকাণ্ড চত্বরে, পুকুরের বাঁধান ঘাটলায়। বাড়ীর বিবাহিত মেয়ে বৌরা চুল বাঁধা সেরে যার যার পতিপ্রেমের গল্প নিয়ে রসময় করে তুলছে অলস অবসরকে।

শীতা উঠে যায়—মেয়ের কাঁথা তুলতে। পুকুরের ধারে দড়িতে ঝুলান ছোট ছোট আঁতুরের কাঁথার সারি। শীতা ধীরে ধীরে পাট করে, কাঁথা আর মনে মনে ভাবে, কত অনায়াসেই সুখী থাকে এদেশের মেয়েরা। কোনও দ্বন্দ্ব নেই জীবনের—কোনও প্রতিজ্ঞা নেই ভবিষ্যতের।

গ্রাম সম্পর্কের এক দেওর এগিয়ে আসে তার কাছে। চোখ তুলে তাকায় শীতা, কি খবর।

"দেবুদা, অ্যারেষ্ট হয়েছে।"

শীতা বিবর্ণ হয়ে যায় এ হঠাৎ-সংবাদে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে যায়। মেয়েটা ভিজে সমানে চেঁচাচ্ছে কুঁকড়ে কুঁকড়ে। মেয়ের কাঁথা বদলে তুলে নেয় অবসন্ন হাতে। মেয়েকেও একটু দেখে গেল না মানুষটি। এ কি তারই উপর অভিমানে। নীরবে সবটুকু দুঃখকেই নিজের ভিতরে চুষে নেয় সে ব্লটিং কাগজের মত। তার মনের অবস্থা বুঝাবার মত কেউই নেই যে বাড়ীতে!

বাতাসের আগে আগে ছড়িয়ে পড়ে খবরটা সারা বাড়ীতে। দেবজ্যোতি আবার অ্যারেষ্ট হয়েছে।

মস্ত বাড়ী, প্রকাণ্ডচত্বর ঘেরানো অনেকগুলি দালান অনেক শরিকের।

দুর্গামণ্ডপ, বৈঠকখানা, অতিথিশালা। বাড়ী ভর্তি লোক গিজ গিজ করছে—পূজোয় বাড়ী এসেছে সবাই শহর থেকে।

সংবাদটা সকলেরই কানে পৌঁছায়, মুহূর্তের জন্য একটু মনটা নাড়া দিয়ে উঠে কারও-কারও। তারপর আবার সাংসারিক কাজের চাকায় হারিয়ে যায় সে খবর।

দেবজ্যোতির এক বৌদি অভিযোগের সুরে বলে, "আচ্ছা, ঠাকুরপো নাকি তোকে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন; তাও ঘরে বাঁধতে পারলিনা।"

রাজনীতি করাকে অপরাধ মনে করে না শীতা। তবু কথাটার একটা ক্ষীণ চাবুকের স্পর্শ যেন অনুভব করে সে বুকের ভিতরে। আজও ভুলতে পারে নি শীতা সেই কথার সুর "ঠাকুরপো নাকি তোকে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন।"

খেয়াল হয় শীতার—বাইরে ঝাঁটার শব্দ থেমে গিয়েছে। আর দেরি করার অর্থ, দিন ভরা বিপর্যয় ডেকে আনা। যদিও জানে সে, এ বাড়ীর দিনের কাজ এই উষার প্রথম আভাসের সাথেই শুরু না করলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু চল্লিশ বছরের কাজের ধারার ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারে না শাশুড়ী। দেরি করে বৌ মানুষের ঘুম ভাঙ্গায় নিতান্তই আপত্তি মেনকার। ঘুম অবশ্য দেরিতে ভাঙ্গে না শীতার। কিন্তু সংসারের জীবনকে গ্রহণ করতে চায় সে দেরি করে। আনন্দ পায় না, এক বিন্দু আনন্দ পায় না সে এই প্রাত্যহিক সংসারের কাজে। তবু উঠতে হয়। এই নিয়ম। আন্তর্জাতিক নিয়মের চাইতেও দৃঢ় এই সাংসারিক জীবনের নিয়ম।

শাশুড়ীর পদশব্দ ভারী হ'য়ে উঠেছে। ঐ পদধ্বনির মাঝেই টের পায় শীতা, অনেক মেঘ জমে উঠেছে, কঠিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে চোখের অপাঙ্গে।

দুয়ার খুলতেই চোখ পড়ে—শাশুড়ী নাইতে চলেছেন গামছা কাঁধে। তার ক্রূর দৃষ্টির আড়ালের অভিযোগটুকু পড়তে বিলম্ব হয় না শীতার। আজ একটু দেরি হ'য়ে গিয়েছে শীতার উঠতে, তাই আরও একটু কম দেরি হ'য়েছে শাশুড়ীর নাইতে যেতে। শুধু বধুকে বুঝিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য, আমার নাইতে যাওয়ার সময় হ'য়ে গেল, আর এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো মহারাণীর।

কিন্তু এত করেও লজ্জা দিতে পারে না শীতাকে। আচার নিষ্ঠার বালাই নেই। স্বামীর মৃত্যুর স্মৃতিকে নিরাভরণ বেশে প্রকাশ করে করুণ করতে চায়না শীতা নিজেকে অ-বান্ধবদের কাছে। নিজের দুঃখকে জিইয়ে রাখতে বৈধব্যের আড়ম্বরপূর্ণ বৈরাগ্য বেশকে গ্রহণ করতে পারেনি শীতা।

কিন্তু মেনকা সহ্য করতে পারেনা যেন এ দৃশ্য। অন্যকে উপলক্ষ করে বহুদিন শুনিয়েছে, "বিধবাদের পাড়াল কাপড় পরলে অভক্তি দেখায়। খৃষ্টান খৃষ্টান লাগে।"

কিন্তু বৌয়ের কানে ছোঁয়ওনা সে কথা। অবাকও হয় মেনকা। সধবা থাকতে একখানা ভাল শাড়ীও পরাতে পারেনি সে বৌকে কোনদিন। সে কেন থান কাপড় ধরলো না, বোধগম্য হয় না শাশুড়ীর।

বিনু এসে বলে, "বৌদি, উনান ধরে গিয়েছে।"

বিনু দেশের বাড়ীর ঝিয়ের ছেলে। গত দাঙ্গার পর সবাই যখন দেশ ছেড়ে চলে আসে—বিনুর মা সঙ্গ ছাড়ে না। কিন্তু শীতার শাশুড়ীর বর্তমান আয়ে একজনেরই খরচ চলেনা, আদায় তহসিল বন্ধ। তাই বিনুর মাকে অন্য বাড়ীতে কাজ ঠিক করে দিয়েছে। বাজার থেকে আসে বিনু।

অবসন্ন মনের ছোঁয়াচ দেহময়। তবু চলতে হয়। এই ত জীবন। শীতা ভাবে, এই কি জীবন? যন্ত্রের মত কাজ করে শীতা।

কুটনো কাটতে বসে। কিন্তু কি রান্না করবে, এই সমস্যা প্রতি-দিনই দিনের আরম্ভে।

অনাসক্ত হাতে বাজারের থলি খোলে শীতা—সেইত একই রোজ-দেখা তরকারি।

একটি আলু সিদ্ধ দেয় মিঠুর জন্য ভাত ফুটবার আগেই। মিঠুর নজর এড়ায় না, "রোজ রোজ আলু সিদ্ধ দিয়ে ভাত দাও কেন মা।"

"কেন ডালও ত দেই।"

প্রতিবাদ করতে ছাড়বে না তবু মিঠু—লাফিয়ে চলা মেয়ে। "ছবির মিঠুর মা ত কত কিছু বানায়। তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি ছবিটা।"

শীতা জানে, কি ছবি দেখাবে মিঠু। ঐ ছবিত তারও মনের ছবি। স্নেহ পিপাসার যাতনা যে কি, তিলে তিলে আজ অনুভব করছে শীতা এই দারিদ্র্যের বন্ধনে বাঁধা জীবনের পদে পদে। শিক্ষিকার সামান্য আয়ে সংসার চালানর কষ্ট টের পাচ্ছে শীতা প্রতি মুহূর্তে।

আর ঐ ছবির দেশের মায়েরা। কত জীবন্ত, কত প্রাণময়ী সে ছবি। প্রাচুর্যের ফোয়ারা ছুটেছে লক্ষ্মীমন্তীদের ক্ষেতে, খামারে, গোশালায়—রাশিয়ান দৌপদীদের গৃহস্থালিতে।

উনুনে ডাল বসিয়ে একটা মরিচঝোলের তরকারি কাটে বসে। ফল্গুর আসার কথা। ভালবাসে সে। ভালত বাসে আরও কত কিছু। কিন্তু বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি--ফল মূলাহারী মুনিঋষির মাটির সম্মান করতে হ'বে যে আগে। মনের তলায় তিক্ততাই শুধু জমে। রাঁধা শেষ না হতেই ফল্গু হাজির হয়—সেই একই রোদে ঘোরা, রোদে পোড়া চেহারা। "কি রাঁধছো দিদি—চাখতে হবে নাকি?" "একটা প্লেট নিয়ে বোস্।"

"দুপুরে নাও আসতে পারি। আমার জন্য দেরি করো না তোমরা।" "তাহ'লে খেয়ে গেলেই পারতি।"

"না দেরি হয়ে যাবে।" বলেই বেরিয়ে যায় আবার ফল্গু।

দুপুর থেকেই কেন যেন মনে হচ্ছে শীতার, পৃথ্বী হয়তো আসতে পারে আজ।

মনের ভিতরে একটা মৃদু সুর গুন্ গুন্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সারাদিন সংসারের কাজের ফাঁকে—পৃথ্বী হয়তো আজ আসতে পারে। এ সুর বর্ষার ফুলের মত অলক্ষ্যে মৃদুগন্ধে ভরিয়ে দিয়ে যায়, তবু এর কোনও প্রকাশ নেই, কোনও তীব্রতা নেই, কোনও উত্তেজনা নেই, শুধু স্নিগ্ধ একটি গন্ধধারা যেন বয়ে বয়ে চলেছে। রাত্রির জলসা ঘরের শেষ গানের ধূয়ার মত একটি মৃদু রেশ জড়িয়ে আছে দেহে মনে।

রবিবার। তার পরের দিনও স্কুল ছুটি। টেবিলের উপর এক রাশ না-দেখা খাতা পড়ে রয়েছে। কিন্তু থাক পড়ে। আজ এ নীরব দুপুরটিকে হারাতে পারে না শীতা। একেবারে নিজের ভিতরে পাওয়া অতি মূল্যবান অবসর। বাইরে উজ্জ্বল রোদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুম জড়িয়ে আসে চোখে। তারও আগে জড়িয়ে আসে বহু বিস্মৃত দিবসের ফেনিল রেশ। রুগ্ন শয্যায় সব চাইতে প্রিয়জনের শীতল স্পর্শের মতই নিকটতম নাড়ীর সংযোগ খুঁজে পায় যেন শীতা এ মৌনী মধ্যাহ্নে। পৃথিবীর নিঃশব্দ প্রাণস্পন্দন অনুভব করে শীতা। তার চার পাশের ঘিরে থাকা এই পৃথিবী জড় নয়। অর্বুদ কোটি মানুষের তরঙ্গায়িত জীবন প্রবাহের পাশে পাশে বয়ে চলেছে এ একাকিনী পৃথিবীর অনিবার বেদনাধারা। পত্র মর্মরে মর্মরে তার ব্যথার শিহরণ। অনুভব করে শীতা পৃথিবীর এ বেদনাঝরা ব্যথার নিঃশ্বাস, আর অনুভব

করে ঐ পৃথিবীর সাথে নিজের গভীরতম সত্তার এক নিবিড় সংযোগ। বহুদূরে নারকেল গাছগুলির মাথায় মাথায় ছোঁওয়া নাম না জানা আরও বহু শাখা প্রশাখা। মহাশান্ত মধ্যাহ্নের মায়াচ্ছন্ন নিস্তব্ধতায় ঘুম জড়িয়ে আসে চোখে।

ঘুম ভেঙ্গে যায় শীতার যেন এক বহু আকাঙ্ক্ষিত পদশব্দে। অর্থহীন চোখে তাকিয়ে থাকে শীতা। যেন জন্মজন্মান্তরের স্মৃতির আবেশ লেগে রয়েছে ঘুমভাঙ্গা চেতনার সন্ধিক্ষণে।

বেলা গড়িয়ে পড়েছে। স্পষ্ট চোখে তাকায় শীতা জানালা দিয়ে। তার আত্মীয়া পৃথিবীটা দূরে সরে গিয়েছে। রাস্তা ভরে গিয়েছে ফ্রক পরা দুরন্ত মেয়েদের চঞ্চল পদসঞ্চরণে।

মিঠু ঘরে ঢোকে—"আর কত ঘুমাবে, মা। পৃথ্বী কাকা কখন এসে বসে আছে। আমি চলে যেতে দেইনি।"

চমকে উঠে শীতা। বুকের ভিতরে অশান্ত কাঁপুনি অনুভব করে। কড়া শাসনে নিজেকে সংযত করে বাইরে বেরিয়ে আসে।

পৃথ্বী একটা মোড়ায় বসে বসে মিঠুর দেওয়া একরাশ পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে। শীতা হেসে ফেলে মেয়ের কাণ্ড দেখে। টেবিলের উপর থেকে টেনে বের করেছে পুরান সোভিয়েট ম্যাগাজিন সব। পৃথ্বী শীতাকে দেখে সম্বর্ধনার হাসিভরা চোখে বলে, "বইত আর বাদ দাওনি দেখছি।"

শীতা উত্তর দেয়, "ঐত একমাত্র সম্বল।"

তারপর একটু খোঁচা দেওয়া সুরে বলে, "তবে একমাত্র বিপ্লবের বই-ই রাখার মত বিপ্লবী হ'তে পারিনি। তাই 'কৃষকের ডাকের' পাশেই রামায়ণ মহাভারতও কিন্তু রয়েছে আমার ঘরে।"

পৃথ্বীকে ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বলে শীতা. "সেদিনত বাইরে থেকে বিদায় নিলেন। আজ কিন্তু বসতে হবে।" পৃথ্বী লক্ষ্য করে,

অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে শীতা। ঘরে ঢুকে একটা স্নিগ্ধ তৃপ্তিতে ভ'রে উঠে মন। শান্ত ঘরোয়া ভাব জুড়ে রয়েছে নিখুঁত হাতে সাজান ঘরখানায়। সবার উপরে রয়েছে মিঠুর মধুর পরিচয় ছোট ছোট খেলার সরঞ্জামে।

দেওয়ালে একখানা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি—তলায় মাতা মেরী।

শীতা তার বইয়ের শেলফটা দেখিয়ে বলে, "এই আমার সাত বছরের সঞ্চয় আর ভবিষ্যতের সম্বল।"

পৃথ্বী চোখ বুলিয়ে দেখে যায়—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গীতবিতান---গীতাঞ্জলি থেকে সুকান্তর ছাড়পত্র ন্যায্য মর্যাদায় রয়েছে বইয়ে ঠাসা শেলফের প্রতি তাকে।

পৃথ্বী সতর্কতার সাথেই ব্যক্তিগত সমস্ত জিজ্ঞাসাকে সরিয়ে রেখে, আলোচনা শুরু করে সাহিত্য নিয়ে। ঠিক আলোচনা নয়। পৃথ্বী একাই কথা বলে। শীতার কথার সুর ধরেই বলে, "রামায়ণ মহাভারতকে বইয়ের তাকে স্থান না দিলে যে গণসাহিত্যই বিপ্লব শুরু করবে।

শীতা সহাস্যে প্রশ্ন করে কটাক্ষময় সুরে, "তাহ'লে এদ্দিনে বুঝি 'ফসিলরা' সব রক্তমাংস গায়ে লাগিয়ে বেরিয়েছে মাটির তলা থেকে।"

পৃথ্বী কথার কটাক্ষটুকু লক্ষ্য করে হাসে। "তা অবশ্য ঠিক," স্মিতহাস্যে উত্তর দেয়। অতীত ঐতিহ্যের সবকিছুকেই যে একদিন বরবাদ করা হ'য়েছিল 'ফসিল' আখ্যা দিয়ে—তার প্রতি শ্লেষ থাকা অস্বাভাবিক নয় শীতার, বোঝে সে। তবু তার কথার জের টেনে বলে পৃথ্বী—"তখনকার দিনের উগ্রতারও একটা উত্তর আছে—সবকিছুরই প্রথম ধাক্কাটা একটু জোরেই হয়।"

অফুরন্ত কথা বলে চলেছে পৃথ্বী। ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটি বিচ্যুতি,

সমালোচনা, আত্মসমালোচনা, মুখর প্রগতি সাহিত্যের সমাজচেতনা দিয়ে ঢেকে ফেলে দুইটি হৃদয়ের গোপন চেতনাকে।

শাশুড়ী একবার উঁকি মেরে দেখে যায়, শীতার লক্ষ্য এড়ায় না। কিন্তু পৃথ্বী লক্ষ্য করে না। আলোচনার মোড় ঘুরে আসে ৯ই আগষ্টে। পৃথ্বী একটু থেমে যায় মুহূর্তের জন্য। দেবজ্যোতির কথা ভাবে একবার—নেতাজীর অনুগত শিষ্যের জীবন উৎসর্গের নির্মম অধ্যায়।

তারপর আবার বলতে শুরু করে। স্পষ্ট ভাষায় বলে, "এটা ঠিকই, আগষ্ট আন্দোলনের বিপ্লবীদের আন্তরিকতার ন্যায্য মূল্য আমরা দেইনি। ভুলের পিঠে ভুল করে' করে' যে পাহাড় সৃষ্টি করেছি আমরা, তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হ'বে আমাদের।"

শীতা একটু ম্লান হেসে বলে, "ভুল করতে ওস্তাদ যে আপনারা, তা'ত জীবন ভরেই দেখছি।"

পৃথ্বী হঠাৎ থেমে গিয়ে শীতার মুখের দিকে তাকায় স্থিরচোখে। শীতা কথার সুর ঘুরিয়ে বলে, "এবারত সুদিন আসছে।" পৃথ্বী মনে মনে বলে, "সুদিন না দুর্দিন সেটাইত ভাববার বিষয়।" বাইরে প্রকাশ করে না মনের এ দ্বন্দ্ব। মুখে বলে "সুদিনের আশায়ইত বেঁচে আছি।"

মিঠু এসে বাধা দেয়, "ঠাকুরমা বল্লেন, গোয়ালা দুধ দিয়ে গিয়েছে। দুধ দিয়ে কি হবে।"

শীতা মনের বিরক্তি অপ্রকাশিত রাখার চেষ্টা না করেই বলে, "বল গিয়ে, কিছু ছানার পায়েস, কিছু ভাপের দই কিছু পাতক্ষীর হবে।"

মিঠু অবাক হ'য়ে মায়ের মুখের দিকে তাকায়। অতটুকু দুধে এত কিছু হ'বে?"

পৃথ্বী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেসে জিজ্ঞাসা করে শীতাকে "এ ভাবেই কি ছয় বছর চালিয়েছ?"

"তবে কি আপনি ভেবেছেন, মাদুলি আর কবচ ধারণ করে সামন্ততান্ত্রিক অধিষ্ঠাত্রীদেবীর কাছে পূর্ণ বশ্যতা মেনে নিয়েছে শীতা।"

তারপর হেসে বলে, "না হ'লে আধসেরত মাত্র দুধ তা' দিয়ে কি করতে হ'বে—আর কি বলতে পারি ?"

শীতা মনে মনে বোঝে, পুরুষ অতিথির সাথে বধূর এতক্ষণ ধরে গল্প করাটা আর বরদাস্ত করতে পারছেন না শাশুড়ী। আবার আধুনিকতার কিছু কিছু মুখোশওত তাঁদেরও পরে থাকতে হয়। অতিথিকে এখন বিদায় দিয়ে সংসারের কাছে বৌকে ডেকে আনার এই ইঙ্গিত।

শীতা একটু উঠে যায়, "আমি এক্ষুনি আসছি। বসবেন কিন্তু। আরও কিছু শুনবার আছে।"

একটু পরেই ফিরে আসে। ইচ্ছে করেই কথাকে আরও দীর্ঘ করে টেনে নিয়ে যায়।

ফল্গু না-নাওয়া না-খাওয়া চেহারা নিয়ে ঘরে ঢুকেই হঠাৎ খুশিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে পৃথ্বীকে দেখে, "উঃ, কার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল আজ।"

"আমাদের ভাগ্যের জোর অতদূর নয়। মিঠুর পার্কের কাকা কিনা। তাই একটু পায়ের ধুলো পড়েছে এ বাড়ীতে।" শীতা ঠাট্টার সুরে বলে। "তা হ'লেত একটা কাজের মত কাজ করেছে মিঠু। কই সে।" "বোধ হয় রাস্তায় কিংবা পার্কে।"

"এইত আমি। কাকার জন্য লজেন্স্ কিনতে গিয়েছিলাম। বিশুদার দোকানে।"

পৃথ্বী হেসে বলে, "মিঠুই তাহলে অতিথির মর্যাদা দিতে জানে। তার মা ত এক কাপ চা ও খাওয়ালনা এতক্ষণে।" মিঠু তাড়াতাড়ি মায়ের দোষ কমাতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠে, "মা ত চায়ের জল বসিয়ে রেখেছে। আরও কি জিনিষ বানিয়ে রেখেছে তুমি আসবে বলে।"

পৃথ্বী শীতার দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে বলে, "তোমার মা কি আগেই জানতো যে আমি আসবো।" শীতা লজ্জা পেয়ে মেয়েকে মধুর দৃষ্টি দিয়ে একটু শাসন করে। তারপর চা বানাতে চলে যায়। পৃথ্বী মৃদু বেদনার সাথে সর্বহৃদয় দিয়েই অনুভব করে নিঠুর এসংবাদ, শীতাও প্রতীক্ষা করেছিল তাকে।

বাড়ী ফেরার পথে চলতে চলতে তন্ময় হ'য়ে ভাবে পৃথ্বী, কিন্তু কিসের জন্য এ প্রতীক্ষা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা ফিরে চলেছে নীড়ে। বহুকাল পর মনে মনে আকুলস্বরে আবৃত্তি করে পৃথ্বী—

"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনই, অন্ধ, বন্ধ কোর না পাখা।"

পৃথ্বীর ঘরের ঠিক নীচের ঘরখানায় তিনবন্ধুর আস্তানা। সুদর্শন, শীতাংশু আর অরুণাংশু। আপাতত সুদর্শন প্রেসের কম্পোজিটার, শীতাংশু এক মারোয়ারী ফার্মের কেমিষ্ট আর অরুণাংশু আর্টিষ্ট।

কয় বছর আগের কথা—পৃথ্বী একদিন ভীমার্জুনকে ডেকে বলে "চাকরিত আর টিকে থাকছেনা আমার। এমন মনিবের কাজে তুমিই বা আর টিকে থাকছো কেন।"

ভীমার্জুন কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, "এটা আপনি কি বলছেন খোকাবাবু, আমি নেমকহারাম হ'বো যে আপনার চাকুরি নেই বলে আপনার চাকরি ছেড়ে দেব।" কিছুদিনের মধ্যেই পৃথ্বীকে না জানিয়ে নীচতলার একখানা অব্যবহার্য ঘরের ভাড়াটে ঠিক করে আসে। ভাড়া দশটাকা। তার উপর তার দেশের লোক। বছরের পর বছর যায় ভাড়াটে ঠিকই আছে, কিন্তু ভাড়ার টাকার নামও নেই।

হঠাৎ একদিন সেই ভাড়াটের কি মতি হয়, জিনিষপত্র গোছাতে

থাকে। ভীমার্জুন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, যাক এতদিনে ঘরখানা গতি হ'লো।

কিন্তু একগাড়ী জিনিষ যেতে না যেতেই আরেক গাড়ী জিনিষ এসে হাজির। ভীমার্জুনের ত চক্ষুস্থির! তারপর চক্ষু আরও স্থির হ'য়ে যায়, যখন শোনে তার দেশের লোক নূতন ভাড়াটেদের কাছ থেকে বছরের অগ্রিম ভাড়াবাবদ দুশো পঞ্চাশ টাকা নিয়ে নিয়েছে।

সেই থেকে এরা তিনবন্ধু এ বাড়ীর বাসিন্দা। তারপর পৃথ্বীর পরিচয় যখন জানলো, তখনত আত্মীয় হ'য়েই দখল করে বসলো ঘরখানা। ভীমার্জুনের খোকাবাবুর নাকি দলের লোক তারা। তাই ভাড়া পাওয়ার শেষ আশাটিও নির্মূল হয় ভীমার্জুনের।

পৃথ্বী জেল থেকে এসে খুশি হ'য়ে বলে, "এতদিনে একটা কাজের মত কাজ করেছ ভীমকাকা। এদের তিন বন্ধুদের একসাথে কি করে যোগাড় করলে।"

সুদর্শন গতযুদ্ধের সময় বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যুদ্ধে যায়, আবার যুদ্ধ থেকে পালিয়ে বাড়ী এসে বলে। "আর যাই করি, খাওয়া-থাকার বদলে ছেলে পড়ানর কাজ আর নয়।" বলে সুদর্শন, "ছেলে পড়ানর চাইতে বাজার করার কাজটাই চেপে বসে ঘাড়ে শেষ পর্য্যন্ত। হয়তো একদিন চাকরের অসুখ করবে। তারপর সেই যে বাজারের থলি হাতে আসবে, একেবারে কাজ ছেড়ে আসা পর্যন্ত সে থলি আর হাত থেকে নামাবেনা। এপর্যন্ত সহ্য করা যায়। কিন্তু মাছের হিসেব নিয়ে গিন্নীর মনে যখন সন্দেহ জমতে শুরু করে, তা আর বরদাস্ত করা যায় না। তার চাইতে হ'কারের কাজ অনেক ভাল। তবে শীতের রাতের আরামের বিছানা ছেড়ে কাকডাকা ভোরে উঠে বাড়ী বাড়ী দৌড়ানটা যা কষ্ট।

"কালীঘাটের দুয়ারে লক্ষীর পাঁচালী বিক্রী করা আরও সোজা। তবে সে রোজগারে পেটে ভাত পড়লেও চালার নীচে আর শোওয়া চলে না রাতে।"

"ফুটপাতে মেয়েদের সায়া ব্লাউজ ছিটের কাপড় বিক্রী করার কাজটাও মন্দ না। মেয়েদের চেহারা বুঝে বোল্ ছাড়তে পারলেই হোল।"

শীতাংশু তার নারকেল তেল জমানোর দিকে নজর রাখছে আর মন দিয়ে শুনছে সুদর্শনের বিজ্ঞ মতামত। "তোমার ত চেখে দেখার আর বাকী নেই কোনও কাজ। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একেবারে ছিটের জামা-কাপড় বিক্রী। মনে হ'ছে প্রেসের কাজটিও তোমার বেশী দিন টিকছে না।"

সুদর্শন হেসে উত্তর দেয়," ঠিকই ধরেছেন। প্রেসের ম্যানেজারের আমলাতান্ত্রিক মেজাজটি আর বেশীদিন সহ্য করা চলবে না।" অরুণাংশু সম্ভাব্য চাকরির উপরওয়ালাদের একদফা দর্শন প্রার্থনা সেরে বাড়ী ফেরে। ঘরে ঢুকে বলে, "কি হে সুদর্শন, তোমাদের 'মধুভাণ্ডার' পত্রিকা ত এবারকার মহাপুরুষের মহানির্বাণ নিয়ে বিশেষ দাঁও মারতে পারেনি দেখছি। মধুভাণ্ডারের পাঁজা নিয়ে এক ছোকরা হ'কার সমানে চেঁচাচ্ছে এই বেলা বারোটায়ও।" ঠাট্টার সুরে বলে অরুণাংশু, "সত্যি আফসোসের কথা। মহাপুরুষেরা যদি নোটিশ না দিয়ে এমন হঠাৎ হার্টফেল করেন—তাহলে পত্রিকাগুলিরই বা শোকের কম-পিটিসন চলে কি করে।" সুদর্শন হেসে বলে, "সত্যি তাই। এরকম বোকা কিন্তু আর কখনও বনেনি 'মধুভাণ্ডার'। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবার কথাটাত আর জানা ছিল না।"

"কিন্তু এইত কিছুদিন আগেও এক নেতার অবস্থা খারাপের সংবাদের সাথে সাথেই তাঁর জীবনী-টিবনী, সম্পাদকীয় শোক প্রকাশ সব কম্পোজ করে রেডি রাখা হ'ল। মৃত্যুর আধঘণ্টা আগেই মৃত্যু সংবাদ

মেশিনে চড়িয়ে দেওয়া হ'ল। তার ফলে সবচাইতে প্রথম টেলিগ্রাম আমরাই বের করতে পারলাম।"

"সে একটা সমারোহ বটে। যতই রিপোর্ট আসছে অবস্থা খারাপ ততই দ্রুত কলম চলছে। ম্যানেজার, এডিটার, সাব-এডিটার সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন শোকসংবাদের বড় বড় ভাষা, কোটেশন নিয়ে।"

শীত সামনে। তাই কোম্পানী থেকে নির্দেশ এসেছে শীতাংশুর প্রতি—নারকেল তেলের ভেজালের মাত্রা কিছু কমিয়ে দিতে হ'বে—যা'তে শীতে তেল জমতে পারে। শীতাংশু তাই নূতন করে আবার ফরমুলা কষছে—ম্যাক্সিমাম কত পার্সেণ্ট সাদা তেল মেশান যায় নারকেল তেলে তা' জানাতে হবে "প্রসাধনীর" ম্যানেজারকে। আজ পর্য্যন্ত যত চাকরি নিয়েছে শীতাংশু কেমিষ্ট হিসেবে—তার প্রধান কাজই হয় ভেজাল তৈয়ার করার ফরমুলা কষা।

কিন্তু মাঝে মাঝে বড় ফ্যাসাদেও পড়তে হয় শীতাংশুকে। সম্প্রতি ছোটবোনের চিঠি এসেছে—"দাদা, তোমাদের 'প্রসাধনীর' তেল মাথায় দিয়ে একমাসেই যে প্রায় সব চুল উঠে গেল আমার। আর ক্রীমগুলি মুখে মাখলে আবার সেগুলো সাবান দিয়ে ডলে না উঠালে চলে না।"

বোনের চিঠি পড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে শীতাংশু। বোন যে এত ভ্রাতৃভক্ত জানতো কি সে।

কিছুদিন আগে চকোলেট তৈয়ারীতেও উঠে পড়ে লেগেছিল শীতাংশু।

শীতাংশু বসে বসে চিন্তা করে স্থির করলো—দেশী চকোলেট তৈয়ার করবে। সঙ্গে সঙ্গে এক্সপেরিমেণ্ট শুরু হ'ল।

কিন্তু সে চকোলেটও ‘ফেল’ করলো ছোট ভাইয়ের কাছে। “উঃ! এত চিট্ হ’য়েছে দাদা তোমার চকোলেট। দাঁত শুদ্ধ যে উঠে যাবে মনে হ’চ্ছে।”

রেগে উঠে শীতাংশু, “চুষে চুষে খা না। হ্যাংলার মত কড়মড় ক’রে না খেলে চলে না।”

“কিন্তু দোকানের চকোলেট ত আমরা চিবিয়েই খাই।” আপত্তি জানায় ভাই।

সেই থেকে খাবার জিনিষের এক্সপেরিমেণ্ট আর করেনি শীতাংশু।

অরুণাংশু শুনে বলে, “এর চাইতে সাহিত্যিক হলে তোমার এই ভেজাল থিওরী কাজে লাগতো। সাহিত্যে রাসায়নিক ভেজাল মিশ্রণ! যেমন ধর বঙ্কিমের এক ব্যর্থ প্রেমের নায়ক আর রবীঠাকুরের হতাশ নায়িকার প্রেমে কিছু খাদ মিশিয়ে চালু করে বাজারে ছেড়ে দিলে পাঠকের কাছে মোটেই অরুচিকর হোত না।” শীতাংশু জবাব দেয় “ওরে বাপরে। সমালোচকরা আছেন না? দুধে জলের পার্সেণ্ট বের করার যন্ত্রকে তবু ভয় না করে পারে দুধওয়ালারা, কিন্তু ভেজালের সন্দেহবাইয়ের চশমা আঁটা সমালোচকের দৃষ্টিকে ভয় করে না, এমন সাহিত্যিক হ’তে পারে না।”

পরদিন ঘুম থেকে উঠে অরুণাংশু দাড়ি কামাবার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে। শীতাংশু চা ভিজাতে ভিজাতে তাকিয়ে দেখে, “আজ বুঝি জয়েনিং দিবস।” সাথে সাথে সুদর্শন বলে উঠে, “মুরগি খাওয়াবার কথাটা যেন মনে থাকে। হুঁশিয়ার মুরগিগুলি আমি কিন্তু বুক করে রেখেছি।”

অরুণাংশু খুশি মনে বেরিয়ে যায়—এই প্রথম চাকরি। সিনেমার চাকরি, একবার নাম করতে পারলে মোটাটাকার ব্যাপার। তাছাড়া ডিরেক্টারের সাথে কিছু বন্ধুত্ব ছিল এককালে।

ডিরেক্টার মহোদয়ের দর্শনপ্রার্থী বহুলোকের ভীড় ঠেলে সোজা উপরে উঠে যায়, অরুণাংশু।

ডিরেক্টারের প্রাইভেট রুম। বিনীত হাসি দিয়ে আপ্যায়ন করে পুরানো বন্ধুকে। কাজের কথা শুরু হয়—বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকতে হ'বে।

এক অর্দ্ধ-উলঙ্গ মেয়ের বিশেষ কোনও কুৎসিৎ ভঙ্গীকে রংয়ে, তুলিতে ফুটিয়ে তুলতে হ'বে। এ কাজের দক্ষতার ওপরই নির্ভর করছে চাকরির স্থায়িত্ব। স্তম্ভিত হয়ে যায় অরুণাংশু—একমাস যাবৎ ঘোরাঘুরি করছে সে এই চাকরির আশায় ?

অরুণাংশু ভাল করে তাকিয়ে দেখে, ডিরেক্টার বন্ধুকে। মিহি সুতোর খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবী-পরা। মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ছড়ানো প্রগতি আর্টের ম্যাগাজিন। দেওয়ালে মহাপুরুষদের ছবি টাঙান—মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, পরমহংস, মতিলাল নেহেরু।

দেওয়ালে টাঙান বিবেকানন্দর ছবির দিকে ইচ্ছে করেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলে অরুণাশু, "এসব ছবির বিজ্ঞাপন দিলে, দর্শকেরা ক্ষেপে যাবে না।"

ডিরেক্টার সাহেব মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে জবাব দেয়, "দর্শকরা ক্ষেপে যাবে! তুমি শিল্পী কিনা তাই দর্শকদের রুচি বোধ সম্বন্ধে খুব উচ্চমত পোষণ করে রেখেছো।"

"তোমার এ কথা মানতে রাজী নই আমি।" দৃঢ়তার সাথে বলে অরুণাংশু, "দর্শকদের রুচিবোধকে বরং খাটো করে দেখছো তোমরাই। দর্শকরা আকৃষ্ট হয় বলেই এসব ছবির বিজ্ঞাপন ঝুলান হয়—তা' নয়। বরং ভাল ছবি পায় না বলেই যা পায় তা' নিয়েই আকৃষ্ট হতে হয় দর্শকদের। কিন্তু একদিন আসবে, যেদিন এসব ব্যাভিচারী রোগ জীবাণু ছড়ানো ছবিকে বয়কটই করবে দর্শকরা।"

"We shall also welcome that day". বিদ্রূপের সুরে বলে ডিরেক্টার বাবু। "কিন্তু আপাতত এ ছবিই আঁকতে হবে তোমাকে।" আমলাতান্ত্রিক সুর ধরা দেয় এতক্ষণে উপরওয়ালার কণ্ঠে।

অরুণাংশুও স্বরে কড়াধকের বিদ্রূপ মিশিয়ে উত্তর দেয়, "দুঃখের সাথেই জানাতে বাধ্য হচ্ছি—এ চাকরিতে ইস্তফা দিতে হ'চ্ছে আমাকে কারণ বাপের রোজগার ভাঙ্গিয়ে চিত্রবিদ্যা শিখেছি মানুষের শুভ চেতনাকে আচ্ছন্ন করার জন্য নয়।"

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে অরুণাংশু।

রাস্তায় চলতে চলতে দু'ধারের বিজ্ঞাপনের ছবিগুলি আজ বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করে দেখে।

উঃ! কি বিষ ছড়ানো হ'চ্ছে পথে পথে। মানুষের সুস্থ উদ্যমকে বিকৃত চোরাপথে চালিত করার একি গোপন সমারোহ। 'দর্শকদের রুচি মাফিক'—এও এক ভাঁওতা। মানুষের রুচিবোধ ত আর স্বর্গ থেকে তৈয়ার হ'য়ে আসে না। এ সমাজেরই সৃষ্টি এ-রুচি।

কিন্তু চাকরিটি গেল। মনের কোন স্তরে যেন একটা সূক্ষ্ম কাঁটার স্পর্শ অনুভব করছে সে—মায়ের চিঠিটা? বৃদ্ধ পিতাকে এবার সংসারের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেবার অনুরোধ এসেছে মায়ের কাছ থেকে তার জ্যেষ্ঠ সন্তানের কাছে। ছোট বোনটি অবিবাহিতা। আরও একটি ভাইয়ের পাঠ্য জীবন শেষ হয়নি এখনও। "মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন উনি অফিসে—" লজ্জিত হয় মনে মনে সে—আর কত কাল মন্থন করবে পিতাকে।

ছোট বোনের পাত্র স্থির করেছিল, লিখছেন মা। কিন্তু পণ লাগবে হাজার টাকা।

বরং শীতাংশুকেই জিজ্ঞাসা করবে—পাত্র হ'তে রাজী কিনা। ভিন্ন জাত হ'লে কি দস্তুর মত সুপাত্রই। গোল্ড মেডেলিষ্ট। মায়ের

নিশ্চয় আপত্তি হ'বে না। শীতাংশুও রাজী হতে পারে হয় তো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলে বসবে হয়তো, "তাহলে আমার বোনটিকেও আপনি উদ্ধার করুন।" সরল ইকুয়েসন।

প্রস্তরীভূত অহল্যারা সব, কেউ উদ্ধার না করে দিলে ত আর ত্রাণ হয় না। এমন পাথর বলেই ত আজ পথে ঘাটে তাদের নিয়ে কত কুৎসিৎ বিজ্ঞাপন।

বেলা প্রায় শেষ করে ঘরে ফেরে অরুণাংশু। আরও দু' জায়গায় কাজের চেষ্টা করে ঘরে ঢুকে দেখে, তার চাকরির প্রথম দিনের "ফিষ্ট" নিয়ে ব্যস্ত দুই শ্রীমান। তাকে দেখেই খুশির স্বরে বলে উঠে শীতাংশু, "মুরগি কাটা শেষ, শুধু মসলা পেষা বাকি।"

অরুণাংশু তাদের কাণ্ড দেখে হেসে বলে, ভোজটা কিন্তু হ'চ্ছে চাকরি ইস্তফার। কাজেই "হুজ্ হুজ্, হিজ্ হিজ্।" সুদর্শন ব্যাকুল হ'য়ে বলে, "একমাস ধরে জল্পনা-কল্পনার ফিষ্টটি এমন অসময়ে মাটি করলে অরুণদা। চারগণ্ডা পয়সাও নেই পকেটে—হুজ হুজ হিজ হিজ করলে এ মুরগি আর হজম হ'বে না। তার চাইতে বরং ওর কাটা ঠ্যাং মুণ্ড সব সুতো দিয়ে জোড়া দিয়ে ফেরৎ দিয়ে আসি হাঁশিয়াকে।"

অরুণাংশু কথা শুনে হাসে, পাঁচটি টাকা বের করে দেয় পকেট থেকে। মনে মনে হিসেব করে, আর রইল মাত্র দশটি টাকা।

মুখে বলে, "একসাথে চাকরি ইস্তফা আর আগামী চাকরির আগাম ফিষ্ট, মনে যেন থাকে।"

অরুণাংশুব মুখে সব শুনে তা'তেই রাজী হয় সুদর্শন। অরুণাংশু দুঃখের স্বরে বলে, "কালী দুর্গা লক্ষ্মী-সরস্বতীর ছবি আঁকতো চিত্রকররা, তার চাইতে আর তফাৎ কি এসব আধুনিক আর্টিষ্টদের। মানুষকে বিভ্রান্ত করাই দুইয়ের উদ্দেশ্য।"

শীতাংশু বলে, "এবার তাহ'লে মানছো আমার ভেজাল থিওরী।

শুধু কেমিষ্টরাই ভেজাল তৈয়ার করে না, শিল্পীরাও করছেন। অস্বীকার করতে পার।"

"রাস্তার দু-ধারে যা নজরে এল, তারপর আর তোমার গবেষণার বিষয়কে উড়িয়ে দেওয়া চলে না! কিন্তু কথা হ'চ্ছে সব আর্টিষ্ট, সব কেমিষ্ট, সব কম্পোজিটার যদি একযোগে এ ভেজালের বিরুদ্ধে বয়কট করতো—তাহ'লে ধনপতিরা কাবু না হ'য়ে পারতেন না!"

শীতাংশু প্রতিবাদ জানায়, "উঁহু, ওসব গান্ধীবাদে আর চলছে না। খাঁটি বিপ্লব চাই। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া—নান্য পন্থা।"

অনেক রাতে সোয়ারী নামিয়ে রেখে রিকসা নিয়ে ফিরছে সোনা আর কালু। বেশী রাত, তার উপর মেয়েমানুষ সোয়ারী, তাই ডবল ভাড়া লাভ হ'য়েছে। মনটা প্রসন্ন দুজনেরই। বাস চলা থেমে গিয়েছে, নিশ্চিন্ত মনে ফুলস্পীডে সাইকেলের প্যাডেলে পা ঘুরিয়ে দেয়। পথের দুই ধাবে জমির বুকে কালী-ঢালা অন্ধকার। মাঝে মাঝে ভিজা হাওয়া উঠে আসছে জলে ডোবা ধানী জমির বুক থেকে। স্নেহসিক্ত শীতল স্পর্শের মত প্রাণ জুড়ান হাওয়া। খুশির যোচর দেয় সোনার মনে।

লেভেল ক্রসিং-এ এসে দেখে গেট্ বন্ধ। ঘন ঘন বেল টিপে সোনা। কালু ডাক দেয়, বলে "ও ঠাকুর, গেটটা একটু খুলে দেবেন নাকি?"

ঘুমভরা চোখে গজ গজ করে শয্যা ছেড়ে উঠে আসে গেট-কিপার।

রেল লাইন পার হ'য়েই চোখে পড়ে নূতন সিনেমা ঘরটা।

"দোস্ত দেখবা নাকি বায়েস্কোপ।" খোশ মেজাজে বলে কালু।

সোনাও হেসে উত্তর দেয়, "দেখাও যদি আর দেখতে দোষ কি।"

"দাঁড়াও তবে রিকশা দুটো ঠাকুরের উঠোনে রেখে আসি।"

রাত বারোটায় বায়োস্কোপ শেষ হয়।

তে-রাস্তার মোড় থেকে কালু বিদায় দেয়। মনের তলায় নূতন মৎলব ঘুরছে তার। সোনাকে তার তাড়ির দলে টানতে হ'বে। এরকম জুয়ান মানুষই চাই তার।

সোনা নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তাকিয়ে দেখে ধোপাবাড়ীর দিকে। ধোপাবৌ ঘুমিয়ে পড়েছে বাতি নিবিয়ে। হাঁশিয়াও কি ঘুমিয়ে পড়েছে? সন্ত বায়োস্কোপ হ'তে ফেরা চোখে ভাবে একটু হাঁশিয়ার কথা। বিয়ের যোগ্যি মেয়ে। সমাজহীন, পরিচয়হীন ভিখারী মেয়ে—ওকে বিয়ে করবে কে? কিন্তু তারই বা আছে কে পৃথিবীতে। একলা মানুষ সে। তার ভয় কাকে। বায়োস্কোপে দেখা সুন্দরী মেয়েটার ছবি বারে বারে ঘুরছে চোখের সামনে। কি চমৎকার নাচলো মেয়েটা। কিন্তু সেও ত ভিখারীর মেয়েই ছিল।···ঘুম জড়িয়ে আসে সোনার চোখে। বাকি অসম্পূর্ণ অধ্যায় হয়তো ধরা দেয় স্বপ্নে। কিন্তু স্বপ্ন শেষ হওয়ার আগেই ঘুম ভেঙে যায় ধোপা-বৌয়ের ডাকে, "ও পূবের ঘরের মানুষ, আজ কি ঘুম ভাঙবে না? দেখ কাণ্ড, ঘরের বাইরেই শুয়ে ছিলে কাল।" সোনা তাকিয়ে দেখে, চা নিয়ে বসেছে ধোপাবৌর ছেলেমেয়েরা। বড় এক কলাই-করা গ্লাস দুই হাতে সাপটে ধরেছে ঢেলো। হাঁশিয়াও বসেছে আসরে।

সোনা মুখ ধুয়ে এগিয়ে যায়, "হাঁশিয়া একটু চা খাওয়াবে নাকি?"

হাঁশিয়া খুশি হ'য়ে তাড়াতাড়ি নিজের গ্লাসটাই দিয়ে দেয়। "আমি পরে বানিয়ে খাব। তুমি খাও।"

সোনা চা খেয়ে একটা বিড়ি ধরায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে হাঁশিয়াকে। আর ভাবে, ও মেয়েটাত দিব্যি আছে খায় দায় ঘুরে বেড়ায় আর ঝগড়া করে। কিন্তু এরা যদি ওকে তাড়িয়ে দেয় তবে ও থাকবে কোথায় সে ভাবনা কি ওর আছে? ছেঁড়া কাপড়খানা জড়িয়ে জড়িয়ে গা ঢেকেছে—দুই তিন জায়গায় শেলাইকরা—আনাড়ী

হাতে—লাল সুতোর বড় বড় ফোঁড়। সোনার মায়া লাগে হাঁশিয়ার উপর।

সেদিনই রোজগারের পয়সা দিয়ে এক জোড়া লাল কাচের চুড়ি কিনে আনে হাঁশিয়ার জন্য।

ধোপাবৌর নজর এড়ায় না। ঠাট্টা করে সে হাঁশিয়াকে, "কিলো, সোনা ত খুব মজেছে দেখছি।" হাঁশিয়ার ভাল লাগে এ ঠাট্টা। চোখের সবটুকু ইশারাকে অনুমান ক'রতে পারে না, তবু চোখে একই কটাক্ষ ফুটিয়ে তোলে সেও। নকল করা সলজ্জ হাসি হেসে, ঘাড় একটু কাৎ করে বলে, "যাও"!

তাকে ও সোনাকে নিয়ে ধোপাবৌয়ের এই রসিকতাটুকু বড় ভাল লাগে হাঁশিয়ার। সারাদিন যেচে যেচে কাজ করে দেয় তার। রোদে দেওয়া কাপড়গুলি তুলে আনতে আনতে জোরে সুর টানে, "আমি বন ফুল গো।" জটার ছোট ভাই পটার ঘরের নূতন-আসা তালাক দেওয়া বৌটিকে হুবহু নকল করে হাঁশিয়া। একগাল পান খেয়ে ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল করে ঢল ঢল ভাব ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে চোখে মুখে। আবার কিছুক্ষণের মধ্যে সব ভুলে গিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে পেয়ারা গাছে উঠে বসে পেয়ারা চিবুতে চিবুতে গান শুরু করে। খেয়াল থাকে না, পটার নূতন প্রেমিকা যে তার মত কোমরে আঁচল জড়িয়ে পেয়ারা গাছের মগডালে উঠে বসে গান করে না কখনও।

হাঁশিয়া ছাগল খুঁজতে গিয়েছে কারবালা পুকুরের ধারে। দূর থেকে দেখে, সোনা রিকসা চালিয়ে ফিরছে শহর থেকে। সোনা ডাক দিয়ে বলে, "হাঁশিয়া চড়বি নাকি রিকসায়।"

এক ডাকে এগিয়ে যায় হাঁশিয়া—নূতন প্রেমিকার দর-বাড়ানোর ব্যাপারটা এখনও আয়ত্ত করেনি সে। খুশির ভাব ছাপিয়ে উঠে তার

জলজ্বলে চোখ দুটিতে। দাঁত বার করে একমুখ হাসি ছড়িয়ে উঠে বসে রিকসায়।

সোনা সাইকেল ঘুরিয়ে চালিয়ে দেয় গ্রামের ভিতর পথে। কি মনে করে মাথাব কাপড়টা টেনে দিয়ে বসে হাঁশিয়া।

অচেনা পথ। কোনদিন এসব পথে আসেনি সে এর আগে। ছোট ছোট ক্ষেত। রাস্তার দুই ধারে ঢেঁড়স গাছে ফুল ধরেছে অজস্র। মাঝে মাঝে তালগাছের সারি।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। মাথার উপরে রাঙ্গা আকাশ—হাঁশিয়ার পরনের তরমুজী রংয়ের শাড়িখানার মতই রং আজ আকাশের। সব কিছুই নূতন চোখে দেখে হাঁশিয়া। বড় ভাল লাগে। বড় ভাল লাগে সোনারও আজ। মনের তলায় একটা কথা গুন গুন করে উঠে তার, হাঁশিয়াকে যদি বিয়ে করে সে, কেমন হয়।

তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, "আজ ফেরা যাক্। ঢেলোর মা হয় তো বকবে।"

রাঙ্গা আকাশ কখন হঠাৎ ধোঁয়াটে বর্ণ হ'য়ে গিয়েছে টেরও পায় নাই। সন্ধ্যার বাতি জ্বলে উঠেছে দূরের কোন এক বাড়ীতে।

হঠাৎ গাছের ফাঁক থেকে এক পরিচিত ডাকে চমকে উঠে সোনা। তাকিয়ে দেখে, কালু এগিয়ে আসছে, "কি দোস্ত, তোমার বিবি নাকি ?"

গাছের ফাঁকে ফাঁকে তাড়ির আড্ডা বসে গিয়েছে গাছের তলায়। সামনেই ছোট এক খানা টিনের ঘর। অনুমানেই বোঝে, এই কালুর আস্তানা।

কালুব চোখে মুখের ঢুলু ঢুলু ভাবে হাঁশিয়া ভয় পেয়েছে লক্ষ্য করে' সোনা বলে, "আজ আর ভিতরে গেলাম না।"

"তা' ঠিক বিবিকে নিয়ে কি আর এখানে আসতে হয় ?" আধাজড়ানো স্বরে বলে কালু।

সোনা দ্বিগুণ স্পীডে সাইকেল চালিয়ে দেয়। হাঁশিয়া একটিও আর কথা বলে না। কালুর অপছন্দকর চোখ মুখের ভঙ্গিতে কেমন একটা অজানা ভয়ে গা ছম ছম করছে তার। ধোপা বৌ ঠাট্টা করে। কিন্তু এ লোকটার ঠাট্টায় কেমন যেন বিষ বিষ করছে শরীর।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে একবার প্রশ্ন করে সে, "ঐ লোকটা বুঝি তোমার দোস্ত।"

আর একটা প্রশ্ন জিভের ডগায় এলেও সাহস পায় না জিজ্ঞাসা করতে—সোনাও তাড়ি খায় নাকি এখানে এসে।

ভাল লাগার এমন নূতন ধরণের স্বাদ এর আগে কোনদিন টের পায় নাই সে। আবার এ ধরণের বিরক্তিবোধও এর পূর্বে কোনদিন আসে নাই তার মনে। হাঁশিয়া রিকসা থেকে নেমে ছাগলটাকে নিয়ে বাড়ি মুখো হেঁটে চলে।

সোনা স্টেশনের দিকে চলে যায়। মনটা বিশ্রি হ'য়ে আছে তারও—কালুকে দোস্ত করা ঠিক হয় নাই—লোক ভাল নয় কালু।

পরদিন সোনা চা চাইতে গেলে মুখ ভার করে জবাব দেয় হাঁশিয়া "ঢেলোর মার কাছে চাও—আমিই ওদেরটা খাই পরি।"

বোঝে সোনা, হাঁশিয়ার এ ব্যবহারের কারণ। মনে মনে সেও চটে যায়—কালু যে লোক ভাল নয় সে কি তা' জানতো। "ভিখারীর মেয়ে, তার আবার এত দেমাক।" বির বির করে' বলে সোনা।

চা না খেয়েই চলে যায় সোনা।

হাঁশিয়াও বেরিয়ে পড়ে ছাগল নিয়ে কারবালা পুকুরের ধারে। অনেক গোবর কুড়িয়ে রেখেছিল কাল—ঘুঁটে দেবে বলে। কিন্তু ঘুঁটে না দিয়েই বেরিয়ে পড়ে সে।

পুকুরের ওপারে কাপড় কাচছে পটা। কাপড় কাচার শব্দ ভেসে ভেসে চলেছে। হাঁশিয়া অর্থহীন করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে রেলগাড়ীর

দিকে। চাকার উপর গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটে চলেছে প্যাসেঞ্জার গাড়ী। গাড়ীটা চোখের অদৃশ্য হ'য়ে যেতে মনটা আরও খারাপ হ'য়ে যায়। প্রিয়জনের বিদায় নেওয়ার মতই একটা শূন্য যাতনা কিশোরী কন্যার বক্ষ পঞ্জরে। একটা জনপ্রাণী নেই কোথায়ও—হু হু করছে ফাঁকা মাঠটা। চোখ ভিজে আসে হাঁশিয়ার—বোঝে না কিছু। শুধু আবছা আবছা মনে পড়ছে, ঐ রেল লাইনের ধার দিয়েই একদিন সে আর তার মা হেঁটে এসেছিল এই পুকুরের ধারে। হাঁশিয়া তার মা যেখানে মারা গিয়েছিল, সেইখানটায় বসে বসে কাঁদে খানিকক্ষণ। একটা নূতন ধরনের দুঃখ থিতিয়ে উঠেছে যে তার মনে, টের পায় না সে। শুধু কাঁদে ফুলে ফুলে। কেউই নেই তার। 'কেউই নেই তার' একথা ভাবতেই বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসে হু হু করে।

সবাই লক্ষ্য করে, হাঁশিয়া কয়দিন ধরে মন মরা হ'য়েই-থাকে। ধোপা বৌ ঠাট্টা করে "কি লো গোঁসা নাকি?" কিন্তু হাঁশিয়া আর সে-সব নকল করা সলজ্জ হাসি দিয়ে "যাও" বলে জবাব দেয় না। বিরক্তির সুরেই জবাব দেয়, "ভিখারী মেয়ের আবার গোঁসা কার সাথে।"

ধোপা-বৌ একটু অবাক হ'য়ে মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বোঝে কি যেন হ'য়েছে ওর।

মাত্র একটি দিন। একটি দিনের গোপন সান্ধ্য ভ্রমণ অনেক খানি বড় করে দিয়েছে হাঁশিয়াকে। বড়র নকল করা নয়, সত্যি সত্যি বড় হ'য়ে উঠেছে সে। দূর থেকে লক্ষ্য করে সোনাকে—তার হাঁটা চলা—মাথার টেরি কাটা। নূতন একটা হাফপ্যাণ্ট কিনেছে সোনা—সাইকেল চালাতে সুবিধা। হাঁশিয়া দূর থেকে দেখে, কেমন সুন্দর মানিয়েছে আজ সোনাকে।

একবার ভাবে, তার ঘর থেকে একটু ঘুরে আসে। কিন্তু কি একটা

কথা মনে করে যায় না। থেকে থেকে মনে হয়—ভিখারী মেয়ে সে ; সোনার সাথে কি সম্পর্ক তার। শুধু দুঃখ মিশ্রিত ভালবাসা ঝরে পড়ে —কাজল হীন চোখে।

সারাটা দিন এক মধুর বিষণ্ণতায় চেপে ধরেছে শীতাকে। পাগলাটে জলো হাওয়ার ছুটোছুটি শুরু হ'য়েছে মাঝ রাত থেকে। মনে হয় ঐ জলকণাভরা বাতাসেরা বয়ে আনছে তার আত্মার সাথে নিবিড় সংযোগময় একটি হারান দিনের সুরকে। মেঘে-ঠাসা নীলাভ ধূসর আকাশের গায়ে দূর অতীতের ছায়া। এ দিনকে শুধু মাত্র নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করে' মন ভ'রে না—হৃদয়ান্তরে এ উপলব্ধির ঘনিষ্ঠ সংযোগ খোঁজে সমস্ত চেতনা। কাব্যে নয়, সাহিত্যে নয়, আলোচনায় নয় ; শুধু হৃদয়ে, শুধু বেদনায় আর অনুভূতিতে আশ্রয় খুঁজছে সাথী-চাওয়া মন। একটি বলিষ্ঠ হৃদয়ের ছায়া-রূপ চঞ্চল করে শীতাকে বারে বারে এই মেঘে-ভারী দিনে।

অজানা ব্যথার গুমরানি নয়। চেনে শীতা, কে সে।

সরু জালেবোনা মুখাবরণের ফাঁক দিয়ে দেখা অস্পষ্ট আভাস মাত্র নয়। একেবারে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে-দেখা পূর্ণ এক ভাস্বর মূর্তি। মনের লক্ষ্যকে চিনতে দেরি হয় না শীতার। নীতির ছদ্মকৌশল নেই মনে—তাই বিবেককেও হয়রান করতে হয় না তার।

নীতির প্রশ্নের উত্তর দেয় সে নিজেকে স্পষ্ট ভাষায়। স্বামীকে বঞ্চনা করার দায় ত তার নয়—সে দায় সমাজের। সমাজের স্বাভাবিক নিয়মেই বিবাহ তার।

তবু একটি দুঃখের তার কিছুতেই ছিঁড়ে আসতে পারে না শীতা —দেবজ্যোতির মৃত্যুকে। সে মৃত্যুর জন্ত নিজেকেই দায়ী মনে হয় তার বহু নিস্পন্দ মুহূর্তে—বহু অতি সতর্ক সন্ধ্যায়। মনের তলায় একটি স্পষ্ট

ব্যথা ঘুমিয়ে আছে, টের পায় শীতা। আরও কিছু সান্ত্বনা, আরও কিছু আশ্রয় পাওনা ছিল দেবজ্যোতির পৃথিবীর কাছে। তার এ-ফাঁকিকে গ্রহণ করেছে দেবজ্যোতি বিনা অভিযোগে, তাই ঋণ পরিশোধ হয় নি শীতার। মৃত মানুষের কাছে এ ঋণের বোঝা বইতে হ'বে তাকে একেবারে মনের গভীর খাদে, একটি মানুষকেও না জানিয়ে। প্রকাশ করার উপায় নেই শীতার এই লুকান ব্যথা, তার আত্ম-অপরাধ।

ক্ষমা চেয়ে আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পায় না শীতা। আত্মার বিচারালয়ে দোষ স্বীকৃতিতেই ত খালাস মেলে না। আত্মদংশন থেকে নিষ্কৃতি নেই বিপক্ষ কৌঁসুলির হাত থেকে মুক্তি পেলেও! তাই সমস্ত জীবন ভ'রে শীতার অদৃশ্য নীতির পাঁজরে এ ব্যথা ক্ষয়ে' ক্ষয়ে' ঝরবে প্রকাশ্য পৃথিবীর অন্তরালে।

মৃত স্বামীর কাছে অর্বুদ কণ্ঠে ক্ষমা চাইলেও ত সে স্বর তার কাছে পৌঁছুবার আশা করা যায় না এ বিজ্ঞানের যুগে। তাই শুধু মাত্র নিজের ভিতরেই এ অপরাধের গ্লানিকে বয়ে চলে শীতা।

অন্যের কাছ থেকে পাওয়া আঘাতের দুঃখকে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করতে না পারলেও নিজের ভিতরে ত পুষে রাখা যায়। কিন্তু অন্যকে দেওয়া আঘাতের গ্লানিকে যে নিজের ভিতরেও স্থান দিতে সংকুচিত হ'য়ে আসে মন।

অসহায় শিশুর মত একজোড়া মুমূর্ষু চোখের অনিমেষ দৃষ্টি অনুসরণ করছে শীতাকে—সুখ দুঃখ ব্যথা অনুভূতির অন্তরালে এক চিরশান্ত চির-স্থির সত্তার উপলব্ধি ফল্গুর মত বয়ে চলেছে শীতার মনের তলদেশ দিয়ে।

আর সইতে পারছে না যে শীতা এই বিবেকের নিঃশব্দ গুমরানি। তাই এ অপরাধবোধকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায় সে। নিজেকে বোঝায়, পৃথ্বীই দায়ী এজন্য। তার এই তিলে তিলে আত্মক্ষয়ের জন্য

দায়ী ত পৃথ্বীই। আসামীর পক্ষের কৈফিয়ৎ তলিয়ে দেখে আবার বিচারক মন। সত্যিই কি পৃথ্বীই দায়ী তার এ আজীবন যাতনা ভোগের জন্য। না তার সেই আত্মগর্বিতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রখর মন? উনিশ বছরের মেয়ের সেই অপরাজেয় অহমিকা।

দেবজ্যোতির প্রতি অবিচার করেছে, আর পৃথ্বীর প্রতিও কি অবিচার করেনি সে। তার কোন এক অলক্ষ্য মুহূর্তে লেখা কয়টি কথাকেই একমাত্র সত্যি বলে মেনে নিয়ে, অবমাননা করেনি কি সে তার হৃদয়ের সত্যকে? কর্ম সমাপ্তির অবসরে, দোসর-খোঁজা ক্লান্ত মুহূর্তে আজও ত শীতা সেই একটি মনকেই কেন্দ্র করে রচনা করছে তার দিনান্তের শেষ আশ্রয়। পৃথ্বী হয়তো জানে না তা। তবু তাকেই শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে মনে মনে গ্রহণ করছে কত ক্লান্ত মুহূর্তে। সান্ত্বনা পায়, শান্তি পায় আজও সে পৃথ্বীর সান্নিধ্যেই।

ঘরের ভিতরে মিঠুর মাতামাতি আর বাইরে জলো হাওয়ার। এমন কিছু করার মত দিন, যা করা হয়নি কোনদিন। মিঠুকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে।

রোজ-চলা পথের সাথে মনে মনে গাওয়া গান গেয়ে উঠে যেন পদধ্বনি। পথধূলিকণারা মানুষের মনকে চিনতে পারে যেন, মনে হয় শীতার। না হ'লে, মানুষের দুঃখে এমন করে মৌন হয়ে উঠে আর আনন্দে মুখর হয় কি করে পথপ্রান্তরেখা।

পার্কের ভিতর দিয়ে ছুটে চলে মিঠু। দুপুর বেলার জনবিরল পার্ক। পার্কের বাইরে বাস চলেছে দু'দিক দিয়ে। বাসের গায়ে জ্বলজ্বলে নম্বরগুলির আকর্ষণ টেনে নিয়ে চলেছে কি শীতাকেও। কত নম্বরের বাসে উঠতে চায় সে, মনে মনে জিজ্ঞাসা করে।

সামনে এসে থামে আরেকখানি বাস—বাসের গায়ের নম্বরটা আরও বেশী জ্বলজ্বল করে উঠে যেন। মিঠু চেঁচিয়ে উঠে, "এই বাসে পৃথ্বী

কাকার বাড়ী যাওয়া যায়।" সচকিত হয়ে উঠে শীতা—এ কথাই ভাবছিল সেও।

"চল তোমার পৃথ্বী কাকার বাড়ীতে বেড়িয়ে আসি।"

মিঠু লাফিয়ে উঠে—একসাথে অনেকগুলি কল্পনার ভীড় ঠেলে বের হতে চায় বড় বড় চোখ দুটি দিয়ে।

বাসে উঠে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে শীতা, "রাস্তাটা চিনিয়ে নিতে পারবে ত। তুমি ত আরও কয়দিন গিয়েছো।"

"ঠিক পারবো। সেই বেল লাইন পার হয়ে—"

শীতা বাধা দেয়, "থাক এখন আর বলতে হবে না। বাস থেকে নেমে দেখিয়ে দিও।"

বাস থেকে নেমে মিঠুর মত শীতাও উর্বর হয়ে উঠে কল্পনায় পৃথ্বীকে অবাক করে দেবে ভেবে।

মিলিটারী যুগের তৈয়ারী সুরকি ঢালাই পথ চলে গিয়েছে গ্রামের ভিতরে। দুই ধারে ঝোপ জঙ্গল বাঁশ ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে শণের আর দেশী টালির ঘর। শুকনো তালপাতার বেড়া দিয়ে উঠোনের সীমানা। বর্ষণস্নিগ্ধ আকাশের স্তিমিত রোদের আভাস আম জাম কাঁঠাল নারিকেল গাছের পাতায় পাতায়। পানায় বোঁজা ডোবার ধারে ধারে অলস ভঙ্গিমায় রোদ পোহাচ্ছে হংসমিথুনেরা। রাস্তার কিনারায়, গৃহস্থদের গৃহ সীমানা ছাড়িয়ে বিলাস ভ্রমণে বেরিয়েছে মোরগ পরিবার। গর্বিতা রাণী-রাণী ভাব মোরগ বধুর।

ছাগ শিশুরাও নরম কাঁঠাল পাতা চিবুচ্ছে পরম তৃপ্তিতে। জীবনের স্বাদ গ্রহণ করার সমারোহ লেগে গিয়েছে যেন এ সবুজ পৃথিবীতে।

শীতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এক মুহূর্তে। এ কোন জগতে নিয়ে এল মিঠু তাকে পথ দেখিয়ে এই মুখর মধ্যাহ্নে!

কত কাল, কত দীর্ঘকাল পরে, কচু পাতায় পাতায় জল গড়িয়ে পড়া মেঠো পথে পা দিয়েছে যেন তের বছরের এক কুমারী কন্যা।

"এই যে পৃথ্বীকাকার বাড়ী," বলেই ভিতরে ছুটে চলে যায় মিঠু।

মনের সাথে কসরৎ করে করে এই মাত্র কলম নিয়ে বসেছে পৃথ্বী। সারাদিন মুখ ভার করে সবে মাত্র একটু রোদের হাসি দেখা দিয়েছে আকাশে। ওদিকে মাকড়সার জাল বোনা শুরু হয়ে গিয়েছে মনে। অন্তঃসত্বা লেখক মনের প্রথম যন্ত্রনা। শান্তি নেই—শান্তি নেই। যতক্ষণ না গড়ে উঠছে, পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছে নবজাতক সৃজন-শিশু। তবু আরম্ভ করতে পারছে না। লিখছে, কাটছে, কাটছে, লিখছে। কেমন একটা মেয়েলী ব্যথায় গুমরে গুমরে ওঠছে ভিতরে। একটা অপ্রকাশিত যাতনা।

পৃথ্বী কলম রেখে সিগারেট ধরায়। একটা, দুটো, তিনটে সমানে পুড়িয়ে যাচ্ছে। কড়া, আরও কড়া নেশা চাই। একটু চা খেয়ে এলে মন্দ হয় না বটতলার দোকান থেকে।

সারাদিন বেরও হয়নি। আরও ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু আকাশের লক্ষণ আর একটু না দেখে বের হতেও ভরসা হচ্ছে না।

বর্ষাতিটাও সেই কবে নিয়ে গিয়েছে শীতাংশু। বর্ষা শেষ না হতে ওটা পাবার আশা নেই। ভালই লাগে ওদের ওই, বেপরোয়া দখলকে। অগত্যা আবার লেখাতেই মন গুটিয়ে আনে।

"কাকা, আমরা এসেছি।" এক মুখ খুশি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় মিঠু—"মাও এসেছে।"

পৃথ্বী তাড়াতাড়ি নেমে আসে। অপ্রত্যাশিত আনন্দে উজ্জ্বল চোখে প্রসন্ন অভ্যর্থনা ছাপিয়ে উঠে, "সত্যি-ভীষণ খুশি হয়েছি।" শীতাকে দেখে বলে পৃথ্বী। আর মনে মনে বলে, ঠিক এমনিই

অপ্রত্যাশিতভাবে আরও একদিন এসেছিলে তুমি আমার ঘরে জলো হাওয়া মাথায় করে সেই পদ্মানদীর ধারে।

শীতা নূতন করে অভিভূত হয় আবার। পৃথ্বীর কাছে এতখানি আনন্দদায়িনী আজও সে! এক প্রশান্তিময় মধুর প্রসন্নতা ঘিরে ফেলে তারও সমস্ত অন্তরকে।

সংযত খুশির সুরে বলে, "এত সুন্দর জায়গায় থাকেন আপনি, সে কথা জানাননি ত একদিনও।"

"পৃথিবীকে একা ভোগ করায় আপত্তি আছে আমাদেরও, কমরেড।" ঠাট্টা মেশান আন্তরিক সুরে বলে শীতা শেষের কথাটা।

পৃথ্বীও মৃদু ঠাট্টা মিশিয়েই বলে, "দুই অর্থেই কথাটা মানি। পৃথিবীকে সমানভাবেই ভোগ করতে চাই আমরা। আবার দোসর ছাড়া যে ভোগ করা যায় না এ সুন্দর পৃথিবীকে, তাও আজ স্বীকার করি, খুব বেশী করেই স্বীকার করি, শীতা।" শীতা তাকিয়ে দেখে, পৃথ্বীর চোখের কোণায় বেদনার ছায়া জমে উঠেছে। নিজেকে শাসন করে শীতা, পুরানো দুঃখের স্থান দেওয়ার জন্য নয় এ দিন। তাই খুশি-করতে-চাওয়া সুরে বলে, "ঘরে কিন্তু তালা চাবি এঁটে এসেছি। জায়গা হবে ত মায়ে ঝিয়ের একরাত্রি থাকার মত?"

"মায়ে-ঝিয়ে থাকার মতই প্রশস্ত জায়গা রয়েছে আমার ঘরে।" "মায়ে-ঝিয়ে" কথাটার উপরই জোর দিয়ে ঠাট্টার সুরে বলে পৃথ্বী।"

কিন্তু কথাটায় রক্তের একটা কাল ছায়া দ্রুত মিলিয়ে যায় শীতার অনিন্দিত মুখশ্রীতে। লক্ষ্য করে ব্যথিত হয় পৃথ্বী। তাই সংশোধন করে নেয় তার উক্তিকে, "আমাদের মিঠুরাণীকে বাদ দিয়ে তার মাকে আজ ডাকা যায় কি ঘরে?" হালকা করতে চায় পৃথ্বী হঠাৎ হোঁচট খাওয়া আবহাওয়াকে। কিন্তু শীতা ভিতরে ভিতরে অপমানিত বোধ করে নিজেকে। পৃথ্বী কি কথার ইঙ্গিতে হুঁশিয়ার করতে চাইছে তাকে

তার মাতৃত্বের চেতনা দিয়ে। কিন্তু দরকার ছিল না এ সাবধানী হুঁশিয়ারির। নিজেকে চেনে শীতা, আর নিজেকে চেনে বলেই পদস্খলন তার হ'তে পারে না কোনও অসাবধানী মুহূর্তেও। পৃথ্বীকে গ্রহণ করতে চায় সে আজ পরম বন্ধু ভাবেই। সংকোচে জড়ান "কমরেড" সম্বোধনটি যে তার অন্তরেরই ডাক—এও কি টের পেল না সে।

পৃথ্বী শীতার মুখের ছায়াতেই পড়ে নেয় তার ভিতরের সবগুলি জিজ্ঞাসা। তাই ক্ষমা-চাওয়া সুরে বলে, ক্ষুণ্ণ স্বরে, "বড় বেশী চুলচেরা বিচার কর, শীতা, মানুষের কথাকে। কথাকে অত বড় করে না দেখে মানুষটাকেই বড় করে দেখতে শেখ, শীতা।"

পৃথ্বীর এ আন্তরিক সুরে কুয়াশা কেটে রোদের আভাস দেখা দেয় ছায়াঘন চোখে। তবু একটা ব্যথার আমেজ জমে থাকে মনের কোণায়।

পৃথ্বী ঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে বলে, "আমাকে একবার বের হতে হবে এখন।" তারপর অনুরোধের সুরে বলে, "আমি ফিরে না আসতে কিন্তু চলে যেও না। নিমন্ত্রণ রইল তোমার আমার ঘরে।"

পৃথ্বী চায়ের তদারক করতে একবার ঘুরে আসে রান্নাঘর থেকে। "দেখ গিয়ে রান্নাঘরে চার বছরের মিঠুরাণীর কেমন মিতালি জমেছে যাট বছরের ভীমার্জুনের সাথে। কিন্তু তোমারই একা একা খারাপ লাগবে। কুরীও নেই বাড়ীতে। কিষাণপুরের স্কুলের গোলমাল মিটাতে গিয়েছে কয়দিন হ'ল। আর ফল্গুত লাষ্ট ট্রেণের আগে বাড়ী ফেরে না।"

শীতা স্মিত হাস্যে বলে, "একা থাকতে খারাপ লাগে না আর আমার। আপনি নিশ্চিন্তে কাজ সেরে আসুন। আর ফল্গু বুঝি এখানেই থাকে!"

"দিন কয়েক হ'ল। তোমাকে জানায়নি? একদিন এসে বললো—

একটা রাত্রিতে থাকার জায়গা ঠিক করে দিতে কোলকাতার বাইরে। আমি বললাম—এখানেই থাক—এখানেইত তোমার কাজ। রাত্রিতে শোয় সে ঠিকই তবে খাওয়াটা সম্ভবত চীনা হোটেলেই চলে। বাড়ীতে সময় হিসেব করে খেতে আসা নাকি পোষাবে না তার।"

শীতাও অনুযোগের সুরে বলে, "আমাদের ওখানে একদিন যদি খেয়ে যায়—পরের দিনই ভাত ঢাকা পড়ে থাকে। আর স্থায়ীভাবে ওখানেই যে থাকতে বলবো তারও উপায় নেই।"

শীতা আর কিছু বলে না। কিন্তু পৃথ্বী জানে, কেন ভাইকে থাকতে বলার উপায় নেই। শাশুড়ীর কাছে ভাইকে ছোট করতে চায় না শীতা।

শাশুড়ীর জমিদারির প্রচ্ছন্ন অহংকারকে অশ্রদ্ধার চোখেই দেখে শীতা। দেবজ্যোতির বাবাও ধনী ছিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর বিমাতার পিত্রালয়ে তাঁর পিতৃসম্পত্তিতে বড় হ'য়েছে—লেখাপড়া শিখেছে দেবজ্যোতি—একথা বহু ঘটনা উপলক্ষে শাশুড়ীর মুখে শুনেছে শীতা।

ফল্গুর মুখেই শুনেছে পৃথ্বী এসব বিস্তারিত কাহিনী।

পৃথ্বী জিজ্ঞেস করে, "ফল্গুর কাছে শুনলাম, তোমার শাশুড়ী কাশী গিয়েছেন। ফিরছেন কবে ?"

"সম্ভবত আর ফিরবেন না। এখন থেকেই ধর্মকর্মে মন না দিয়ে সংসারে সব শেষ করে বসলে পরকালের উপায় কি হবে। বিশেষ করে এ যুদ্ধোত্তর যুগে। ছেলে যখন নেই—তখন আর সংসারের মায়ায় জড়িয়ে লাভ কি। বরং লোকসানই। পাড়াপড়শী আত্মীয় স্বজনের কাছে ত ছোট হওয়া যায় না জমিদার গৃহিণীর !"

পৃথ্বী হাসে। মনে মনে বোঝে, অনেক জ্বালাই জমে রয়েছে ওর মনে। ভূস্বামীর আত্মদম্ভকে মেনে নিতে পারার মত মেয়ে নয়

শীতা, পৃথ্বী জানে তা। কিন্তু মুখে সে বলে, "কাশী থেকে না ফিরলে, তুমিত খুশিই হও।"

"নিশ্চয়ই। ভগবানকে বিশ্বাস না করলেও আর কিছু জুটাতে না পারি—অন্ততঃ বাতাসা দিয়ে ঘুষ খাওয়াব কাল্পনিক ঈশ্বরকে।"

"তাহলে লিখে দিলেই পার ওখানেই থাকতে।"

"দোষটা আমার কাঁধে নেব কেন। আগ্রহ যখন অপর পক্ষে বেশী।"

পৃথ্বী হেসে ফেলে, "সাংসারিক রাজনীতিতে একেবারে প্যাটেল সাহেব।"

জবাব দেয় শীতা, "তা আর হবো না কেন। ছয়টি বছর ধরে এ সংসার পলিটিক্স করছি। সামন্ততান্ত্রিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ আর সাম্যবাদের ডুয়েল চলেছে আজ ঘরে ঘরে।"

ভীমার্জুন চা দিয়ে যায়। মিঠুও একবার উঁকি মেরে দেখে যায়। চায়ের পেয়ালাটা উঠিয়ে আবার ঠাট্টার সুরে বলে পৃথ্বী, "শ্রীমতী মিঠুর মায়ের আগমন উপলক্ষে।"

চা খেয়েই বেরিয়ে যায় পৃথ্বী।

পৃথ্বীর ঘরখানা মন দিয়ে দেখে শীতা। শুধু মন দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়েই যেন দেখছে সে ঘরখানা।

আলমারি ভর্তি বইগুলি গৃহস্বামীর জ্ঞান পিপাসারই পরিচয় দিচ্ছে। টেবিলের উপর ফ্লাটফাইলে পাণ্ডুলিপি, কাটা-ছাঁটা প্রুফ সিট। শেলফে পত্রিকার পাঁজা—পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক।

দেওয়ালে টাঙান একখানা মাত্র ছবি। পর্বত শিলার গায়ে শৃঙ্খল বদ্ধ এক দৃঢ় দীপ্ত মূর্তি আর তার মাথার উপরে এক বিরাট ঈগল পক্ষী শাণিত চঞ্চু দিয়ে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে তার দেহ। ছবির নিচে লেখা—"শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস।" অনেকক্ষণ ধরে দেখে শীতা ছবিখানা। এর পিছনের ইতিহাসটুকু জানে না সে। হয়তো কোনও গ্রীক পুরাণ

থেকে রূপায়িত। কিন্তু এ ছবি ঘরে রাখার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে। এ অত্যাচারী লৌহ্ ঈগলের কাছে কোন যুগেই মাথা নত করবে না মানুষের অপরাজিত আত্মা।

মিঠুর কথার তুবড়ি চলেছে। "কত বড় বাগান নীচে দেখবে মা।" মিঠু মাকে ধরে নিয়ে চলে নীচে।

পুরানো বাড়ী। বহুকাল সংস্কার করা হয়নি। মাঝে মাঝে আস্তর খসে পড়েছে। মাঝখানে মস্ত উঠোন। উঠোনের দুইসারিতে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর। উপর তলায় মাত্র দুখানা ঘর—কিন্তু নীচের ঘরগুলির তুলনায় অনেক বেশী প্রশস্ত ও আলোবাতাস ভরা। নীচের ঘরগুলি পরিকল্পনাহীন, অগোছালও। মনে হয় এক পুরুষ আগের করা এ ঘরগুলি। নীচতলায় হাঁস-মুরগি-কুকুর-ভাঁড়ার-রান্নাঘর আর ভীমার্জুনের একাধিপত্য।

মিঠু শীতাকে টেনে নিয়ে যায় কোণের দিকের আরও একখানা ঘরে। ঘরে একটু চোখ বুলিয়েই বোঝে শীতা এ ঘরের বাসিন্দা পৃথ্বী নয়, অন্য কেউ। চারদিকে ছড়ান গৃহ-সামগ্রী দেখে কৌতুক বেড়ে যায় শীতার।

মেঝেতে ছড়ান চিত্র সরঞ্জাম। অসমাপ্ত ছবিব ক্যানভাসের উপর ধুলোমাখা। তাকের উপর পত্রিকার পাঁজা—কেমিকেল ঔষধপত্র, ঢাকনাহীন ডালদার টিনে সুগন্ধ স্নো জাতীয় পদার্থ। আলু পটল রেশনের থলিতে চাউল আটা সব একাকার।

"এ ঘরে অরুণ কাকারা থাকে।" গর্বের সুরে বলে মিঠু। "ঐ যে ছবি আঁকে, চকোলেট বানায়, চা বিক্রী করে।"

অনুমানেই বোঝে শীতা মিঠুর এ কাকারা মিঠুর মতই সবজান্তা, সর্ব-কর্মা।

মিঠুর সাথে বাগানে ঢোকে শীতা। আম কাঁঠাল সুপারি

নারকেল লিচু প্রায় সব রকম গাছই আছে। অকারণেই ঘুরে বেড়ায় শীতা গাছের ছায়ায় ছায়ায়। পায়ের তলায় পচা পাতার ঠাণ্ডা স্পর্শ। চারদিকে ঝরা পাতার স্তূপ।

চৈত্র পূর্ণিমার শোক নিঃশ্বাসগুলি জমে রয়েছে যেন গাছতলায় রাশি রাশি ঝরাপাতার বুকে।

বাগানের সংলগ্ন ছোট্ট একটি দীঘি। দীঘির বুকে বহুকালের পুরানো এক ঘাটলা। ঘাটলায় এসে চুপ করে বসে থাকে শীতা। শেওলা ধরা জীর্ণ সিঁড়িগুলির বুকেও যেন মিশে রয়েছে কোন অতীত বধূর শেষ পদধ্বনি। আম-জাম-কাঁঠালের শাখাপ্রশাখায় ঢাকা অন্ধকার প্রাচীরের কোণা থেকে শেষবেলায় ক্লান্ত রোদের ফালিটুকু যাই যাই করেও যেতে পারছে না যেন। মানকচুর পাতায় পাতায়ও সেই বিদায়-প্রার্থী রোদের শেষ স্নেহস্পর্শ।

নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে দেখে শীতা, সমস্ত বাড়ীখানাতেই যেন কোন পুষ্পিত যৌবনের হারানো স্বর ছড়িয়ে রয়েছে—কোন অনাস্বাদিত জীবনের মৃদু ক্রন্দন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। পৃথ্বী ফেরে নাই তখনও।

শীতা উঠে যায় রান্নাঘরে। "চল মিঠু, তোমার ভীমকাকা কি করছে দেখে আসি।"

"তরকারি কাটছে। পৃথ্বীকাকা বলে গেলেন যে, ভাল করে আজ রান্না করতে।"

শীতা হাসে মনে মনে, পৃথ্বীও ভাল করে রান্না করতে বলে গেছে, শুধু বই-ই পড়ে না এরা।

রান্নাঘরের বারান্দায় এসে ভীমার্জুনের তরকারি কাটার নমুনা দেখে হেসে ফেলে শীতা। "আজ বুঝি তোমাদের ফিস্ট্।"

বঁটিটা চেয়ে নেয় হাত থেকে "আজ তোমার ছুটি। কি কি আছে ঘরে। মাছ আনবে না?"

"না দাদাবাবু নিষেধ করে গেলেন। বললেন, এই গরমের মধ্যে মাছ মাংস ভাল লাগে না।"

শীতা মনে মনে কিসের আন্দাজ করে বলে, "একদিনের জন্য রান্না করবো, নিরিমিষ খাইয়ে ভাল লাগবে না। তুমি যাও বাজার থেকে খুব ভাল গঙ্গার ইলিস কিনে নিয়ে এস।"

ভীমার্জুন খুশি হয়। এমনি একটি দিদিমণি হ'লে এঘরে মানাত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবে, বৌ ঠাকরুণ বেঁচে থাকলে, দাদাবাবুরও এদ্দিনে বৌ আসতো ঘরে।

গৃহস্থালির তন্ময়তার ডুবে যায় শীতা। পৃথ্বী ফিরে এসে কৌতুকভরা চোখে একবার ঘুরে দেখে যায়। কিন্তু মনের নীচে একটা ব্যথার ছায়াই স্থির হ'য়ে থাকে। বারে বারেই একটা কথা ছুঁয়ে যায় মনের তলায়—এ ঘরে পূর্ণ অধিকারই থাকতো আজ শীতার। আর আজ শুধু অতিথি সে এ ঘরে।

রাত্রিতে খেতে খেতে ফল্গু এসে পড়ে। অবাক হয়ে যায় সে শীতাকে দেখে। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, "রাত্রে এখানেই থাকবে ত? লাষ্ট বাস ত চলে গেল।"

পৃথ্বী খেতে ডাকে ফল্গুকে, "দিদির হাতের রান্না একটু চেখে দেখবে নাকি?" শীতাংশুদেরও ডাকা হয়েছে আজ খেতে।

পৃথ্বী ফল্গুর খাওয়া দেখে ঠাট্টার সুরে বলে, "ফল্গু, দেখে মনে হচ্ছে তোমার প্রলিটারিয়েট হোটেলের খাওয়া ট্রেনে আসতে আসতেই হজম হ'য়ে গিয়েছে।"

"এমন রান্নার গন্ধে প্রলিটারিয়েট হোটেল কেন, যে কোনও বুর্জোয়া

হোটেলের রান্নাও হজম হ'য়ে যেতো। গঙ্গার ইলিস, তার উপর দই মাছ।"

খাওয়া হ'য়ে গেলে সবাই উঠে যায় মুখ ধুতে। পৃথ্বী অপেক্ষা করে মৌনমুখে।

শীতা বোঝে, কোনও অনুরোধ জানাতে চাইছে পৃথ্বী—যা বলতে পারছে না মুখফুটে। তাই নিজেই কথা বলে শীতা, "শুনলুম মাছ মাংস ভাল লাগে না। আমি কিন্তু ভীমকাকাকে জানিয়ে দিয়েছি—আজ থেকে নিরিমিষই আর ভাল লাগবে না তার দাদাবাবুর।"

একটু থেমে আবার বলে, "আর আপনি হয়তো জানতেন না মাছ মাংস আমি কোন দিনই খাইনি। পিসীমার আশ্রমে ছোটবেলা কেটেছে আমার। হয়তো সেই জন্যই জ্যান্তপ্রাণীদের খাওয়াটা বড় বর্বরতা মনে হতো ছোটবেলা থেকেই।"

"ভাল যদি লাগতো তাহ'লে এখনও খেতাম।" একটু বিদ্রোহের স্বরে বলে শীতা শেষের কথাটা। "অবশ্য শাশুড়ী তাহলে আমার হাতে খেতেন না, তাও ঠিক।"

পৃথ্বী উত্তর দেয়, "তাহলে সে বর্বরতায় অন্যের বেলায় আপত্তি নেই কেন।"

"আমার মনে হওয়াটাইত সব উত্তর নয়। বিজ্ঞানের যুগে হয়তো এ ধরনের মন প্রশংসনীয়ও নয়। তা'হলেত পৃথিবীশুদ্ধ সবাই মাছ মাংস ত্যাগ করতো। তবে যুক্তি দিয়েও সব সময় ভাল লাগা-না লাগার উপর জোর খাটে না। তাহ'লেত অনেক ব্যাপারই অনেক সহজ হ'য়ে যেত।"

শেষের কথাটায় মনে মনে চমকে উঠে গেল পৃথ্বী। শীতাও লক্ষ্য করে তা'। মুখে বলে পৃথ্বী, "তোমার হুকুম না হয় মেনে নেবে ভীমার্জুন। কিন্তু অতিথি কি অভুক্ত থাকবে আজ আমার বাড়ীতে?"

"আনন্দের দিনে অভুক্ত থাকে নাকি মানুষ। সেজন্য গৃহস্বামীর না ভাবলেও চলবে—অন্নপূর্ণা যখন উপস্থিত ঘরে।"

শীতা উঠে যায়—ভীমার্জুনকে পরিবেশন করতে।

পুরাতন ভৃত্যের চোখ ভরে উঠে প্রসন্নতায়। "আপনি এখানে থাকলে দাদাবাবু ঠিক মত শাসনে থাকতো।"

ভীমার্জুন খেতে খেতে কথা বলে—তার দুঃখের কথা, "বাবুদের দেশের জোতজমি ঘরবাড়ী সবই ত নদীর তলায় গেল। তারপর বাবু এখানে এসে শহর ছাড়িয়ে এ বাড়ীখানা কিনলেন। নিরিবিলি থাকবেন বলে কোলকাতায় বাড়ী কিনলেন না। কিন্তু কপালে ছিল না ভোগ। নাহ'লে কি ই বা বয়স হ'য়েছিল। বৌ ঠাকরুণ মারা যাওয়ার পর থেকেই সংসারে আর মন ছিল না বাবুর। সেও ত কম শোক নয়। এক মাসের মধ্যে বৌ,—দু'দুটো ছেলে মারা গেল কি এক কাল জ্বরে। সেও অবশ্য আজকের কথা নয়। দাদাবাবু তখন একটাও পাশ দেয় নাই। আমাদের কুরী দিদিমণি সবে হামা দিতে শিখেছে। মা লক্ষ্মীর মত চেহারা ছিল বৌ ঠাকরুণের। তারপর দাদাবাবুও যদি সংসারী হতেন, সে শোক হয়তো সামলে নিতে পারতেন বাবু। কিন্তু দাদাবাবুওত জেলে জেলেই কাটাল সারা জীবন।"

শীতা তন্দ্রাতুর চোখে তাকিয়ে দেখে পুরাতন ভৃত্যের বাৎসল্যরস-সিঞ্চিত বলিরেখাময় মুখছবি। সম্মুখে উঠোনে ভরে উঠেছে ফিকে জ্যোৎস্নায়।

দীঘির জলেও জ্যোৎস্না গলে' গলে' পড়ছে। স্তরে স্তরে সাজান মেঘের ফাঁক দিয়ে চতুর্দশীর চাঁদ ঐন্দ্রজালিক আচ্ছাদনে ঢেকে ফেলেছে পৃথিবীকে।

ঘাটলায় বসে মিঠুর অজস্র কথার জবাব দিয়ে চলেছে ফল্গু আর পৃথ্বী। আজ মিঠুর চোখেও ঘুম নেই।

শীতাও এসে বসে। মিঠুর দুইপাশে বসেছে পৃথ্বী আর শীতা। পৃথ্বী ভাবে এই ছোট মেয়েটির মাঝে লুকিয়ে আছে সমুদ্রের ব্যবধান। আবার এই ছোট্ট মেয়েটিইত সমুদ্রের উপর দৃঢ় সেতু। এই দৃঢ় সেতুর জন্যই ত সমুদ্র পার হ'য়ে তার কাছে আসা এত সহজ হয়েছে শীতার।

ধীরে ধীরে মিঠুর কথা থেমে যায়—ঘুম জড়িয়ে আসে ছোট্ট দেহ-টুকু ঘিরে। জ্যোৎস্নার আবরণে ঘুমন্ত শিশুর সৌন্দর্য তন্ময় চোখে পান করে পৃথ্বী পৃথিবীর অপূর্ব সুধারসের মত।

নীচে নববধূর নিথর কাল দৃষ্টির মত ভাদ্রশেষের ভরা দীঘি। পূর্ণ ফোটা শাপ্‌লাফুলের প্রতি পাঁপড়িতে চাঁদের অনুরাগ ঝরে পড়ছে।

ফল্গু বলে, "পৃথ্বীদা, মধুবনের পিসীমার সেই আশ্রমের কথা মনে আছে? আপনি পলাতক অবস্থায় মাসখানেক ছিলেন। ঠিক এরকমই একটা ঘাটলায় বসে আমার আর দিদির কাছে বিপ্লবীদের গল্প বলতেন।"

রোমাঞ্চকর স্মৃতির দমকা হাওয়ায় অতীতের ছিটকিনি আঁটা জানালাটা খুলে যায় জোর ধাক্কায়। পৃথ্বীর শৈশবের গ্রাম—আড়িয়ল খাঁ নদের ধারে ঠাকুরদার আমলের বিরাট বাড়ীর সবই আজ নিশ্চিহ্ন।

শোনা যায়, এককালে কুমার নদীর ধারেই নাকি ছিল সে গ্রাম। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ আড়িয়ল খাঁ তার তরঙ্গায়িত অট্টহাসিময় বক্ষের উন্মত্ত আলিঙ্গনে টেনে নিল সে শাখা নদীকে। তাতেও শান্ত হল না তার অন্তরের জ্বালা। পৃথ্বীর পাঠ্য জীবনের সমস্ত স্মৃতি চিহ্নই সে নদীস্রোতে মিশে গিয়েছে।

কালের স্রোতেও। পদ্মা, মেঘনা, কীর্তিনাশা, আড়িয়াল খাঁর তটছায়ায় ছায়ায়, গোচারণ ভূমির সুদূর শ্যামলিমায় অনুভূত বিপ্লবী তরুণের প্রথম রোমাঞ্চ, সবই আজ ধুয়ে মুছে গেছে। পৃথ্বীদের স্কুলে তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন শীতার বাবা। সে স্কুল থেকেই শুরু হয় পৃথ্বীর প্রথম অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ।

ফন্তু বলে চলেছে, "কি শ্রদ্ধার চোখেই না দেখেছিলাম আপনাকে সেই যেদিন একটা কাল ভারী জিনিস দেখিয়েছিলেন আমাদের।"

কাল ভারী জিনিস! হাসে পৃথ্বী। ১৯৩৪ সাল। সহকর্মীরা সব ধরা পড়ে গেছে। তাদের শেষ পদচিহ্নটুকুও নিশ্চিহ্ন করার তোড়জোড় চলেছে গ্রামে গ্রামে সরকারী ব্রতচারী উৎসবের "কোদাল চালাই" নৃত্য-কৌশলে। আর গোরা সৈনিকদের উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল পদক্ষেপে গ্রামবাসীর মনে ভীতি সঞ্চার করার চেষ্টায় ব্যস্ত, বেকারগ্রস্থ দারোগা এস, ডি, ও'রা।

ভাঙা মনে ফেরার অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথ্বী। কিন্তু সেই কাল ভারী জিনিসটির মায়া তবু ত্যাগ করতে পারছে না। সে সময়েই শীতার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ তার শীতার পিসীমার আশ্রমে।

পৃথ্বী হেসে বলে, "কাল ভারী জিনিসটি সেদিন শীতার জিম্মায় রেখে গিয়েছিলাম বলেই সে যাত্রা কালাপানির হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম।"

শীতা হেসে বলে, "সেই পিস্তলটি নিয়ে কি বিপদেই পড়েছিলাম আমি। আমার জিম্মায় সেটি রেখে কোথায় যে উধাও হ'লেন উনি। কিছুদিনের মধ্যে সংবাদ এলো, ধরা পড়েছেন আসামী; তবে আপত্তি-জনক জিনিস কিছু পাওয়া যায়নি। ওদিকে আপত্তিজনক জিনিসটিকে মাটির মধ্যে পুঁতে রেখেও শান্তি নেই আমার। যদি কিছু বিকল হ'য়ে যায়? জেল থেকে ফিরে এসে মুখ দেখাব কি করে। তাই রোজ রাতে একবার বের করে দেখি, আবার মাটি দিয়ে লেপে পুঁছে রাখি। কেউ পাছে সন্দেহ করে তাই সব ঘর খানাই রোজ লেপে রাখি। তারপর একদিন রমার দাদা একটুকরো কাগজ হাতে দিলেন, তাতে লেখা 'এর হাতে দিও।' লেখাটা চিনলাম।"

নূতন করে মনে মনে ভাবে শীতা দীর্ঘ-অতীতের কথা। গচ্ছিত

জিনিস ফিরিয়ে দিয়েছিল সে পত্রবাহকের হাতে। কিন্তু সেই মধুর হস্তাক্ষর কয়টি ছিঁড়ে ফেলতে পারলো না। দিনের মধ্যে কতবার যে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তো সে লেখাটুকু। প্রেম কি জিনিস জানতো না সেদিনের সেই কিশোরী শীতা। কিন্তু টের পেল প্রথম অনুভূত এক রহস্যময় অনুভূতির দোলা। সমস্ত চেতনাকে আছন্ন করে ফেললো যেন সেই অপরূপ দেহভঙ্গী, সেই পল্লবিত গভীর কাল চোখ দুটি। কিন্তু বাইরে কেউই জানলো না সে খবর। নিজের ভিতরেই গুটিয়ে রাখলো শীতা সেই অজানা রহস্যকে। আর জানাল তার পিসীমার ঠাকুরকে। গোপন প্রার্থনায় আকুলিত হ'য়ে উঠলো শীতা—"আবার যেন দেখা হয় তার সাথে। তার মুক্তি দাও, হে ঠাকুর।"

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয়ই নেই তখন শীতার মনে। তাই দিনের পর দিন ঠেলতে লাগলো সে আকুল প্রতীক্ষায়।

তারপর দীর্ঘ দুই বছর পর পৃথ্বীর দ্বিতীয় চিঠি এল জেল থেকে শীতার প্রথম পাশের অভিনন্দন জানিয়ে। কলেজে ভর্তি হ'য়েছে সে তখন।

সে কি অশান্ত কাঁপুনি সেদিন বুকের স্পন্দনে। মধুর আলিঙ্গনের মত জড়িয়ে ধরেছিল একমাত্র চিন্তা, পৃথ্বী ভোলে নাই তাকে!

শীতা গল্প বলে চলেছে। পুরানো দিনের রোমন্থন। পৃথ্বীর সম্মোহিত চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেন "ফ্লাগপাড়" শাড়ি পরা তের বছরের একটি উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী মেয়ে, আর মহাদীক্ষায় দীক্ষিত এক আঠার বছরের ফেরার ছেলে। প্রথম রাতে পৃথ্বীকে ভাত এনে দিয়েছিল শীতা আশ্রমের মাটির ঘরের বারান্দায়। আজও স্পষ্ট চোখে ভাসছে বাঙালী মেয়ের সেই লাজুক দৃষ্টি।

মাধবীলতায় ঘেরা ছোট্ট আশ্রম। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ছবির সামনে প্রাত্যহিক স্তবস্তুতি সন্ধ্যারতির আড়ালে আড়ালে চলতো

বিপ্লবের গোপন পরিকল্পনা। আর তারও আড়ালে রাধাচূড়ার ছায়ায় ছায়ায় পঞ্চশরের অদৃশ্য ইশারায় যে জাল বোনা হয়েছিল দুটি তরুণ প্রাণে, সেদিনের পৃথ্বী হয়তো জানতো না তা। কিন্তু সেদিনের সেই অদৃশ্য জালকে আজও ত ছিন্ন করতে পারলো না পৃথ্বী!

শীতা বলে চলেছে, "তারপর সেই ফেরার ছেলেটির দ্বিতীয় চিঠিও এল একদিন। আমি তখন কলেজে ভর্তি হয়েছি। চিঠি ত নয়, যেন কবিতা। প্রথম অধ্যায় শেষ হ'য়েছে ব্যর্থতায়, তবু তার ব্যথার রেশ কাটে নাই।" পৃথ্বীকে বলে শীতা, মনে পড়ে সেই চিঠির কথা? সেই—"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।"

শীতার স্বপ্নাবিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে পৃথ্বী। বিষণ্ণ, ম্লান হাসি। মনে মনে বলে, "সেদিনের কথা ভুলতে পারলাম আর কই, শীতা।"

ফল্গু আধা-ঠাট্টার সুরে বলে, "কি সুখেই ছিলেন আপনারা তখন। অন্তত চাঁদার খাতা নিয়ে পুরানো বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী ঘুরবার চাইতে অনেক সোজা ছিল আপনাদের সেই দু'একটা খেলার পিস্তল দেখিয়ে ডাকাতি করা।" পৃথ্বী জবাব দেয়, "সেই জন্যই ত সে রোমাঞ্চের যুগকে ছাড়তে এত বাকবিতণ্ডা, এত মন কষাকষি গিয়েছে। দস্তুর মত একটা 'ফাইট' বলা চলে।"

পৃথ্বী ঘুমন্ত মিঠুকে তুলে নেয়, "আর ঠাণ্ডা লাগান ঠিক নয়—এবার ঘরে চল।"

রাত অনেক। অনেক রাত। শীতা শুয়ে শুয়ে ভাবে, এ বিনিদ্র রজনীর শেষ কোথায়। রাত্রির রুদ্ধ নিঃশ্বাসগুলি শোনা যায় না, গোণা যায় না। তবু সমস্ত চেতনার উপর এ রাত্রির চাপ।

বাইরে শিউলিগুলি খসে' খসে' পড়ছে। চাঁদের কিরণে লেগেছে

হিমেল স্পর্শ। হিমস্পর্শী অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় জড়ান পৃথিবীও বুঝি নিদ্রাচ্ছন্ন। শুধু ঘুম নেই শীতার চোখে !

শীতা কাতর চোখে তাকায় বাইরে—একমাত্র জাগ্রত যেন আকাশের নক্ষত্ররা। মহাকাশের সহস্র বাতিঘর থেকে জানাচ্ছে পথসংকেত। পথনির্দেশের কত স্নিগ্ধ ইশারা।

মহাশূন্যের বুকে মুমূর্ষু দেবজ্যোতির প্রেমদৃষ্টি যেন ঐ স্নিগ্ধ দ্যুতির মত স্থির হ'য়ে রয়েছে। নক্ষত্রদের মত ক্ষমাদীপ্ত শান্ত গভীর দৃষ্টি।

কিন্তু সে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না তাকে। আচ্ছন্ন করে ফেলছে তাকে আবার সেই অতীত রহস্যময় বেদনার মধুর আবেশ।

মিঠুকে বুকের কাছে টেনে নেয়—শিশুর নরম দেহের উষ্ণতা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চায় নিজেকে।

কিন্তু বৃথাই এ আত্মছলনা। সহস্র রন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করছে এক মধুর বেদনার সুতীব্র রশ্মি।

জীবনের লবনাক্ত সমুদ্রে আবার লেগেছে ফেনিল স্পর্শ। অনুভব করে শীতা, হৃদয়ের পান্থশালায় আবার পথ খুঁজে নিয়েছে প্রথভ্রষ্ট পথিক।

দেবজ্যোতির করুণ মৃত্যুস্মৃতিও দ্বার রুদ্ধ রাখতে পারে নাই এ বাত্যাহত অশান্ত হৃদয়ের।

প্রথম উষার শীতস্পর্শে ঘুম ভেঙে যায় পৃথ্বীর। নূতন আস্বাদিত রাত্রির বিজড়িমা জড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। জ্যোৎস্নাশুভ্র একটি মধুর রাত্রির প্রীতিস্পর্শ রেখে চলে যাবে শীতা। এই তন্দ্রাবিজড়িত রাত্রিকে কি ভাবে গ্রহণ করেছে শীতা, জানতে চায় মন। কিন্তু জানবার উপায় নেই। কোনও বিশেষ অনুভূতির মাধুরীতে বিনিদ্র কেটেছে কি তারও এই মধুরজনী, জানবার অধিকার নেই।

সচেতন হয়ে উঠে পৃথ্বী—এ কি ভাবছে সে। জোর করেই ঝেড়ে ফেলে এ অনুচিত চিন্তাপ্রবাহকে। একটা জ্বালা অনুভব করছে সে চোখে। উঠে গিয়ে পুকুর থেকে চোখেমুখে জল দেয়—ঠাণ্ডাজলের ধারায় স্নিগ্ধ হয়ে আসে স্নায়ু।

শীতাও উঠে এসেছে। ঘাটলায় বসে তন্ময় হ'য়ে কি ভাবছে সেও। বিষণ্ণ ম্লান মূর্তি। অনেকখানি সহজ করে আনা সমুদ্রের সেতুটা স্বপ্নময় রাত্রির কুহেলীতে তলিয়ে গিয়েছে। শুধু বিরাট দূরত্বের কুজ্ঝটিকা অকুল সম্মুখে।

শীতা দেখতে পায়নি পৃথ্বীকে। পৃথ্বী স্থির চোখে দেখে নিঃশব্দে নতমুখী শীতাকে। গভীর জিজ্ঞাসাভরা দৃষ্টি যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখতে চায় ওর ভিতরের জটিলতম গ্রন্থিগুলিকে।

পৃথ্বী লক্ষ্য করে, শীতার চোখের কোণায় বিন্দু বিন্দু বেদনা অশ্রু বিন্দুর মতই টলটল করছে। নিস্পন্দ মুহূর্তেরা সমস্ত চিন্তা স্রোতের শেষ কিনারায় এনে দিয়েছে দুজনকে। ঝড়ের শেষের ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত মহীরুহের মত ক্লান্ত অবসাদ মাখা স্থির চোখে দেখে পৃথ্বী এই অশ্রুহীন ক্রন্দন।

একটিমাত্র রাত্রি এমন নূতন করে আবার দূরত্বের উপলব্ধিকে নাড়া দিয়ে যাবে, বোঝেনি হয়তো শীতা। তবু এর কোন জবাব নেই, কোনও সান্ত্বনা নেই। জোর করেই উজান স্রোতে ঘুরিয়ে দিতে হ'বে তরীর পাল। কিন্তু সে শক্তি ওর আর নেই এ বিদায় নেওয়া সকালবেলায়। সহায়তা করতে হবে পৃথ্বীকেই।

পৃথ্বী নিকটে সরে এসে স্নেহস্পর্শী হাত রাখে শীতার মাথায়, "শীতা, তুমিত কোনও অন্যায় করনি। কেন অত কষ্ট পাচ্ছ।"

এ স্নেহস্পর্শে আরও ভেঙে পড়ে দুর্বল মেয়ে। চোখের কোঁণায় অশ্রু বিন্দু দেখা দেয়। পৃথ্বী বোঝে, ওর এ নীরব কান্নার শেষ এত

সহজে আসবে না। এ প্রেমের গ্রন্থিকে ছিন্ন করতে হবে তাকেই। শক্তি চাই। শক্তি চাই তারও। শক্তি তাকে পেতে হ'বেই।

পৃথ্বী স্নেহের সুরে আবারও ডাকে, "শীতা, শুধু কি মন খারাপ করেই থাকবে এমন সুন্দর সকালটায়।"

নিজেকে সংযত করে শীতা। কিন্তু কথা বলতে পারে না। নিঃশব্দে উঠে যায় রান্নাঘরের বারান্দায়। চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে নেয়।

ফল্গু ও মিঠু এসে বসে। মিঠু আপত্তিজানান সুরে বলে, "মা, আজই চলে যাবে?"

পৃথ্বী মিঠুর অনিচ্ছুক মুখখানা দেখে বলে শীতাকে, "তোমার শাশুড়ী যদি আর নাই ফেরেন এখন, তবে তুমি আর একা একা ও বাড়ীতে পড়ে' থাকছো কেন? কয়দিনের জন্য এখানেই চলে এস না।"

ভীমার্জুন দন্তবিকশিত একগাল হাসি দিয়ে সমর্থন করে কথাটা। তার এত খুশির হাসি দেখে হেসে ফেলে সবাই।

কিন্তু শীতা রাজী হয় না। "এতদূর থেকে স্কুল করা সম্ভব না।" এটা যে শুধু অজুহাতই, বোঝে পৃথ্বী। বোঝে, এত শীগ্গীর একটি রাতের দাগ মুছে ফেলতে পারবে না সে।

শীতা উঠে পড়ে। স্কুলের বেলা হ'য়ে যায়।

পৃথ্বী বাস পর্যন্ত যায়। আজ যে শীতা স্কুল করতে পারবে না, জানে সেও। শুধু নিজেকে লুকোবার জন্যই আশ্রয় নিতে চলেছে সে নিজের ঘরে।

"আবার এসো মিঠু, মাকে নিয়ে।" বলে দেয় পৃথ্বী মিঠুকে। বাস ছেড়ে যায়।...

পৃথ্বী বাড়ী ফেরে না। বাসেও উঠে না। হাঁটতে শুরু করে। ঝড়ের আঘাতে বিদীর্ণ সেও। মনের শাখা প্রশাখায় আবার নূতন পাতা গজাতে সময় লাগবে।

শীতার আশ্রয় রয়েছে তার সন্তান। মূর্তিমতী জীবন একটি। কিন্তু এই ঝড়ের শেষে তার আশ্রয় মিলবে কোথায় ?

কোন আশ্রয় খুঁটি ধরে উপেক্ষা করবে সে এই ঝড়ের আক্রমণকে।

ভিতর থেকে আত্মার ধ্বনি ফুলে ফুলে উঠে—"তোমার আদর্শ —তোমার কর্মজীবনের প্রতিজ্ঞা—এইত আশ্রয়—ঝড়ের রাত্রির দিগদর্শী নিশানা।"

নিবিষ্ট মনে হেঁ'টে চলেছে পৃথ্বী। হঠাৎ থামতে হয়। রথীর সাথে দেখা। হাতে একখানা কড়কড়ে পত্রিকা। "নূতন নাকি ?" জিজ্ঞেস করে পৃথ্বী। ঠাট্টার স্বরে উত্তর দেয় রথী "হ্যাঁ, এ মাসেরই। পড়ে দেখ, কমরেডরা কি ভাষায় অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তোমার বইকে। পড়ে ত মাথায় হাত দিয়ে বসবে। এসব সংস্কারবাদের কাল কালি দিয়ে সাহিত্যিকদের চোরাকারবার আর চলবে না। এখন থেকে এক দোয়াত লাল কালি কিনে নিয়ে বোস লিখতে।"

পৃথ্বী ম্লান চোখে পত্রিকাখানায় একটু চোখ বুলায়।

রথী বলে, "কুলীনরা ত ত্যাগ করেই আছে। এবার অন্ত্যজদেরও কপাট বন্ধ হ'ল। এ একঘরেদের স্থান হ'বে কোথায়।"

সারাদিনের কাজ শেষ করে লাস্ট বাসে উঠে বসে পৃথ্বী। বাস ছুটে চলে উন্মুক্ত ময়দানের পাশ দিয়ে। পৃথ্বী তন্ময় হ'য়ে ভাবে তার বইয়ের সমালোচনার কথা।

দুঃখবাদকে বাদ দিতে হ'বে। কিন্তু দুঃখকে বাদ দিয়েও ত চলে না। অসীম দুঃখ পৃথিবী ছড়ান। কুয়াশা জড়ানো জ্যোৎস্নাবৃত রাত্রির একাকীত্বে একি কষ্ট, একি যাতনা, পৃথিবীর মানুষ, তোমাদের বোঝাই কি করে।

অশান্ত আত্মার এ অনন্ত যন্ত্রণাবোধ; এর কোনও সমাপ্তি নেই। কোনও আশ্বাস নেই। কোনও সান্ত্বনা নেই।

বাসের চারপাশে ঠাসাঠাসি করে বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে কর্মপিষ্ট মানুষ। শান্তির নীড়কে কামড়িয়ে ধরে থাকার একান্ত চেষ্টার শেষ সীমায় এসে পড়েছে তারা। তবু এ যন্ত্রণা সংগ্রামের প্রেরণা আনে।

কিন্তু তার আত্মার এ যন্ত্রণা কিসের। সংগ্রামের নয়, শান্তিরও নয়। তবু নিরবচ্ছিন্ন একটি দুঃখের ধারা নিঙড়ে নিঙড়ে উঠছে ভিতরে।

বিদ্রূপ করো না, বন্ধুরা। কান্না শুনবার সময় এ নয়, জানি। তবু এ নিঃশব্দ কান্নার প্রস্রবণ ভেঙে ভেঙে রেণু রেণু হ'য়ে গুঁড়িয়ে মিশে যাচ্ছে ঐ কুয়াশাচ্ছন্ন বসুধার বুকে।

এক অপরিসীম দুঃখানুভূতি পৃথ্বীকে লোকচক্ষুর অগোচরে সরিয়ে নিয়ে আসে এ কোন জগতে।

বাসের পাশ দিয়ে শবদাহ করতে চলেছে শোকার্ত প্রিয়জনেরা।

একটি ভিখারী শিশু বিনিয়ে বিনিয়ে পয়সা চাইছে। মর্মভেদী ক্ষুধার্তের বিলাপ।

একি যাতনা! চেতনার স্নায়ুতে আরও, আরও শক্তির প্রয়োজন। এ পৃথিবীকে গ্রহণ করতে আরও জোরাল যুক্তির আশ্রয় চাই।

একজন উন্মাদ নগ্নদেহে দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকারে পথপ্রান্তে। যুক্তির জগতের বাইরে চলে গিয়েছে। দাঁড়িয়ে আছেন গৈরিকবসনা এক বৃদ্ধা—আত্মসমর্পিতা, না আত্মবঞ্চিতা?

আত্মবঞ্চনার একি করুণ ছবি ঘরে বাইরে সর্বত্র। এক বিরাট দুঃখের সুর বয়ে চলেছে পৃথিবী ব্যাপি। তবু বলতে হ'বে, দুঃখবাদকে স্পর্শ করা চলবে না!

রিকসা ভাড়া আনতে বেরিয়ে যায় সোনা। তে-রাস্তার মোড়ে কালুর সাথে দেখা হয়। সোনার কাঁধে হাত রেখে ঠাট্টা করে কালু, "কি দোস্ত, মন ভার ভার ঠেকছে ?"

তারপর আরও কদর্থময় হাসি দিয়ে বলে "মন ভাল করার ওষুধ চাও ত একদিন সন্ধ্যার পর চল আমার সাথে। দেখবে কেমন খাসা মেয়েমানুষ। তোমায় ও বিবি ত—"

সোনা মনে মনে চটে যাচ্ছে, তবু রাস্তার মধ্যে এসব ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করতে চায় না সে। গম্ভীর হ'য়ে উত্তর দেয়—কথার মাঝখানেই, "ও আমার বিবি নয়।"

হেসে ফেলে কালু, "তা' কি আর জানি না। এই কালুর চোখে ধুলোকণাটি পর্যন্ত ফাঁকি দিতে পারবে না কেউ। কিন্তু কথা হ'চ্ছে এ দুধের মেয়েটাকে নিয়ে সময় নষ্ট করছো কেন।"

একটা অশ্লীল উক্তি বেড়িয়ে আসে মুখ দিয়ে।

সোনা কথার মাঝখানেই ধমক লাগায়, "চুপ কর। মেয়ে মানুষের বে-ইজ্জতি কথা কোনদিন যদি শুনি—"

সোনা আর কথা না বলে চলে যায়। দূর থেকেই কালুর মন্তব্য কানে আসে, "কোনদিন যদি শুনি—কি করবা তাহ'লে।"

মনে মনে আওড়ায় দাগী গুণ্ডা, "এখনও কালুর শক্তি কি তা' জান না।" সন্ধ্যাবেলা তাড়ি খেয়ে সোনার কথাটা ভেবে জোরে জোরে একাএকাই হাসে কালু—"মেয়ে মানুষের বেইজ্জতি নয় তো—বেইজ্জতি কি তবে পুরুষমানুষের করতে হ'বে।"

তাকে হাসতে দেখে আড্ডার আর সবাইও হাসতে থাকে। কুৎসিত হাসির বমি।

রাত ভ'রে হল্লা করে। বহুকাল আগের চুরি করা একটা হারমোনিয়াম বের করে এক মাতাল গায়েনের সামনে। টপ্পা গান শুরু হয় কালুর

ঘরে। জড়ানো গলায়—মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে কালু, "নাচনী-ওয়ালীকে বোলাও।"

"এইসেঁ চাঁদনি রাত—নাচনীওয়ালী বিনা কেইসে কাটাই।" বলেই কাঁদতে শুরু করে পূর্ণ-মাতাল একজন। সঙ্গে সঙ্গে গানের সুরে সুর মিলিয়ে কাঁদতে থাকে দলের সবাই।

তারপর একজন উঠে কোমর ঢুলিয়ে নাচের ভঙ্গিতে বলে, "নাচনী-ওয়ালী গোসা কিয়াথা ঐসেঁ ঘাবড়ানোকো কেয়া বাৎ—হামলোক নাচনী-ওয়ালী বন্ জায়গা।" বলেই নাচতে শুরু করে সে। কালু এক কোণায় বসে বসে তালিম দেয়, "বহুৎ আচ্ছা, নাচনীওয়ালী বকশিশ মিলেগা।" হারমোনিয়ামধারী তখন গানের সব কথা হারিয়ে ফেলে শুধু গাইছে—"নাচনীওয়ালী নেইত—উসঁসে কেয়া হুয়া,"

জঙ্গলের ভিতর থেকে কতকগুলি শেয়াল মাতাল গায়েনের সুরে সুর মিলিয়ে যেন ডেকে উঠে।

রাত বারোটা।

সোনা তখন বায়োস্কোপ দেখে ফিরছে হাঁশিয়াকে নিয়ে—। ...... দুপুর বেলা বাড়ী এসে দূর থেকে লক্ষ্য করে সোনা, হাঁশিয়া বাবুর বাড়ীর বারান্দায় বসে ঢেলোর বোনকে খেলা দিচ্ছে। তাকে দেখে যে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে, তাও লক্ষ্য করে। কিন্তু আজ নিজে থেকে ডাক দেয় সোনা হাঁশিয়াকে। "হাশিয়া এক কলসী জল এনে দিবি টিপ কল থেকে।" হাঁশিয়া এই সামান্য আদরের ডাকেই খুশি হয়ে উঠে। কলসী ভরে জল এনে রাখে সোনার ঘরে।

সোনা আবার বলে, "তোর থেকে কয়েকটা ঘুঁটে দিবি—বাড়ীতেই রান্না করবো আজ।"

হাঁশিয়া এক ঝুড়ি ঘুঁটে এনে রাখে দুয়ারে। সোনা চাল ধুতে ধুতে বলে, "কত করে বিক্রি করছিস।"

"পয়সা লাগবে না।" বলেই বেরিয়ে যেতে চায় হাঁশিয়া। সোনা বাধা দিয়ে বলে, "উনুনটা একটু ধরিয়ে দিয়ে যা না হাঁশিয়া, এত ক্ষিধে পেয়েছে।"

হাঁশিয়া ঢেলোর বোনকে একটা কৌটো দিয়ে বসিয়ে কয়লা ভেঙে নিয়ে আসে।

"উনুন জ্বলুক—তুমি যাও স্নান করে এস।"

সোনা একটু মিষ্টি হেসে বলে, "বায়স্কোপ দেখবি হাঁশিয়া। ঢেলোর মাকেও নিয়ে যাব।"

বায়স্কোপের নামে চোখদুটি জ্বলজ্বল করে উঠে হাঁশিয়ার। বহুদিন পর আবার সেই ছেলেমানুষী হাসি হাসে সে, "সত্যি দেখাবে ?"

"নয়টার 'শো'তে যাব। তুই ঢেলোর মাকে বলে রাখিস।"

রাত্রি বেলা হাঁশিয়াদের নিতে আসে সোনা। হাঁশিয়া জটার কাচা কাপড়ের পাঁজা থেকে বেছে সুন্দর একখানা বেগুনী-রংয়ের শাড়ি পরে চুলে তেল দিয়ে পাতা কেটে খোঁপা বেঁধেছে—একটি টিপও পরেছে 'টিপ পোকা' কেটে।

তাকিয়ে দেখে সোনা, হাঁশিয়াকে বড় সুন্দর লাগছে। ঢেলোকে নিয়ে রিকসায় উঠে বসে সে "কই ঢেলোর মা কই"।

"সে যাবে না—শরীর খারাপ।"

হাঁশিয়াকে নিয়ে রওয়ানা হয় সোনা বায়স্কোপ দেখতে। এক বড়-লোকের বাড়ীতে রেডিওতে ইংরাজী সুর বাজছে। বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে সে যন্ত্রসঙ্গীত। পিয়ানোর মিঠা আওয়াজ।

হাঁশিয়ার খুশিমাখা মনটা আরও ভরপূর হ'য়ে উঠে বিলিতী বাজনার মিষ্টি সুরে।

সিনেমা হল। শো আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে—দুরু দুরু বুকে অন্ধকার হলের ভিতরে ঢুকে যায় হাঁশিয়া।

পর্দার গায়ে ছবির পর ছবি ঘুরে চলেছে—। অবাক হ'য়ে যায় সে।

এই প্রথম তার বায়স্কোপ দেখা। পর্দার ছায়ায় প্রেমিক প্রেমিকা এসে বসেছে নদীর ধারে······দুইটি ফুল ছিঁড়ে ফেলেছে স্রোতের জলে। ফুল দুটি স্রোতের ঘূর্ণিতে ঘুরে ফিরে এসে আবার একত্রিত হয়।···

হাততালিতে মুখরিত হ'য়ে উঠে শহরতলীর লাষ্ট শো'র সিনেমা হল। হাঁশিয়া চমকে তাকায় চারদিকে। ছবির গল্পাংশ বুঝতে মনোযোগ না দিয়ে দর্শকদেরই বুঝতে চেষ্টা করে সে। এত ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছে কেন ওরা ?

ফেরার পথে সোনা খুশি-ভরা সুরে জিজ্ঞাসা করে, "কেমন দেখলা।"

এই চাঁদনি রাতে আর এই সিনেমা দেখা মন নিয়ে হাঁশিয়াকে 'তুই' বলে সম্বোধন করতে ইচ্ছে হয় না সোনার। ছবিতে দেখা প্রেমিক প্রেমিকার বিরহ আর মিলনের শিহরণ বয়ে চলেছে বাইশ বছরের উষ্ণ রক্তে। ভালবাসার প্রথম স্বাদ। বড় সুন্দর দেখে সে আজ হাঁশিয়াকে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে হাঁশিয়ার চোখে মুখে—খোঁপায়, কপালের সবুজ টিপটিতে। কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে পাঁচ বছরের ছেলেটা। দু পাশের বাড়ীর লোকজন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। সাইকেলের স্পীড্‌টা একটু কমিয়ে পিছন ফিরে তাকায় সোনা, হাঁশিয়াকে বলে সে ঠিক ছবিতে দেখা প্রেমিকের সুরে, "হাঁশিয়া, তোমাকে আমি বিয়ে করবো।" সোনার কথায় লজ্জা পেয়ে মুখ লুকাতে পারলে বাঁচে যেন হাঁশিয়া। সলজ্জ হাসি ফুটে উঠে সুরমা পরা চোখের কোণায়।

চারদিকে স্পষ্ট দিনের মতো চাঁদের আলো। হঠাৎ কাকে লক্ষ্য করে চমকে উঠে হাঁশিয়া।

কালুর তাড়ির আড্ডা থেকে ঘরে ফিরছে দুজন মাতাল। তে-রাস্তার মোড়ে মুখোমুখি চমকে দাঁড়ায় তারা হাঁশিয়াকে দেখে,—জড়ানো সুরে সুর করে গুন গুন করে, "চাঁদনি রাতে নাচনীওয়ালী······।" "তাড়াতাড়ি

চালাও।” ভয়ার্ত স্বরে বলে হাঁশিয়া “ওরা তোমার সেই দোস্তর সাঙ্গাত।” এক সন্ধ্যায়ই চিনে রেখেছে সে এই ভয়াল মুখগুলি।

ফুলস্পীডে প্যাডেল ঘুরিয়ে নেয় সোনা। মনে মনে আগুন হয়ে উঠেছে সে। হাঁশিয়ার ভীত মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলে “কালুকে এর শিক্ষা না দিয়ে ছাড়বো না আমি।”

স্টীমারের সিঁড়িটা টেনে ফেলে খালাসীরা খাড়া মাটির গায়ে। নীচে নদীতে ঢেউয়ের ধাক্কায় গায়ে গায়ে ঠোকর খেয়ে দুলছে নৌকাগুলি। ফল্গু রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে প্রাণভ'রে দেখছে বহুকাল পর তার গ্রামের পরিচিত ছবিখানি।

মধুবনের ছোট্ট স্টীমার স্টেশন—ছোট ছোট চেরাবাঁশের স্টেশন ঘর—ঘরের পেছন দিয়ে সরু পথ নারকেল আর সুপারি গাছের ছায়ায় আর যাত্রীদের জন্য অপেক্ষমান নৌকার সারি।

সেই পুরানো পরিচিত গ্রাম! তবু যেন এক নূতন আস্বাদের মত পরিতৃপ্ত স্বাদ গ্রহণ করছে ফল্গু অনুভূতির মৃদু আলোড়নে। সুস্নিগ্ধ জল ধারার মত জুড়িয়ে আসছে সারা মন।

সিঁড়ি বাঁধা হ'য়ে গিয়েছে—এক এক ক'রে নামছে যাত্রীরা। ফল্গুও সুটকেশটি হাতে নিয়ে নেমে আসে। পুরু কাবলীজুতোর তলায় উর্বর মাটির ছোঁওয়া যেন মায়ের স্নেহস্পর্শের মত। একবার প্রত্যাশাময় চোখজোড়া ঘুরিয়ে আনে চার দিকে। আবার মনে মনেই উত্তর দেয় নিজেকে—দীপু কেন আসবে। সেত চিঠি লিখে জানায়নি তার বাড়ী আসার কথা। এ সময়ে বাড়ী আসার কোন কথাও ছিল না। কিন্তু একদিন হঠাৎ মনে পড়লো মায়ের বহুদিন আগের এক চিঠির কথা—লিখেছিলেন, ফল্গুর বাবার শরীর ক্রমশই খারাপের দিকে চলেছে। মনে মনে বাবার বয়সটা একবার হিসেব করে। বুড়োমানুষ—কখন

কি হ'য়ে যায়। বার বার লিখছেন একবার বাড়ী যেতে। পরের দিনই টিকিট কিনে রওয়ানা হয় সে।

ঝোপ জঙ্গল বেতবনের ধার দিয়ে সরু পথ চলে গিয়েছে গ্রামের ভিতর। বহুকাল পর আবার অভ্যস্ত পায়ে পার হ'য়ে যায় ফল্গু এক-বাঁশের সাঁকোগুলি। খালে জল এখনও আছে—আর কিছুদিন পরই নৌকা চলা বন্ধ হ'য়ে যাবে। মাঝে মাঝে পরিচিত আঁটাল মাটির গন্ধ। সবে ভোর হ'য়েছে। চারদিকে অসংখ্য অচেনা গাছের বিস্তৃত শাখাপ্রশাখারা যেন বাহুবেষ্টন করে রেখেছে গ্রামখানিকে নিবিড় মমতায়। ফল্গুর মনের তলায় এক স্পষ্ট প্রসন্ন সুর বয়ে চলেছে—মনে মনে হিসেব করে, মা হয়তো এতক্ষণে সকালবেলার কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে। উঠোনে গোবর জল দেওয়া শেষ হ'য়েছে হয়তো—এবার গরুর ঘরের দুয়ার খোলা হ'চ্ছে···

প্রায় এসে পড়েছে। ঐত শ্মশান খোলা, তারপর মুন্সীবাড়ীর মাঠ। ফল্গু পায়ের গতি দ্রুত করে নেয়। শিব মন্দির—একশোবছরের পুরানো ভাঙা মন্দির। ঐ কি পশ্চিমের বাড়ীর ভিটা? ঐ পাগলা ঢেঁকি বনের তলায়। বহু স্মৃতির ছায়ায় পল্লবিত করুণ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চালাহীন ভিটাগুলি। এই জঙ্গলে ঢাকা উঠোন দিয়ে চলতে চলতে কেউ কোনদিন ভাবতেও পারবে না আর—এখানে এই পশ্চিমের বাড়ীর আধা অন্ধকার টিনের দোচালা, চৌচালা ঘরে কত গুপ্ত সমিতি কত গোপন বৈঠক বসতো নিশীথ রাতে, কত রোমাঞ্চময় বিপ্লব কাহিনী বোনা এই মাটির ভিটাগুলির উপর শিয়াল ঘুরে বেড়াবে দিনে দুপুরে!

বিপ্লবী দাদাদের প্রথম মন্ত্রশালা! ফল্গু কাতর চোখে দেখে, মনে হয়, ঐ বোবা ভিটাগুলিও তাকিয়ে আছে কাতর চোখে। যেন সেই ব্যর্থবিপ্লবের পরিণতিকে নিঃশব্দে বহন করছে গভীর বেদনায়, ওরাও।

ফল্গুর চিন্তাস্রোত কেটে যায় পরিচিত আঞ্চলিক দীর্ঘ উচ্চারণে—"ওমা ফল্গু আইছে দেখি। এই ভোরের ষ্টীমারে আইলা ?"

ফল্গু অপরিচিত চোখে তাকায়—তবু চোখে ভরে উঠেছে সহজাত আত্মীয়তার হাসি।

বিধবাটি বুঝতে পারে।—আনন্দ আর অভিযোগের সুর মিলিয়ে বলে, "চিনলা না। আমি পরাণের দিদি। আর চিনবাই বা কি কইরা। বাড়ীতে ত থাক না।" ফল্গুর পিছনে পিছনে সেও এগিয়ে আসে—ফল্গুর মায়ের এই ছেলে বাড়ীআসার আনন্দের অংশ গ্রহণ করতে।

"বাড়ীতে বুঝি চিঠিপত্র দিয়া আস নাই—না হইলে দীপু নিশ্চয়ই যাইত ইষ্টেশনে। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হইল কাইল, কইলনাত কিছু।"

"হঠাৎ ঠিক করলাম কিনা।"

"তা' ভালই করছো। বাড়ীর ছেলে তোমরা বাড়ী না আইলে কি ভাল লাগে আমাগো।"

হঠাৎ সুর পরিবর্তন হয়; অলক্ষ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—"কি হইয়া গেল দেশের।"

"এই যে গো দীপুর মা, দেখেন কে আইছে।"

"মা, ছোড়দা আসছে।" মুখ ধুতে ঘাটলায় নেমেছিল দীপক, লাফিয়ে উঠে আসে সে।

ফল্গুর মা রাতের এঁটো বাসনের পাঁজাটা তাড়াতাড়ি পুকুরের ধারে নামিয়ে এগিয়ে আসে।

ঘরের বারান্দা হ'তে শোনা যায় ফল্গুর বাবার আশান্বিত জিজ্ঞাসা—"কে, কে আসছে। ফল্গু আসছে ?"

"হু, ফল্গুই আইছে।" পরাণের দিদি আশ্বস্ত করতে চায় তাড়াতাড়ি রোগী মানুষটিকে।

"বেশ, বেশ হইছে। খুব ভাল হইছে। ফল্গু আসছে খুব ভাল

হইছে”, বলতে বলতে ধীরে অথচ সাধ্যানুযায়ী দ্রুত লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকেন ফল্গুর বাবা—বিশ্বেশ্বর। ফল্গু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় তার কাছে। হাত ধরে সাহায্য করে বাতগ্রস্ত পিতাকে।

বৃদ্ধের চোখেমুখে প্লাবিত হ'য়ে উঠেছে শিশুর মত হঠাৎ-উচ্ছ্বাসের ঔজ্জ্বল্য।

“বেশ, বেশ হইছে।”

তারপর এ অপ্রত্যাশিত আনন্দকে আর সংযমে রাখা সম্ভব হয় না দুর্বল স্নায়ুগুলির। গরু দেখার জন্য রাখা ছোট ছেলেটিকেই বারে বারে ডেকে বলতে থাকে—“মনা, এই মনা দেখ কে আসছে। ফল্গু— ফল্গু আসছে।” পূজোর ফুলের ভাগ নিতে আসে বামুনবাড়ীর অন্নদাদিদি। আরেকবার ভিতরের উত্তেজনাকে ব্যক্ত করার সুযোগ পায় যেন বিশ্বেশ্বর—“আমাগো ফল্গু আসছে ভোরের ষ্টীমারে।”

“কে—ফল্গু? কই সে।”

“ঐত ঘাটলায় গেছে মুখ হাত ধুইতে।” প্রতিবেশীনীদের এই প্রগাঢ় অভিনন্দনে অভিভূত না হ'য়ে পারে না ফল্গু। ওরা এত খুশি হয় তার বাড়ী আসায়! আর কোলকাতায় তার বহুকাজের ফাঁকে একবারওত মনে পড়ে না, এদের আলাদা আলাদা প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন সুখ দুঃখের কথা। এই নিরালা দেশের জনহীন ভিটার ছায়ায় ছায়ায় কেমন করে দিন কাটায় পরাণের দিদি—মনার ঠাকুরমা—অন্নদাদিদি কোনদিনত ভাবে নাই সে তার বিস্তৃত আন্দোলনের কোনও এক বিচ্ছিন্ন অবসরে।

আর তবু এরা এমন করে আত্মীয় করে নিয়েছে তাকে। এক মহা-আত্মীয়তার গাঁটছড়া পড়েছে যেন একাকীত্বের একাত্মবোধে। তাই কোনও এক বাড়ীতে সুখের আস্বাদে সব ঘরের মানুষেরাই সে আস্বাদন গ্রহণ করে। আপনজন প্রায় কারও বাড়ীতেই নেই—তাই

কারও বাড়ীতে আপনজন এলে তারা আপনজনের মতই মনে প্রাণে খুশি হ'য়ে উঠে অফুরন্ত আনন্দে।

সমস্ত রোমকূপ দিয়ে অনুভব করছে যেন বিশ্বেশ্বর পুত্রের গৃহাগমনের আগমনী সুরকে।

লাঠিতে ভর দিয়ে ঘাটলায় এসে বসে—ফল্গু কি গল্প করছে তার মায়ের কাছে, কান খাড়া করে শোনে বিশ্বেশ্বর। "ওগো, বাজারে যাইবো কে আজ।"

বিশ্বেশ্বর জানে, কে বাজারে যাবে আজ, তবু শুনতে ইচ্ছে করে। প্রমীলা ঘর থেকেই উত্তর দেয়, "ফল্গু বাড়ী আসছে, আজ আর বাজার করানর চিন্তা কি।"

দীপু ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, "আজ আর পড়তে ইচ্ছে করছে না।" প্রতিবেশী ছেলে বরুণও আজ আর এ বাড়ী ছাড়তে পারছে না, ফল্গুদা এসেছে। সেও ডেকে বলে, "ফল্গুদা, চলুন আপনার সঙ্গে বাজারে যাই।"

বাজার থেকে ফিরে এসে মাকে ডেকে বলে, "দেখো কত মাছ নিয়ে এলাম।" প্রমীলা রাঁধতে খাওয়াতে ভালবাসে জানে সে।

ফল্গু যেন বিশ্বাসও করতে পারছে না, এত সস্তা মাছ। "কি সস্তা মাছ এখানে। এক টাকায় দেখো কতগুলি পাবতা।" "আর একটা রুইও আনলাম।" প্রমীলা খুশি হ'য়ে বলে "ভাল করছিস। পাপতা মাছ পাতরি করি, কেমন। আর বরুণও যেন এখানেই খায় তোদের সাথে।"

বাড়ীর চারদিকে সারা বর্ষায় দারুণ জঙ্গল হ'য়ে গিয়েছে। মফির বাঁপকে রাখা হ'য়েছে জঙ্গল সাফ্ করার জন্য। জঙ্গলে নিড়ানি চালাতে চালাতে তাকিয়ে দেখে মাছগুলি। ক্ষুধাতুর চোখদু'টো জ্বল জ্বল করে উঠে। জঙ্গল পরিষ্কার করতে করতে বলে, "মাছদুধ মিললে কি হইব কিনবো কে। পয়সা আছে নাকি পাকীস্তানের মানুষের। কাজকর্ম

নাই পয়সা থাকবো কি। কাজ করাইত যারা, তারাত সব দেশ ছাইড়া চইলা গেছে।"

প্রমীলার মনটা খারাপ হ'য়ে যায়। চার পাশে অভুক্তের দল। এদের বাদ দিয়ে ভাল দ্রব্য কি ছেলের পাতে দেওয়া যায়। মফির বাপকে ডেকে বলে, "বুড়া, আমাদের ছোওয়া খাইবেন? তাই'লে আজ এইখানে খাইয়েন।"

কোটরাগত চোখদুটি চক্ চক্ করে উঠে মফির বাবার।

"না খাইয়া মইরা গেলাম—আর ছোওয়ার বিচার।" তারপর একটু সংকোচের সুরে বলে "কিন্তু সমাজের মাইনষেগো না ডরাইয়াত পারি না। গরীব মানুষ আমরা, যত চোট ত আমাগো উপরই। খাওয়ান যদি সন্ধ্যার পর আসুমখন। যত ডরত ঐ করিমুদ্দিরে। লীগের সেক্রেটারী সে আবার। মইরা গেলেও এক সন্ধ্যা খাইতে দিব না। এক ঘরে করনের সময়, তারই গলা আগে শোনা যায়। সারাটা বর্ষা কি ভাবে কাটাইছি, দেখছেনত। না খাইয়া না খাইয়া হাটতে চলতে পা কাপে।" প্রমীলা বলে দেয়, "আচ্ছা সন্ধ্যার পরই আসবেন।" অন্নদা ঠাকরুণ এসে বসেছে রান্নাঘরে কতগুলি কলমির ডগা নিয়ে। "দীপুর মা, এই কলমি ডুগা ফল্টুরে রাঁইধা দিও। আমার আর খাওয়ানের সাধ্যই বা কি?" প্রমীলা বাধা দিয়ে বলে, "প্রাণের থেইকা যে যা দেয়, তার সঙ্গে কি আর তুলনা আছে।"

প্রমীলা এক ফালি লাউ ও কিছু সীম দিয়ে দেয় বামুন ঠাকরুণকে "ওনার গাছের সীম—ডালে দিয়া খাইয়েন।"

খুশি উপছে উঠে লোল চর্মের ভাঁজে ভাঁজে—"শাকলতাপাতা দিয়া এই বুড়া বয়সে আর ভাত মুখে দিতে ইচ্ছা করে না।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অন্নদা ঠাকরুণ—"কে জানতো দেশের এমন দুর্দিন আসবো।"

প্রমীলা ফল্টুর জন্য পিঠে ভাজছে। কেমন একটু মায়া লাগে

প্রমীলার—অন্নদাঠাকরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে। "পরিষ্কার উনুনে ত ভাজি নাই—না হইলে একটু চাইখা দেখতে পারতেন।"

"তা' তুমি যখন করছো তখন কি আর পরিষ্কারের বাকি আছে। আর দুধের জিনিস অপবিত্র হয় না।" "তবে দেখবেন একটু চাইখা"? বলে কয়খানা পিঠে এনে সামনে দেয় পাথরের বাটিতে। "তোমার হাতের খাবার একি আর ঘিন্না করতে পারি।" প্রমীলা ভাবে, না খেয়ে খেয়ে মানুষের আজ কি অবস্থা চারদিকে। না হ'লে আচার নিষ্ঠার একচুল এদিক ওদিক হ'তে পারতো না এই সব বামুন ঠাকরুণদের। আজ তিনিও মাছের উনানের ভাজা পিঠে খেয়ে যাচ্ছেন কেমন তৃপ্তির সাথে!

বিকেলে চা খেতে রান্নাঘরে ঢুকে দেখে ফল্গু, তখনও উনুনের উপর ভাত ফুটছে। "একি আবার ভাত কার জন্য।"

"মফির বাপের ভাতটা রেঁধে রাখি। আরও কে কে আসে ঠিক কি। এক পাগলী ত বাধাই আছে—ফ্যান খেতে আসবেথন দেখিস একটু পরেই। বেহুলার গল্পে পড়েছিলাম এক মণ চাউলের ভাত খেয়েও নাকি পাতা চাটছিল চাঁদসদাগর। সে-রকমই ক্ষুধার শোষ এখানেও চারদিকে। মাছ দুধ মিললে কি হ'বে—চাউলেই ত শেষ ক'রে দিল—তের চোদ্দ আনা সের চাউল।" বলতে, বলতে পাগলী এসে হাজির একটা গামলা হাতে নিয়ে বির বির করতে করতে "পোলায় খাইব, মাইয়ায় খাইব, হক্কলেইত খাইব।" প্রমীলা গামলা ভর্তি ভাতের মাড় ঢেলে দেয় "আগে কিছুটা পেট ভরে নিক—পরে ভাত দেব চারটি।" পাগলী এক চুমুকে এক গামলা মাড় খেয়ে উঠে। ফল্গু একটু বিস্মিত হ'য়ে তাকায়।

প্রমীলা বলে, "ভাত চারটি বাড়ী নিয়ে যা।"

পাগলী বির বির করে, "পোলায় খাইব, মাইয়ায় খাইব হক্কলেইত খাইব।"

প্রমীলা হাসে, "ঠিকই। ভাত বাড়ী নিয়া গেলে ছেলেমেয়েরা খাইয়া ফেলবো—তোর ভাগে ত কিছুই থাকবো না। তা' তুই এখানে বইসাই খা তবে।"

মফি রান্না ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়, আমার এই তামাকের কল্কিটায় একটু আগুন দেন দেখি।"

প্রমীলা চা ঢালছে। "চা করতাছেন, আমারেও একটু চা দিয়েন।"

প্রমীলা আরও খানিকটা গুড়-জল বসায় হাড়িতে। চিনি পাওয়া যায় না পাকিস্তানে।

অনটনের সংসার প্রমীলারও। বড় ছেলে শরৎ মাসে পঞ্চাশটি টাকা পাঠায়। তার উপরই নির্ভর।

তার উপর চারদিকে যেন বুভুক্ষার ছায়া।

বিকেলবেলা বিশ্বেশ্বর ফন্তুকে নিয়ে তার নূতন তৈয়ারী রাস্তা দেখাতে যায় দক্ষিণের মাঠে।

"একটা রাস্তা বাঁধাইয়া দিলাম—ছেলেদের স্কুলে যাওয়ার যা অসুবিধা ছিল বর্ষায়।"

প্রমীলা উত্তর দেয়, "রাস্তা ত হ'ল কিন্তু স্কুলে যা'বে কে। আছে নাকি কেউ পাড়ায়।"

প্রমীলার রাগ, লাইফ ইনসিওররেন্সের পাওয়া টাকার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত এই রাস্তার পিছে ব্যয় করেছে বিশ্বেশ্বর।

বিশ্বেশ্বর স্ত্রীর কথায় জবাব দেয়, "যারা আছে, তারাই যা'বে।" বুক থেকে দীর্ঘ নিশ্বাস ঢেলে উঠে অলক্ষ্যে।

প্রমীলা হাসে, "তারা স্কুলে পড়লে ত স্কুলে যা'বে।" বিশ্বেশ্বর আর জবাব খুঁজে পায় না। দিশাহারা হ'য়ে উত্তর খোঁজে—ছেলে স্কুলে পাঠানর মত কেউই কি নেই গ্রামে। কেউই নেই। এখন স্কুলে যাবার রাস্তা বাঁধান হ'ল কিন্তু স্কুলে যাবার ছেলে নেই। আর এতকাল

কত কষ্ট করে পাড়ার ছেলেরা বর্ষার দিনে স্কুল করেছে। কোথায় গেল তারা। কোথায় গেল সে-সব দিন।

বিহ্বল আর্তদৃষ্টির সামনে খাঁ খাঁ করছে চারদিকে চালাহীন ভিটা-গুলি—জনহীন বনপ্রান্তর।

আবার হবে। আবার ছেলেরা সব দেশে ফিরে আসবে। এতকাল হিন্দু ছেলেরাই পড়তো। এখন হিন্দু মুসলমান দুইয়েরই ছেলেরা স্কুলে যাবে এ রাস্তা দিয়ে বই খাতা নিয়ে। তার বুকের রক্ত জল করা শেষ টাকায় বাঁধান রাস্তাটার দিকে আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিশ্বেশ্বর। বুকের ভিতরে স্তিমিত আশা ধুক ধুক করে।

রাত্রিতে ফল্গুর সাথে আলাপ করে প্রমীলা—"আর ত কোনও অসুবিধা নেই এখানে থাকতে। ওনারে ত এখন স্কুলের প্রেসীডেণ্ট করছে। একটু হাঁটতে পারলেই একটা দুটো ক্লাসও নিতে পারতেন। এখনও ত কত ছেলে এসে পড়া বুঝে যায় ওনার কাছ থেকে।

"কিন্তু একটা শুধু মস্ত অসুবিধা। ডাক্তার বৈদ্য নাই গ্রামে। একেবারেই নাই। অসুখ বিসুখ হ'লে অন্ধকার দেখা।" বিশ্বেশ্বর কান পেতে শোনে—তাকে মধুবন থেকে সরিয়ে নেবার পরামর্শ করছে নাকি মায়ে ছেলে।

মধুবন থেকে সরাতে পারবে না তাকে। না, কিছুতেই না। তার দীর্ঘ জীবনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে গ্রামের প্রতিটি ধূলিকণার সাথে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়—দীঘির জলে মাছের শব্দ, পঞ্চাশ বছর ধরে শোনা একই গ্রাম্য পাখীর ডাক—নমাজ ঘরের আজান—কাঁসারী বাড়ীর কাঁসা পিটানর শব্দ, সব শব্দ মিলিয়ে এক মধুর সংলাপে বাঁধা যেন সমস্ত মধুবন।

নিশ্চিন্ত হয় বিশ্বেশ্বর, না তাকে সরিয়ে নেবার ষড়যন্ত্র নয়। রাত্রিতে খাবার পর, বিছানায় বসে রাজনীতির কথা বলে বিশ্বেশ্বর, ফল্গু।

"এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কি কম আন্দোলন করেছি আমরাও আমাদের ছাত্র জীবনে। কার্জন সাহেব বিলেত থেকে ফিরে আসার সময়, লাল দীঘির ধারে প্ল্যাকার্ড নিয়ে সব সারি সারি দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা—'Don't divide Bengal !"

বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বের হয় বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর। "দেশটাকে একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেললো। যত বেশী টুকরো করবে, ততই বেশী সুবিধা শকুনদের ছোঁ মেরে নিতে। আর এই দল করেই আরও সর্বনাশ হ'ল দেশটার। কেবল দল আর দল। টুকরো টুকরো দল সব। আমাদের আমলেও ছিল। সুরেন ব্যানার্জীর দল, রবীঠাকুরের দল। পরে তার নাম হ'ল বিপিন পালের দল। মডারেট আর এক্স্ট্রিমিস্ট দল। নীতির পার্থক্য যত না—দলগত মোহ ছিল তার চতুর্গুণ। তখনকার ইংলিসম্যান পত্রিকা ত বলতোই—"Scratch a moderate, you will find an extremist."

বিশ্বেশ্বরের ভাঙা স্বরে পুরানো স্মৃতি ঝরে পড়ে। তার যৌবনের রাজনীতির ইতিহাস। ইতিহাসই মনে হয়।

ফল্গু পিতার মুখের দিকে তাকায়। এই বার্দ্ধক্যজড়িত লুপ্তস্মৃতি মানুষটিও একদিন তাদেরই মত পান্থীর মাঠে, কলেজ স্কোয়ারে, টাউন হলে, স্টার থিয়েটারে বক্তৃতা শোনার জন্য ছুটোছুটি করতেন, ভলান্টিয়ারী করতেন—দল করতেন।

বহুদিনের তালা-আঁটা স্মৃতির কোঠা খুলে গিয়েছে। বিশ্বেশ্বরের কথা আর ফুরোয় না। সেই পুরানো উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে ভাঙা স্বরে।

"বরিশাল কনফারেন্সের সময় কোলকাতা থেকে সুরেন্দ্র ব্যানার্জী, বিপিন পাল আসছেন। অশ্বিনী দত্ত ও বরিশালের স্থানীয় নেতারা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাথে চুক্তি করলেন—"বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়া হ'বে না।"

"সুরেন্দ্র বানার্জী ত ষ্টীমার থেকে নেমেই ক্ষেপে গেলেন এসংবাদ

শুনে—'অসম্ভব এচুক্তি মেনে নেওয়া।' পরদিন "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিয়েই চললো শোভাযাত্রা। পথেই সুরেন্দ্র ব্যানার্জী, বিপিন পাল গ্রেপ্তার হলেন। পুলিশ ভীষণ লাঠি চার্জ করলো ছাত্রদের উপর। মারতে মারতে ছাত্রদের খালে ফেলে দিল। বেআইনী ঘোষণা করে দিল কনফারেন্স। এ দিকে সভায় অপেক্ষা করছেন কৃষ্ণ মিত্র। এসংবাদ পৌঁছুতেই আগুন হ'য়ে গর্জে উঠলেন, 'কি, এত বড় অত্যাচার! আমরা সভা না করে এক পাও নড়ব না।'

বিশ্বেশ্বরের চোখের সামনে ভাসছে সেই অগ্নিমূর্তি। সেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর "কি, এত বড় অত্যাচার!"

সে একটা যুগ গিয়েছে। অগ্নিযুগ।

আজকালকার ছেলেদেরও তেজ কম নয়। সেই একই তেজ পুরুষানুক্রমে বয়ে চলেছে যুগে যুগে। বিশ্বেশ্বর গর্বিত চোখে তাকায় ছেলের মুখের দিকে। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেই একই প্রতিবাদ ওদেরও ধমনীতে। স্ফীত পেশীতে সেই একই বজ্রহুংকার "কি, এত বড় অত্যাচার!"

আজকের বংশপরিচয় তাই আর রক্তধারার নয়, প্রতিবাদের। এই রক্ততিলক, এই ত ওদের একমাত্র বংশপরিচয়।

•

দেখতে দেখতে যেন সাতটি দিন ফুরিয়ে গেল। ফল্গুর যাবার দিন আজ। ঘুম থেকে উঠেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠে প্রমীলার, ফল্গু আজই চলে যাবে দুপুরের ষ্টীমারে!

তাড়াতাড়ি রান্না বসায় প্রমীলা—ফল্গু কি কি ভালবাসতো ছোট বেলায়, সবই যেন খাইয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

সময় হ'য়ে আসে। মা বাবাকে প্রণাম করে রওয়ানা হয় ফল্গু। লাঠিতে ভর দিয়ে বিশ্বেশ্বরও আসে পিছু পিছু। প্রমীলাও হাঁটে

পিছে পিছে—ছেলেকে ছাড়তে আর চায় না মন। আকুলিত স্নেহের পীড়ন বুকের ভিতরে। একটা নালার কাছে এসে দাঁড়াতে হয় বিশ্বেশ্বরকে—এক বাঁশের সাঁকো। পার হ'বার সাধ্য নেই তার। করুণ চোখে বাতগ্রস্থ পায়ের দিকে তাকায়। আর যাওয়া সম্ভব নয়। এখান থেকেই বিদায় দিতে হ'বে।

মা বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ফল্গুর মনটায় মোচড় দিয়ে উঠে। মুখে বলে, "তোমরা এবার বাড়ী ফিরে যাও।" সাঁকো পার হ'য়ে যায় ফল্গু—ক্ষেতের পাশ দিয়ে নদীর দিকে হেঁ'টে চলে।

ক্ষেতের বাঁক ঘুরে বহুদূর থেকে তাকিয়ে দেখে ফল্গু, মা বাবা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন। করুণ আকুল দুটি নিশ্চল মূর্তি।

ঐ পিছুটানা কাতর দৃষ্টিপথের বহু বহু দূরে চলে যেতে হবে তাকে। হয়তো শীগগীর দেখা হ'বে না, হয়তো জীবনেই আর দেখা হ'বে না। ব্যথার ঝঙ্কার দিয়ে উঠে সবখানি মনে।

ষ্টীমার ঘাটে এসে দেখে, ষ্টীমার আসতে অনেক দেরী। সুটকেশটি নামিয়ে রেখে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে দু' ভাই। মফি এক নৌকার মাঝির কাছ থেকে একটু তামাক খাওয়ার আয়োজন করে।

হেমন্তের ক্লান্ত নদী নিস্তেজে বয়ে চলেছে দূর দিগন্তের দিকে। নদীর কিনারায় সুপারি গাছের সারি। নীচে শুকিয়ে যাওয়া পলিমাটির বুকে ধানকাটা গোড়াগুলি পড়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গোলাকৃত বিচালির স্তূপ।

চারদিকেই এক উদাসকরা গৈরিক মূর্তি। ফল্গুর দৃষ্টির বিষণ্ণতায় থেকে থেকে ভেসে উঠছে মা-বাবার অশ্রুগোপন করা কাতর মূর্তি দুটি।

ষ্টীমার ঘাটের সামনে এক পাঁজা কাঁসা পেতলের বাসন—বড় বড় ডেগ কলসী পরাত—চালান দেবার অপেক্ষায়। অদূরে এক মিঠাই-ওয়ালা মিষ্টির ভার নিয়ে অপেক্ষা করছে ষ্টীমারের জন্য।

ফল্গু বারে বারে তাকায় রাস্তার দিকে—বরুণের আসার কথা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বরুণ এসে পড়ে, হাতে একটা পত্রিকা। দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলে সে, "ফল্গুদা, মুকদেনের পতন।" আনন্দ ঠিকরে বের হ'চ্ছে চোখে মুখে।

"পতন নয়। মুক্তি বল।" বলে ফল্গু। তাড়াতাড়ি পত্রিকাটা খুলে ধরে। বড় বড় স্বর্ণ অক্ষরগুলি থেকে এক অপূর্ব দীপ্তি বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে যেন—এক মুহূর্তে মা-বাবার অশ্রুভেজা মুখ মিলিয়ে যায়। চোখের সামনে শুধু উজ্জ্বল সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়ছে হেমন্তের আকাশ থেকে—সোনালী আশার গুঞ্জন আকাশের ধূসর নীলিমায়।

ফল্গু টাকা বের করে, "রসগোল্লা কিনে আন দীপু—মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী জয়ের ভোজটা এই নদীর পারে বসেই হোক।"

দীপু রসগোল্লা কিনে ছুটে আসতে আসতে চেঁচিয়ে বলে, "ষ্টীমারের ভোঁ শোনা যাচ্ছে। ষ্টীমার এসে পড়লো।" "এখনও অনেক দেরি। নদীর বাঁকই ছাড়ে নাই।" মফি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, "ঐ যে দূরে চরের মাথায় নীলা নীলা ধূয়া দেখা যায়।"

খুশি ভরা চোখে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে দেখে ফল্গু, চরের শেষ মাথায় ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে ষ্টীমারের মাস্তুলটা।

বরুণ ডাকে মফিকে "আস দেখি, মফিভাই। বিপ্লবের জয় হোক।" বলে রসগোল্লা মুখে তুলে দেয়।

"ক্যান এই রসগোল্লা খাওয়াইল ফল্গুদা, জান। শোন তবে।" বরুণ উৎসাহের সাথে বুঝাতে শুরু করে, "তোমাগো মতই চাষীর দেশ ছিল চীন—".

ফল্গু প্রতীক্ষাকুল চোখে তাকিয়ে দেখে, পিছুটানকে ছিঁড়ে ছিঁড়েই যেন এগিয়ে আসছে ষ্টীমার। দ্বিতীয় বার ভোঁ পড়লো। যেন মহাসমুদ্রের আহ্বান ভেসে আসছে দিগন্তপ্রসারী ধানক্ষেতের উপর দিয়ে।

ঘরে বসে বিশ্বেশ্বর প্রমীলাও কান পেতে শোনে ষ্টীমারের ভোঁ। পাথর-চাপা বুকের ভিতরে এসে আঘাত করে বিষণ্ণ গম্ভীর বাঁশির আওয়াজ।

"ষ্টীমার এসে পড়লো গো" ব'লে লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে প্রমীলার কাছে এসে বসে বিশ্বেশ্বর।

রথী ও সাগরীর বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন হ'বে আজ সাগরীদের বাড়ীতে। পৃথ্বীকে যেতে বলেছে—সাক্ষী হ'তে হ'বে। সন্ধ্যা হ'তেই কুরীকে নিয়ে পৃথ্বী যায় সাগরীদের বাড়ী।

ঘরে ঢুকেই একটি নিপুণ হাতের রূপসজ্জা স্পর্শ করে মনকে যদিও চোখে পড়ে না বিশেষ কোনও আড়ম্বর। একমাত্র বিশেষত্ব আজ, ঘরের দেওয়ালে টাঙান একখানা গৃহশান্তির ছবি। ঘরের এক কোণায় বেশ কিছু রজনীগন্ধার স্তবকে স্তবকে মধুযামিনীর সমারোহ আর পূর্ণ চন্দ্রমার অজস্র আশীর্বাদ বাইরে সুনির্মল আকাশে। ঘরে একধারে একটি সুন্দর রংয়ের গালিচা বিছান অতিথিদের জন্য।

পৃথ্বী সমর্থনের চোখে তাকিয়ে বলে, "আর বাকি জিনিসগুলি কি হ'ল—বিছানা, সুটকেশ, রান্নার সস্প্যান?" সুমিত্রা উত্তর দেয়, "রোজকার রাতগুলি থেকে এ রাতটিকে একটু আলাদা করার চেষ্টা। তাই নীচের তলার মাসীমার ঘরে তারা সব একরাতের জন্য আশ্রয় নিয়েছে।" পৃথ্বী তাকিয়ে দেখে সাগরীকে আশীর্বাদমাখা চোখে—তার স্নেহাস্পদের জীবন সঙ্গিনীকে।

একমাত্র রক্তিমশ্রী ছাড়া আর কোনও আভরণ নেই। দু'গাছা লাল কাঁচের চুড়ি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হাত দু'খানার অনিন্দিত শোভা বর্দ্ধন করেছে।

আর সুমিত্রার শুভ্র শাড়িখানায় ও যেন স্নেহশীলা নারী মূর্তির শাশ্বত সৌন্দর্য মূর্তিমতী হ'য়ে উঠেছে। মুগ্ধ চোখে দেখে পৃথ্বী। মনে মনে ভাবে—রূপ ও রুচির সমন্বয়।

পৃথ্বী হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, "রথীটা এখনও আসছে না। ওর আর স্বভাবের ব্যতিক্রম হ'বে না কোন দিন।" বলতে বলতেই ঘরে ঢোকে রথী। পৃথ্বী তাকিয়ে দেখে বলে "এই মূর্তি নিয়ে বিয়ে করতে এসেছো। না হয় টোপর নাই পরলে, তবু চুল দাড়িগুলি কি—" "ঐ যাঃ, ভুল হ'য়ে গিয়েছে। ভেবেছিলাম আসার পথেই নাপিত আর ধোপার লোকাচার গুলি সেরে আসবো। আচ্ছা আর আধঘণ্টা সময় চাইছি।" "তোর উপর কোনও ভরসা করা যায় না। চল তবে আমিও যাই। হয় তো আবার কোনও বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বিয়ে করতে আসার কথাটাই ভুলে যাবে।" সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বলে, "রেজিষ্টার এলে বলবেন, বর এখনও পৌঁছায় নি।"

ওরা বেড়িয়ে গেলে সুমিত্রা ডাকে কুরীকে "কুমারী, এবার কিছু কাজ করতে হবে। মিষ্টি মুখের ব্যবস্থাটা সেরে রাখি তোমার দাদারা ফেরার আগেই।" কুরীর পুরো নাম কুমারী। পৃথ্বীর দেওয়া নাম।

কুমারীর সাথে অল্পদিনের পরিচয়। তবু এই অল্প দিনের ভিতরই খুব ভাল লাগে তার ও সুমিত্রাদিদের জীবনযাত্রার ধরণ।

মনে মনে কল্পনা করে কুরী তার দাদার সাথে সুমিত্রাদির বিয়ে হ'লে বেশ হ'ত।

সুমিত্রা নীচের তলার মাসীমাদের রান্নাঘরটাও চেয়ে নিয়েছে এক রাতের জন্য। রান্নাঘরে ঢুকে কুরী অবাক হয় আয়োজন দেখে। বিচিত্র নক্সা-আঁকা নারকেলের খাবার।

"এত সব খাবার কে বানালো ?"

"কেন ? আমাকে দেখেই বুঝি ভেবে রেখেছো একেবারে অকর্মণ্য।

পৃথ্বীরা ফিরে আসে ঘণ্টা খানিকের মধ্যে। সুন্দরপ্রকাশ আর ফল্গুও ঘরে ঢোকে। ফল্গু সাগরীকে বলে, "আমি কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণেই হাজির হ'লাম। সুন্দরপ্রকাশদার সাথে দেখা হ'ল—উনি রথীদার বিয়েতে আসছেন। আমিও অমনি পিছু ধরলাম। আর শীতাংশুদাকেও বলে এসেছি—রাস্তায় দেখা হ'ল তার সাথে।"

সুন্দরপ্রকাশ হেসে বলে, "শীতাংশুকে বলে আসার অর্থ কমপক্ষে তিরিশ জন কমরেড হাজির হ'বেন।" ফল্গু সায় দিয়ে বলে, "কমরেডদের বিয়েতে হাজির হ'তে ত আর উপহার দেবার দুশ্চিন্তা নেই—কাজেই তিরিশ কেন পঞ্চাশও হ'তে পাবে। কিন্তু সেজন্য ভাববার কি আছে পৃথ্বীদা থাকতে। বেশী কিছু নয়—দু'কাপ করে চা আর সামান্য একটু মিষ্টি মুখ—লেডিক্যানি, মাংসের সিঙ্গারা, সন্দেশ"—

"থাক আর ফর্দ বের করতে হ'বে না।"

"তা হ'লে এই পর্যন্ত ত রাজী। আর বড়দের জন্য কয়েক প্যাকেট, কি বল। টাকাটা বের কর। আমিই নিয়ে আসছি সব কিনে টিনে। তোমার কিছু ভাবতে হ'বে না।" তারপর সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বলে, "এ ত গেল বর পক্ষের, এবার কনের পক্ষের?"

"সেটা রান্নাঘরে গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখে এস" বলে কুরী। খুশির স্বর ফুটিয়ে বলে উঠে ফল্গু—"রান্নাঘরে কি ব্যাপার? লুচি মাংস? মাটন না চিকেন?"

সুমিত্রা হাসে। ঠাট্টার সুরে বলে, "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের যুগে এসেছো বরযাত্রী সেজে বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে? নাম কাটা যাবে শীগ্গীরই তোমার। একবার রিপোর্টটি পৌঁছলেই হ'ল।"

ফল্গু একটু ঘাবড়ে যাওয়া কপট সুরে বলে,

"আচ্ছা—তা'হলে শুধু চা-ই খাইও দু'কাপ করে সুমিত্রাদি। লুচি মাংস কিছু চাই না—দোহাই তবু নামটি যেন কাটা না যায়।"

শীতাংশু যথা সময়ে উপস্থিত হয়। তবে মাত্র পাঁচজন কমরেডকে নিয়ে আসতে পেরেছে। আফসোসের সুরে বলে সে, "আর কাউকেই বাড়ীতে পেলাম না।"

রথীর দিকে তাকিয়ে বলে, "তোমার কিন্তু এ মস্ত অন্যায়। এ রকম চুপি চুপি বিয়ে করতে আসা। বরযাত্রী হ'বার সৌভাগ্য ত কমরেড হ'বার যুগ হ'তে কপাল থেকে উঠেই গিয়েছে। আর বৌ-ই যখন হয় না এঁরা—তখন বৌ ভাতের নিমন্ত্রণের আশা ত নেই। তবু বিয়ের সাক্ষী হবার নিমন্ত্রণটাও ত করতে পারতে।"

"কজন সাক্ষী হ'বে। কোলকাতার সমস্ত কমরেড গুষ্টিত আর একটি বিয়ের সাক্ষী হ'তে পারে না।" হেসে উত্তর দেয় সুন্দরপ্রকাশ।

"পারবে না কেন? সবাই একটা করে সই করে এক ডিস যদি খাবার পাই ক্ষতি কি?"

রেজিষ্ট্রেশন হ'য়ে যায়।

রাত ঘন হ'য়ে আসে। জ্যোৎস্নার আস্তরণ বিছিয়েছে ছাদে পূর্ণিমার চাঁদ। সুমিত্রার প্রীতি মাখা চোখে শুভ কামনা ঝরে। বর বধূকে আশীর্বাদ জানায় অন্তরে।

কুরীর দিকে তাকিয়ে বলে, "এবার শ্রীমতী কুমারীকে যেজন্য ডাকা। গান শুনাতে হ'বে, একটি সুন্দর রাতের সম্মানে। রবীন্দ্রনাথকে বরবাদ করে নিশ্চয়ই রাখ নাই এ বয়সেই।" তারপর রথীর দিকে তাকিয়ে বলে, "এক রাতের জন্য তাঁর স্মরণ নেওয়া চলতে পারে, কি বল রথী?" কুরী সমর্থনের সুরে বলে, "কিন্তু আমি ত একা গাইতে পারি না। দাদাও করুক তা'হলে।"

পৃথ্বী লজ্জিত হ'য়ে বলে, "দূর বোকা মেয়ে। তুই একাই গা না—"

সুমিত্রা পৃথ্বীর দিকে তাকায়—গুণের সমঝদারের চোখে। মনে মনে বলে—"গানও জানেন মানুষটি।"

পৃথ্বী লক্ষ্য করে এ অনুরাগী দৃষ্টি।

মনে মনে বোঝে সুমিত্রা—তাদের সামনে গান করা সম্ভব নয়—পৃথ্বীর মত লাজুক মানুষের। তাই সহাস্যে বলে সে "কুরী, তোমার দাদা ছাড়াও এ বাড়ীতে গানের দোসর হবার মানুষ আছে। তুমি নির্ভয়ে শুরু কর।" কুরী আরম্ভ করে।…"আজি প্রাতে সূর্য উঠা সফল হোল কার।"

সুমিত্রা সুরে সুর মিলিয়ে টেনে নেয় গান।

অপূর্ব কণ্ঠস্বর। সম্মোহনের জাল যেন ছড়িয়ে পড়েছে শ্রোতাদের মনে।

গাইতে জানে সুমিত্রা—এ খবর জানতো না কেউই।

গান শেষ হ'লে রথী বলে "একজন মানুষের ভিতরে এত গুণ থাকলে সহ্য করা যায় না কিন্তু, সুমিত্রাদি।" তারপর কুরীর দিকে তাকিয়ে বলে "একখানা কোরাস হোক এবার—বিপ্লবের গান।"

সুন্দরপ্রকাশ হাসে—"বিয়ের রাতে বিপ্লবের গান?" "না কেন? বিপ্লব ছাড়া কি আর মধু রজনীর শান্তি আসতে পারে এ যুগে।"

"আচ্ছা তবে আরম্ভ কর, কুরী।" বলে, ফল্গুই আরম্ভ করে। নারী ও পুরুষ কণ্ঠের সমবেত বিপ্লব সঙ্গীত কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যায় মিলন রাত্রির মধুর দিগন্ত রেখায়, সদ্য পরিণীত দম্পতীর নির্ভীক আত্মার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝংকার লাগায় সে সুর—শাশ্বত মধুর মিলনের মহা আহ্বান।

সোনালী একটা রোদের রেখা এসে পড়েছে বিছানায়—সাগরী তাকিয়ে দেখে, রথী আগেই উঠেছে। বারান্দা থেকে ষ্টোভ ধরানর শব্দ আসছে। ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বসে সাগরী। রথী চায়ের জল বসিয়ে ঘরে ঢোকে, "কি, রাজকন্যার ঘুম ভাঙলো।"

"তোমার সাথে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। মাঝরাত থেকেই তোমার কাজ শুরু হয়।"

"মাঝ রাতই ত?" বলেই পূবের জানালাটা খুলে দেয় রথী। তীব্র এক ঝলক রোদ ঘরে ঢুকে চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে সাগরীর। রথী মুগ্ধ চোখে একবার তাকায় সাগরীর মুখের দিকে।

সাগরী মুখ ধুয়ে এসে বিছানাগুলি গুছিয়ে রাখে তাড়াতাড়ি।

এত বেলা হয়ে গিয়েছে। এখুনি ত দলবল সব এসে হাজির হ'বে। মনে মনে ভাবে।

একখানা মাত্র ঘর। রাতে শোবার ঘর। দিনে বসবার ঘর। একেবারে বৈঠকখানা। রথী চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখেছে। টি-পটে চা ভিজাতে ভিজাতেই দুয়ারে কড়া নড়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে হালকা সুরে অভিযোগও—"নাঃ, রথীটা বিয়ে করে একেবারে অসামাজিক হ'য়ে গেল। দুয়ারটা আবার বন্ধ করে না রাখলে চলে না।" বন্ধুটি ঘরে ঢুকে বলে, "টু মেকস্ কম্পেনী, থ্রি দি ক্রাউড্—আমরা কি এরই মধ্যে জনতার দলে পড়ে গেলাম?"

তারপর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে ছোট্ট একটি তারিফ করা শব্দ বের করে "হুঁ"।

"কি হ'ল।" রথী প্রশ্ন করে।

"দেখছিলাম ঘরের চেহারা পর্যন্ত বদলে গেছে। কিন্তু এত যে ঘর গুছাচ্ছ—ব্ল্যাক বিলের সৌজন্যে বেশীদিন নয় আর এ নীড় রচনা।" আধা-ঠাট্টা আধা-শঙ্কার সুরে বলে বন্ধুটি।

সাগরী চা ভর্তি একটা পেয়ালা এগিয়ে দেয় সামনে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে কাজের কথা শুরু করে। "এসেছিলাম একটা কাজে। শুনলাম তোমাদের কলেজে ইকনমিক্সের একজন প্রফেসার নেবে। একটা দরখাস্ত করেছি। তুমি প্রিন্সিপ্যালকে এক বলে রেখো।"

"আমি চেষ্টা করলে ত উল্টোই ফল হ'বে। কমিউনিষ্টের বন্ধু হওয়াটাও ত পাপ এখন। তুমি বরং ক্ষিতীন বাবুকে দিয়ে বলাও।" তারপর প্রশ্ন করে, "কেন? তোমার ওখানে কি হোল? ও-ত বেশ ভাল চাকরি।"

"চাকরি ত ভাল। কিন্তু ছাঁটাইয়ের যুগ পড়েছে জান না। শুনছি আমি ওয়েটিং লিষ্ট-এ ঝুলছি। কখন শমন এসে পড়ে ঠিক কি। পড়ে কি পড়বেই। এইজন্যই ত দুবছরেও কনফারম করেনি।"

"তোমাদের ত একটা ইউনিয়ানও ছিল। তার কি খবর।"

"শুধু ছিল না। ভাল ইউনিয়ানই ছিল। কিন্তু আজ সেখানে সহস্র ফাটল। তাই কর্তাদের পোয়া বার।

"আবার নূতন নিয়ম হয়েছে ছোট বাবুর ঘরে গিয়ে হাজিরার খাতায় নাম সই করতে হবে। অপমানের আর শেষ নেই। এদিকে অফিস টাইমে ট্রাম বাসের অবস্থা ত জানই—বাদুড়-ঝোলা হ'য়ে কোন মতে প্রাণ নিয়ে অফিসে ঢুকেই যদি আবার এক মিনিট দেরির জন্য কথা শুনতে হয়, মাথা ঠাণ্ডা থাকে? কলেজের কাজে মায়না কম হ'লেও এসব ঝামেলা নেই।"

"না, আজকাল আর সেদিন নেই। সর্বত্রই এক শাসন—এক রাজার এক শাসন।"

উঠে পরে বন্ধুটি—"চলি আজ। টিউসনির খোঁজ পেলে জানিও। এক চাকরির টাকায় ত আর সংসার চলতে চায় না।"

এক চাকরির টাকায় যে সংসার চালান কি কঠিন রথীও একটু আধটু টের পেতে শুরু করেছে। স্বামী স্ত্রী দুজনে চাকরি করে—মাত্র দুজন মানুষ—তাও দস্তুর মত হিসেব করেই চালাতে হ'চ্ছে সংসার। বন্ধুটি চলে গেলে দুজনে মিলে সংসারের কাজ শুরু করে দেয়—রথী নীচের

কলতলা থেকে জল নিয়ে আসে, সাগরী চাল ডাল ধুয়ে নেয়। রথী বাজারের থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কাছেই বাজার।

সাগরী মনে মনে অবাক হ'য়ে ভাবে রথীর কথা। একটি মানুষ কেমন করে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাকে। সাথে সাথেই নাড়া দেয় মনে রথীর বন্ধুর কথাটা—"বেশী দিন নয় আর এ নীড় রচনা।" বেশী দিন নয়, জানে তারা দু'জনেই। জানে বলেই এক মুহূর্ত অবসর নেই তাদের।

ইকমিক কুকারে ভাত ডাল ফুটতে থাকে—দু'জনে কাগজ কলম নিয়ে বসে।

"নোটস অব লেসেন্স" লিখতে বসে সাগরী। রথী নিয়ে বসে টেষ্ট পরীক্ষার খাতার গাদা।—কলেজের চাকরির সব চাইতে বিরক্তিকব কাজ।

টিফিনের সময় সাগরী সোজা চলে আসে বোর্ডিং-এ নমিতার ঘরে। এসেই বিছানাটার উপর শুয়ে পড়ে। "উ, যা ঘুম পেয়েছে। আজ আবার একটা অফ্ পিরিয়ড নেই।"

কাল সারারাত বসে একটা রিপোর্ট ড্রাফট করেছে রথী আর সে।

হাত ঘড়িটায় চোখ বুলায় করুণভাবে—মাত্র তিরিশ মিনিটের 'রিসেস্'।

পাশের খাটে বসে "নোটস অফ্ লেসেন্স"-এর খাতায় দ্রুত কলম চালাচ্ছে সিপ্রা। টিফিনের পরের ক্লাসগুলির নোটস্ লেখা হয় নি। খিটখিটে মেজাজের হেড মিসট্রেস—সুপ্রীতি দি। এত কম বয়সেও মানুষ এত তিক্ত প্রকৃতির হয় কি করে ভাবে সিপ্রা। আবার একরাশ খাতা দেখাও বাকী সেকেণ্ড ক্লাসের। একটা মানুষের ক্ষমতারও ত সীমা

থাকে। কিন্তু পান থেকে চুন খসলেই বলবে কম্যুনিষ্ট টিচাররা কেবলি ফাঁকি দেয়।

কিন্তু তারা ফাঁকি দেয় না বলেই ত পেরে উঠে না এতগুলি ক্লাসে ঠিক ভাবে পড়াতে।

"আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। প্রথম বেল পড়লেই ডেকে দিও।" জড়ান স্বরে বলে সাগরী। কিন্তু চোখ বুজতে না বুজতেই ঝড়ের মত ঘরে ঢোকে চন্দনা—"উঃ, যা ক্ষিধে পেয়েছে। খালি পেটে আর কত চেঁচান যায় বল ত। আর এবারকার ক্লাস ফোরটা যা দুরন্ত। কেবল বলবে—জল খেতে যাব, বাইরে যাব।"

"আঃ" ঘুমজড়ান স্বরে মৃদু বিরক্তি জানায় সাগরী "কি যে বক বক করছিস চন্দনা। একটু যদি ঘুমুতে দিবি।"

"ঘুমাবার এই সময় কি না। রাত্রিতে কর কি।"

"রাত্রিতে কি করে ওকে দেখেও বুঝতে পারছো না।" বিবাহিত শিক্ষয়িত্রী একজন উত্তরটা না দিয়ে পারে না।

"নাঃ, কার সাধ্যি যে একটু চোখ বোঁজে। উঠেই বসি। বল, কি করতে হবে।"

"বিশেষ কিছুই না, কয়েক আনা পয়সা বের করে তোমাদের রাজুকে ডেকে ডালমুট আনাও।"

"এই জন্য আমার ঘুমটা না ভাঙলে চলতো না। পর পর চারটে ক্লাস নিতে হ'বে এখন।"

রামু এক ঠোঙা চিনেবাদাম দিয়ে যায়—ডালমুট নেই। উচ্ছ্বসিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠে চন্দনা—

"That will do, three cheers for our সাগরী দি।"

চিনেবাদাম খাওয়া শেষ না হতেই স্কুলের ঘণ্টা পড়ে যায়।

নন্দিতা ক্লাসে যেতে যেতে সাগরীকে ডেকে বলে, "ফ্র্যাকসন মিটিং

ডাকা হ'য়েছে তোমাদের বাড়ীতে। টোকেন স্ট্রাইক ডাকা হ'চ্ছে একমাস পর। যারাই স্ট্রাইকের বিরুদ্ধে মত দেবে—তারাই আমাদের বিরুদ্ধে ধরে নিতে হ'বে।" "তাহ'লে আর মতামত জানাতে বলার অর্থ কি।" ক্লাসে ঢুকে পড়ে নন্দিতা—হেড্‌মিসট্রেস আসছে পাশের ঘরে ক্লাস নিতে।

মৃদুস্বরে বলে যায় নন্দিতা "পরে কথা হ'বে।" ক্লাসে 'টাস্‌ক্‌' দিয়ে কতকগুলি পুরানো 'টাস্‌ক্‌' 'কারেকসন' নিয়ে বসে সাগরী। কিন্তু মন কিছুতেই গুছিয়ে আনতে পারে না। বারে বারেই নাড়া দিচ্ছে নন্দিতার কথাটা "যারাই স্ট্রাইকের বিরুদ্ধে তাদেরই আমাদের শত্রু বলে ধরে নিতে হবে।"

শত্রু মিত্রের সীমানা রেখাটা ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। দো-মনাদের মুখোশ ভাঙার দিন এগিয়ে আসছে।

কিন্তু রথীরাও ত মনে মনে সমর্থন করে না এত ঘন ঘন স্ট্রাইক। শত্রু বলে ধরে নিতে হ'বে কি তাকেও। চিন্তাস্রোত হঠাৎ কেটে যায় —ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে।

"উমা, শেষ হয়নি এখনও" এগিয়ে যায় সাগরী খাতা নিতে।

এখনও পর পর তিনটা ক্লাস।

মাঠ পেরিয়ে ফোরথ ক্লাসের দিকে চলে যায় সে—ইতিহাসের ধারা বোঝাবার কথা আজ এই ক্লাসে।

এক ঘুমের পর ঘুম ভেঙে যায় সাগরীর। নিদ্রালু চোখে তাকিয়ে দেখে, রথীর পাশেই শুয়ে রয়েছে সে। নিরাপত্তার প্রগাঢ় অঙ্গীকারময় বলিষ্ঠ বক্ষের উত্তাপ। রথী, তারই রথীর দেহের উত্তাপ অনুভব করছে সে তার সমগ্র হৃদয়ের চেতনা নিয়ে, সমগ্র দেহ-চেতনা দিয়ে। মদির প্রিয়স্পর্শানুভূতি।

এক আবেশময় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রেমাকুলহৃদয়ে—মধুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি—নারীদেহের প্রতি অঙ্গে, কটিদেশে, স্তনাগ্রশিহরণে।

বাইরে জ্যোৎস্নাময় আকাশে প্রকৃতির সহচরী হৈমন্তিক পূর্ণ চন্দ্রমা। নিরাবরণা নগ্ন শশী ঐন্দ্রজালিক জ্যোতির বাণ ছুঁড়ে চলেছে যেন নারীরূপমুগ্ধ পুরুষের বলিষ্ঠ সংযমে।

সন্তান কামনার মধুর আত্মপ্রকাশ রোমাঞ্চিত নারী চেতনায়—রথীর সন্তানকে গর্ভোষ্ণ উত্তাপ দিয়ে সৃষ্টি করতে উন্মুখ তার নারীমন।

কিন্তু দিনের সংবাদপত্রের প্রথম পঙতিগুলি ভেসে উঠে মনের পর্দায়। এক মুহূর্তে সচেতন হ'য়ে উঠে দু'জনেই, সমাজ চেতনার সতর্ক প্রহরীর ইঙ্গিতে। দূর সাগর পারের এক অশুভ-ঘোষণা স্তনিত হ'য়ে উঠছে মহারাত্রির বুকে। হৃদয়ের স্খলিত বাসনা সংযত করে প্রথর পরিখাপ্রান্তে সরে যায় সাগরী। সন্তান বহন করবার সময় এখনও আসে নাই তাদের জীবনে। দেরী আছে, আরও বহু দেরী। তার আগে এ প্রথম রাত্রির কামনার শিশুদের খেলাঘরকে নিরাপদ করতে হ'বে দৃঢ় বাহুর মিলিত অঙ্গীকার দিয়ে।

"তপস্যা ভাঙার দিন এ নয়। শিশু কামদেবতার ভস্মস্তূপের উপর এগিয়ে চল, রথী, এগিয়ে চল সাগরী—" সংগ্রামী আত্মারা বলে উঠে যেন, "তারপর নূতন যুগের সন্ধিক্ষণে নবজীবনের সুর দিয়ে মধুময় করে তুলো, তোমাদের কামনালুকান এই রূপালী রাত্রিগুলিকে। কিন্তু আজ এ রাত তোমাদের জন্য নয়।"

উঠে বসে সাগরী। ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছে। চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে আধা-পড়া পত্রিকার পাতা। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। "আমাকে ডেকে দাওনি কেন", নিজের শয্যার দিকে তাকিয়ে বলে সাগরী, "মশারীও টানিয়ে নেইনি। এত ঘুমও বেড়েছে।"

"এত রাতে আর মশারী টানানর হাঙ্গামা করতে হ'বে না। এখানেই শোও," বলে রথী।

প্রতিশ্রুতি আঁকা মুখখানার দিকে তাকায় একবার সাগরী তারপর শুয়ে পড়ে পাশে। যেন এক সংগ্রামী সৈনিকের পার্শ্বে রাত্রির বিশ্রাম শয্যা গ্রহণ করেছে তারই এক সংগ্রামী সাথী।

দৃঢ়সংকল্পময় হাতে হাতখানা চেপে ধরে একটু, প্রেমার্ত হাতের উত্তাপ অনুভূত হয় মনে মনে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে দু'জনে।

আকাশে পরাজিত চাঁদ ম্লান হ'য়ে আসে ধীরে ধীরে।

এসপ্লানেডে এসে বাস থেকে নেমে পড়ে পৃথ্বী—ভোরবেলার সুন্দর রোদ লেগে রয়েছে গড়ের মাঠের বুকে—প্রতিটি ঘাসের মাথায়। শীতের রোদ। কুমারী মেয়ের লাজুক চাহনির মতই কমনীয় রোদ। ঘুমভাঙা নগরীর কোলাহল শুরু হ'য়ে গিয়েছে। চতুর্দিকের কোলাহলের ভিতরেও একটি মহাসঙ্গীতের সুরই ঘিরে রয়েছে পৃথ্বীর চার পাশে—চীন আজ মুক্ত। ভোরের কাগজের স্বর্ণাক্ষরগুলি যেন রেণু রেণু হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ছে ঐ উন্মুক্ত উদার আকাশের প্রতিটি রৌদ্র কণিকার গায়ে। এক অপূর্ব জীবনানুভূতি!

তিরিশ বছরের সংগ্রামের পর চীন আজ মুক্ত। সংগ্রামী চীন, মুক্তচীনের উদাত্ত ভেরী বেজে উঠেছে যেন দিকে দিকে। তাই কি এত সুন্দর, এত দীপ্ত লাগছে আজ প্রতিটি তুচ্ছ বস্তুও। পরিচিত মুখ খুঁজছে পৃথ্বী—কমরেডদের মুখ। এ আনন্দাবেগকে প্রকাশ না করে থাকা যায় না। কিছুদূরে কাকে লক্ষ্য করে দেখে পৃথ্বী—বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুমিত্রা না?

এগিয়ে আসে পৃথ্বী। হাসি মুখে প্রসন্ন অভ্যর্থনা জানায়, "মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"

"তাই ত ভাবছি—এবার ত আমাদের দিন আসছে।" একই সুরে

জবাব দেয় সুমিত্রা। চোখেমুখে ছাপিয়ে উঠেছে তারও অফুরন্ত আনন্দ। পৃথ্বী বলে, "চলুন একটু কফি খাওয়া যাক। মুক্তচীনের অনারে প্রথম নিমন্ত্রিত হ'ন আপনিই। রোববারে নিশ্চয়ই টিউসনি নেই।"

সুমিত্রা মৃদু একটু সংকোচের সাথে রাজী হয়। যখন তখন রেষ্টু-রেণ্টে ঢোকার ব্যাপারে খুব সপ্রতিভ নয় সে।

সুমিত্রা বলে, "টিউসনি নেই বলেই রোববারে কাজ বেড়ে যায় পাঁচগুণ। অন্ধকার ভোরে উঠে বেরিয়েছি। 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের' শেষ নেই। শোহনলালের যুগে বাবুগিরি নাকি যথেষ্ট করা হ'য়েছে। এখন সত্যিকারের কাজ চাই।"

অলিগলি ঘুরিয়ে এক পাঞ্জাবী সরাইখানায় ঢোকে পৃথ্বী। পরিচিত দোকানদার। খুশি-ঝরা চোখে প্রাতঃনমস্কার জানায়—"চীন ত হো গিয়া।" "সেজন্যই ত এলাম আপনার এখানে মুক্তচীনের অনারে কফি পান করতে।"

"কফি আর-আর কি খাবেন বলুন।" সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞেস করে পৃথ্বী।

সুমিত্রা ভিতরে ভিতরে একটু রাঙিয়ে উঠে। বাইরে কিছু প্রকাশ না করে বলে, "এসব ত অপরিচিত ব্যাপার আমার কাছে। আপনিই বরং ঠিক করুন।"

তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয় সে।

ঠাট্টার সুরে বলে "সত্যসন্ধানী পত্রিকার কারটুনগুলি দেখেছেন ?

নূতন বরণমালা হাতে দাঁড়িয়েছে ট্রুমান নূতন চিয়াংবধূকে বরণ করতে।" "নূতন চিয়াংবধূটিকে ত ঠিক চিনেছে সত্যসন্ধ্যানী পত্রিকা। কিন্তু সাথে সাথে তার উপরও যে রক্তচক্ষুর শমন হাজির হ'য়েছে—জানেন নিশ্চয়।"

"জানতাম না, তবে আশংকা করছিলাম। কদিন ধরে যা কড়া সম্পাদকীয় লিখছে ওরা। মনে হয় খুবই সচেতন।"

"সচেতন মনে হ'বে না কেন। সম্পাদকীয়ের কলমটি কার হাতে জানেন ত।"

"কলম যার হাতেই থাক না কেন—অনেকেই ত শেষপর্যন্ত আর মাথা খাড়া রাখতে পারেন না। এরই মধ্যেই ত বহু সপ্তরথী মাথা কাত করে ফেলেছেন।"

সুমিত্রা রাস্তা থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

পৃথ্বী চলে আসে "স্বাগতমে।" শিবশম্ভুবাবুর সাথে দেখা হয় সেখানে। পৃথ্বীকে দেখে বলে উঠে শিবশম্ভুবাবু, "যাক্ ভালই হোল তোমার সাথে দেখা হ'য়ে। আমি ভাবছিলাম তোমার বাড়ীতেই যাব। সাংঘাতিক খবর সব ফাঁস হ'য়ে গিয়েছে। কুমারশংকরের নামে ত দারুণ অভিযোগ। সে নাকি বিস্তর টাকা আত্মসাৎ করেছে পার্টির। তাছাড়া পুলিসের সাথেও নাকি তার যোগাযোগ রয়েছে। কি ভীষণ কথা বল দেখি। আমরা ত কল্পনাও করতে পারতাম না কোন কালে এমন কাণ্ড।'

পৃথ্বীর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে যায় শিববাবু। "বিশ্বাস করতে পারছো না বুঝি।"

"মিথ্যা কথা কি কখনও বিশ্বাস করা চলে।" গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয় পৃথ্বী "কুমারশংকরের নামে—এ অভিযোগ আমি কেন, কেউই বিশ্বাস করবে না।"

"ভুল করছো, পৃথ্বী। অভিযোগ সত্যি কি মিথ্যা সে প্রশ্নই উঠে না। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হ'বে পার্টির উপর। পার্টি থেকেই যখন এ অভিযোগ এসেছে, তখন আমাদের তা' মেনে নেওয়াই উচিত। আর শুধু বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়। তাকে সোশ্যাল

বয়কট করার নির্দেশ এসেছে পার্টি সভ্যদের প্রতি। তুমি দেখোনি বুঝি এখনও। আমাদের কাগজেই ত বের হ'য়েছে।"

"প্রমাণ কিছু দেখিয়েছে।"

"তা কি আর প্রকাশ্যভাবে জানান যাবে! নিশ্চয়ই প্রমাণ পেয়েছে।"

"ভুলও ত করতে পারে।"

"ভুল? একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে পার—যে পার্টি ভুল করে কোনও একসপেলড করেছে। এ পার্টি অত ভুল করে না।"

পৃথ্বী উত্তর দেয়, "একেবারে নিজের চোখে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না।"

"বিশ্বাস করা না করা তোমার নিজের ব্যাপার। কিন্তু এসব কথা আর কোথায়ও বোল না। তোমার এ উক্তি জানাজানি হ'য়ে গেলে তোমাকেও হয়তো সন্দেহ করবে।"

পৃথ্বী কঠিন দৃষ্টি দিয়ে একবার তাকায় শিবশম্ভুবাবুর দিকে।

সকালবেলার সুন্দর সুর টুকু একেবারে ছিঁড়ে যায় মন থেকে। ক্রমশই দুশ্চিন্তা জট পাকাতে থাকে—'কি ব্যাপার খোঁজ নেওয়া দরকার—কুমারশংকরের কাছ থেকেই।"

আবার বাসে উঠে পৃথ্বী।

কুমারশংকরের বাড়ীর উপরে উঠতে উঠতে লক্ষ্য করে, প্রবালদের ঘরটা খালি। জিনিসপত্রও নেই। প্রবাল ও আরও দুইটি ছাত্র-কমরেড কুমারশংকরের বাড়ীতে থেকে কলেজে পড়তো।

কুমারশংকরকে দেখে জিজ্ঞাসা করে, পৃথ্বী, "প্রবালদের ঘরটা খালি দেখছি।"

"সোস্যাল বয়কট।" গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয় কুমারশংকর।

"এ বাড়ীতে এলেন যে, খবর সব শুনেছেন ত।" শ্লেষার্ত স্বরে প্রশ্ন করে কুমারশংকর।

পৃথ্বী স্মিত হাস্যে বলে, "শুনলেই ত আর বিশ্বাস করা যায় না সব কথা। এ সবের ফল যে কোথায় দাঁড়াবে ভাবতে পারছি না।" গাঢ় স্বরে বলে পৃথ্বী।

কুমারশংকর যেন আজ আর এতটুকু আন্তরিকতাও আশা করে না কমরেডদের কাছে। পৃথ্বীর হাতখানা চেপে ধরে। কিন্তু কথা বলতে পারে না। আহত অভিমানে বুক ভ'রে উঠেছে—তার সততার এই অপব্যাখ্যায়। চোখের পাতা ভিজে উঠে অভিমানী বেদনায়।

পৃথ্বী বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। ব্যথিত স্বরে বলে, "এর প্রতিবাদ নিশ্চয়ই জানাবে কমরেডরা।"

"প্রতিবাদ জানাবে!" তিক্তস্বরে বলে কুমারশংকর "এ বাড়ীতে পা দিতে পর্যন্ত সাহসে কুলাচ্ছে না। কাওয়ার্ড সব।"

"কাওয়ার্ড নয়" মনে মনে বলে পৃথ্বী। পার্টির প্রতি অন্ধ মমতা। এক নূতন সম্ভাবনার রঙ্গিন নেশায় আচ্ছন্ন আজ দীর্ঘদিনের আশাতুর মন। তাই তারা সত্য মিথ্যা সব কিছু সেই নেশাচ্ছন্ন চোখেই দেখছে আজ।

ছুটির ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথেই টিচাররা প্রায় সবাই বাড়ী চলে গিয়েছে। শুধু সাগরীরা কয়জন কমনরুমটি দখল করে বসেছে আর নিভাদি বৃষ্টির জন্য আটকা পড়ে গিয়েছেন। সাগরী উঠে গিয়ে গরম সিঙ্গারা আর চায়ের ফরমাশ দিয়ে আসে স্কুলের ঝিয়ের কাছে।

নিভাদি খুশি হ'য়ে উঠে—এই "মেজমেজে" দিনে চা পেলে মন্দ হয় না। প্রসন্ন মেজাজের মেয়ে সাগরী। দিল খোলসা—হাতও খোলসা।

কিন্তু বিয়ের পরও চাকরি করছে কেন, এ নিয়ে মৃদু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল বয়স্কা শিক্ষয়িত্রীদের মহলে।

"বাসর ঘর থেকে সোজা আবার চাকরির ঘানি কাঁধে তুলে নিলে সাগরী। এখনও যে বিয়ের গন্ধ ছাড়েনি গা থেকে।" একটু রসিকতার সুর মাখিয়ে বলে নিভাদি—এই স্কুলের তিরিশ বছরের পুরানো দিদিমনি। কোনও আদর্শের দৃঢ় আশ্রয় নেই তার জীবনে, তাই জীবনের একঘেয়েমীটাই তীব্র হ'য়ে ফুটে উঠেছে চোখেমুখে।

সাগরী বয়স্কা শিক্ষয়িত্রীর প্রাপ্য সম্মান ক্ষুণ্ন-না-করা সুরে জবাব দেয় হাসিমুখে, "বাসর থেকে সোজা রান্নাঘরের ঘানি কাঁধে তোলার চাইতে আপনাদের সঙ্গ ধরাটাই পছন্দসই মনে করলাম।"

"তোমার একথা সাজে না। তোমার ত অনুপযুক্ত ছেলের সাথে বিয়ে হয়নি। রথীর মত উপযুক্ত ছেলেও তোমার একার ভার বইতে পারতো না ?"

"ভার জিনিসটা ভারই। সেটা একারই হোক আর বহুরই হোক। কারও ভার হ'য়ে যা'তে না উঠি সেজন্যই ত এই আপনাদের পথ ধরেছি।"

"তারপর ছেলেপুলে হ'লে।"

নববিবাহিতা সাগরী। কুমারীর লজ্জা ভাঙে নাই এখনও। লাল হ'য়ে উঠে সে বয়স্কা নিভাদির এই অসংকোচ প্রশ্নে। তবু নিজেকে সামলে নিয়েই জবাব দেয় অপরাজিত সুরে, "তখন না হয় ছুটি নেব দু'চার মাসের জন্য।"

"দু'চার মাসই বটে।" তিক্ত অভিজ্ঞতার অবসাদ জড়ানো সুরে ঠাট্টা করে নিভাদি।

"না হয় দু'চার বছরের জন্য। কিন্তু সেটা শুধু ছুটীই নেওয়া। একেবারে গোত্রান্তর নয়।"

"তারপর একটিকে বড় করতে করতেই যদি আরেকটি আসে।"

"তাহ'লে স্কুলের চাকরি ছেড়ে না হয় ঘরে বসেই যা পারি তাই করবো। অনুবাদ করা কিংবা মাসিক কাগজে লেখা, না হয়তো পাড়ার ছেলেমেয়েদের পড়াবো। তাও যদি না পারি, সূচ সূতোর কাজ, উলবোনা—এসব করবো।"

নিভাদি তবু পরাস্ত হ'বে না, "তা হ'লে ত ঘুরে ফিরে সেই পুরানো নিয়মকেই মেনে নিলে। রান্নাঘরে না হোক ঘরেই ত ঢুকলে। দু'দিন আগে আর পরে।"

"কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ত ঠিকই রইল। আমার যোগ্যতা অনুযায়ী রোজগার করা—তার ত ব্যতিক্রম হ'ল না।"

নিভাদি হঠাৎ অন্য সুরে আক্রমণ করে, "আসলে কম্যুনিজম ঢুকেছে মাথায় তাই। কি যে সব হাওয়া এসেছে রাশিয়া থেকে। ঘর সংসারে আর কারও মন নেই। আর স্কুলটাও হয়েছে কম্যুনিষ্টদের ঘাঁটি। আর মেয়েগুলির কি পড়ায় মন আছে। কথায় কথায় স্ট্রাইক—এত স্ট্রাইক করলে লেখাপড়া করবে কখন।"

সাগরী উত্তর দেয় না। সে জানে, তর্ক তুলে নিভাদিকে ঘায়েল করা যেতে পারে, কিন্তু কাছে টানা যাবে না। জীবনের পূর্ণতায় মস্ত বড় একটা খাদ পড়ে রয়েছে, সে খাদকে পূর্ণ করার সহজ পথটি চোখে পড়েনি এতকাল। তাই আজ সহজ পথে চলতে শুরু করে যারা তাদের পথকে স্বীকার করার অর্থ নিজেদের এতকালের নিবুর্দ্ধিতাকেই বড় করে তোলা। ছাত্রীদের পথ দেখিয়েই চলেছে নিভাদি দীর্ঘ তিরিশ বছর। আর আজ সেই নাবালিকা ছাত্রীরা তাকে সোজা পথ বাতলিয়ে দেবে—সমস্ত জীবন, যৌবনের কাছে এত বড় পরাজয় স্বীকার করার মত আত্মগরিমা-বিলুপ্ত মন তার নয়।

সাগরী চেনে নিভাদিকে, চেনে নিভাদির মতই একই ধাতুতে গড়া তাদের মা, মাসী পিসী জ্যেঠী পাড়াপড়শীদের। নিভাদি খুশি হয়, সাগরী জবাব দিল না দেখে। "চলি, বাড়ীতে আবার জ্বর এসেছে দেখে এসেছি বড় নাতনীটির।"

সাগরী তাকিয়ে দেখে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনও। সে তার ছাতাটি এগিয়ে দেয়, "এটা নিয়ে যান। আমি যাবার পথে নিয়ে আসবো।"

শিশুর মত খুশি হ'য়ে উঠে নিভাদি এ আন্তরিকতায়।

"কিন্তু তোমারও ত লাগবে, বৃষ্টি আজ আর থামবে মনে হয় না।"

"আমাদের একটু-আধটু ভিজলে কিছু হ'বে না। আপনি বুড়ো মানুষ—ভিজলে অসুখ করে যাবে।" জোর করেই দিয়ে দেয় সাগরী ছাতাটা।

আধা অপ্রতিভ সুরে কৈফিয়ত যেন দিয়ে চলে নিভাদি, "ছাতাটা গেল বছর হারিয়ে গেল বাসে। তারপর আজ কিনি কাল কিনি করে আর কেনাই হয় নি। আর নাতি নাতনীদের অসুখই ছাড়ে না।"

আর কিছু বলে না নিভাদি—চলতে শুরু করে। মনে মনে প্রশংসা করে সাগরীকে—"মেয়েটার মনটা ভালই ছিল—শুধু ঐ কম্যুনিজম করে বলে। তা' করুক। ও ত কারও ক্ষতি করছে না। অসম্মানও করে না। কিন্তু ঐ কম্যুনিষ্ট ছাত্রীরা শাহানা, বাসনা। ওদের যেন পাখা গজিয়েছে—আমলই দিতে চায় না কাউকে। হাজার হোক তোদের অভিজ্ঞতার চাইতে আমাদের অভিজ্ঞতা যে অনেক বেশি এটা ত মানতেই হ'বে। একটা কিছু করার আগে আমাদের কাছে এসে একটু উপদেশও ত নিতে পারে।"

রাস্তার মোড় ঘুরতেই জোর বৃষ্টি শুরু হয়। "ভাগ্যিস ছাতাটা

ছিল। সাগরী মেয়েটা ভালই। তবে ঐ শাহানাদের নিয়ে অতটা মাতামাতি না করলেই ত পারে। এই সাগরী স্নচরিতা এরাও কম্যুনিষ্ট আবার ঐ শাহানা, সিপ্রা, বাসনা এরাও কম্যুনিষ্ট। একেবারে তেল আর জল। কেমন করে যে মিশ খায়। শীতাও ত তাই। শিক্ষিকা প্রতিনিধিত্বের ভোটাভোটিতে নন্দিতাকেই ত ভোট দিয়েছিল তার বিপক্ষে এই শীতাও। অথচ দেবজ্যোতির বৌ বলেই তাকে এ স্কুলে এনেছিল সে নিজেই। মুখে বিনয়ী, নম্র এতটুকু খুঁৎ নেই ব্যবহারে। অথচ কাজের বেলায় একচুল নড়বে না এরা কেউই। সব একজোট। চক্ষুলজ্জা বলেও কোন পদার্থই নেই এদের কারও চোখে। এতকালের একচেটিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রতিনিধি সে। আর ঐ ফুচকে মেয়ে নন্দিতাকে নির্বাচন করলো এরা সবাই দল বেঁধে। আচ্ছা দেখা যাবে এবার কি হয়।···কিন্তু যা জোর বৃষ্টি চলছে বাড়ীর রাস্তা নিশ্চয়ই ডুবে গিয়েছে এতক্ষণে। ভাগ্যিস ছাতাটা ছিল।" অতি সন্তর্পণে ফুটপাতের উপর দিয়ে এগুতে থাকে বয়স্কা শিক্ষয়িত্রী তার ছাত্রীদের খাতার বোঝা সামলে ধরে।...

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে—কিন্তু জ'লো হাওয়ার জোর মাতামাতি চলছে স্কুলের সামনের কৃষ্ণচুড়াগাছের শাখায় শাখায়। মেয়েরা সব বাড়ী চলে গিয়েছে—শিক্ষয়িত্রীরাও।

শুধু সাগরীরা চারজন বাড়ী যায় নি এখনও। সাগরী নন্দিতা সিপ্রা, আর শীতা।

স্কুলের দপ্তরী ঘরে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করছে—তারই দুমদাম শব্দ আর এই জ'লো হাওয়ার শব্দ মিলে বারে বারে দূর অতীতে সরিয়ে নিয়ে যায় শীতাকে এ চায়ের মজলিস থেকে।

চায়ের পয়সা নিতে আসে স্কুলের ঝি। নন্দিতা সাগরীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—"দেখছো না নূতন বিয়ে-হওয়া বৌ।"

মানদা হাসি মুখে সাগরীর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে চায়ের পেয়ালাগুলি সরিয়ে নিয়ে যায়। আগামী স্ট্রাইক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

"এত ঘন ঘন স্ট্রাইক করলে স্ট্রাইকের গুরুত্ব কমে যায় কিনা—সেটাও ভাববার কথা।" সাগরীর কথায় শীতা নিজেকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে আলোচনায়। "আমারও সেই মত। এখনই গুঞ্জন শুরু হ'য়ে গিয়েছে শিক্ষয়িত্রী মহলে। লক্ষ্য করে দেখো, ৫ই তারিখের মত পূর্ণ সমর্থন এবার আর আমরা পাচ্ছি না। বরং একতা রক্ষা করার জন্য আমাদের দু'একবার ইচ্ছাকৃত পরাজয় মেনে নেওয়া উচিত। কিষাণপুরের স্কুলের গোলমাল নিয়ে এখানকার স্কুলে স্কুলে স্ট্রাইক করা—"

সিপ্রা বাধা দেয়—"মফস্বল স্কুল বলে তোমরা তাদের আন্দোলনকে ছোট করে দেখছো। না হ'লে ভাবতে পার, ঐ টুকু স্কুল কি ভাবে এদ্দিন ধরে স্ট্রাইক চালিয়ে যাচ্ছে। সহস্কুলগুলির সমর্থন পেলে ওদের জোর কত বেড়ে যায়।" "একটা স্কুলের জোর বাড়াতে পাঁচটি স্কুলের জোর কমে যাচ্ছে কিনা সেটাও ত দেখা দরকার।"

"বাসনা, শাহানার মত মেয়ে আছে যে স্কুলে, সেখানে এত ভাবিত হওয়ার কোনও কারণই দেখি না।" আধা বিদ্রূপের সুরে বলে নন্দিতা।

শীতা আর জবাব দেয় না। মনে মনে চিন্তা করে, ধীরে ধীরে কত একঘরে হ'য়ে যাচ্ছে তারা। এই ত আজ রেইনি-ডে তে শুধু মাত্র তারাই রয়েছে এ কমনরুমের আসরে। মাত্র চারজন। বুড়োদের কথা বাদই দাও, সহপাঠী টিচাররাও আজ আর যোগ দেয় না তাদের আসরে। এমন কি নমিতা পর্যন্ত বাড়ী চলে গিয়েছে। অথচ কলেজ জীবনে ওই ছিল নন্দিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ফেরার মুখে সাগরীদের বাড়ীর পথে যায় শীতা।

"চলো না শীতাদি একটু চা খেয়ে যাও। বাড়ী গিয়ে আর কি করবে এখন।"

শীতা আপত্তি করে না। এই জ'লো হাওয়ার দিনে কিছুতেই মনকে আয়ত্তে রাখতে পারে না সে। মনটাকে একটু হালকা করতে চাইছে সেও।

সাগরী কাপড় ছেড়ে যায় চায়ের জল বসাতে।

"ও, মনে থাকতে তোমার সঞ্চয়িতাখানা দিয়ে দেই। ছয় বছর ঘরে পড়ে রয়েছে ওটা। বিজনদা জেল থেকে বের হবার সময় পৃথ্বীবাবু তোমাকে দিতে এই বইখানা দিয়েছিলেন তার সাথে। কিন্তু তুমি নাকি তখন শ্বশুর বাড়ী। এতদিনে বইখানা উদ্ধার করা হ'য়েছে।"

সাগরী রান্নাঘরে চলে যায়। শীতা সঞ্চয়িতার পাতা উল্টায় বসে বসে।

"শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে।"···
"মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে···"

এক নিঃশ্বাসে পড়ে যায় সম্পূর্ণ কবিতাটি। কবিতা ত নয়। যেন স্মৃতির মণি-মাণিক্যে ঠাসা মনের একটা তালা-আঁটা কোঠা খুলে দিয়েছে কে চাবি ঘুরিয়ে।

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।"

অনুভূতির কি অসহিষ্ণুতা! ধৈর্যহারা স্মৃতির ফলক! শীতা হিসেব করে মনে মনে—কত বছর, কত বছর আগের কথা। পৃথ্বী তার জেল থেকে প্রথম লেখা চিঠিতে উদ্ধৃত করেছিল ছোট্ট পঙ্‌ক্তিটি। "জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।"

শীতা পৃষ্ঠাগুলি উল্টিয়ে যায় শুধু নিজেকে কবিতার আড়ালে লুকোবার চেষ্টায়।

কিন্তু বইয়ের শেষ পাতায় এসে আর যেন মনের স্থৈর্য ধরে রাখতে পারে না সে। পেনসিলে লেখা অস্পষ্ট কয়টি পঙক্তি যেন এক শরবিদ্ধ কোমল শিশুর মত জড়িয়ে ধরেছে তাকে। সমস্ত নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে এক অসহায় শিশুর নরম আলিঙ্গনে। এ হস্তাক্ষর অচেনা হবে না কোনদিনই শীতার।

বুকের প্রতি স্পন্দনে আছড়ে আছড়ে পড়ছে—
"আমার বক্ষের কাছে, পূর্ণিমা লুকান আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।"

ছোট্ট উদ্ধৃতিটির নীচে ক্ষয়ে যাওয়া তারিখটিও লক্ষ্য করে শীতা।

সাত বছর আগের প্রদীপ্ত একটি দিন যেন বহু ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত পরিক্রমা শেষে এসে দাঁড়িয়েছে আজ তার সামনে এসে। সহস্র ধ্বনির মধু-ঝংকার উঠেছে শীতার ভিতরে—বইয়ের শেষ পাতায় পেনসিলে লেখা এ উদ্ধৃতি কার উদ্দেশ্যে। কার উদ্দেশ্যে লিখেছিল পৃথ্বী কারাপ্রাচীরের এক কুঠরিতে বসে এ কথা! কাকে জানাতে চেয়েছিল সে—

"আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকান আছে।" এ ত শুধু কাব্য লক্ষ্মীর আরাধনা নয়। শুধু কাব্যরস খেলা নয়। সাত বছর আগে জেল থেকে তাকেই পাঠান সঞ্চয়িতার প্রতিটি পৃষ্ঠা যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে ঐ দুটি নীরব কলির মাঝে—"আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকান আছে।"

কারাগৃহের অন্ধকার কুঠরির ভিতর থেকে প্রেমদীপ্ত এক জোড়া

চোখ যেন আজও অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—কিন্তু সে চোখের প্রত্যাশাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল শীতা কিসের অহংকারে !

আজ তিল তিল করে টের পাচ্ছে শীতা—মান অপমানের তুলাদণ্ডে প্রেমের মাপ নিতে যাওয়াটা কতবড় ভুল মানুষের।

শীতাও সেই একই ভুল করেছিল এক দাম্ভিক মুহূর্তে ।

না হ'লে মানুষটির সাবধানে লুকিয়ে রাখা ব্যথার স্থানে চোখ পড়লো না, চোখ আটকে রইল শুধু তার দুর্বলমুহূর্তে লেখা মিথ্যা ছলনায়।

বোবা মানুষের অসহ্য আর্তনাদের মত চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে যেন শীতাকে—'আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে।'

শীতা অনুভব করে, নির্দ্বিধায় আজ অনুভব করে, কার উদ্দেশ্যে এ লেখা।

উনিশ বছরের শীতার সেই প্রেমাঞ্জন আঁকা গোপন চোখের ভাষাকে গ্রহণ করেছিল পৃথ্বীও গোপনে। প্রেমার্তমনের মীমাংসা কোনদিন হয় নাই পৃথ্বী-শীতার। তবু একই প্রেম নিঃশব্দে বয়েছিল পৃথ্বীরও মনের ফল্গু দিয়ে, অনুভব করে নিশ্চুপ হয়ে যায় শীতা।

রথী ঘরে ঢোকে। দীর্ঘকাল পর দেখা। প্রসন্ন হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করে দুজনে দুজনকে।

"বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে যেন।—"

শীতা নিজেকে ঢাকবার চেষ্টা করে, "স্কুল থেকে ফিরলাম কিনা, —তাই হয়তো।"

রথী একটা চেয়ার নিয়ে বসে। "কতকাল পর দেখা বলুন ত। সেই সে পদ্মার চরে, আপনি আর উর্মি 'সি অফ্' করতে এসেছিলেন, আমি যেবার এম. এ পড়তে আসি।"

শীতা হেসে বলে, মনে আছে ঠিকই। তবে—এম-এ পড়তে নয়, পড়বার ভাণ করতে।”

“তা’ অবশ্যি ঠিক। রাত্রি বারোটার পর বাবার বকুনি শুনতে শুনতে ঘুম আসতো চোখে। পড়াশুনা শেষ না করে রাজনীতি করার বিরুদ্ধে যত রকমের অস্ত্র ছিল তাঁর, রোজ রাতে তার প্রয়োগ চলতো।”

শীতার মনের তলা দিয়ে স্রোত বয়ে চলেছে নিঃশব্দে। এই রথী, তার বাবা, মা, উর্মি পদ্মার চর, সেই স্কুলের বোর্ডিং বাড়ী, সবার সাথেই কেমন করে জড়িয়ে রয়েছে একটি মানুষের অনুভূতি।

রথী শীতার দিকে তাকিয়ে বলে, “সাগরীর কাছে শুনেছি—আপনি যে ওদের স্কুলে কাজ পেয়েছেন। ভালই হ’ল—বেশ একটি শক্ত ঘাঁটি তৈয়ার হ’চ্ছে।”

সাগরী চা আর কুচো নিমকি নিয়ে ঘরে ঢোকে। রথী খুশি-করা সুরে বলে, “যাক একটা ভাল কাজ করেছিলে বসে বসে। আমি ভাবলাম অতিথিকে একা ঘরে ফেলে—”

“একা ফেলে নয়। সঞ্চয়িতাখানা দিয়েই বসিয়ে গিয়েছিলাম। সেই পৃথ্বীদার পাঠান সঞ্চয়িতাখানা এতদিনে উদ্ধার করতে পেরেছি বিজনদার কাছ থেকে।”

“সবগুলো পৃষ্ঠা আছে ত। সেই শেষের পৃষ্ঠাটা।” আধাঠাট্টার সুরে বলে রথী, “পৃথ্বীদার কাণ্ডই আলাদা। না হ’লে, বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকান আছে—তা’ সে পূর্ণিমাকে অমার তলায় লুকিয়ে না রাখলেই কি চলতো না। যাক সে অতীত। পাষ্ট ইজ পাষ্ট। এখন কত বলি সুমিত্রাকে বিয়ে কর, পৃথ্বীদা, তোমারই যোগ্য মেয়ে সে অতিমাত্রায়। পূর্ণিমাকে লুকিয়ে রাখায় সেও ওস্তাদ কম নয়।”

“সাগরীর অনুরোধে ঘটকালিও করলাম—”

সাগরী থামিয়ে দেয় রথীকে—“চা টুকু শেষ কর ত এবার। এতকাল

পর নাকি দেখা তোমাদের। অথচ কেমন আছেন কোথায় থাকেন, কিছু খোঁজ নিলে না। অদ্ভুত মানুষ ত তুমি!"

"কমরেডের খোঁজ খবর কি তার মুখ থেকেই নেবার অপেক্ষা রাখি?"

শীতা মনে মনে সহস্রবার স্বীকার করে তা'। রথীর চেষ্টায়ই এ স্কুলে চাকরি পাওয়া সম্ভব হ'য়েছে তার। না হ'লে আজ শাশুড়ীর সঞ্চিত অর্থ ক্ষয় করার পাপে তিল তিল করেই ক্ষয় হ'ত সে নিজে। ফল্গুর মুখে এ সংবাদ জানা মাত্রই সে খবর পাঠিয়েছে শীতাকে স্কুলে কাজ নেবার জন্য, সাগরীকে দিয়ে তার শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছে।

শীতা উঠে পড়ে। "চলি আজ।" "আসবেন মাঝে মাঝে।" আন্তরিক অনুরোধ জানায় রথী। রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে আসে।

শীতা হেঁটে চলেছে। আবেগে বিভোর চিত্ত। ঝড়ো হাওয়া বারে বারে লুটোপুটি খাচ্ছে শাড়িতে। শাড়ির আঁচলটা শক্ত করে জড়িয়ে নিয়ে এগুতে থাকে। ছায়ার মত পিছু পিছু হেঁটে চলেছে যেন অদৃশ্য লঘুপদ সঞ্চরণে আরও একটি মেয়ে। তার চুলের মৃদু ঘ্রাণ অনুভূত হ'চ্ছে যেন শুধু মাত্র একটি নামোচ্চারণে। সুমিত্রা। সুমিত্রা পৃথ্বীকে ভালবাসে। একটি অদেখা মেয়েকে নিবিড়ভাবে অনুভব করছে শীতা— একটি ঘনিষ্ট মন বারে বারে স্পর্শ করছে তাকে—যে মন ভালবেসেছে পৃথ্বীকে।

ভালবাসে সুমিত্রা পৃথ্বীকে। কিন্তু তার মতই ভালবাসে কি? এমন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছে কি সেও—এমনি গোপনে গোপনে ডুকরে কাঁদে কি তারও আত্মা? চাওয়া পাওয়ার উর্দ্ধের এক সুহৃদ হৃদয় স্পর্শ কামনার অতনু আশ্লেষে। না-না একই প্রেমানুভূতির দংশন নয়। সুমিত্রা বাঞ্ছিতকে পাওয়ার আশা রাখে অসংখ্য মানুষের ভীড়ে, এই পৃথিবীরই এক শান্ত গৃহ নীড়ে। কিন্তু শীতা পেতে চায় না। শুধু

অনুভব করতে চায় আত্মায় আত্মার সংযোগ। শুধু সৌহার্দ্যের অনুভূতি।

পৃথ্বী আজও ভালবাসে কিনা তাকে—এ প্রশ্ন একেবারে থেমে গিয়েছে মনে। শুধু পৃথ্বী অনুভব করছে কিনা তার ব্যথার স্থানকে—এই একমাত্র নির্ভাষা জিজ্ঞাসা তার গোপন হৃদয়ের।

"সুখী হও সুমিত্রা।" মনে মনে বলে শীতা গভীর আন্তরিকতায়। শুধু নিরালা গৃহকোণ নয়—উন্মুক্ত পথের সাথী বলে গ্রহণ করেছে সে আজ পৃথ্বীকে। সে জানে, পৃথ্বীও গ্রহণ করেছে তাকে একান্ত বান্ধবী, পরম সাথী রূপে। তাই এত দৃঢ় তার আত্ম-আস্থা। হারাবার ভয় তার নেই। তাই গোলাপী কাচের ভিতর দিয়ে দেখা ছোট্ট বাসর ঘরের কোনও ছবিই আজ উঁকি মারে না তার মনের কোণায়।

তাই এত অকুণ্ঠিত চিত্তেই দিতে পারে সে তার প্রিয়শ্রেষ্ঠকে অর্পিতার হাতে।

একটি মহান আদর্শের এ দৃঢ় রাখী ছিঁড়বে না কোন দিনই। বাসর শয্যার ফুলডোরের চাইতে অনেক বেশী দৃঢ় পৃথ্বী-শীতার রাখীবন্ধন।

শীতা মনে মনে আবারও আশীর্বাদ করে—"সুখী হও সুমিত্রা।"

শীতা স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে দেখে, শাশুড়ীর জ্বর এসেছে। এদিকে বাসন মাজার ঠিকে ঝিও আসেনি; তাই মেনকা জ্বর নিয়েই বাসন মাজছে। সামনে বসা তার দূর সম্পর্কিতা এক আত্মীয়া। কয়-দিন হ'ল মেনকা কাশী থেকে ফিরে এসেছে। দেশেই অবস্থা যখন শান্তই আছে—তখন শেষ বয়সটা দেশের বাড়ীতেই থাকার ইচ্ছা। একমুহূর্তেই বুঝতে পারে শীতা শাশুড়ীর আজ জ্বর নিয়েও বাসন মাজার তাৎপর্য কি। বোঝে, এ শুধু বৌয়ের কর্তব্যহীনতাকে প্রচার করারই কুটিল কৌশল। মেনকার মনের অলিগলি সবই আজ শীতার চোখে

স্পষ্ট। শীতা বশ্যতা স্বীকার করে নাই মেনকার কাছে। তাই তার কর্তৃত্ব পরায়ণ মন নিজেকে পরাভূত মনে করে ক্ষয়ে মরছে নিজের ভিতরেই, ক্ষত বিক্ষত করছে নিজেকে আত্মনিপীড়নে। তাই আজও শীতার এই স্কুল থেকে বাড়ী ফিরতে বিলম্বটুকুতেও সেই ক্ষতটাই টন টন করে উঠেছে।

শীতা তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে এসে বসে কলতলায়, মেনকার হাত থেকে 'বৌখনা'টা সরিয়ে নিয়ে সহাস্যে বলে, আর রাগ দেখাতে হ'বে না। এবার বিছানায় বসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করুন ত।"

পরাজয় মানতে হয় মেনকাকেই। এই শীতার চিরন্তনী পন্থা। জব্দ করাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে জব্দ না হওয়াটাই প্রতিপক্ষকে হার মানানর এক কৌতুকময় কায়দা শীতার।

কিন্তু দূর সম্পর্কিতা আত্মীয়াটি একটু অপ্রস্তুত হয় যেন শীতার কাণ্ড দেখে। শাশুড়ী জ্বর নিয়ে বাসন মাজছে, তার বৌ বেড়িয়ে এল বন্ধুর বাড়ী থেকে—তাও নিজ মুখেই স্বীকার করলো—এতটুকুও অপ্রতিভ না হ'য়ে? তাই আরেকবার চেষ্টা করে। বোনের দুঃখে অভিভূত সুরে বলে, "ঘরের বৌ-ঝিদের কি আর ইস্কুলে কাজ করলে চলে। দেখ না, মেনুর কি চেহারা হয়েছে। এসব কাজ ত আর কোনদিন অভ্যেস ছিল না।" শীতা শাশুড়ীর সুডোল স্বাস্থ্যবতীর চেহারার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, "ঠিকই বলেছেন মাসীমা। কিন্তু ইস্কুলকলেজে কাজ না করলেও ত চলে না"—

শেষের কথার তীরটা মেনকার উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য—জমিদারকন্যাকে জানিয়ে দেওয়া যে তার জমিদারীতে আর সংসার চলছে না। আর চলবেও না এ যুগে। যে খেটে-খাওয়া মানুষদের ঘৃণার চোখে দেখছে মেনকা এতকাল, এখন সেই খেটে-খাওয়াদের কাছেই মাথা নত করতে

হ'বে। শীতা তাই অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদ, মেনকা-গোষ্ঠীর শেষ পরাজয়টুকু দেখার আশায়।

আত্মীয়াটি বলেই চলেছে "ও ত আর সে রকম শাশুড়ী নয়। মায়া দয়ার শরীর। বলে, বৌমার কষ্ট হ'বে ইস্কুল থেকে এসে আবার বাসন নিয়ে বসতে।"

"বৌমার কষ্ট হবে!" বুকের ভিতরে নিজেরই ব্যঙ্গধ্বনি শুনতে পায় যেন শীতা। "অন্তঃকরণের এত ক্ষুদ্রতায়—এত সংকীর্ণতায়—আমি যে খান খান হয়ে যাচ্ছি—সে কষ্টের খবর আপনারা রাখেন কি?"

কি নির্লজ্জ মিথ্যার ব্যাভিচার! মনে মনে বলে উঠে শীতা, "আপনাদের পৃথিবীর বৃহৎ ঘটনার পাশে এসব সাংসারিক ছোটখাট ঘটনার গুরুত্ব হয়তো অণুপরমাণুরও কম। কিন্তু মানবাত্মার কাছে আমার বিপুল প্রত্যাশায় সংসারী মানুষের মনের এই ক্ষুদ্রতাকে, এই সংকীর্ণতাকে ত তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারি না আমি।"

সেই জন্যই সংসারে এত বীতশ্রদ্ধ আজ শীতা। মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতে চায় সে। সমস্ত মানুষকে—বহির্বিশ্বে এবং নিজের ছোট্ট সংসারেও—সর্বত্রই।

মানবসত্তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় জেনেছে শীতা—তার হৃদয় আছে, আর আছে সে হৃদয়ের অনুভূতি। জীবনের সকাল-সন্ধ্যা-মধ্যাহ্নগুলি যেখানে অনুভব করবে সে—তার নিজের পরিবারে, নিজের সংসারে—সেখানে এত জীবনবিমুখতায় হাঁপিয়ে উঠে শীতা।

প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খায় তার সৌন্দর্যপূজারী মন, যখন সে দেখে, এত কুটিলতা, এত কপটতা কি বিরাট আসন পেতে বসেছে মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব মানব হৃদয়ে।

মানব আত্মাকে ভালবাসতে চায় সে, জীবনের একটি পলার্ধও

নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না এ মানবপ্রেমের স্বাদ থেকে। কিন্তু এ কি বিমুখতা তার দৈনন্দিন জীবনে!

অনুভূতি, অনুভূতি, প্রেমের অনুভূতি, সুন্দরের অনুভূতি, হৃদয়ের অনুভূতি, জীবনের অনুভূতি—অনুভূতিকেই একমাত্র বরণ করতে চায় শীতা। কিন্তু এ কি কুৎসিৎ হানাদারের আক্রমণ প্রতিনিয়ত পরাস্ত করতে চাইছে তাকে জীবনের স্বাদ থেকে। এই সুন্দর বসুন্ধরায় এত অসুন্দরের স্থান কেন? বোঝে না শীতা, মানুষের প্রতি মানুষের এই ঈর্ষার ভ্রূণ সৃষ্টি অসাম্যের কোন জীব-কোষে!

তাই মাঝে মাঝে ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। কোনও অপরাধ করেনি ত সে। মধ্যযুগের বধূরূপী ক্রীতদাসী হ'য়ে থাকছে না বলেই কি এত অন্তর্জ্বালা শাশুড়ীর?

আত্মীয়াটি চলে গিয়েছে। এইবার বিনুকে নিয়ে পড়ে মেনকা। একটি ভাত পড়ে রয়েছে চৌবাচ্চার ধারে বিনুর অসাবধানতায়। তাই মেনকা একটানা বকেই চলেছে। আক্রোশে কণ্ঠস্বর বিকৃত হ'য়ে উঠেছে। ক্রোধ-ঈর্ষা-পরশ্রীকাতরতা আর, সকলের উপরে আত্ম-নিপীড়নেচ্ছা—সব কয়টি রিপুর এক কদর্য রাসায়ণিক মিশ্রণ থেঁতলানো সাপের গরলের মত গলে গলে পড়ছে। এ ত তিরস্কার নয়। বিনু উপলক্ষ মাত্র।

"স্কুলে কাজ না করলেও ত চলে না" শীতার বিকেলের সেই উত্তরের এটা যে প্রত্যুত্তর বুঝতে বিলম্ব হয় না। তার শেষ আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরতে চাইছে যেন মেনকা এই সদম্ভ, সৌভাগ্য প্রচারে: "কেউ যেন মনে করে না, আমি কারওটা খাই-পরি। আমারটাই আমি খাই। শেষদিন পর্যন্ত আমারটাই আমি খেয়ে যাব। তাই শেষদিন পর্যন্ত আমার আচারনিষ্ঠা আমি বজায় রাখবোই।"

এ কি প্রলাপ! এ ত দম্ভ নয়, ভাবে শীতা—এ যে আত্মগঞ্জনা। এক মূর্তিমতী ব্যর্থতা মাথা খুঁড়ে মরছে!

কিন্তু কার কাছে? তবে কি শীতার কাছেও কোন গোপন, অতি গোপন প্রত্যাশা লুকিয়ে আছে মেনকার সন্তানপিপাসু হৃদয়ের? ভালবাসা পাওয়ার এক অবচেতন আকাঙ্ক্ষা?

কিন্তু এত দেরিতে কেন এ হাহাকার? যখন শীতা এসেছিল এই গৃহে, সেদিন শীতাকে বরণ কবেনি মেনকা তার হৃদয়ে—বরণ করেছিল তার পরাজিত দম্ভকে। সে-দিনেব সে দম্ভ অনেক, অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে শীতাকে। তাই আজ মনে পড়ে প্রথম বধূজীবনে একবার কঠিন রোগাক্রান্ত মেনকাকে শীতা আন্তরিক সেবা দিয়ে সুস্থ করেছিল। সদ্য আরোগ্য-লব্ধা মেনকা সেদিন তোরঙ্গ থেকে গয়নার বাক্স বের করে শীতাকে বলেছিল, "আমাকে শেষদিন পর্যন্ত যে সেবা করবে, তাকেই এ গয়না দিয়ে যাব।" সে কথায় ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিল শীতার সমস্ত মন—ছিঃ ছিঃ—প্রলোভন! প্রলোভনের দাঁড়িপাল্লায় কেনা হ'বে আন্তরিক সেবা?

নাবালিকা ছিল সেদিন শীতা। কিন্তু আজ বোঝে, কতবড় ব্যর্থ জীবন মেনকার। তাই আজ করুণা হয়, দুঃখও হয় মেনকার জন্য। নূতন তথ্যের সন্ধান জেনেছে আজ শীতা—মানুষের বিশ্লেষণ একটি মাত্র ব্যক্তিগত মানুষেই সীমাবদ্ধ নয়। বিচার করতে হ'বে শাশুড়ীর এই পশু-মনকে সমাজের নিরীক্ষণী মানদণ্ডে।

মেনকারও থাকতে পারতো শীতার বয়সী একটি মেয়ে—তার শেষদিনের আশ্রয়। নিশ্চিন্তে থাকতে পারতো সে তার দুঃস্বপ্নময় শেষ জীবনের একাকীত্বের দুশ্চিন্তার হাত থেকে। সমাজের বিরুদ্ধে, বিধাতার বিরুদ্ধে, তার আজীবন বৈধব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগই কি এমন বীভৎস রূপ নিয়েছে আত্মনিপীড়নে? তাই এই মুহুর্মুহুঃ আত্মঘোষণা?

ঈর্ষা! একি মানুষের শুধু ব্যর্থতারই দীর্ঘশ্বাস! সমাজই তবে সুন্দর, কুৎসিৎ সকল মানব আত্মার জন্মদাতা? শীতার প্রথম স্বপ্ন, শেষ স্বপ্ন —সেই মহামানব আত্মারও?

কিন্তু যে সমাজের নিষ্ঠুরতায় এই ব্যর্থ জীবন মেনকার—সে সমাজের প্রতিই ত মমত্ব লুকিয়ে রয়েছে মেনকার ভিতরে। আগামী যুগের কাছে বশ্যতা মানতে চায় না বলেই ত এত মাথা কুটছে মেনকা নিজের ভিতরে। এ ত শুধু শীতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়—আগামী যুগের বিরুদ্ধেও। তাই মনকে কিছুতেই অনুত্তেজিত রাখতে পারে না শীতা যখন সে টের পায়, অস্নাত অভুক্ত ফন্তুদের কমরেড বন্ধুদের পাতেও কোনও ভাল আহার্য দ্বিধাহীন মনে দিতে পারে না সে এ-বাড়ীতে।

ফন্তুরা জানেও না খোঁজও রাখে না কত কদর্যতা লুকিয়ে আছে এই মহানগরীতে—প্রতি সংসারে—আর তাদের দিদির এই স্নেহভরা গৃহেও। তাই তারা ঝড়ের মত ঢুকবে ঘরে, কপালে উড়বে অস্নাত চুলের গুচ্ছ। দম না নিয়ে বলবে, "দিদি নূতন গুড়ের সন্দেশ এইমাত্র নামাতে দেখে এলাম কড়াইতে।" তার সাথে জুড়ে দেবে আর একজন "বেশী দূরে নয়, ঐ ত মোড়ের দোকান।"

কি মধুর স্নেহের দাবী! এই ত জীবন। কৈশোরের প্রাণস্ফুরণ।

হাসি মুখে একটি টাকা বের করে দেয় শীতা। "পুরো একটি টাকা! তোমার বোনাস বাড়ুক মাসে মাসে।"

আবার ঝড়ের মত দুরন্ত আবেগে বেরিয়ে পড়বে সবাই।

কিন্তু তারপরই রাত্রির অন্ধকারে কুটিল ফিসফিসানী বিষাক্ত সাপের মত এগিয়ে আসে—"ভাইদের জন্য সন্দেশ এনেছিল বুঝি, আর কিরে?"

"আর কিছু না।" জবাব দেয় বিনু, তবে ফিসফিসিয়ে নয়। আবার প্রশ্ন আসে, "আর ঐ যে আমার বোনপো এসেছিল তাদের কি দিয়েছিল রে?"

"সন্দেশই"। অধীর হ'য়ে উঠছে কি বিনুও? ঐ ছোট্ট ছেলের চোখেও কি ধরা পড়ে যাচ্ছে বিচারকের অপকৌশল।

কার এ বিচার, ভাবে শীতা। আসামী কেউই নেই। তবু আসামী চাই-ই চাই বিচারকের! না হ'লে যে তার পেশাই থাকে না।

কিন্তু কেন? এ তুলাদণ্ডে কিসের মাপ নিতে চায় মেনকা? শীতার আত্মার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের?

তার মোটর-হাঁকানো ধনী বিলাসী বোনপোকে সন্দেশ যদি নাও খাওয়াতো শীতা, তাহলেই কি তার আত্মাকে ছোট ভেবে খুশি হ'তে পারতো মেনকা।

অভুক্ত অনাহারী, তবু প্রাণবেগে অফুরন্ত কমরেড ভ্রাতাদের খাওয়ানর চাইতে, তাকেই ত শীতা জানে, এ সংসারে বড় কর্তব্য বলে— শাশুড়ীর ধনী আত্মীয়দের সন্দেশ রসগোল্লার চটক দেখিয়ে ভূস্বামীর মহিমা প্রচার করা। এই কি আতিথ্য? তার বাবা-পিসীমার মুখে মুখে গল্প শোনা সেই অতীতের, সেই তার ঠাকুরদার আমলের স্নেহ প্রীতি রসে ভরা আতিথ্যের এই কি শেষ পরিণতি?—এ ত শুধু আত্মম্ভরিতা!

তবু, তবু এদেরই বিচারের কাঠগড়ায় উপবিষ্টা শীতা। "সীতার এই অগ্নিপরীক্ষার" শেষ হবে কবে? শ্রান্ত, বড় শ্রান্ত আজ সে। বিকালের সেই কিরণস্পর্শটুকু হাতড়ে খোঁজে সীতা—"আমার বক্ষের মাঝে পূর্ণিমা লুকান আছে।" কিন্তু কোথায়? হারিয়ে যায় তার জীবনের সুর—সংসারের গ্লানিতে, তিক্ততায়, কদর্যতায়।

এক মহান অন্বেষণে আকুল হ'য়ে উঠে তার সমস্ত সত্ত্বা। কোথায়, কোথায় সেই শাশ্বত মহান—সেই শাশ্বত সুন্দর। উত্তর আসে যেন তার বক্ষস্থল থেকে—যেন তার হৃদয়ের অন্তঃপ্রস্রবণ থেকে—"এই অমার আড়ালেই লুকিয়ে আছে তোমার সেই প্রতীক্ষ্যমান পূর্ণিমা। পৃথিবীর পূর্ণিমা, মহাজাতির পূর্ণিমা—আর প্রেমের পূর্ণিমা। এই বিশ্বাসই ত শীতার জীবন-উৎস—অমার আড়াল থেকেই উচ্ছৃত হ'বে একদিন মহামানবত্বের পূর্ণিমা—উচ্ছলিত হ'বে জীবনের পূর্ণিমা।

ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চলেছে। স্তম্ভিত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সারা কোলকাতায়। অন্ধকার ভোর থেকে ঘুরছে সুমিত্রা ছাত্রনেতাদের বাড়ী বাড়ী। এই উত্তেজিত কোলকাতায় কে কোথায় ছড়িয়ে রয়েছে খুঁজে বের করাও মুস্কিল। রাতের মধ্যেই একত্রিত হওয়া দরকার। নন্দিতার সাথে দেখা হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। প্রতিটি স্কুলে কলেজে ধর্মঘট করাতে হবে কাল। একটি স্কুলও বাদ দিলে চলবে না। শুধু ধর্মঘট নয়—বিক্ষোভ-মিছিল বের করতে হবে প্রত্যেকটি স্কুল থেকে। আজ রাতের মধ্যেই সব 'অর্গেনাইজ' করতে হবে। লক্ষ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান চাই এ দাম্ভিক সরকারের বিরুদ্ধে—অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

ধৈর্যহারা উত্তেজনায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে সুমিত্রার। কী ভীষণ স্পর্দ্ধা! ঐ টুকু কচি ছেলের বুকেও লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। দেশের মানুষ সব ভেড়া হয়ে গিয়েছে, এরা মনে করছে। না তা নয়। এ স্বৈরাচার কখনও করতে পারে না সন্তানের জনক-জননীরা। লক্ষ লক্ষ মা বাবা ভাই বোন এর প্রতিবাদ নিশ্চয়ই জানাবে।

উত্তেজিত মস্তিষ্কের শিরা উপশিরায় রক্ত স্রোত ধাবিত হচ্ছে। সুমিত্রা ভিতরের প্রতিহিংসায় ফুলে ফুলে উঠছে—"একটি স্কুলও খোলা থাকবে না কাল, একটি স্কুলও নয়। কিশোর ভাইদের এ ডাককে অপমান করে স্কুলে যেতে পারে না স্কুলের ছেলেরা।

যদি কোনও স্কুল জোর করে খোলা রাখতে চায় কোনও আমলা-তান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ—পিকেট করতে হবে।

দেখিয়ে দিতে হ'বে ওদের, লাঠি আর গুলির জোরই বড় জোর নয়। তার উপরেও শক্তি আছে মানুষের।

অস্নাত রুক্ষ মাথার উপরে প্রখর সূর্য—তাতান পিচের রাস্তার উত্তাপ পাদুকাহীন পায়ের তলায়। কিছু খেয়াল নেই সুমিত্রার। স্নায়ুতে স্নায়ুতে রক্তের যে উষ্ণতা তার কাছে তুচ্ছ মনে হয় ঐ প্রখর জ্যোতিষ্কের তেজও।

আগুন জ্বলে উঠেছে তার রক্ত কণিকায়। তারই কোলের উপর শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে ছেলেটি। স্কুলেপড়া কচি ছেলের কি কমনীয়-মুখ। অমন সুকুমার দেহেও গুলি ছুঁড়তে এতটুকু দ্বিধা হ'লো না আমলাতন্ত্রের পদলেহনকারীদের!

আর এরাই নাকি একমাত্র গান্ধীজীর অহিংসা বাণীর রক্ষা-কবচধারী।

"গান্ধীজীর পবিত্র নামের কলংক এরা।" মনে মনে আওড়ায় সুমিত্রা। পরক্ষণেই ভাবে, কিন্তু একমাত্র গান্ধীব নামের সুযোগ নিয়েই ত সক্ষম হয়েছে এরা এত বড় স্বৈরাচার চালাতে। এই তেরঙ্গা পতাকার আড়ালেই ত। এই খদ্দরের মোহ দিয়ে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করেছে—স্বার্থান্বেষীরা। খদ্দরের ভণ্ডামী! নিজের গায়ে জড়ানো খদ্দরের শাড়িখানা যেন কাঁটার মত বিঁধছে গায়ে। আর খদ্দর নয়। জনতার সাজই ধরবে সে আজ থেকে। নন্দিতার

বাড়ী গিয়ে, তার মায়ের কাছ থেকে একাখনা শাড়ি চেয়ে পরে সুমিত্রা। তারপর পরনের শাড়ি-খানায় কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

নন্দিতার মা অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে। সুমিত্রা তার বিস্ময় লক্ষ্য করে বলে "আমার কোলের উপরই মারা গেল ছেলেটি। ওর শ্মশানেই দিয়ে আসতে পারলে দিতাম। আজ থেকে মানুষ ঠকাবার এ-বেশ আর নয়।"

হাতঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করে "নন্দিতা ফিরবে কখন ?"

"ও ত আর বাড়ীতে থাকছে না।"

"বোধন খেতে আসবে কখন ?"

"এখন কি খাওয়া দাওয়ার সময় আছে ওদের। ভাত কি এখন গলা দিয়ে যেতে চায় কারও। এমন অত্যাচার ত ব্রিটিশ আমলেও দেখিনি আমরা। শুনলাম স্কুলের ব্যাগ ঝোলান ছিল কাঁধে—স্কুল থেকেই বাড়ী ফিরছিল ছেলেটি। তার মায়ের কথাটা ভাবতে পারছি না।"

চোখ ভিজে ওঠে মায়ের। সুমিত্রারও চোখের জল বেরিয়ে আসে। এমন কোমলমনা মায়ের দেশেও বর্বরতা কি করে সম্ভব হয়! চোখ মুছে বলে নন্দিতার মা, "বোধন বলে গিয়েছে, সিপ্রাদের বাড়ীতে ওদের মিটিং হবে আজ রাতে। ফল্গুও এসেছিল। বলে গেল, কলেজ স্ট্রীটে নাকি রক্তগঙ্গা বয়ে চলেছে কাল থেকে।"

আবার বেরিয়ে পড়ে সুমিত্রা। মনে ভাবে, তার মা থাকলেও নিশ্চয়ই এ শিশুহন্তাদের ক্ষমা করতেন না।

পান বিড়ির দোকানে দোকানে, বাসষ্টপে, উত্তেজিত আলোচনা চলেছে "কলেজ স্ট্রীটে আগুন জ্বলেছে দেখে এলাম। ট্রামকে ট্রাম সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলছে।"

স্বরে জলে প্রতিহিংসা! আশান্বিত কানদুটো সজাগ হয়ে উঠে সুমিত্রার। সাধারণ মানুষেরাও কখনও এ অন্যায়কে ক্ষমা করবে না। আগুনই একমাত্র উত্তর এ অপমানের।···

রথীদের কলেজের বহির্দেওয়ালগুলি পোষ্টারে ভরে যায়। হুঁশিয়ারী সতর্কবাণী বড় বড় লাল অক্ষরে। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রিন্সিপ্যাল দারোয়ান দিয়ে পোষ্টারগুলি ছিঁড়ে রেখে যায়। আবার পরদিন আরও কড়া ভাষায় পোষ্টার আঁটা হয় দেওয়ালে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে প্রফেসারদের চোখের সামনে জলজল করে—"রক্তের বদলে রক্ত চাই—শিশুহত্যার ক্ষমা নাই।"

কমনরুমে এসে গোল হয়ে বসে প্রবীন অধ্যাপকরা। পড়াতেও আর উৎসাহ লাগে না মনে। কেমন যেন চিন্তার চাপ মনের ভিতরে। একটা কিছু না ঘটিয়েই ছাড়বে না কম্যুনিস্টরা।

কম বয়সের অধ্যাপকদের চোখে প্রতিবাদের কুঞ্চিত রেখা। এ ভাবে দেশ শাসন করলে বেশী দিন আর থাকতে পারবে না এ সরকার।

কলেজের দুয়ারে দাঁড়িয়ে শূন্যে ঘুঁষি মেরে মেরে বক্তৃতা দিচ্ছে এই কলেজেরই এক কম্যুনিস্ট অধ্যাপক। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গিয়েছে। উস্কোখুস্কো চুল। সারাদিন ঘুরে ঘুরে মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে।

ছাত্ররা ভিড় করে শুনছে। তাদের চোখের তলায় খুশির ভাব—অধ্যাপকরাও ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বিকেলের দিকে অধ্যাপকদের একটা প্রতিবাদ সভা ডাকা হয়—তরুণ অধ্যাপক, বিকাশ মুখোপাধ্যায় উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয়···"শুধু একদিন শোকসভা করে এই জঘন্য বর্বরতার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। দিনের পর দিন আমাদের একাগ্রতার সাথে এই সরকারের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকটি কলেজ থেকে, আমাদের এই আওয়াজ তুলতে হবে। সংগ্রামী ঘাঁটি হিসেবে পরিণত করতে হবে প্রত্যেকটি শিক্ষাকেন্দ্রকে”...

বাইরে রাস্তা দিয়ে ছাত্রদের এক দীর্ঘ মিছিল চলেছে। আওয়াজের পর আওয়াজ আছড়ে পড়ছে প্রাচীরের গায়ে। ছোট ছোট ইস্তাহার হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ে। কলেজ সীমানার ভিতরেও এসে পড়ে একগাদা ইস্তাহার। ভিতবের ছাত্ররা বিলি করছে। প্রবীণ অধ্যাপক একজন পকেট থেকে চশমাটা খুলে চোখ বুলিয়ে যায় ইস্তাহার খানায়—“কম্যুনিজমের পথ সংগ্রামের। শান্তি, প্রগতি, জনগণের মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সাম্যবাদীরা সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত। এই প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তারা সংগ্রামী সর্বসাধারণকে টানিয়া আনিতে চায়। শুধু নৈতিক জোরে নয়—অর্থনৈতিক আদর্শে।”

প্রেসে প্রতিবাদ পাঠান হ'বে। পৃথ্বীর উপর ভার পড়েছে, সাহিত্যিকদের সই সংগ্রহ করে আনার। সারাদিন ঘুরছে সে সাহিত্যিক-দের বাড়ী বাড়ী। কিন্তু মনের ভিতরে একটি প্রশ্ন অনবরতই তোলপাড় করছে। পিছনে শ্রমিক আন্দোলন না থাকলে কোনও আন্দোলনই টিকে থাকতে পারে না। না হ'লে ইতিহাসে স্থান পাবার মতই এখানকার ছাত্র আন্দোলন। বুক পেতে গুলি গ্রহণ করেছে বই-এর ঝোলা কাঁধে-নেওয়া এতটুকু ছেলেরাও।

কিন্তু তাও ত শ্রমিকদের মধ্যে আশানুযায়ী সাড়া নেই। ফ্যাক্টরী-গুলিতে পূর্ণ ধর্মঘট করান গেল না।

এভাবে টানা-হেঁচরা করে আন্দোলন টিকিয়ে রাখা যাবে কয়দিন ?

রাতে বাড়ী ফিরে দেখে পৃথ্বী,—একরাশ কাগজ ছড়িয়ে বসেছে

কুরী পোষ্টার লিখতে। চেহারা দেখেই বোঝে, সারাদিন স্নান হয়নি। ঘুমও হয় ত হয়নি এ দু'দিন। চোখের কোণায় ক্লান্তি।

পৃথ্বী বলে, "অনেক রাত হ'য়েছে, এবার শুয়ে পড়্ কুরী।"

"এখনই শোব? অর্ধেকও ত শেষ হয়নি। আজই এগুলো শেষ না করে রাখলে ফল্গুদা আর আস্ত রাখবে না।" পৃথ্বী মনে মনে হাসে বোনের ভয় দেখে। "ফল্গুদা আস্ত রাখবে না! কিন্তু তার আগে যে নিজেই আস্ত থাকবি না—যা চেহারা হ'য়েছে। তুই বরং শুয়ে পড়্— আমি খেয়ে এসে লিখে রাখবো বাকিগুলো। তোর খাওয়া হয়েছে ত।"

কুরী জানায় বিকেল বেলায়ই বাড়ী ফিরে ভাত খেয়েছে সে। মনে মনে ভাবে পৃথ্বী, সারাদিন খাওয়াও তাহলে হয়নি। সে খেয়ে এসে বসে কাগজ কালী নিয়ে। কিন্তু কুরী উঠে না—"আমার ঘুম পায়নি।"

পৃথ্বী নির্দেশ মত কলম ঘুরিয়ে যায়, "নেহেরু সরকার হুঁশিয়ার— লাল ঝাণ্ডা হ্যায় তৈয়ার।"

পৃথ্বী প্রশ্নের স্বরে বলে, "লাল ঝাণ্ডা তৈয়ার? চোখে ত দেখছি শ্রমিক আন্দোলন শেষ হ'তে চলেছে।"

পরের স্লোগান লিখতে শুরু করে, "ফ্যাসিস্ট সরকারকে খতম কর।"

মনে মনেই আবার ভাবে পৃথ্বী, খতম ত কর। কিন্তু করবে কে? সেই প্রস্তুতি কোথায়? এত বেশী এ্যাডভান্স স্লোগান-এর ফল যে কোথায় দাঁড়াবে তার দৃষ্টান্ত ত জার্মাণীতে দেখেছে তারা।

ট্রামে, বাসে, দোকানে সর্বত্রই আগামী রেলওয়ে ধর্মঘট সম্বন্ধে একটা তীক্ষ্ণ ঔৎসুক্য লক্ষ্য করে পৃথ্বী। "কি হে পৃথ্বী, সত্যি কি রেল ষ্টীমার সব বন্ধ হয়ে যাবে।" এক বৃদ্ধ আত্মীয় রাস্তা থেকে

ডেকে বসায় পৃথ্বীকে একটা পরিচিত ওষুধের দোকানে। চোখে মুখে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মিশ্রিত প্রশ্ন, "সমস্ত ভারতে যদি রেলগাড়ীর চাকা বন্ধ করতে পারে কম্যুনিস্টরা, তবে বুঝতে হ'বে, যুগের চাকা সত্যি ঘুরে আসছে।"

কম বয়সের কম পাউণ্ডারটি আর যেন চুপ করে থাকতে পারে না। উত্তর দেয়, "সত্যি না হ'লে আর এ ঘোষণা করতো না তারা। নিজেদের শক্তি না বুঝে কাজে নামে না এরা।" পূর্ণ বিশ্বাস ছাপিয়ে উঠেছে চোখে মুখে। "দেখবেন এবার, যা কোনদিন দেখেননি এতখানি বয়সে।"

সাধারণ মানুষের এ প্রত্যাশাময় আগ্রহ হৃদয় দিয়ে লক্ষ্য করে পৃথ্বী। বোঝে, কেন এত আগ্রহ, এত উৎকণ্ঠা এদের এই ধর্মঘটের ব্যাপারে। জনসাধারণের ভাগ্যও যে জড়িয়ে রয়েছে আজ শ্রমিকদের স্বার্থের সাথে। তাই এদের সফলতা-বিফলতার প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না তারা। ছোট ছোট চায়ের দোকানগুলিতেই আরও বেশী চাঞ্চল্য। মুখর আলোচনা। প্রত্যেকের মুখে একই কথা—রেল ধর্মঘট। চোখে উৎসাহী প্রতীক্ষা।

দিন এগিয়ে আসতে থাকে। কফি হাউজের একটি গোলটেবিলের চারপাশে আলোচনা গরম হ'য়ে উঠেছে। ভিতরের উত্তেজনা আর চেপে রাখা অনাবশ্যক। "ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এই ধর্মঘট।" সগর্ব মুখর হাসির সমর্থন কমরেডদের চোখে।

"এই ধর্মঘটের সফলতা বিফলতার উপরই বোঝা যাবে আমাদের ভাগ্যচক্র কোনদিকে।"

"বিফলতা? কেন কোনও সন্দেহ জমেছে নাকি?"

পৃথ্বীও একটা চেয়ার টেনে বসেছে। এক জন পুরান বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

মৃদু সংশয়ের সুরে বলে পৃথ্বী, "কিন্তু, রেলওয়ে ইউনিয়ান থেকে বেরিয়ে আসাটা ঠিক হ'ল বলে মনে হচ্ছে না আমার।"

এক সাথে সব কয় জোড়া চোখ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পৃথ্বীর উপরে। "তাছাড়া উপাযই বা ছিল কি ?" প্রতিবাদ করে বন্ধুটি।

"উপায় ছিল, রেল শ্রমিকদের সংগঠনের সাথেই মিশে থাকা।"

"সেখানে ত সোশ্যালিষ্টদের নেতৃত্ব। তাদের সাথে মিশে থাকার অর্থ তাদের নেতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া। তাহলে ত রেলশ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে সংগ্রাম করা কোনদিনই হোত না।"

আরেক জন কমরেড উত্তর দেয়, "সংগ্রামী শ্রমিক একবার সংগ্রাম আরম্ভ করলেই, এই সমস্ত দালালদের নেতৃত্ব থেকে শ্রমিকদের ছাড়িয়ে আনা সম্ভব।" তর্ক শুরু হয়।

ডাক আসে শীতাংশুর—'কাজ' শুরু করতে হবে। নন্দলালের বিশ্বস্ত কমরেড ব্যোমকেশের উপর ভার পড়ে—তার সাথে সংযোগ রাখার ! কিন্তু কোনদিনই ব্যোমকেশকে পছন্দ করতে পারেনি শীতাংশু। তার কুঞ্চিত চোখের ভাঁজে ভাঁজে যেন এক অপরিচ্ছন্ন মনেরই আভাস।

তবে শীতাংশুর সাথে প্রথম থেকেই নিজে যেচে ঘনিষ্ঠতা জন্মাতে চেষ্টা করে ব্যোমকেশ—"একজন গোল্ড্ মেডেলিস্ট হ'য়েও গতানুগতিক 'কেরিয়ারের' পথে পা না বাড়িয়ে এ পথে আসাটা উদাহরণ যোগ্য।"

নিজের স্তুতিতে বিচলিত হ'বার মত ছেলে নয় শীতাংশু, তবু মন দিয়ে শুনে যায়—কি একটা রহস্যের সন্ধান খোঁজে। ডেকে পাঠিয়েছে ব্যোমকেশ,—কোন জরুরী কথা আছে। শীতাংশু ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে যথাসময়ে যথাস্থানে হাজির হয়। ছোট্ট একখানা অপরিসর আধ-অন্ধকার ঘর। ঘরের এক কোণায় বেঞ্চিতে বসা দুজন কৃষক কমরেড

মন দিয়ে শুনে যাচ্ছে ব্যোমকেশের কথা—সংগ্রামী কৃষকের দায়িত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগের বহু উদাহরণ। গ্রীস-চীন-তেলেঙ্গানা-গাড়ো-অঞ্চল-বড়াকমলাপুর···ভেসে ভেসে চলেছে যেন চোখের তারায়। কমরেড দু'জন সমস্ত হৃদয় দিয়েই গ্রহণ করছে এক সংগ্রামী নেতার অমোঘ বাণী।

তারপর বিদায় নেবার আগে মনের সাথে বহু সংগ্রাম করে মিনতির সুরে বলে, "কমরেড, একটা আবেদন ছিল। আমাদের এলাকার কর্মীদের জেল থেকে জামিনে খালাস করার জন্য কিছু টাকা যদি দিতেন এ টাকা থেকে। আর"—কথাটা শেষ করতে দেয় না ব্যোমকেশ। গম্ভীর সুরে উত্তর দেয়, "দানছত্র খুলবার জন্য এ-টাকা নয়।"

কৃষক এলাকা হ'তে সদ্য-পাওয়া টাকার পুঁটলীটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, "এসব সংগ্রাম-তহবিলের টাকার এক পয়সাও এদিক-ওদিক খরচ করার জন্য নয়।"

শীতাংশু একবার তাকিয়ে দেখে, কৃষকদের লজ্জিত মুখের দিকে। শুকনো মুখ দেখে খেয়াল হয়, সারাদিন নিশ্চয়ই না খেয়ে আছেন। ব্যোমকেশ দশমিনিটের জন্য কোথায় যায়। সেই ফাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করে সে, "সারাদিন খাওয়া হয়েছে?" "খাওয়া হবে কোথা থেকে। সেই মাঝরাতের আঁধারে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি গাড়ী ধরতে। তার পর গাড়ী থেকে নেমে এই পর্যন্ত ত এখানেই অপেক্ষা করছি টাকা নিয়ে ওনার জন্য। এই ত মাত্র দেখা পেলাম। কতবড় নেতা এনরা—এনাদের কি আর সময় হয়ে উঠতে চায়?" গর্বের সুরে উত্তর দেয় কমরেডটি।

আরেক জন কৃষক কমরেড জানায়, "আর আমরা কি কোলকাতার পথঘাট চিনি—কোথা থেকে কোথায় যাব—তাই আর বের-টের হইনি।"

কোলকাতার একজন কমরেডের সাথে অকুণ্ঠিত চিত্তে কথা বলতে পেয়ে আরও একটু মন খুলে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা কমরেড, চীন নাকি দখল হ'য়ে গেছে। কাগজে নাকি বেরিয়েছে ?"

তাদের উৎসাহিত সুরটি লক্ষ্য করে মনে মনে খুশি হয় শীতাংশু। "আর একমাসের মধ্যেই দখল হয়ে যাবে, আশা করছি।" একই সুরে উত্তর দেয় সেও ।

ব্যোমকেশ এসে পড়ে। শীতাংশু নিজের ফাঁকা পকেটটা হাতড়ে দেখে একবার। কিন্তু সংগ্রামী যুগে ব্যোমকেশের কাছে মনের দুর্বলতার পরিচয় দিতেও বাধ বাধ ঠেকছে। তবু না বলে পারে না, "এঁরা যে সারাদিন না খেয়ে আছেন।"

"এরা বুদ্ধিজীবী নয়—দস্তুর মত কৃষাণ কমরেড। একদিন না খেয়ে থাকতে পারবে না ?" পিঠ-চাপরান সুরে জবাব দেয় ব্যোমকেশ।

রাত আটটার আগে কোনও ট্রেন নেই। তাই একটা বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়ে দু'জনে।

"সময় মত চলে যাবেন কুরিয়েরের সাথে। দেখবেন, ট্রেন যেন ফেল করবেন না। এখানে কিন্তু থাকার জায়গা হ'বে না রাতে।" বলে' শীতাংশুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ব্যোমকেশ।

"একটু চা খাওয়া যাক।"

ব্যাগের ভিতরে কোনও জোতদার বধূর হাতের দাগ মাখা টাকার পুঁটুলিটা স্বস্তির সাথে অনুভব করছে যেন সে।

রেষ্টুরেণ্টে ঢোকে শীতাংশুকে নিয়ে। ডবল কাপ চায়ের অর্ডার দেয় আর ডিমের পুরু অ্যামলেট্। রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষমান ভীড়ের দিকে অনুকম্পার চোখে একটু তাকিয়ে বলে ব্যোমকেশ, "অফিসের ভীড় শুরু হ'য়ে গিয়েছে। বাসের জন্ত দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা চলবে না এখন। একটা ট্যাক্সী ডাকা যাক।"

শীতাংশুর মনের পর্দায় কৃষক কমরেড দুজনের অভুক্ত চেহারাটারই ছাপ পড়ছে বারে বারে। আর ব্যোমকেশের বিদ্রূপমিশ্রিত খোঁচাটা—"বুদ্ধিজীবী নয় এরা—দস্তুর মত কৃষাণ কমরেড—একদিন না খেয়ে থাকতে পারবে না ?"

ট্যাক্সী চলেছে বিস্তর অলি গলি পার হ'য়ে উন্মুক্ত ময়দানের পাশ কাটিয়ে পরিচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে।

সুন্দর একটি ফ্ল্যাটবাড়ীর সামনে এসে ট্যাক্সী বিদায় দেয় ব্যোমকেশ। চারতলার উপরে দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাটে থাকে সে।

বহু প্রশ্ন ভরা চোখে তাকিয়ে দেখে শীতাংশু সেই বসবার ঘরের সৌখিন আসবাব—ফুলদানিতে ফুলের গুচ্ছ! সুন্দর বিলিতী পেয়ালায় চায়ের সুগন্ধ ধোঁয়া উড়ছে।

ব্যোমকেশ তার স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। স্বামীর প্রতি কটাক্ষময় ইশারায় কি যেন জানিয়ে দেয় সে। শীতাংশু লক্ষ্য করেও করে না।

গবেষণা শুরু করেছে সে ব্যোমকেশকে নিয়েই। কি ব্যাপার! কম্যুনিজমের ছিটে ফোঁটা গন্ধও ত নেই কোথায়ও। শুধু বিলিতী ফুলের মৃদু গন্ধ ফুলদানী হ'তে ছড়িয়ে পড়ছে, জড়িয়ে ধরছে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে। আবার মনে মনে চিন্তা করে, হয়তো—এ শুধু ক্যামো-ফ্লেজই। কিন্তু ওদের ঐ আয়েশী নিশ্চিন্ত চেহারা, এও কি ক্যামো-ফ্লেজ হ'তে পারে! একটা অস্বস্তিকর মৌন উত্তেজনায় অপেক্ষা করতে থাকে শীতাংশু। বৌটি চলে যায়। এইবার কাজের কথা শুরু করে ব্যোমকেশ।...

ব্যোমকেশের আমলাতান্ত্রিক স্বর আছড়ে পড়ছে নরম গালিচা-বিছান সিটিং রুমের নীলাভ আস্তরণে। কথা শেষ হয়। বিদায় নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে শীতাংশু। বিস্মিত উত্তেজনায় বাক্‌রোধ

হ'য়ে গিয়েছে তার! এখানেও তবে ভেজাল! মনের তলায় লাখো লাখো প্রশ্ন ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। ব্যোমকেশের ঘরের প্রতিটি আসবাব, দেওয়ালের নীলাভ আস্তরণ, স্ত্রীর বিলোল কটাক্ষ, তার আমলাতান্ত্রিক গম্ভীর কণ্ঠস্বর—প্রতিটি যুক্তি, প্রতিটি কথা—কথা বলার প্রতিটি ভঙ্গি ব্যবচ্ছেদ করে চলেছে শীতাংশুর কেমিষ্ট মন।

এত নিশ্চিন্ত আয়েশে উৎস কোথায় ?

কিন্তু একথা প্রকাশ করারও উপায় নেই কারও কাছে। কণ্ঠনালী কেটে দেওয়া গোপন দায়িত্ব।

মার্চের উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন। আর বারো ঘণ্টা পর সর্বভারতীয় রেল ধর্মঘট শুরু হ'য়ে যাবে। চাপা উত্তেজনা ক্রমশই তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠছে কমরেডদের মনে। আত্মগোপন করা নেতাদের গোপন আস্তানাগুলিতে নিশ্চয় এখন প্রস্তুতির সাজ-সরঞ্জাম শুরু হ'য়ে গিয়েছে। বৈপ্লবিক সংকেত পাঠান হ'চ্ছে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। শোনা যাচ্ছে, মিলিটারী সৈন্যের সাহায্যে নাকি গাড়ী চালান হ'বে। তাহলে পিকেট করাতে হ'বে—রেল লাইনের উপর সারি দিয়ে শুয়ে থাকবে পিকেটাররা।

আরণ্যক স্তব্ধতা বিরাজ করছে। দরদীদের চোখে মুখে চাপা চাঞ্চল্য।

ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়েছে ফল্গু, রাতে আর ফিরবে না, বলে গিয়েছে পৃথ্বীকে। মনটা শংকিত হ'য়ে রয়েছে পৃথ্বীর—পিকেটারদের উপর গুলি চালান অসম্ভব নয় আর আজ।

পৃথ্বী লক্ষ্য করে, ফল্গুর বন্ধুদের চোখে মুখে দায়িত্বের গাঢ় চিন্তা আর আত্মত্যাগের উদ্দীপনা।

মনে মনে ভাবে পৃথ্বী, এদের এই প্রাণ-তুচ্ছ-করা আত্মত্যাগ, এ কর্মনিষ্ঠা, সফল হ'বে ত ? বারে বারে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করে সে।

পুলিশের কর্মতৎপরতা বেড়ে গিয়েছে বিকেল থেকেই। রাস্তায় রাস্তায় ছুটোছুটি করছে লরী ভর্তি সশস্ত্র সৈন্য। সেই সৈন্যের হাতেই সঁপে দেওয়া হয়েছে নগরী। প্রত্যেক থানার সামনে লরী বোঝাই সৈন্য মোতায়েন। লরীর মধ্যে সৈন্যরা বসে বসে বিড়ি ফুঁকে ফুঁকে শরীরটা চাঙ্গা রাখছে।

ডালহৌসীতে পুলিশ অফিসারদের কর্মক্ষিপ্রতা আরও তীব্র। ঘোড়ার খুরে খুরে সজাগ হ'য়ে উঠছে নিরীহ পথচারীও। তাহ'লে সত্যি কিছু ঘটবে কাল।

পৃথ্বী লক্ষ্য করে পুলিশ সার্জেণ্টদের ব্যস্ততা। সমস্ত দিনের ছবির মিলিত সুরে মনের সংশয় মিলিয়ে গিয়েছে। "তাহ'লে এরাও ভড়কে গিয়েছে।" আশার সুর রণিয়ে উঠে মনে।

উনুনের উপর গরম জল বসিয়ে তার উপর ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে রাখে শীতা। সারাদিন অপেক্ষা করছে সে ফল্গুর জন্য। সারাদিন কি আর ওদের পেটে অন্ন পড়েছে আজ। চোখমুখ দেখেই বুঝেছে শীতা কি যেন করতে চলেছে ওরা। ওদের চোখে মুখে ছাপিয়ে উঠেছে কিসের এক আশু সম্ভাবনার চঞ্চলতা।

রাত্রিতে ব্যস্ত পায়ে ঘরে ঢোকে ফল্গু, দ্রুপদ আরও দুটি ছেলে। "দিদি, ভাত হ'বে বেশী—তিনজনের মত ?"

"তিনজন কেন—আরও কারও দরকার থাকলে ডেকে নিয়ে আয়।"

"আর কেউ আসতে পারবে না এখন। দেরি করতে পারবো না কিন্তু—সময় নেই।"

শীতা তাড়াতাড়ি ভাত নিয়ে আসে। উৎকণ্ঠাভরা চোখে তাকিয়ে দেখে, ওদের চোখ-মুখের উত্তেজনা।

এই কি শেষ খাওয়ান? ছ্যাৎ করে উঠে বুকটা। শীতা অনুমানেই বোঝে, এমন কিছু করতে যাচ্ছে এরা যাতে মৃত্যু ঘটাটা অভাবনীয় নয়।

খাওয়া শেষ হ'লে আবার বেরিয়ে পড়ে সবাই। শীতা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওদের গতিপথের দিকে। রাত্রির বুকে ঘন কুয়াশার ঘোমটা। দূরে কোনও বাড়ীর রেডিওতে রাগপ্রধান উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত চলেছে।

শীতা মৌন হ'য়ে ভাবে—কত জীবনমরণ সমস্যা আজ এ-সব সংগ্রামী ছেলেদের। আর তারই পাশে পাশে কত নিশ্চিন্তে গার্হস্থ জীবন যাপন করছে বিত্তশালী সংসারী মানুষেরা।...

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের সুরের আলোড়ন ভেসে চলেছে বেতার তরঙ্গে। সুর ত নয় যেন বেদনার প্রস্রবণ। যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল বেদনা তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠেছে কোন দূর অন্তরীক্ষের আড়ালে।...

রাস্তার একটা মোড় থেকে ফল্গু আর দ্রুপদ বিদায় দেয় সুব্রতকে। নীরব হাস্যে বলে সুব্রতকে "চলি, আবার যদি দেখা হয়।"

মনের তলায় বয়ে চলেছে নূতন উত্তেজনার রোমাঞ্চ। তবু মনটা ভিজে উঠে একবার, সত্যি যদি দেখা না হয় আর! যদি ফিরে না আসে! আবার সচেতন করে তোলে বিপ্লবী মনকে। কোনও পিছু আকর্ষণ নয়। এগিয়ে যেতে হবে শুধু সামনে।

মহালগ্নময় এ রাত্রি। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে এ রাত। নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে দুজনে—ফল্গু আর দ্রুপদ। দুজন দুজনের উষ্ণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও অনুভব করছে যেন।

কি ভীষণ কুয়াশা পড়েছে—কিছু দেখা যাচ্ছে না। একটা 'লেভেল ক্রসিং' পার হয় তারা। গেট বন্ধ। গাড়ী আসছে।

মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হাসে দ্রুপদ, 'এ গেট আর খুলতে হ'বে না—চাকা বন্ধ হো গিয়া।'

কিন্তু এ পথ দিয়ে আর নাও ফিরতে পারে তারাও।

"এসে পড়েছি।" নীচু গলায় বলে দ্রুপদ। নিঃশব্দ উত্তেজনা। নীরব উৎকণ্ঠা।

কিন্তু মোহিত দা ত আসেনি!

তিনটা বাজলো বহুদূরে কোন এক বাড়ীতে। আধঘণ্টা কেটে যায়—কোথায় মোহিত দা!

উৎকণ্ঠা বেড়েই চলে—কিন্তু মোহিতদার পাত্তাও নেই কোথায়ও। অদূরেই একটা থানা-ঘরের বারান্দায় নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে জমাদাররা। তাকিয়ে দেখে দুজনে ওদের এই নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। আরও আধঘণ্টা কাটে।

রাগে দুঃখে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ফল্গুর। প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হ'য়ে বের হ'য়েছে তারা। আর কিনা এমন বেকুবের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখতে হচ্ছে শুধু।

আকাশ ফর্সা হ'য়ে আসে। মুরগী ডেকে উঠেছে দূরে কোন এক বাড়ীতে।

হতাশ হ'য়ে বসে পড়ে ফল্গু মাঠের উপর।

"এভাবে আমাদের বসে থাকটা ঠিক হ'বে না। চল ফিরে যাই। সব খবর সেখানেই পাওয়া যাবে।" বলে দ্রুপদ।

"তুমি যাও। আমি এখান থেকে নড়ছি না—।"

"কি ছেলে মানুষের মত করছো, ফল্গুদা।"

"তুমি বুঝবে না—এসব ব্যাপারে ছেলেখেলা নয়। মোহিতদার না আসার কারণ কি?"

সন্দেহের গাঢ় ছায়া নেমে এসেছে তার চোখেমুখে।

দ্রুপদ বলে, "সে বোঝাপড়া নিশ্চয়ই হ'বে। এখন উঠ ত।"

ফেরার পথে হাঁটে দুজনে। লেভেল ক্রসিং বন্ধ এখনও—সিগন্যাল ডাউন। একটা গাড়ী এগিয়ে আসছে—তার বাঁশীর তীব্র আওয়াজে বিস্মিত হ'য়ে তাকায় দুজনে।

বিস্ময় আর হতাশায় ফেটে-পড়া দুজোড়া চোখের সামনে দিয়ে তীরের বেগে এগিয়ে আসতে থাকে ইঞ্জিনের চাকাগুলি।

. .

ভোর চারটায় একটা ইঞ্জিনের হুইসিল শুনে ঘুম ভেঙে যায় পৃথ্বীর। কান পেতে শোনে—গাড়ীরই শব্দ। লাইনের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে বিরাট লৌহ চাকাগুলি—দীর্ঘ একটানা চাকার শব্দ। "কি ব্যাপার।" জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পৃথ্বী। দূর থেকে লক্ষ্য করে, একটা মালগাড়ী চলেছে মন্থর গতিতে।

গেটকিপারের কাছে খোঁজ নিতে যায় সে—"মালগাড়ী গেল বুঝি।"

"এই ত এখুনি প্যাসেঞ্জার আসছে। সিগন্যাল ডাউন হ'য়ে গিয়েছে।"

"প্যাসেঞ্জারও আসছে? বলে কি!" হয় তো সিগন্যাল ডাউন পর্যন্তই, মনকে আশা দিতে চেষ্টা করে পৃথ্বী। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই গাড়ী এসে পড়ে।

করুণ চোখে তাকিয়ে দেখে পৃথ্বী, তীব্র হুইসিল দিয়ে আত্ম-ঘোষণা জানিয়েই ছুটে আসছে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেন। দৈত্যের মত ইঞ্জিনের চাকাগুলি যেন সংগ্রামী মানুষের একাগ্র আশাকে পিষে পিষে গড়িয়ে চলেছে লাইনের উপর দিয়ে।

ইঞ্জিনের সামনে বসা সেই কালীমাখা ড্রাইভারই—সশস্ত্র সৈনিকও নয়। হতাশ চোখে দেখে পৃথ্বী।

হয় ত শুধু লোকাল ট্রেনগুলিই চলছে। মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার

সুরেই বলে সে। বাড়ী এসে হাত মুখ ধুয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে শিয়ালদার দিকে।

স্টেশনে এসে দেখে, আপ ডাউন সব গাড়ীই যথারীতি আসছে—যাচ্ছে।

পরিচিত বহু কমরেডের সাথে দেখা—একই কারণে এসেছে। চোখে একই বিমূঢ় বিস্ময়। বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া হয়ে দাঁড়ালো নাকি, প্রশ্ন করছে। "দার্জ্জিলিং মেইল পর্যন্ত ইন করলো। এখনও আশা করছেন!" আর এক কমরেডের নিরাশ উক্তি শোনা যায়।

কিন্তু পৃথ্বীর মনের সন্দেহ ক্রমশই দানা বাঁধছে।······রাত্রিতে বাড়ী ফিরে দেখে, ফন্তু একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েচে। তার এই অসার অবস্থা দেখে পৃথ্বী হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না।

"ব্যাপারটা কি হ'ল, ফন্তু? এত গরম পোষ্টার—এত শ্লোগান। এখন যে পথে ঘাটে মুখ দেখানই দায় হবে।"

ফন্তুর চোখমুখ রাগে ফেটে পড়ছে যেন। উত্তর দেয় "সে আমরাও ছাড়বো না নেতাদের কাছে এর জবাব চাইতে। দেখে নিতে আমরাও জানি।"

কুরী আর ফন্তু দু'জনে মিলে পৃথ্বীদের নীচের তলার একটি অব্যবহার্য ঘব ঝাড়া-পোঁছা শুরু করে। ছাত্রদের এক জরুরী সভা হবে—ইউজি কমরেডরাও আসবে। ঘরময় পুরু ধুলো, ভাঙা চেয়ার টেবিল, সাবেক আমলের পালংক, খাটের ডালা—পরিত্যক্ত শিশিবোতলের স্তূপ—সব টেনে বের করে বারান্দায়।

একটা ভাঙা অর্গান। ফন্তু অর্গানটা একটু নেড়েচেড়ে বলে "এমন ভাল জিনিসটার এই দুর্দশা।"

"ওটাতে হাতুরী দিয়ে পিটালেও আর সুর বের হবে না।" উত্তর দেয় কুরী, "আমার মা নাকি ভাল গাইতে জানতেন। তাঁর মৃত্যুর

পর পাড়ার অ্যামেচার থিয়েটার উপলক্ষ্যে বহু বেসুরোদের সুরচর্চা হ'য়েছে ওর উপর। ফলে একেবারেই স্বরভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে ওনার।"

ফল্গু আর কথা না বলে ঘর পরিষ্কার করতে থাকে। পাহাড়ের গায়ে হঠাৎ আটকে পড়া তুষার খণ্ডের মত তার মনের কোন একটা স্তরে যেন কুরীর দুইটি মাত্র কথা আটকে লেগে থাকে "আমার মায়ের মৃত্যুর পর।" তারপর সে তুষার থেকে এক অজানা স্নেহের ঝরণা বয়ে চলে অনুভূতির উপলখণ্ড বেয়ে।

কুরী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে—"ওরে বাবা, সাপ। সরো শীগগীর।"

ফল্গু চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখে, একটা মস্ত ইঁদুর পালিয়ে যাচ্ছে ভাঙা এক সুটকেসের ভিতর থেকে। সুটকেসটা নাড়া দিতে একপাল বাচ্চা ইঁদুর ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

ফল্গু হেসে বলে, "এই তুমি বিপ্লবী মেয়ে। একটা ইঁদুর দেখে দশহাত লাফ দাও।"

"কি করে বুঝবো, ওটা যে ইঁদুরের লেজ।"

"ভয় জিনিসটা ত এরকমই। সর্পভ্রম রজ্জু থেকেই হয় বেশীর ভাগ সময়।" ঠাট্টার সুরে বলে ফল্গু।

ঘর পরিষ্কার হয়ে গেলে মন দিয়ে তাকিয়ে দেখে বলে ফল্গু "মন্দ হবে না। নিরিবিলি আছে।"

ফল্গু জলের বালতি আর ঝাঁটা নিয়ে আসে।

কুরী বাধা দেয় "তোমার জ্বর নিয়ে আর জল ঘাঁটতে হবে'না। আমিই ধুইয়ে দিচ্ছি।"

কয়দিন ধরেই জ্বর চলছে ফল্গুর—মাথারও যন্ত্রণা আছে। কিন্তু শুয়ে থাকার সময় নয় এখন। ছাত্রনেতাদের সাথে বোঝাপড়া না হতে মনের শান্তি নেই তার।

নন্দিতা আর সুজয় এসে পড়ে।

"আমরা একটু আগেই এলাম। কয়টা কাজ সেরে নেব এখানে বসেই।"

কুরী একটু ভাললাগার চোখে তাকিয়ে দেখে দু'জনকে।

ফল্গু বারে বারে রাস্তার দিকে তাকায়—দ্রুপদরা আসছে না কেন। চার্জসিটের কাগজ পত্রের ফাইল সব দ্রুপদের কাছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেকজন ছাত্রনেতা এসে পড়ে—উমাপতি। এ দিকে ফল্গুদের পক্ষের দ্রুপদ-বোধন-সমীরও আসে।

আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু প্রথমেই যে ধরনের সুর শোনা যায় দ্রুপদের মুখে তার ত মনে হয় সারাদিনই আজ এখানে থাকতে হ'বে।

উমাপতি একটু উসখুস করে বলে "ফল্গু, এটা ত শুনেছি কুরীদের বাড়ী। একটু চা টা হ'তে পারে নাকি।"

"চা-ই শুধু—টা আর নয়।" "চা আসছে" বলে উঠে যায় ফল্গু। রান্নাঘরে এসে দেখে, কুরী রান্নার আয়োজন শুরু করেছে সবার জন্যেই। ফল্গু মনে মনে খুশি হয়। মুখে গম্ভীর হ'য়ে বলে, "না জিজ্ঞেস করে যে এসব আরম্ভ করেছো ওরা যদি এক্ষুণি চলে যায় এসব রান্না নষ্ট হ'বে ত?"

কুরী উত্তর দেয়, "যে আন্দাজে মাথা গরম দেখলাম দ্রুপদদার এ বেলার রান্না ত কাজে লাগবেই রাতেও রাখতে হয় কিনা দেখো একবার। হাতে পেয়ে এখুনি ছাড়ছে কিনা দ্রুপদদা এই নেতাদের।"

মনে মনে বলে ফল্গু, "দ্রুপদ চটবে না ত চটবে কে এমন বোকা বোধহয় জীবনে হইনি আমরা"

"চা-টা একটু তাড়াতাড়ি চাই। একঘণ্টা চা না পেলেই শ্রীমানদের আবার গলা কাঠ হয়ে আসে।"

দুপুর বেলা কুরী হাঁড়ি শুদ্ধ ভাত ঐঘরেই দিয়ে আসে। যে

যেখানে বসা, সেখানে থেকেই হাতে হাতে একটা করে ডিস তুলে নেয়। পৃথ্বী একবার ঘুরে একটু তদারক করে যায়। এদের খাওয়ার ধরন দেখে মনে মনে হাসে। খাওয়ার সংগ্রামটাই বড় কথা এদের—খাওয়াটা নয়। একেবারেই স্বতন্ত্র জীবন যাত্রা এদের। পাঁচ মিনিটেই খাওয়া শেষ হয়ে যায় ছেলেদের। নন্দিতা একটা মাছের মুড়ো নিয়ে চিবোচ্ছে। উমাপতি তাড়া দেয় "তাড়াতাড়ি শেষ কর, নন্দিতা।"

নন্দিতা একটু ঠাট্টার সুরে বলে, "দাঁড়াও। কতদিন পর এত ভাল খাবার জুটলো ভাগ্যে। এক হিন্দুস্থানীর বাড়ীতে থাকি। মাছের আঁশও ঢোকার উপায় নেই সে বাড়ীতে"।

ফল্গুরা ডিসগুলি সরিয়ে নিয়ে যায়। মুখ ধুয়ে এসে আবার সবাই বসে আলোচনায়। আলোচনা ত নয়—তুমুল তর্ক। দুই পক্ষই সমান।

ফল্গুরা বলতে চায় "শ্রমিক শ্রেণী একেবারেই সংগঠিত নয়—শুধু স্বতস্ফূর্ততার পিছনেই ছোটা হ'চ্ছে।"

দ্রুপদ জোর দিয়ে বলে, "শ্রমিকশ্রেণী যে সংগঠিত নয়, তার জলন্ত দৃষ্টান্ত, রেলওয়ে স্ট্রাইকের ব্যর্থতা।" "ভ্যানগার্ডিজম ছাড়া আর কিছুই নয় এসব আন্দোলন।" ক্রমশই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে দ্রুপদরা। চোখ দিয়ে প্রতিবাদ ঠিকরে বের হ'চ্ছে। দ্রুপদ ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠে "তাছাড়া আমাদের ধাপ্পাও দেওয়া হ'চ্ছে। স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে এছাড়া আর কিছুই বলার নেই।"

সুজয় আগুন হ'য়ে উঠে। একজন নেতার মুখের উপরই এতবড় দুঃসাহসিক অভিযোগ!

"নেতাদেরও সমালোচনা করার মত তোমাদের এই ঔদ্ধত্য দেখে অবাক হচ্ছি আমি। একে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।"

নন্দিতা শান্ত করতে চেষ্টা করে সুজয়কে। "এ ভাবে বললে ত চলবে না। ওদের বুঝিয়ে দিতে হ'বে যে, ওদের এসব ধারণা

অপরিপক্কতার লক্ষণ।" সুব্রয়কে থামিয়ে নন্দিতাই বলতে শুরু করে—"চারদিকে এখন বিক্ষোভ জ্বলে উঠেছে—সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে আজ বিক্ষোভ, আন্দোলন, অভ্যুত্থান—শ্রমিক, কৃষাণ, ছাত্র, কেরাণী সকলের মধ্যেই আজ আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এ সময়ে শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত নয় বলে এই অভিযোগ আনাটা—শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিকে খাটো করেই দেখা। শ্রমিক শ্রেণী যদি সংগঠিত নাই হোত—তাহ'লে পুলিশের এত নির্যাতনও শুরু হোত না। পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি থেকেই ত এটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠে যে, শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত শক্তিতেই ভীত হ'য়ে উঠেছে শত্রুপক্ষ। একটা ধর্মঘটের ব্যর্থতা থেকেই তোমাদের এ সিদ্ধান্তে আসা মূর্খতা। এ ব্যর্থতার কারণ ক্যাডারদের বিশ্বাসঘাতকতা। এবারকার ব্যর্থতা থেকে এই শিক্ষা হ'ল আমাদের যে, এসব ছদ্মবেশী ক্যাডারদের একবিন্দু মমতা না করে পার্টি থেকে সরিয়ে দিতে হ'বে।"

যুক্তির পিঠে যুক্তি। আলোচনা শেষই হয় না। যার যত মনের জ্বালা উজাড় করে ঢেলে না দিলে শান্তি পাচ্ছে না কেউই।

উমাপতি উঠে দাঁড়ায়, "যা মশা, এখানে আর বসা চলছে না। ফল্গু, তুমি একটু নজর রেখো। ছাদে গিয়েই বসি আমরা। রাত্রিবেলা নিশ্চয়ই কেউ আর এতদূরে আসছে না পৃথ্বীবাবুর খোঁজ করতে।"

ছাদে এসে বসে সবাই। দ্বিতীয়বার সান্ধ্য চা দিয়ে গিয়েছে কুরী।

কুয়াশার ঘোমটা জড়ানো জ্যোৎস্না রাত। নিস্তরঙ্গ দীঘির আয়নায় মুখ দেখছে রূপসী চাঁদ। কিন্তু চাঁদনি রাতের কুহেলী তার রূপের ইন্দ্রজাল বিছিয়েও আচ্ছন্ন করতে পারছে না এদের সুদূর প্রসারী দৃষ্টির প্রভাকর দীপ্তিকে।

দৃঢ় মুঠি দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিচ্ছে যেন এক বিপ্লবী মেয়ে

এ মোহময় চাঁদের যাদু প্রভাকে। দম না নিয়ে কথা বলে চলেছে নন্দিতা। আর বেশী সময় নেই। এখনি যেতে হ'বে।

মিটিং শেষ হয়। কিন্তু কথা শেষ হয় না। "আবার আর এক দিন মিট্ করবো" বলে উমাপতি।

প্রসন্ন চোখে বিদায় জানিয়ে যায় সবাই কুরীকেও। নিকট-আত্মীয়তার সম্ভাষণ সকলেরই চোখে। কুরী ছাদে দাঁড়িয়ে দেখে, ওদের চলে যাওয়া। নির্ভীক আত্মার ঘোষণা যেন অ-কম্পিত প্রতি পদক্ষেপে।

দূরে কুয়াশার আড়ালে অস্পষ্ট হ'য়ে যায় সার্ট-প্যাণ্ট্-ধুতী-শাড়ী-পরা প্রাণবন্ত দেহ ভঙ্গিগুলি। শ্রদ্ধায় অভিভূত হ'য়ে আসে তার দৃষ্টি। সামনেই এলোমেলো ছড়ান রয়েছে ছাদে সিগারেটের পোড়া টুকরো, কাগজ-পোড়া ছাই আর চা-খাওয়া পেয়ালা পিরিচ। কুরী পেয়ালাগুলি জলের বালতিতে ডুবিয়ে রেখে ঝাড় দিয়ে ফেলে ছাদটা। সমস্ত দিনের আমেজ মনে। বড় ভাল লাগে তার কমরেড ছেলে মেয়েদের এই আদর্শমণ্ডিত জীবন।···

কয়দিনের মধ্যে ফল্গুর উপর আদেশ আসে কৃষাণ এলাকায় গিয়ে কাজ করতে হ'বে তাকে। কৃষাণ এলাকায় গিয়ে কাজ করলেই মধ্যবিত্ত মনের এসব দ্বন্দ্ব কেটে যাবে—জানিয়ে যায় সুজয়। যাবার দিন স্থির হ'য়ে যায়। কুরীয়ের এসে নির্দিষ্ট স্থান হ'তে নিয়ে যাবে তাকে।

কুমারী বাস পর্যন্ত আসে এগিয়ে দিতে। মনের তলায় বলতে-না-পারা বহু কথার ভীড়। ফল্গু হয়ত জানেও না তার মনের খবর। জীবনে আর জানা হ'বেও না। জীবনে আর দেখাই হ'বে কিনা ফল্গুর সাথে কে জানে। চোখের পাতা ভিজে ভিজে আসে বার বার। তবু হাসিমুখেই বিদায় দিতে হ'বে তার কর্মসাথীকে। ফল্গু লক্ষ্য

করেছে কুরীকে—তার কাল দৃষ্টির গহনে ঘনিয়ে-উঠা ব্যথার বাষ্প। তবু লক্ষ্য না করার ভাণ করেই বিদায় নিতে হ'বে তাকে। হাসিমুখে বিদায় গ্রহণ করে "আমাদের অসম্পূর্ণ কাজের ভার রইল তোমাদের উপর—মনে থাকবে ত।" কুমারীও হাসিমুখেই জবাব দেয় "মনে থাকবে।" প্রতিশ্রুতিময় উত্তর দৃঢ়স্বরে।

বাস এসে পড়ে। শহরতলীর বাস। মানুষের গাদাগাদি ভিতরে। বাসের পা-দানীতে উঠে দাঁড়ায় ফল্গু। শেষ বারের মত তাকিয়ে দেখে কুরীকে। লালপাড় শাড়ির আঁচলটা উড়ছে বাতাসে, পিঠের উপর ছাড়া-চুলের এলোমেলো দুই একটা গোছা উড়ছে কপালের উপর। আর তারই আড়ালে ছলছল করে উঠেছে যে সবখানি মন, প্রকাশ করতে না চাইলেও অপ্রকাশিত রাখতে পারেনি তা' সে। পেছনে স্তিমিত রৌদ্রে ঢাকা মাঠের বুকেও যেন একই বিষণ্ণ দৃষ্টি।

বাস ছেড়ে দেয়। দূর থেকে হাত তুলে লাল সেলাম জানায় কুরী। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ে প্রথম প্রেমের বেদনা, আতংক আর কুমারী-হৃদয় মথিত কল্যাণী কামনা।

ঘুম ভেঙেই প্রথম কথা মনে হয় পৃথ্বীর, পার্টি থেকে বহিষ্কৃত সে। কাল রাতে সেল সেক্রেটারী জানিয়ে দিয়েছে এ সংবাদ। অবাঞ্ছনীয় লোকের সাথে সংযোগ রাখার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত সে।

সারাটা দিন এলোমেলো ঘুরে বেড়ায় পৃথ্বী। যাবার স্থান নেই আর। প্রিয়বন্ধুদের দুয়ার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। নির্দেশ এসেছে কোনও সামাজিক সম্পর্কও রাখা চলবে না তার সাথে। শত্রু বলেই নির্দ্ধারিত সে আজ কমরেডদের কাছে।

বুকের ভিতরে একটা ক্ষত যেন টন টন করছে সারাদিন। এক অদৃশ্য ব্যথার চাপ।

অভিমানী বেদনা গুমরে উঠছে ভিতর থেকে অনুক্ষণ—বহিষ্কৃত সে বিনা কারণে। বহিষ্কৃত সে তার জীবন, যৌবনের একমাত্র স্বপ্ন, একমাত্র সাধনা থেকে। জল, আলো, বাতাসের মতই জীবনের সাথে মিশে ছিল এই পার্টি। জনতার আত্মার সাথে নিবিড় সংযোগ তার আত্মার।

কিন্তু আজ অবাঞ্ছিত সে সংগ্রামী জনতার মিছিলে। অতিরিক্ত সে এই লক্ষ কোটি মানুষের ভীড়ে।

শ্রান্ত পায়ে আবার ঘরে ফিরে আসে পৃথ্বী—লাঞ্ছিত পথিকের ক্লান্ত অবসাদ প্রতি পদক্ষেপে। পার্টিকে ভালবাসে সে সকল হৃদয় দিয়ে, আর তাই তার ভুল ভ্রান্তিকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারে না সে। এ ত শুধু ভুল বোঝাই নয়, আকস্মিক ঘটনাও নয়, তার প্রতি এ অবিচার। এক সর্বগ্রাসী ঝড়ের পূর্বাভাষ।

কত বড় ভাববার কথা স্থির হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে সম্মুখে, টের পাচ্ছে কি তা' তার এতকালের পরিচিত প্রিয় বন্ধুরা। নিজেকে ত চেনে পৃথ্বী। চেনে তার সততাকে। চেনে বলেই টের পাচ্ছে, কোথায় যেন মস্ত ফাটল ধরেছে পার্টির ভিতরে। যেন কোন অদূরাগত দুর্দিনের কাল মেঘ দেখা যাচ্ছে ঈশান কোণে।

নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে শীতা। এ সংবাদ শুনেই এসেছে সে। এ আঘাত যে উপেক্ষণীয় নয় জানতো সে, তবু পৃথ্বীর এই অসার মূর্তি দেখে একেবারে থমকে দাঁড়ায়। এক মিনিটেই টের পায়, কতবড় ঝড় বয়ে গিয়েছে তার মনের ওপর দিয়ে। টেবিলের উপর মাথা নত করে' বসে আছে পৃথ্বী; শীতা যে ঘরে ঢুকেছে তাও টের পায়নি। টেবিলের উপর চা ঠাণ্ডা হ'য়ে রয়েছে, খেয়াল নেই। চোখের কোণায় ক্লান্তির স্পষ্ট রেখা।

এমন ভেঙে-পড়া মূর্তি পৃথ্বীর কখনও দেখেনি শীতা। অসীম

বেদনায় আলোড়িত হ'য়ে উঠে তার সমস্তখানি মন। সামনে এসে দাঁড়ায় সে—স্নেহসিক্ত কোমল দৃষ্টিতে বন্ধুত্বের প্রগাঢ় স্পর্শ।

মুখ তুলে তাকায় পৃথ্বী—স্নিগ্ধ জলধারার মতই এক হৃদয়-স্পর্শ অনুভব করে ভিতরে। প্রশ্ন করে, "কখন এলে শীতা ?"

একি ক্লান্ত স্বর ! শীতা তাকিয়ে দেখে পৃথ্বীর মুখের দিকে। বেদনায় আরক্ত দুটি চোখ। একই মাত্র পুত্রের গৃহ থেকে বিতাড়িত বৃদ্ধ পিতার অসহায় বিদীর্ণ দৃষ্টি চোখে। কোন অশেষ দুঃখ এমন করে থেঁতলে দিতে পারে একটি বলিষ্ঠ মানুষের বুকের পাঁজর, ভেবে নির্বাক হ'য়ে যায় শীতা।

তার মুখের পানে তাকিয়ে সচেতন হ'য়ে উঠে পৃথ্বী। শীতার এই পাণ্ডুর মুখদর্পণে নিজেরই মনের প্রতিবিম্ব দেখতে পায় যেন। তাড়াতাড়ি কৈফিয়ত-দেওয়া সুরে বলে, "মনটা ভাল নেই। আমার খবর শুনেছ নিশ্চয়ই।"

"শুনেছি বলেই ত এলাম।"

শুনেছি বলেই ত এলাম ! চমকে উঠে পৃথ্বী। স্থির সকৃতজ্ঞ চোখে তাকায় পৃথ্বী শীতার পানে।

মনে মনে আকুল সুরে বলে উঠে, এ খবর শুনেছ বলেই এসেছো তুমি শীতা। এত নিপুণভাবে চিনে রেখেছো তুমি পৃথ্বীকে। অথচ কত অবিচার করেছে পৃথ্বী তোমার প্রতি, অতি সাধারণ এক গৃহ-কোণের মেয়ে ভেবে।

আর পৃথ্বীর সব চাইতে গর্বের, সব চাইতে শ্রদ্ধার পাত্র যাঁরা, তাঁদের কাছেই এত অচেনা যে তার অন্তরের সত্যরূপ, জানতো না তা' পৃথ্বী। অবিশ্বাস্য সে আজ তার শ্রদ্ধেয়দেরই চোখে।

শীতা কোমলস্বরে বলে, "শুনলেই কি আর বিশ্বাস করবে কেউ

একথা। এ ভুল নিশ্চয়ই স্বীকৃত হ'বে এক দিন।" স্বরে স্বরে দৃঢ় আশ্বাস।

পৃথ্বীর সমস্ত অন্তর আকুলিত হ'য়ে উঠে এ সরল সান্ত্বনায়।

হায়রে হৃদয়! তোমার কাছেই পরাজয় মানতে হ'ল বিদ্যা, বুদ্ধি অভিজ্ঞতার শেষ গর্বকে। বিদ্বান, ধীমান, পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তাদের দূরদৃষ্টির তীক্ষ্ণ চেতনা দিয়ে যে সত্যকে চিনতে পারলো না, শুধু বেদনা আর হৃদয়ানুভূতি দিয়েই সে সত্যকে চিনতে পারলো অতি সাধারণ একটি মেয়ে, নিতান্তই গৃহকোণের একটি মেয়ে !

একটি কমরেডের সততার পক্ষে এ যে কতবড় নিষ্ঠুর শাস্তি—এই সত্যের অপলাপ, শিবশম্ভু বাবুর মত বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মানুষও কি উপলব্ধি করলেন না তা। টের পেল না তা' সাহিত্যিক, সাংবাদিক শিক্ষকবন্ধুরা।

আর শীতা? তুমি তোমার বুকভরা আন্তরিকতার ঐশ্বর্য নিয়ে এগিয়ে এসেছো তাই, পৃথ্বীকে সান্ত্বনা দিতে। একথা শুনেছ বলেই ছুটে এলে তুমি ?

পৃথিবী, তোমাকে জানার এখনও অনেক বাকি।

শীতা চায়ের পেয়ালাটি সরিয়ে নিয়ে আবার চা করে নিয়ে আসে, "চা ঠাণ্ডা হ'য়ে রয়েছে, তাও খেয়াল নেই। এবার চা-টুকু খেয়ে নিন ত। শুনলাম, বিকেলবেলা বেরও হননি। কেন, আমরা কি কেউই নই! রাজনীতির অ আ ক খ' র জ্ঞান না থাকলেও ন্যায় অন্যায়ের বিচারবোধ থাকতে পারে ত মানুষের।"

একজন পরিচিত কমরেডের সাথে দেখা হয় পৃথ্বীর। উজ্জ্বল চোখে অভিনন্দন জানায় সে। কিন্তু অজিতবাবু অবিশ্বাস ভরা চোখে প্রত্যাখ্যান করে সে অভিনন্দন। কোনও কথা না বলেই পাশ কাটিয়ে

চলে যায়। পৃথ্বী মুহূর্তের জন্য বিস্মিত হ'য়ে উঠে বন্ধুটির এ অদ্ভুত আচরণে। পর মুহূর্তেই সচেতন হয়ে উঠে—পরিষ্কার হ'য়ে যায় এ দুর্বোধ্য আচরণ। বহিষ্কৃত সে, এ কুসংবাদ যে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে বন্ধুদের মহলে, তা' সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠে। পৃথ্বী কল্পনা করে, এতদিনের পরিচিত বন্ধুরা আজ কি চোখে দেখতে শুরু করেছে তাকে —কতখানি ঘৃণার চোখে।

শত শত মানুষের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে পৃথ্বী উদ্দেশ্যহীন মনে। দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে লোকের পর লোক। কর্মব্যস্ততার চাঞ্চল্য প্রত্যেকের চোখে-মুখে—প্রত্যেকেরই রয়েছে নির্দিষ্ট কর্মসীমানা। আছে কর্মসাথী। কিন্তু পৃথ্বীর কাজের দুয়ারে বিদায়ের নোটিশ ঝুলছে। জীবনের সব চাইতে কাম্য দিনগুলি কাটিয়ে এসেছে যাদের সাথে—শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়েছিল যাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ লগ্নে—আজ তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—সন্দেহ-ঘৃণা-অবজ্ঞা আর বিদ্রূপের ছায়া নেমে এসেছে অবিশ্বাস-ভরা চোখে।

জীবনে, এই প্রথম পৃথ্বী ভাবছে নিজেকে একা—একেবারে একা। প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে গৃহচ্যুত শিশুর মতই অসহায় লাগছে নিজেকে। কোনও আশ্রয় নেই—কোনও দুর্গ নেই—যেখানে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করবে সে। দুর্গচ্যুত সৈনিকের মত শুধু শত্রুরই বেষ্টনী চতুর্দিকে।

মনে মনে খতিয়ে দেখে পৃথ্বী—কি নিয়ে চলতে পারে সে জীবনে। সাহিত্য? কিন্তু কি লিখবে সে? ওদের মতই ভুলের ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাবে কলমকে?

অসম্ভব। স্বগোত্র স্বার্থকে বঞ্চনা করতে পারবে না সে। আর তার বিপরীত লিখলে পড়বেই বা কে? আজকের এ কৌলীন্য বিচারে একঘরে হ'য়ে আছে যে তার লেখনীও।

হোক একঘরে। তবু সে লিখেই যাবে। সত্য যা—তারই আশ্রয় নেবে। একজনও যদি পাঠক মেলে, তাতেই সার্থক হবে তার লেখনী।

একজন কমরেডকেও কি সে পাবে না, যে তার অন্তরের ভাষাকে বুঝতে চাইবে অন্তর দিয়ে। কেউই কি নেই?

রথী, ফল্গু, সাগরী, সুমিত্রা এরাও কি প্রতিবাদ করবে না? তার অন্তরের এ আর্তনাদ কি একটি বন্ধুর কানেও পৌছুবে না? সবহারাদেরই বন্ধু সে আজও, চিরদিন থাকবেও সে তা। তার সত্তাকে অবিশ্বাস করে ক্ষতিই করছো তোমরা, বন্ধুরা।

এ ভাবে নির্দোষী আত্মাকে পঙ্গু করে নিজেদেরই স্বার্থকে পঙ্গু করছো তোমরা। পৃথ্বী মনে মনে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠে—"না, না, আমাকে বর্জন করার কোনও অধিকার নেই তোমাদের।"

কিন্তু এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাকেও। সন্তানের কাছ থেকে অপমানিত মায়ের মতই আজ সব গ্লানিকে নিজের ভিতরে চুষে নিয়ে সে-সন্তানেরই মঙ্গল সাধনা করতে হবে তাকেও। ভুল করলেও সে-সন্তানকে ত্যাগ করার সাধ্য নেই তার। তাকে বর্জন করলেও সে ত বর্জন করতে পারে না তার সবহারা বন্ধুদের।

পৃথ্বীকে বহিষ্কার করার কিছুদিন পরই রথীর উপরও শমন আসে। অতীতের ছোটখাট ত্রুটিগুলিকেই ঢাকঢোল পিটিয়ে বড় করে দেখান হ'তে থাকে। পৃথ্বীর সাথে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক ত্যাগ করতে বলা সত্ত্বেও রথী তার বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করেনি, এ নিয়ে বেশ একটু আলোচনাও হ'য়ে যায় অধ্যাপক কমরেডদের মহলে। কিছু তর্কও উঠে। তারপর দ্বিতীয়বার সাবধানী আসে, পৃথ্বীর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে।

রথীও শুনাতে ছাড়ে না, "পৃথ্বীদা সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করতে

আমাকে অন্যের মতের অপেক্ষায় থাকতে হবে না। বরং আমার কাছেই তার সম্বন্ধে সঠিক খবর নিতে পারেন।”

অধ্যাপক বিজ্ঞান উত্তর দেয় অবিশ্বাসমাখা সুর জড়িয়ে, “হ্যাঁ, সন্ত্রাসবাদ থেকে যারা এসেছে—তাদের যদিও একটা অতীত ঐতিহ্য আছে স্বীকার করি—তবু এদের অনেকের ভিতরেই পেটিবুর্জোয়া সংস্কারবাদ আছে লুকিয়ে যা সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না—কিন্তু এরা আসলে চোরাবালির মত বিপ্লবের শত্রুই। না হলে কুমার-শংকরের বহিষ্কার ব্যাপার নিয়ে এত বেশী মাতামাতি করার কি প্রয়োজন ছিল তার।”

রথীও একই সুরে জবাব দেয়, “বিপ্লবের কারা শত্রু আর কারা মিত্র—তা' ইতিহাসই ধরিয়ে দেবে।”

“তা ত নিশ্চয়ই। তাই ইতিহাসকেই ত ধরে থাকতে বলি আমরাও—কোনও ব্যক্তি বিশেষকে নয়।” শ্লেষ-ঝরা সুরে একটু বেশী জোর দিয়ে বিকাশ বলে শেষের কথাটা।

এ আলোচনার সাতদিন পরই রথীর উপরও বহিষ্কারের আদেশ আসে—অসংশোধিত সংস্কারবাদী মনোভাবের জন্য।

কত বড় ভাঙন যে ঘনিয়ে আসছে পার্টির ভিতরে অনুভব করে স্তব্ধ হয়ে যায় সে। ঘনীভূত মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। পত্রিকা দিয়ে যায় হকার। চিন্তিত মনে পত্রিকাটা খুলে প্রথমেই চোখে পড়ে—“লক্ষ্মীপুর থানার কাছে পুলিশের সাথে কম্যুনিষ্টদের সংঘর্ষ। দুইজন কম্যুনিষ্ট যুবক নিহত।”

‘দুজন কম্যুনিষ্ট যুবক নিহত!’ ছ্যাঁৎ করে উঠে বুকটা।

ঘরে আগুন, বাইরে ঝড়।

সাগরী ঘরে ফেরে তাদের সেল মিটিং থেকে। তার চোখ-মুখের ভেঙে-পড়া অবসন্ন চেহারা দেখেই বুঝতে পারে রথী, তার বহিষ্কারের

সংবাদ জেনেই এসেছে সেও। রথীর দিকে তাকাতে পারছে না যেন সাগরী।

কোন লজ্জায় আর সে মুখ দেখাবে সুমিত্রার কাছে—নন্দিতা—সিপ্রা—সাহানাদের কাছে। কিন্তু সে ত চেনে রথীকে। "এ অবিচার, সম্পূর্ণ অবিচার।" আর্তস্বরে বলে উঠে সে মনে মনে। কিন্তু বিচার ত শেষ হয়ে গিয়েছে। শত্রু বলে ঘোষিত সে আজ সকলের কাছে। তাকেও মেনে নিতে হবে আজ থেকে—রথী বিপ্লবের শত্রু—তার পার্টির শত্রু, তার নিজেরও শত্রু। এ দিকে সহকারী সেক্রেটারী করা হয়েছে তাকে তাদের ইউনিটের। কত বড় দায়িত্ব আজ তার সামনে। কিন্তু রথীর সাথে আর ত তার রাজনীতির কোনও আলোচনা করারই অধিকার নেই। কোনও মতামত, পরামর্শ, উপদেশ নেওয়া চলবে না। এমনকি কোনও সার্কুলারই আর তাকে পড়তে দেওয়া চলবে না।

কিন্তু যদি সে এ আদেশ না মেনে চলে? তার পার্টির প্রতি আনুগত্যহীনতা প্রমাণ হবে। ছাত্রীদের কাছে—নন্দিতা, সিপ্রা, সুমিত্রা সকলের কাছেই এই অবিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় ধরা দেবে।

সে অসম্ভব। সাগরী মন শক্ত করে—রথীকে যতদিন পর্যন্ত না আবার মেম্বারসিপ দেওয়া হয়, ততদিন সেও তাকে এড়িয়েই চলবে রাজনীতির ব্যাপারে। কিন্তু মত পরিবর্তন যে অসম্ভব রথীর তাও ত সে ভাল ভাবেই জানে। পৃথ্বীর প্রতি রথীর অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা তার মত ভালভাবে আর কেউই জানে না।

রথী তর্ক করে—"মন থেকে যদি বিশ্বাস না করি তাকে শত্রু বলে—তবে তাকে একঘরে করতে যাব কেন।"

সাগরী উত্তর দেয়, "এ তোমার ব্যক্তিগত মোহ।"

"ব্যক্তিগত মোহতে ক্ষতি বরং কম হয়—কিন্তু আদর্শগত মোহতে যে সর্বনাশ হয় তার তুলনা নেই।"

"আদর্শগত মোহ কেন বলছো? সত্যকে স্বীকার করা কি মোহ।"

"সত্যকে স্বীকার করাটা মোহ নয়—কিন্তু অন্ধের মত মিথ্যাকে মেনে নেওয়াটাই মোহ। আজ তোমাদের ভিতরে সংক্রামক রোগের মতই অতিবিপ্লবী বীজ ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদেরও এক সময়ে এ ত্রুটি মারাত্মক ভাবেই জড়িয়ে ধরেছিল, তাই আমরা ভালভাবেই জানি এর ফল কোথায় গড়াবে।"

সাগরী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে এই 'অতি বিপ্লবী' কথাটায়। সংস্কারবাদী মনের কাছেই বিপ্লবকেই অতি-বিপ্লব বলে মনে হয়!

রথী লক্ষ্য করে, সাগরী তার বহিষ্কারের আদেশ নিয়ে কোনও আলোচনাই করলো না। মনে মনে দুঃখিত হয় সে। সেও তা নিয়ে কোনও কথা বলে না।

সাগরী তার কাজের পরিমাণ দ্বিগুণ করে নেয়—যেন স্বামীর পরিপূরক হিসাবে দ্বিগুণ কাজ করে পার্টিকে সন্তুষ্ট করবার শেষ চেষ্টা করছে সে। রাত এগারোটার আগে কোনদিন বাড়ী ফেরে না—দিনের বেলায়ও প্রায় দিনই না খেয়েই বেরিয়ে যায়—তারপর একেবারে স্কুল সেরে বাড়ী ফেরে।

রবিবারে একসঙ্গে খেতে বসে দু'জনে—কিন্তু সংসারের কয়লা, চিনি, আটা আর চাউলের কাঁকর—এ ছাড়া কোনও বিশেষ কথাবার্তা হয় না। বড়জোর সিনেমার কথা। তা'ও ঘুরে ফিরে আবার সেই সংস্কারবাদ আর অতি-বিপ্লবে ঠোকাঠুকি লেগে যায়।

খেয়েই আবার বেরিয়ে পড়ে সাগরী। ১৪৪ ধারা অমান্য করবে ছাত্রছাত্রীরা এক সপ্তাহ পরে তারই তোড়জোড়।

রথী কলেজে ঢুকতে ঢুকতে দেখে, বিকাশ মাঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে ছাত্রদের সামনে।

প্রফেসারদের ঘরে ঢুকতেই কানে আসে প্রিন্সিপ্যালের বিরক্ত

কণ্ঠস্বর, "বেশ ত, রাজনীতিই যদি করবে, কলেজের কাজ ছেড়ে দিয়ে কর। কলেজে চাকরিও করবে, অথচ কলেজের নিয়ম কানুন মানবে না, এ ত চলতে পারে না।"

বোঝে রথী, কাদের বিরুদ্ধে মনের এ ঝাল। সামনে কিছু বলার সাহস নেই। তাই আড়ালে এই বিষোদ্গিরণ। বিকাশকে ভয়ই করে আজকাল প্রিন্সিপ্যাল। যে ভাবে সব সময়ই ঘুঁষি পাকিয়ে রক্তচক্ষু করে থাকে হয়তো কখন এক ঘুঁষিই মেরে বসবে।

লক্ষ্য করে রথী, প্রায় বেশীর ভাগ প্রফেসারই আজকাল কম্যুনিস্ট প্রফেসারদের সাথে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে। ভয়ই পায় তাদের। রোদে ঘুরে ঘুরে চোখ লাল, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। দেখলেই মনে হয়, একটা জঙ্গী মনোভাব ফুটে বের হ'চ্ছে। সব সময়ই উগ্রমূর্তি, স্বাভাবিক ভাবে কথাই বলতে ভুলে গেছে যেন এরা। যে কোনও কথার একটা প্রতিবাদ না জানিয়ে পারে না।

"এখন আবার নূতন নীতি ধরেছে ক্লাস দখল করা। আরেকদিন, আমি ত হতভম্ব। ক্লাস নিচ্ছি হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, আমার ক্লাসে ঢুকে বক্তৃতা দিতে শুরু করলো বিকাশবাবু।" আধা ঠাট্টা আধা নিন্দার স্বরে বলেন বাংলার এক প্রৌঢ় অধ্যাপক।

এ যেন বড় বেশী মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে মনে মনে ভাবে রথী। কিন্তু সে কিছু বলতে গেলে এখন উল্টো ফল হবে।

মন একেবারেই দমে গেছে তার। চোখের উপরে ঘরে বাইরে সর্বত্র এ ভাঙন দেখতে হ'চ্ছে। শিক্ষক আন্দোলনকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে চলেছে এরা, ভাবা যায় না।

রথী রুটিন মিলিয়ে কলেজে আসে, ক্লাস করেই বেরিয়ে পড়ে। কমন রুমে বসলে আরও মন খারাপ হ'য়ে যায়। হয় উগ্রপন্থীর

টেবিল চাপরান রক্তচক্ষু, নয় ত সাধারণ প্রফেসারদের নরম গরম অনুযোগ সহ্য করা।

"যতই বিরুদ্ধ মতবাদ হোক না কেন, কিন্তু, সেজন্য ছাত্ররা অধ্যাপকদের গায়ে হাত তুলবে, এটা কিছুতেই সমর্থন করা চলে না।" প্রগতিশীল প্রফেসার একজন রথীকে দেখেই বিরক্তিপূর্ণ মন্তব্য করে।

কলেজের দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে পোষ্টার আঁটা হয়েছে: "মাগ্‌গী ভাতা দাবীতে অধ্যাপক ধর্ম্মঘট।"

নূতন চোখে তাকিয়ে দেখে অধ্যাপকরা। এই প্রথম এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ধর্মঘট।

সংগ্রামী ছাত্ররা খুশিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে—অধ্যাপকরাও বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসছেন।

দু'চারটি প্রিন্সিপ্যালের নজরে-পড়া ছেলে আপত্তি করে, "না, এটা কিন্তু সমর্থন করা চলে না। শিক্ষকদের কত বড় মহান আদর্শ! শিক্ষাদান করাটা তাঁদের ধর্ম। আর তাঁরা করছেন ভাতার জন্য ধর্মঘট। এ বড় খেলো করছেন নিজেদের।"

প্রতিবাদ ঝলসে উঠে বিপক্ষ ছাত্রদের চোখে, "শিক্ষাদান করাটা তাঁদের ধর্ম? খালিপেটে তবলা বাজিয়ে শিক্ষা দিবেন? দুর্মূল্যের বাজারে এই মায়নায় সংসার চালান যায় কিনা ভেবে দেখেছো?"

কলেজে কলেজে একই আলোচনা। প্রবীণ অধ্যাপকরা মন থেকে সমর্থন করতে পারছে না অধ্যাপকদের ধর্মঘট। যেন ঠিক মন থেকে সায় দিচ্ছে না। তর্ক করতে করতে গলা ভেঙে গেছে বিকাশের। আরও রুক্ষ হ'য়ে উঠেছে চোখমুখ।

"কোনও কলেজ যদি ধর্মঘট না করে, সেখানে পিকেট করা হ'বে।" টেবিলের উপর ঘুঁষি মেরে জানিয়ে দেয় বিকাশ।

সাগরীদের স্কুলে পর পর কয়টা খুব সাকসেসফুল ষ্ট্রাইক হয়।

নন্দিতা লক্ষ্য করে, সাগরীও এখন তাদের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। সব ব্যাপারে তাদের সাথেই একমত। এখন একমাত্র শীতাকে টানতে পারলে আর কোনও তর্ক উঠতো না। তবে শীতার ভিতরে যে দোদুল্যমান ভাব থাকবে তা'তে আর আশ্চর্য হ'বার কি? দেব-জ্যোতির প্রভাব কি এত সহজেই শেষ হ'য়ে গিয়েছে!

স্কুলের পর সাগরীকে এক পরিচিত বাড়ীতে নিয়ে যায় সাহানা। নন্দিতা ডেকে পাঠিয়েছে তাকে জরুরি কি দরকারে।

সাহানা বলে যায়, "আমি চলি। আমাকে আবার এক্ষুণি ছুটতে হ'বে কিষাণপুরে সাহানাদের নিয়ে, স্কুলটার গোলমাল মিটছে না। কর্তৃপক্ষ স্কুলে তালাচাবী লাগিয়ে রেখেছে। দু'জন শিক্ষয়িত্রীকে বরখাস্ত করেছে।"

"এই যে নন্দিতা এসে পড়েছেন—।"

"নন্দিতাদি, আমি কিন্তু দেরি করতে পারবো না। পাঁচটাব ট্রেণ ধরতে হ'বে—কিষাণপুরে যাচ্ছি।"

"সেখানকার রিপোর্ট এইমাত্র পেলাম একটা। সেক্রেটারীকে একটু উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিলেই ত হয়। বুড়ো য'াতে আর কোনদিন মেয়েদের সাথে লড়তে না আসে। আস্পর্দ্ধা কত—সেকেণ্ড ক্লাসের একটি মেয়েকে এমন মেরেছে যে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হ'য়েছে।"

সংবাদ শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে যায় সাগরী। নন্দিতা সাগরীর মৌনভাব লক্ষ্য করে বলতে থাকে বিদ্রূপের সুরে, আমাদের সংস্কারবাদীদের মুখোস ভাঙছে এ'তে। মেয়েদের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা আসে না—এসব শয়তানদের সাথেই আবার আপোস করতে চায় এরা। এরা যে বিপ্লবের কত বড় শত্রু তা' এদ্দিনে আমরা টের পাচ্ছি। এইসব শোহনলালের ভক্তদের চিনতে হ'বে আমাদের স্পষ্ট দিনের আলোতে।"

এ ইঙ্গিতের সাথে রথীওকি জড়িয়ে আছে? ভিতরে ভিতরে একটা ম্লান ছায়া ঘনিয়ে উঠে সাগরীর মনে। সাহানা চলে যায়। নন্দিতা সাগরীর হাতে একটা চিঠি দেয়। নন্দলালের চিঠি নন্দিতার কাছে। রথীর স্ত্রীর সাথে দেখা করতে চায় সে। সাগরী সম্বন্ধে তার সেল সেক্রেটারীর রিপোর্টে খুব সন্তুষ্ট হ'য়েছেন। ঘরে ঘরে এরকম মেয়েই চাই—যারা ব্যক্তিগত প্রভাব মুক্ত হ'য়ে আদর্শের জন্য লড়তে পারে।" সাগরী এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে ছোট্ট চিঠিটুকু। তার সাথে দেখা করতে চায় নন্দলাল! নন্দলাল ছদ্মনাম কিন্তু সত্যিকার মানুষটি কে তা' ত জানে সে।

অত বড় একজন নেতা দেখা করতে চায় তারই সাথে! নন্দিতা সময়, তারিখ আর স্থান ঠিক করে চলে যায়। যাওয়ার সময় স্মরণ করিয়ে দিতে ভুল হয় না—"রথী যেন টের না পায়। কত বড় গুরুত্ব পড়েছে তোমার উপর, তার মর্যাদা যেন নষ্ট না হয়।"

সাগরী পূর্ণ আশ্বাস দেয় "এ বিষয়ে ভাবতে হ'বে না।"

নির্ধারিত দিনে একই বাড়ীতে নন্দিতা আসে স্কুল ছুটির পর সাগরীকে নিয়ে যেতে। রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সী ডাকে। "চলো—বাণী সিনেমা।"

সিনেমা হলের সামনে নেমে ট্যাক্সী বিদায় করে দেয় "কত?"

"দু' টাকা বারো আনা।"

"সাগরী, তিনটে টাকা দিয়ে দাও ত।" আদেশের সুরে বলে নন্দিতা।

তারপর একটা সরু গলির ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে। গলির শেষে আর একটা বড় রাস্তায় এসে পড়ে। "এবার আমি একটু এগিয়ে যাই তুমি এসো আমাকে লক্ষ্য করে।"

মস্ত একটা বাড়ীতে ঢুকে পড়ে সে।

অলি, গলি বারান্দার পর বারান্দা, করিডোর, ব্যাকডোর সিঁড়ি পার হ'য়ে একখানা প্রশস্ত ঘরে এসে ঢোকে দু'জনে।

ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপর ঝুঁকে এক মনে কি লিখছেন পৃথ্বীদের বয়সী এক ভদ্রলোক।

নন্দিতা ফিসফিস করে বলে সাগরীকে "এই নন্দলাল।" নন্দিতা সাগরীর পরিচয় করিয়ে দিয়েই আবার চলে যায় "তুমি যেতে পারবে ত?"

"আচ্ছা, আমি সে ব্যবস্থা করবো।" সাগরীর আগেই জবাব দিয়ে দেয় নন্দলাল।

সাগরী নিমেষের মধ্যে ঘরখানা তাকিয়ে দেখে নেয়—গাঢ় নীল রঙের পুরু পর্দা ঝুলছে জানালায় জানালায়। একটা বইয়ের শেলফ্ ভর্তি বই—টেবিলের উপর লেখার পূর্ণ সরঞ্জাম—পত্রিকার পাঁজা। সেক্রেটারিয়েট টেবিল—টাইপ রাইটার—মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে ফুল স্পিডে। সব কিছুই এক নিখুঁত চোখে দেখে নেয় সাগরী। বুকের ভিতর টিপ টিপ করছে উত্তেজনায়। যে-কোনও নেতা নয়—একেবারে নন্দলালের সাথে কথা বলতে এসেছে সাগরী দ্বিতীয়বার। তাকিয়ে দেখে পরিপূর্ণ চোখে তাদের বিপ্লবী নেতাকে—তাদের পথপ্রদর্শক সারথীকে।

নন্দলাল ঘনিষ্ঠ অথচ আদেশমিশ্রিত সুরে কথা আরম্ভ করে। নাম ধরেই সম্বোধন করে দ্বিধাহীন কণ্ঠে।

সাগরীর কানে গিয়ে স্পর্শ করে একজন নেতার মুখ থেকে শোনা নিজের নামটা। একজন অপরিচিতা মহিলাকে এভাবে প্রথম সাক্ষাতেই নাম ধরে ডাক এক বিন্দু অসামাজিক বলে মনে হয় না এ বিহ্বল মুহূর্তে।

সাগরী শুনে যায় পার্শ্বোপবিষ্ট এক ধীমান বিরাট ব্যক্তির উপদেশ, অনুরোধ—আদেশ।

নন্দলাল বলেই চলেছে—"আমার কথায় তুমি হয়তো খুবই ঘাবড়ে যাচ্ছ। কিন্তু তোমার মত বিপ্লবী মেয়ের কাছেই আমার এ কথার সার্থকতা মিলবে। ঠিক যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করবার মতই মেয়ে তুমি। আমি খুবই খুশি হ'য়েছি—তুমি যে মধ্যবিত্ত ঘরের সংস্কার-বাদী মেয়েদের মতই মামুলী পথ বেছে নাওনি। রথীর ভুল ত্রুটি যে তুমিও ধরতে পেরেছো এটা খুবই আশার কথা।

"কিন্তু শুধু ভুল বুঝতে পারাটাই আমাদের চরম লক্ষ্য নয়। ভুলকে সমূলে উৎপাটন করতে হ'বে। এসব সংস্কারবাদীদের সাথে চরম শত্রু হিসেবে একেবারে সম্পর্ক ছেদ করতে হ'বে, সে ভাই হোক—বোন হোক—বন্ধু হোক—আর স্বামীই হোক। তাকে ত্যাগ করে আসতে হ'বে। বুঝিয়ে আসতে হ'বে যে সে অন্যায় করেছে, তাই সে বর্জনীয়।"

সাগরীর মুখের বিবর্ণছায়া লক্ষ্য করে মনে মনে হাসে একটু নন্দলাল। তারপর আবার সুর ঘুরিয়ে মোলায়েম সুরে বলতে শুরু করে, "কষ্ট পাবে তা' নিশ্চয়ই বুঝি। কিন্তু ভেবে দেখো, কিসের জন্য রথীকে বিয়ে করেছিলে তুমি। তোমাদের ত আর মা বাবার নির্বাচিত মামুলি বিয়ে নয়। আদর্শের জন্য এ বিয়ে। তার বিপ্লবী আদর্শের জন্যই তাকে বিয়ে করেছিলে তুমি।"

একটু থেমে গলার স্বর গভীর খাদে টেনে নিয়ে আবার বলে সে "কিন্তু এখন সে আর বিপ্লবী নয়—বিপ্লবের ঘোর শত্রু। তা যদি স্বীকার কর তবে তাকে ত্যাগ করাই উচিৎ নয় কি?"

তারপর সাগরীর দিকে আয়ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে "তোমার মতামত শুনতে চাই।"

সাগরী সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে অপ্রকাশিত রেখে জবাব দেয়, "আচ্ছা, আমি ভেবে উত্তর দেব। দু'দিন সময় চাই।"

"তাই বেশ।"

"আরও একটা কথা আছে। তোমাকে স্কুলের কাজও ছেড়ে দিতে হ'বে। ইউ জ়িতে চলে আসতে হ'বে। ও স্কুলের দায়িত্ব রাখতে সিপ্রা সাহানাই যথেষ্ট। তোমাকে আমাদের এখানেই প্রয়োজন বেশী। শুনেছি, তুমি খুব সুইফট্ অনুবাদ করতে পার। এখন আমাদের অনুবাদ করার লোকের দরকার খুব।"

অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফিরছে রথী। লাষ্ট বাস চলে গিয়েছে। পৃথ্বীর বাড়ীতে কথায় কথায় খেয়াল হয়নি। তারপর হেঁটেই রওয়ানা হয়—ঘড়ি দেখে হিসেব করে সাগরী হয়তো এখনও বাড়ী ফেরেনি। কিংবা ফিরলেও ঘুমিয়ে পড়েছে। কতক্ষণ কড়া নাড়তে হ'বে কে জানে। এত রাতে কড়া নাড়া এক বিরক্তিকর ব্যাপার। ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দুয়ারে এসে পৌঁছায়—কিন্তু দুয়ার খোলাই রয়েছে। সাগরীও ঘুমায় নাই। খায়ও নাই। "একি তুমি এখনও বসে আছ!" বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখে রথী সাগরীকে।

"অসুখ করেছে নাকি, সাগরী? এত পেল (Pale) দেখাচ্ছে?"

"মাথা ধরেছে।" সংক্ষেপে উত্তর দেয় সাগরী। কিন্তু মনের আর চিন্তার অকূল সমুদ্র স্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে। কি করবে সে, কি করবে ভেবে কূল পায় না।

রথী কোমল স্বরেই বলে, "তা'হলে এতক্ষণ বসে রয়েছ কেন। খেয়ে নিলেই ত পারতে। একটা সরিডন নিয়ে আসি ডাক্তারখানা থেকে—।"

"কিছু দরকার নেই। তুমি খেয়ে নাও। রাত অনেক হ'য়েছে। এখন বের হতে হ'বে না।"

একঘুমের পর তাকিয়ে দেখে রথী—সাগরী তখনও ঘুমায় নাই—তার মশারীও টাঙান হয় নাই। অপ্রস্তুত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে "মাথার

যন্ত্রণা কমে নাই কি?" বলে উঠে গিয়ে মশারীটা টাঙিয়ে দেয়। "শোও তুমি আমি টিপে দিচ্ছি মাথা। এত রাত্রে ত আর ওষুধ পাব না।"

"না—না কিছু দরকার নেই—তুমি ঘুমোও।"

রথী তবু যায় না। সাগরীর পাশে বসে এসে। সাগরী হঠাৎ ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে "যাও আর দরদ দেখাতে হ'বে না। পৃথ্বীদাই তোমার আপন লোক। তাঁদের সাথে সম্পর্ক না রাখলে তোমার চলে না। আমাদের সাথে সম্পর্ক থাক বা না থাক—তোমার কিছু যায় আসে কি? তোমার সবই ভণ্ডামী। তোমার প্রেমে ভণ্ডামী, আদর্শে ভণ্ডামী, তোমার স্নেহ মায়া মমতা সবই ভণ্ডামী—"

এ আকস্মিক আক্রমণে ভিতর শুদ্ধ কেঁপে উঠে রথীর। তবু সমস্ত ক্রোধ নিজের ভিতরেই টেনে নিয়ে চুপ করে থাকে, উত্তর দেয় না। স্তব্ধ হ'য়ে ভাবে, এ কোথায় চলেছে সাগরী। এ কোন ভাঙনের বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লো ও।

আর ঘুমায় না রথী। চুপ ক'রে ভাবে সাগরীর সাথে প্রথম পরিচয়ের ছোটখাট বহু ঘটনার কথা। ধাঙ্গরদের বস্তিঘরে নিবু নিবু বাতির ধারে বসে পড়াতো সাগরী। আজও সে পূর্ণ ছবিখানি আঁকা রয়েছে তার মনে। আর সে পড়াতো বড়দের। তারপর এল তাদের ধর্মঘট—এল আরও কত আন্দোলনের ঢেউয়ের পর ঢেউ। একসাথেই কত মিছিলে মিছিলে এগিয়ে চলেছে দু'জনে পাঁচ বছর ধরে। রাজনীতির স্রোতই টেনে এনেছিল সাগরীকে তার কাছে। আবার রাজনীতির স্রোতই সরিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে তার কাছ থেকে।

আকাশ ফর্শা হ'য়ে আসে। ঘুমিয়ে পড়েছে সাগরী। ঘুমাতুর-প্রেমার্ত চোখে তাকিয়ে দেখে রথী ঘুমন্ত সাগরীকে। লক্ষ্য করে

দেখে—চোখের কোণায় জল শুকিয়ে রয়েছে। "কাঁদছিল সাগরী!" চমকে উঠে রথী। "হয় তো সারা রাত ভ'রেই কেঁদেছে নিঃশব্দে।"

এক মুহূর্ত্তে টের পায় সে—"দ্বন্দ্ব চলেছে ওরও মনে কম নয়। তবু বোঝে ঘা খেয়ে না বুঝলে এ ভুল ওর ভাঙবে না। নিজের যুক্তির প্রতি অতি-বিশ্বাস ওর মজ্জায় মজ্জায়। একবার যখন মন থেকে মেনে নিয়েছে—ঠিক পথেই চলেছে সে, তখন তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।"

ভোর বেলা চা খেয়ে কথাটা তোলে সাগরী। সারারাত ভ'রে চিন্তা করে রথীকে ছেড়ে যাওয়াই ঠিক করেছে সে। একদিন হয় তো রথীর ভুল ভাঙবে—সেদিন আবার কাছে পাবে তাকে। কিন্তু আজ বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের ব্যক্তিগত প্রেমকে বিসর্জ্জন না দিতে পারলে, বৃথাই এতকাল নিজেকে বিপ্লবী বলে ভেবেছে।

রথী জামা গায়ে দিয়ে বের হ'বার উদ্যোগ করে।

সাগরী তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডাকে "রথী।"

রথী লক্ষ্য করে তার এ দৃষ্টি। কিছু যেন বলতে চাইছে সে। বলতে পারছে না। বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে—"সাগরী, কিছু বলবে।" কোমল স্বরেই প্রশ্ন করে সে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে সে, আর ওর সাথে রূঢ় ব্যবহার করবে না রাজনীতি নিয়ে।

"আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হ'বে।" ম্লান কণ্ঠে বলে সাগরী।

বেদনার্ত বিদ্রূপের হাসি হাসে রথী—"অর্থাৎ আমাকে ছেড়ে?"

সাগরী করুণস্বরে বলে উঠে, "কেন তুমি তোমার মত পরিবর্তন করছো না। শোহনলালের প্রতি তোমার আনুগত্য। এত কেন এখনও? কত বড় সর্বনাশ সে করেছে আগাগোড়া। পর পর কতগুলি বিপ্লবের সম্ভাবনাকে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে নষ্ট করেছে—"

রথী আর ধৈর্য রাখতে পারে না—"আর এরা বিশ্বাসঘাতকতা করছে না?"

তার এ অসহিষ্ণু স্বরে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয় সাগরী। মুখে পূর্ণ বিশ্বাস ভরা স্বরে উত্তর দেয় দৃঢ় কণ্ঠে, "না, বিশ্বাসঘাতকতা করছো তোমরাই। শ্রমিকের বড় শত্রুই আজ তোমাদের মত ছদ্মবেশীরা। তোমার শোহনলাল, পৃথ্বী রায়। "চুপ কর সাগরী।" আগুণ ঝলসে উঠে যেন রথীর সমস্ত শরীরে। তার দিকে তাকিয়ে একটু স্তম্ভিত হয় সাগরী। এ কি নগ্ন কুৎসিৎ পরুষ মূর্তি! রথীর মত মানুষেরও ভিতরে এ মূর্তি লুকিয়ে থাকতে পারে—? স্বামীত্বের শাসন যেন ঠিকরে পড়তে চাইছে ঐ ক্রুদ্ধ কয়টি কথায়—"চুপ কর সাগরী।"

স্বামীত্বের তেজ সহ্য করার মত মেয়ে নয় সেও। ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দেয় সে—"মেয়েদের—সাথে কথা বলার বিনয়টুকুও হারিয়েছ আজ তোমরা।"

"থাক, তোমার কাছ থেকে বিনয় শিক্ষা নিতে হবে না আমাকে। আশা করি মেয়েদের সাথে কথা বলতে জানে যারা, তাদের কাছেই চলে যাচ্ছ!"

সাগরী আর জবাব দেয় না। অপমানে দুঃখে বেদনায় যেন তার সমস্ত আত্মা মথিত হয়ে ওঠে। রথীও আর কথা না বলে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

আঘাত করলে দ্বিগুণ হ'য়ে ফিরে আসে আঘাত নিজের বুকেই। মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে উত্তেজনায়। উঃ, এ কি হ'ল। সেই বিনয়ী নম্র রুচিসম্পন্ন সাগরীর আজ এ কি পরিণতি! আর তার নিজেরই বা কি অধঃপতন। ক্রোধ সংবরণ করতে পারে না কেন? একটি স্ত্রীলোকের কাছে এ কি কুৎসিৎ মূর্তি দেখিয়ে এল সে।

কোথায় গেলে শান্তি পাবে সে। কোথায় গেলে এ অসহনীয়

চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাবে। শোহনলালের নামে যে কোনও কুৎসা ছড়াতে দ্বিধা বোধ করে না আজ সাগরীও।

পৃথ্বীর বাড়ীতেই যায় রথী। বাড়ীতেই আছে সে। রথীর দিকে তাকিয়ে শংকিত হ'য়ে উঠে পৃথ্বী, "কি হ'য়েছে রথী—খুব চিন্তিত দেখছি তোমায়।"

"পৃথ্বীদা, আর ত সইতে পারছি না এদের। এরা যে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে—ভাল ভাল ছেলেমেয়েদের—আত্মত্যাগের সুযোগ নিয়ে—। একটা কিছু কর, এ ভাবে চুপ করে বসে থাকা অসম্ভব।"

"যে ভাবে বিষ ছড়ান হ'য়েছে এর প্রতিক্রিয়া সারাতে সময় লাগবে। তাড়াতাড়ি কিছু করতে গেলে উল্টো ফল হ'বে।" রথীকে ভালভাবে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করে পৃথ্বী "নূতন আরও কোনও সংবাদ পেয়েছ নাকি। সাগরী কেমন আছে। যে ভাবে প্রসেসন লিড করে সে দেখলাম—কোন দিন মরবে গুলির মুখে।"

"তা'ও ভাল। ও একাই মরবে। আর কারও মধ্যে সংক্রামক বীজ ছড়াবে না।"

পৃথ্বী হাসে রথীর রাগ দেখে। "কেন, কি হ'য়েছ বল ত। মাথাটা খুব গরম দেখছি আজ। সাগরীর সাথে ঝগড়া করেছিস—"

"আপাততঃ সে আমাকে ত্যাগ করে তার মহান আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাতে দৃঢ় সংকল্প।"

"এই অর্ডার এসেছে নাকি ওর উপর।" পৃথ্বী স্তম্ভিত হ'য়ে যায়—"এতদূর গড়িয়েছে? বাড়ী আছে সাগরী? চল ত একবার বুঝিয়ে দেখি।"

"তুমি বোঝাবে? সংস্কারবাদের সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত তুমি এখন তার চোখে।"

"আচ্ছা, চলই না।" পৃথ্বী আর্দ্র স্বরে বলে। "জান, ভাল ভাল

ছেলেমেয়ের উপরই ওদের চোখ পড়বে আগে। এ ধাক্কা সামলাতে সোজা সময় লাগবে না আমাদের? ভুলের পিঠে ভুলই করে যাচ্ছি আমরা আর সেই সুযোগে শত্রুরই শক্তি বাড়ছে।"

রথীকে নিয়ে তার বাড়ীতে আসে পৃথ্বী। দুয়ারে এসে দেখে, ঘরে তালা লাগান। ওদের দু'জনের কাছে দু'টো চাবী থাকে চিরদিন। ঘর খুলে ভিতরে ঢোকে। টেবিলের উপর সাগরীর চিঠি—"যেদিন তোমার ভুল ভাঙবে, সেদিন আবার আসবো। ভালবাসা। সাগরী।"

চৌকীর উপর বসে পড়ে রথী। এ কি গ্লানির বোঝা জড়িয়ে রেখে গেল সাগরী। সাগরীর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কি এমন করেই করতে হ'বে তাকে—এমন তিলে তিলে অনুভূতির পীড়ন সহ্য করে?

সাগরীর খোঁজে সুমিত্রার বাড়ী যায় পৃথ্বী। সুমিত্রা নেই,—পাশের ঘরের মহিলাটি দুয়ার খুলে দেয় পৃথ্বীকে।

ঘরে ঢুকেই যেন একটা চাবুকের আচমকা আঘাত পড়ে পৃথ্বীর বুকের ভিতরে। ঘরের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায় সে। মনে হচ্ছে, কোনও এক অপরিচিত ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়েছে। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার তলায় কোথায় তলিয়ে গিয়েছে সেই নিপুণ হাতে রচিত গৃহশ্রী। সুমিত্রার নিখুঁৎ, পরিপাটি ঘরখানায় কতবার এসেছে পৃথ্বী, প্রাণভ'রে এক স্নিগ্ধ ঘরোয়া আস্বাদ গ্রহণ করেছে সে। তার সৌন্দর্য অনুরাগী মনে ছড়িয়ে পড়েছে এক কমনীয় শান্তি।

কিন্তু সেই শান্তির ছোট্ট নীড়খানি যেন কঠিন পদাঘাতে চুরমার করে লণ্ডভণ্ড করে রেখে গিয়েছে কোন উপকথার দৈত্য।

সুদূরদর্শী চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখে পৃথ্বী সম্পূর্ণ ঘরখানা। খদ্দরের একখানা দামী শাড়ি কেটে পর্দা ঝুলান হ'য়েছে দুয়ারে। তারও সেলাই খুলে গিয়ে ঝুল ঝুল করছে একধারে মেঝের উপর। মনে হয়, খেয়াল নেই গৃহস্বামিনীর। টেবিলের উপর শাড়ির বাকি অর্ধেক পাতা।

তা'তে আঠা, আলতা আর কালীর চিহ্ন স্থানে স্থানে বড় আকারে। ঘরময় ধুলোর আস্তরণ, ছেঁড়া কাগজের কুচি, পোড়া বিড়ির টুকরো— কাগজ-পোড়া ছাই। বহুকাল ধোপার বাড়ী না-দেওয়া একটা সুজনী বিছান বিছানায়। এলোমেলো ছড়ান খাতা, বই, পত্রিকার পাতা। পেরেক খসে-যাওয়া আধা কাৎ ব্র্যাকেটে অর্ধ-লুণ্ঠিত মলিন শাড়ি, ময়লা তোয়ালে, মেয়েদের অন্তর্বাস।

সুমিত্রার সেই সুন্দর শিল্পী হাতে বিচিত্র কুঁজোটির গায়েও ধুলোর পর্দা। রজনীগন্ধার পরিবর্তে, একট ডালদার টিন দিয়ে ঢাকা। সম্ভবতঃ জলাধারে রূপান্তরিত হ'য়েছে সুচিত্রিত পুষ্পাধার।

নির্বাক বিস্ময়ে চুপ হ'য়ে বসে থাকে পৃথ্বী। নীড়ভাঙা বিহঙ্গের বেদনা চোখে।

ছোট্ট ঘরখানাতেই কমরেডদের আজকের এই ভাঙামুখী রাজনীতি প্রতিবিম্বিত হ'য়ে উঠেছে।

সংস্কারবাদের ছিঁটেফোটা নিদর্শনও যেন আত্মগোপন করে না থাকে। সেই জন্যই কি এত সযত্ন নিখুঁৎ বিশৃঙ্খলা সুমিত্রার ঘরেও?

সুমিত্রা ঘরে ঢোকে। সাগরীর চলে যাবার কথা শুনে বিস্মিত হয় না সে। স্থির কণ্ঠেই উত্তর দেয়, "আমি শুনেছি এ সংবাদ। এ ছাড়া আর কি পথ ছিল তার? পার্টির শৃঙ্খলা না মানলে পার্টিতে থাকতে দেবে কেন তাকে।"

সুমিত্রা মন থেকেই গ্রহণ করেছে কিনা এ যান্ত্রিক শৃঙ্খলাকে—তার কথার সুরে ধরা পড়লো না।

পৃথ্বী ব্যথাতুর দৃষ্টিতে সুমিত্রার মুখের দিকের তাকায়। এক অদূরবর্তী রণক্ষেত্রের আশংকিত উত্তেজনা স্থির হ'য়ে রয়েছে চোখের প্রতিটি পল্লবে। অরণ্যের প্রতীক্ষা বিরাজ করছে যেন চোখের গহনে। গৃহ

চিন্তার একবিন্দু অবশেষও নেই আর সেখানে। আর কোনও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই পৃথ্বীর। বিদায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে ঘর থেকে।

সাগরী একমাস যাবৎ নন্দলালের ডেনে আছে। সমস্তটা দিন কাজের ভিতর ডুবে থাকে সে। অবিরাম অনুবাদ করে' চলেছে। তার ফাঁকে ফাঁকে টাইপ করছে। এক মুহূর্তও অবসর নেই। অবসর চায়ও না সে। তার এই অবিশ্রান্ত কাজ দেখে তারিফ করে উপরওয়ালারা।

ভোর বেলায় চা খেয়ে যে-যার পেয়ালা ধুয়ে রেখে একটু পত্রিকা নিয়ে বসে। তারপর পড়াশুনা। যার যার কাগজপত্র নিয়ে বসে নেতারা, নিজ নিজ টেবিলে।

সাগরীও এসে বসে তার টেবিলে, যে অনুবাদগুলি ছাপাখানায় যাবে, সেগুলোতে আর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। 'চীনে জাতীয় বুর্জোয়াদের স্থান।'

চোখ বুলিয়ে চলেছে সাগরী, মাঝে মাঝে দু'একটা বানান শুদ্ধ করছে। কিন্তু চিন্তার গুহা গহ্বর দিয়ে বয়ে চলেছে এক উত্তেজনার স্রোত? আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক দেশ ছিল চীন। কিন্তু আজ সে মুক্ত। ভারতেরও মুক্তির দিন আগত—সারা ভারতে মুক্তির সারা উঠেছে আজ।···

কুরীয়ের এসে ডাক নিয়ে যায়। আবার নূতন লেখা নিয়ে বসে সে কপি করতে। নেতাদের উদাত্ত ঘোষণা:

"পশ্চিম বাংলার সীমান্তে, ময়মনসিংয়ের হাজং এলাকায়, হিন্দু মুসলীম কৃষক, লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে হাজার হাজার বিঘা জমি দখল করেছে। হাজার হাজার নওজোয়ান নিয়ে মুক্তিফৌজ তৈয়ার হয়েছে। জমিদার জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষকদের এ অভ্যুত্থানে সাম্রাজ্যবাদের চোখের ঘুম সরে গিয়েছে।"

কলম ঘুরাতে ঘুরাতে ভারতবর্ষের সংগ্রামী এলাকার ছবিগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠে। খণ্ড খণ্ড আশার ছবি।

চীনের নওজোয়ান এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে এদেশেও অন্ধ্রে, তেলেঙ্গনায়, উত্তরবঙ্গের লালমাটিতে আর সুন্দরবনের ভিজামাটিতে। পদচিহ্ন এঁকে এঁকে, এগিয়ে চলেছে গারো পাহাড়ে, চীনের আড়ালে আড়ালে রৌদ্রে উত্তপ্ত উপত্যকায়।

আশার দীপ্তি ঝরে পড়ে সাগরীর চোখের সুদূরতায়।

অরুণাংশু ঘরে ঢোকে, "সাগরীদি, আজকের পত্রিকাটা কোথায়? চীনের খবর কি।" সাগরী পত্রিকাটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "চীনের খবর ত শেষ হ'য়ে এল। নিজের দেশের খবর পড়ার দিন এসে যাচ্ছে।" সমর্থনের লাল অভিনন্দন ছুঁয়ে যায় অরুণাংশুর চোখে। শিল্পীর চোখে ঝরে পড়ছে, নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনার সুর। শিল্পের নবজীবন আসতে পারে, একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজে। এ অসম সমাজে শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠার কোন আশাই নেই। বিক্রীত সে ব্যবসাদারদের হাতে।

অরুণাংশু পত্রিকাটা রেখে কাগজ পেনসিল নিয়ে বসে। কতকগুলি নূতন ছবির কল্পনা মনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সময়াভাবে সেগুলোকে রূপদান করা হ'চ্ছে না।

উনুনে ভাত ফুটছে। সিদ্ধ হ'তে বহু দেরি। এই ফাঁকে একটু বসা যেতে পারে স্থির হ'য়ে।

কিন্তু আবার উঠতে হয়। গম্ভীর গলায় ডাক আসে, "অরুণাংশু, চট করে একটা ব্লেড্ কিনে নিয়ে এসো ত।" সঙ্গে সঙ্গে আরেক জন কমরেড একপাটি ছেঁড়া চটি দিয়ে যায় "আর আমার এই চটিটাও একটু সেলাই করিয়ে আনবে।"

নিতান্ত অনিচ্ছায়ই উঠতে হয়। জুতো সারিয়ে আর দোকান থেকে ব্লেড কিনে আনতেই আবার ডাক আসে—

"এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনো ত অরুণ, চট করে এই সামনের কোনও দোকান থেকে।"

মৃদু অসন্তোষের ভ্রূকুটি একটু কুঁচকে উঠে চোখের কোণায়। কিন্তু আপত্তি করারও সাহস হয় না। হয়তো ধমক শুনতে হ'বে। ছবি আঁকার আশা তখনকার মত স্থগিত রেখে বেরিয়ে পড়ে সে।

সাগরী টাইপ করতে করতে একবার তাকিয়ে দেখে অরুণাংশুকে। তার উপর ভার ঘরবাড়ী পরিষ্কার রাখা, বাজার করা, রান্না করা আর সবার উপর নেতাদের ফরমাইজ খাটা। হাজার কাজের ফাঁকেও ছবির সরঞ্জাম নিয়ে না বসে পারে না অরুণাংশু। সাগরীর মনের তলায় প্রশ্ন উঁকি মেরে যায়, বেছে বেছে একজন চিত্রকরকে কেন এরা রান্নার কাজে আটকে রেখেছে।

তাছাড়া বাড়ীর সম্পূর্ণ নির্ভর নাকি তার উপরই ছিল। বাবা অসুস্থ। মা, ছোট ভাই বোন আছে। অরুণাংশু নাকি মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল, 'হোল টাইমার' হ'তে। তার উত্তরে ধমক খেয়েছে সেল সেক্রেটারীর কাছ থেকে, "অত মা, ভাই, বোন, মাসী পিসীর কথা ভাবতে গেলে আর পার্টিতে থাকা চলে না। অত সোজা নয় এখন পার্টিতে থাকা। সে সব পুরনো আমলের বাবুগিরির দিন চলে গিয়েছে। এসব ব্যক্তিগত সেন্টিমেণ্টকে প্রশ্রয় না দিয়ে নির্দেশমত কাজ করে যাও।"

ছবি আঁকা সম্বন্ধেও নাকি বলেছেন, "সবার আগে বিপ্লবের চিন্তা। বিপ্লবের পর শিল্প ত আপনি বেঁচে উঠবে। তাই এখন শুধু পোষ্টার এঁকে যাও। রক্তে সূর্য ফোটান গরম গরম পোষ্টার। এমন পোষ্টার চাই—যাতে রক্ত আগুন হ'য়ে উঠে।"

অরুণাংশু সিগারেট কিনে এনে দিয়ে, রান্নাঘরে গিয়ে দেখে, ভাত প্রায় ফুটে এসেছে। এই ফাঁকে নিজের জামা কাপড়গুলিতে সাবান

দিতে বসে চৌবাচ্চার ধারে। সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'তিনটা সার্ট গেঞ্জি এসে জমা হয়—"এগুলোতেও একটু সাবান দিয়ে রেখো।" নন্দলাল উপর থেকে ছুঁড়ে দেয় গেঞ্জি আর সার্টটা। "আর আমার এই তোয়ালেটায়ও।"

সাবান দেওয়া শেষ হ'লে ভাত নামিয়ে রান্না চাপায় সসপ্যানে।

সাগরী লিখে যাচ্ছে—সংগ্রাম তহবিলের অর্থ সংগ্রহের ডাক। এক একটি টাকা—এক একটি বুলেট।

রান্নাঘর থেকে পেঁয়াজ সম্বরার কড়া গন্ধটা আরও যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—ক্ষুধাটাকেই।

পাশের ঘরে খেতে বসেছে নন্দলাল। তার বিরক্তিভরা গুরু গম্ভীর বকুনি কানে এসে ঠোকর যাচ্ছে অনবরত—এমন রান্না নাকি মুখে দেওয়া যায়!

পর্দার ফাঁক দিয়ে অরুণাংশুর বিব্রত মুখখানার দিকে একটু তাকিয়ে দেখে সাগরী—। "বেচারা" মনে বলে একবার। আবার দ্রুত কলম ঘুরিয়ে চলে। প্রত্যেকটি বন্দী কমরেডের কাছে এ ডাক পৌঁছাতে হ'বে—এক একটি টাকা এক একটি বুলেট।

দুপুর বেলা সাগরীও টাইপ করে চলেছে একমনে। কাচের সার্সি দিয়ে অপরাহ্নের সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে চোখে মুখে, ঘরের আরেক দিকে লোহার খাটে শুয়ে' নন্দলাল। এইমাত্র ঘুম থেকে জেগেছে সে। ঘুমের চোখে তাকিয়ে দেখে সে সাগরীকে। মসৃণ গৌরবর্ণ কপোল দুইটিতে ঈষদ গোলাপী আভা। সূর্যের আভায় আরও উজ্জল দেখাচ্ছে। আনত গ্রীবায়, আর ঘনকৃষ্ণপক্ষ্মরেখায় জড়িয়ে রয়েছে যেন জীবনে প্রথম দেখা রূপলাবণ্য।

"এরকম সুন্দরী সচরাচর চোখে পড়ে না।" মনে মনে বলে নন্দলাল।

সাগরী একমনে টাইপ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্য করে না এ সম্মোহিত দৃষ্টি। বহুদূরের একজোড়া অনিমেষ দৃষ্টিই স্পর্শ করছে তাকে বারে বারে। পাঁচ বছর ধরে দেখা সেই আচ্ছন্ন-করা প্রশান্ত দৃষ্টি।

সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণের জন্য একেবারে নিস্তব্ধ হ'য়ে যায় বাড়ীটা। সন্ধ্যা হ'তেই যার যার কুরীয়েররা আসতে থাকে, সবাই বেরিয়ে পড়ে রাস্তে আধা গা ঢাকা দিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করতে।

এই সময়টুকু বড় অসহ্য লাগে সাগরীর। রথী হয়তো বাড়ী ফিরেছে এখন কলেজ থেকে। ফিরেই আবার বেরিয়ে পড়েছে হয়তো সে কোন রেষ্টুরেন্টের দিকে। সাগরী ভেবে চলে, এমনও ত হতে পারে, হঠাৎ একদিন দেখবে সে, রথীকে আবার কাজে ডেকেছে। রথী আর সে আবার সেই আগের দিনের মতই কাজ করে চলেছে একসাথে!

রথী আর সে আবার একসাথে কাজ করছে! মধুর উত্তেজনা জড়িয়ে ধরে সাগরীকে। হঠাৎ খেয়াল হয় সব ভুল টাইপ করা হ'চ্ছে। তাড়াতাড়ি কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন কাগজ বসিয়ে নেয়।

রাত্রিতে ঘুমোতে গিয়ে দেখে, জ্যোৎস্না—ছড়িয়ে পড়েছে বিছানায়। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সাগরী বাইরে জ্যোস্নাস্নাত আকাশের দিকে। ঘুম আসে না চোখে—স্নায়ুতে স্নায়ুতে মিশে রয়েছে এক আবেশময় উত্তেজনা। মনে মনে আকুলস্বরে বলে সে, "আর ত সইতে পারি না, রথী। এমন করে আর কতকাল তুমি সাগরীকে ছেড়ে থাকবে। তোমার ভুল কি ধরা পড়বে না কোনদিনই তোমার চোখে।" না না, এভাবে চিন্তা করে' করে' নিজেকে দুর্ব্বল করার

কোনও অর্থ হয় না। আরও মন শক্ত করতে হবে তাকে। রথীর কথা কখনও ভাববে না সে।…

গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে চমকে উঠে সাগরী—রথী এসে হাত রেখেছে কি তার কপালে? "এত হাঁপাচ্ছো কেন—কি হয়েছে তোমার রথী? কোনও দুঃসংবাদ?"

ঘুমের ঘোরেই উঠে বসে সাগরী—ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলে দেখে—নন্দলাল রয়েছে দাঁড়িয়ে। মুখ দিয়ে চমকে উঠা কথাটা বেরিয়ে আসে "আপনি!"

নন্দলাল ব্যস্ত হয়ে বলে, "উঠতে হবে না—শুয়ে থাক। শুনলাম জ্বর তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম।"

একটু বিস্মিত হয় সাগরী—ভাবে নন্দলালের বহিঃব্যবহারটা যত রুক্ষ—ভিতরটা তত নয়।

ভোরে শুয়ে শুয়েই তাকিয়ে দেখে একটু রাস্তার ওপাশের বাড়ীটার দিকে। জানালার ধারে বসে উলের জামা বুনছে একটি বিবাহিত মেয়ে। ঘরের ভিতর থেকে গান ভেসে আসছে—

"রোদন তোমার সাঙ্গ কর—ওগো অন্তরতম।"

আবার স্বপ্নে দেখা ছবিটা বারে বারে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় জ্বরার্ত অনুভূতিতে।

সাতদিন পর জ্বর ছাড়ে সাগরীর।

টাইপরাইটারটা খুলে বসে। আজকে মাসের তারিখ কত? ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকায়। সতের তারিখ। চমকে উঠে সাগরী নিজের ভিতরেই। রথী, রথী, তুমিও নিশ্চয় খেয়াল রেখেছো আজকের তারিখটা। টুকরো টুকরো স্মৃতির উত্তাপ। কেমন একটা জ্বরার্ত অবসাদ।

কাজ শুরু করে দেয় সে। কাজ করলেই এ অবসাদ চলে যাবে।

টাইপ করা আরম্ভ করে একটা বই থেকে কিছু অংশ টাইপ করে রাখে সে নিজের জন্য :—

"Comrades ! Cultivate hate and nothing but hate to the enemies of your class. Class battle must be fought with revolutionary ruthlessness. পার্শ্বেই আরেকটি কমরেড সাইক্লোষ্টাইল নিয়ে অপেক্ষা করছে। দ্রুত হাত চালায় সাগরী—বৈদ্যুতিক উত্তেজনা আবার ছড়িয়ে পড়েছে চেতনায়—স্নেহ, মায়া, প্রেম, অবসাদের রেশও নেই আর মনে। টাইপ করে চলেছে সে :—Bullets, tear gas and lathis are no answer to the economic problems. People will be killed. People will be maimed. People will be terrorised. People will be silenced. But the broad and brave masses will not shrink in fear. They have nothing to lose but their chains."

দুপুরবেলা খাওয়ার পরই আবার কপি করতে বসে সাগরী।

সাহিত্য সমালোচনাগুলির কপি করতে দিয়ে গিয়েছে—প্রেসে যাবে আজই।

সাগরী কপি করতে শুরু করে—

ঘরের আরেকদিকে একজন কমরেডের সাথে তর্ক করছে নন্দলাল। কমরেডটিকে চেনা চেনা লাগছে—কিন্তু ঠিক করতে পারছে না—কোথায় দেখেছে।

বর্তমান পার্টি নীতির সাথে এক মত নন তিনি—"এখনই জাতীয় ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম হতে পারে না। চীনদেশের মতই আমাদের বিপ্লবের পর্যায়। তাই আমাদের বর্তমানে গণতান্ত্রিক বিপ্লব হবে—সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।"

নন্দলাল জোর দিয়ে প্রতিবাদ জানায় "বর্তমানে আমাদের প্রথম শ্রেণীর মুখোমুখী শত্রু হচ্ছে ধনিকতন্ত্র। সামন্ততন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় স্তরের শত্রু। কাজেই আগে মুখোমুখী প্রথম সারির শত্রুকে ঘায়েল করতে পারলেই তাদের লেজুর ধরা শত্রুরাও শেষে ঘায়েল হয়ে যাবে।"

কমরেডটির চোখে মুখে নন্দলালের কথা মানতে না পারা ভাব ফুটে উঠে। তিনি প্রশ্ন করেন—"তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন যে, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আলাদা করে আমাদের আর কোনও সংগ্রাম করতে হবে না। সামন্ততান্ত্রিক বিপ্লব ও ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর এক বারেই পার হওয়া যাবে।"

"এটা শুধু আমি বলছি না—আমাদের সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই এ সত্য বেরিয়ে এসেছে।"

কমরেডটি সন্দিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করেন—"তাহলে এই বিপ্লবে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট কাদের নিয়ে তৈয়ার হবে? কোন কোন শ্রেণী, কোন কোন দল, কোন কোন লোককে আমাদের সাথে নেওয়া হবে।"

"সে ত খুব পরিষ্কার। একমাত্র সর্বহারা শ্রমিক ও বিত্তহীন কিসান। আর তাদের মধ্যে থাকবে দুমুখো-মন নিম্ন-মধ্যবিত্ত। এ ছাড়া বাকী সব আমাদের শত্রু। জাতীয় বুর্জোয়া, উচ্চমধ্যবিত্ত—জোতদার—কিসান এমনকি মাঝারী কিসান পর্যন্ত সবাইকে শত্রুর পর্যায়ে ফেলতে হবে।"

"আর দলের দিক থেকে।"

"দলের দিক থেকে গণতান্ত্রিকতার নামধেয় মরীচিকার পেছনে ত এতকাল বহু মেহনৎ আমরা করেছি। তার বদলে পেয়েছি 'ডিক্সন লেন'—সংস্কারবাদী নীতির উপযুক্ত পুরস্কার।

"আমাদের শিবিরে, না হয় শত্রুর শিবিরে—মাঝামাঝি আর কোন শিবির নেই।"

নন্দলাল লক্ষ্য করে, সাগরী গভীর মন দিয়ে শুনছে তার কথা।

আরও গম্ভীর স্বরে বলে যায় নন্দলাল, "হ্যাঁ, একতা আমরা চাই। সেই একতা হচ্ছে সংগ্রামী জনতার। মুষ্টিমেয় হলেও তারাই হচ্ছে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী।"

সন্ধ্যা হতেই কমরেডটি চলে যায় কুরীয়েরের সাথে। ওয়ারেণ্ট আছে তার নামে।

আবার তাকে নিয়েই আলোচনা শুরু হয়, অনুমানেই বোঝে সাগরী।

মন্মথ এসে জিজ্ঞাসা করে নন্দলালকে "কি, কেমন মনে করেন? মত ঘুরেছে।"

"না। এত সহজেই এদের মত ঘুরবে! শোহনলালের চেলা সব। মজ্জায় মজ্জায় এদের সংস্কারবাদের বিষ।"

তাহলে আর এদের পুষে রেখে লাভ কি? এ সব লোক সম্বন্ধে এক বিন্দু মমতা থাকা উচিত নয়।" মিছিমিছি মাসে মাসে কতগুলি টাকা ধ্বংস হচ্ছে পার্টি ওয়েজ দিয়ে।"

"কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে ওর পপুল্যারিটি এখনও রয়েছে।"

"সেজন্য ভাবতে হবে না—।" সাগরীকে লক্ষ্য করে এ আলোচনা থামিয়ে দেয় মন্মথ। "এ বিষয়ে আর সবাইয়ের সাথে আলোচনা করা যাবে।"

বহুদিন পর সুমিত্রার সাথে হঠাৎ দেখা হয় পৃথ্বীর এসপ্লানেডের মোড়ে। দু'জনেরই চোখে প্রসন্ন অভিনন্দন বেরিয়ে আসে নিজেদের অজ্ঞাস্তে।

ঘন রংয়ের সাধারণ শাড়ি পরনে সুমিত্রার। তার নিজস্ব রুচিবিরুদ্ধ এ নতুন বেশে মুহূর্তের জন্য অবাক হ'য়ে সামলে নেয় পৃথ্বী। মনে মনে বোঝে। খদ্দরের আভিজাত্যকে ত্যাগ করে প্রলেটারিয়েট বেশ

ধরেছে। মনের বিস্ময় অপ্রকাশিত রেখে, স্বাভাবিক সশ্রদ্ধ সুরে প্রশ্ন করে "ভাল আছেন ?"

স্মিত হাস্যে প্রশ্নটা এড়িয়ে যায় সুমিত্রা। কিন্তু তার নীরব চোখ দুটি বলতে চাইছে যেন "ভাল আছি কিনা বোঝেন না নাকি আপনিও।"

সুমিত্রার মৌন হাসি লক্ষ্য ক'রে আবার প্রশ্ন করে পৃথ্বী—"এ দিকে কোনদিকে ?"

"ফরটি এইটে।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় সুমিত্রা। পৃথ্বী হঠাৎ চুপ ক'রে যায়। সমস্ত মুখর জিজ্ঞাসার দুয়ারে কপাট পড়ে যায় যেন।

'ফরটি এইটে' কেন চলেছে সুমিত্রা—অনুমান করতে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার অধিকার আর নেই। অনর্থক বিব্রত করা। হয়তো কোনও বৈঠক কিংবা সেল মিটিং।

দু'মাস আগেও দু'জনে একসাথে মিটিং করেছে, আলোচনা করেছে, আর আজ কত বড় দূরত্ব দু'জনের মাঝে।

সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি দিয়ে বলে পৃথ্বী "আচ্ছা চলি।"

মনে মনে ভাবে, কেউ আবার দেখে ফেললে সন্দেহের চোখে পড়ে যাবে হয়তো সেও।

সুমিত্রা আর কোনও কথা বলে না—বিদায় গ্রহণ করে। কিন্তু তার নীরব চোখের ভাষাকে এক নিমিষে লক্ষ্য করে পৃথ্বী।

কিছুই আর বলার নেই সুমিত্রার—জানে সে, তার মৌন জিজ্ঞাসার অবসান হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু তার অন্তরের রাখী যে ছিন্ন হয় নাই—উপলব্ধি করে পৃথ্বী।

মনে মনেই হাসে পৃথ্বী—শাড়ির আভিজাত্যকে বিসর্জন দিয়েছে সুমিত্রা—মিলের রঙিন শাড়ি পরেছে। সংস্কারবাদের খোলস ছেড়েছে দেহ থেকে। মন থেকেও মুক্ত হ'তে চাইছে কি সে ব্যক্তিগত প্রেমের

সংস্কার থেকে। তাই হয়তো নিজেকে দূরে সরিয়েই নিতে চাইছে সুমিত্রা তার কাছ থেকে।

কিন্তু শত্রু বলেই কি স্বীকার করেছে সুমিত্রাও তাকে? বুকের ভিতরে একটা সচেতন কাঁটা বিঁধছে অনবরত—সুমিত্রাও কি বর্জন করেছে তাকে অবিশ্বাস করেই?

সুমিত্রার দৃঢ় মনের পরিচয় আর বুদ্ধির দীপ্তিতে আকৃষ্ট হ'য়েছিল সে। উত্তাল সমুদ্রের বুকে একই তরীর দাঁড় বেয়ে চলেছিল দু'জনে। দু'জনেই দু'জনের সেই দাঁড়টানা দৃঢ় কব্জিকে গভীর আস্থাপূর্ণ চোখে দেখেছে। সহযাত্রীর পথশ্রমের ব্যথাকে উপলব্ধি করেছে দু'জনে। আর তারই ফাঁকে আত্মীয়তা জন্মেছিল মনে মনে—অন্তরে অন্তরে। পরম বন্ধু রূপেই স্বীকার করেছিল তাকে সে জীবনের পরম অবসন্ন মুহূর্তে।

শীতা তাকে অবসন্ন করে রেখেছে এক অশান্ত বেদনানুভূতি দিয়ে। কিন্তু সুমিত্রা সে মেঘ সরিয়ে রোদ ঢেলে দিয়েছিল তার ক্লান্ত মনে। তাই তার উপস্থিতিকে কামনা না করে পারেনি পৃথ্বী—এক নারীবন্ধুর স্পর্শ পেয়েছিল সে তার কাছে।

এই ধারালো মেয়েটিরও অন্তরের বহু অস্পষ্ট অতীত রেখার মাঝে আরও একটি নূতন রেখা পড়েছিল যে তাকেই জড়িয়ে, নিজেকে জানতে না দিলেও জেনেছিল তা' পৃথ্বী। সুমিত্রার নীরব মনের পরিচয়কে গ্রহণ করেছিল সে নীরব মনেই। সুমিত্রাকে শ্রদ্ধা করে সে, তার বুদ্ধি রুচি সৌন্দর্য আর হৃদয় সব নিয়েই।

কিন্তু ভালবাসে সে শীতাকেই—সুমিত্রাকে নয়। তার বন্ধুত্বের চৌকাঠ ডিঙিয়ে আর বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় যে পৃথ্বীর, হয়তো সেও তা' টের পেয়েছিল। তাই দূরত্বকে সজাগ রেখেছিল নিজের দীপ্তি দিয়েই।

কিন্তু আজকের এ দূরত্বের মাঝে কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পায় না পৃথ্বী। তরী থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে যেন সে সেই উত্তাল সমুদ্রের বুকে। ঢেউয়ের ধাক্কায় ধাক্কায় শুধু দূরত্ব বেড়ে চলেছে, হয়তো এ দূরত্বকে ইচ্ছে করেই বাড়িয়ে নিতে চায় সে। তাই কি প্রতিবাদ জানায় নি সুমিত্রাও তার প্রতি অবিচারের।

ত্যাগ করেছে তাকে শীতাংশু—শিবশম্ভু—অজিত—অসীম—আরও অনেকে। কিন্তু সুমিত্রাও ত্যাগ করেছে এ দুঃখ ভুলতে পারে না পৃথ্বী।

হ'তে পারে, এ শুধু তার পার্টিশৃঙ্খলা মেনে চলা। কিন্তু এ শৃঙ্খলার অর্থ কি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা না থাকলে—এ ত শুধু যান্ত্রিক শৃঙ্খলা। আর্ত স্বরে বলে পৃথ্বী মনে মনে "সুমিত্রা—বড়—ভুল করছো তুমি।—কিন্তু পৃথ্বী আশা রাখে—একদিন এ ভুল ভাঙবেই তোমার।"

উজানস্রোতে বৈঠায় জল কেটে চলেছে কৃষক কমরেড বসন্ত। নৌকোর ভিতরে ফল্গু আর সত্যব্রত।

গাঢ় অন্ধকার রাত্রি, মাথার উপরে তারার ভীড়, নীচে বিদ্যাধরীর দুরন্ত স্রোত। সমুদ্রের আকর্ষণে ছুটে চলেছে নদী। আর ওরা? ওরা ছুটে চলেছে কিসের আহ্বানে? জনসমুদ্রের আহ্বানে। তেভাগার লড়াই করা কৃষকের ডাকে।

ফল্গু সশ্রদ্ধ চোখে তাকায় মাঝির দৃঢ় কব্জীর দিকে। ঐ দৃঢ় বাহুর সাথেই ত হাত মিলাতে চলেছে তারা, ছাত্রজীবনের উচ্চাশা আর বুদ্ধিজীবী তরুণের স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে ফেলে। আর দু'মাস পরই পরীক্ষা। ভাল রেজাল্ট করার অদমিত ইচ্ছা, ছাত্রজীবনের এক বড় ব্যাধি—ধাম-ঝরা কাজের ফাঁকে ফাঁকেও উঁকি মারে অঙ্কের জটিল

ফরমূলাগুলি। কিন্তু এই দীপ্ত মুহূর্তে, এক স্রোতস্বিনী নদীর বুক ভেঙে গোপন নৈশ অভিযানের উন্মাদনায় কোথায় ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে ছাত্রজীবনের সুপ্ত কামনাগুলি!

তেভাগার লড়াই···গোলাভাঙা···জোতদারের খামারে লেলিহান আগুনের শিখা···সর্বহারা বিপ্লবের প্রথম সূচনা...অদমিত উত্তেজনায় ঋজু হ'য়ে উঠে দৃঢ় পেশী—। প্রতিজ্ঞায় দীপ্ত হ'য়ে উঠে মনের প্রতিটি চেতনা। শতাব্দীর স্রোতে এগিয়ে চলেছে বিপ্লবী কর্মী।

ফল্গু এসে বৈঠা ধরে, "আপনি একটু জিরিয়ে নিন। একটানা ছয় মাইল বৈঠা চালিয়েছেন। আরও মাইল ছয়েক বাকী এখনও।"

অন্ধকার আকাশের গাঢ়ছায়া নদীর বুকে। চতুর্দিকে শুধুই অন্ধকার। আর বৈঠাফেলার একটানা শব্দ। হঠাৎ কিসের শব্দ আছড়ে পড়ে জলের বুকে। বসন্তমাঝি বলে উঠে "দেখছেন কি, কুমীর।"

"কুমীর?" বিস্ময়ে আঁৎকে উঠে বাকি দুইজনে।

"এসব নদীতে যেমন কুমীর তেমনি হাঙ্গর।" উত্তর দেয় বসন্ত।

সত্যব্রত ঠাট্টার সুরে বলে, "কৃষকের লড়াই-এ যাচ্ছি—কাজেই হাঙ্গর কুমীরে ভরা পথ হ'বে না ত, পথে কি গোলাপের পাপড়ি বিছান থাকবে? কি বল ফল্গুদা।"······রাত্রি প্রায় শেষ। বসন্ত আঙ্গুল দিয়ে দেখায় "ঐ যে গাঙভেরী দেখা যাচ্ছে।" বহুদূরে ধানক্ষেতের শেষমাথায় গোলাবাড়ীর গম্বুজের মত মাথাগুলি ভেসে আছে। স্থিরচোখে তাকিয়ে দেখে ফল্গু আর সত্যব্রত। দূরে ঐ স্রোতের কিনারায়, শুরু হ'বে তাহাদের আমরণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জীবনের শেষ লড়াই। মনে ভাসে মা বাবার শেষ দেখা মুখগুলো, কুন্নীর গহন ঘন দৃষ্টি। হয়তো জীবনের শেষ রক্ত ঝরবে ঐ নোনামাটির দেশে, ঐ উদ্ধত গোলা বাড়ীব আঙ্গিনায়। এই সুন্দর পৃথিবী আর পরিচিত মানুষের কাছ

থেকে শেষ বিদায় নিতে হবে কি এইখানে? এই নদী তীর্থে? মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠে একবার জীবনের সহজাত প্রথম কামনায়।

নৌকা ভিড়ায় পারে। নদীর বাঁধ ধরে এগুতে থাকে তিনজন। দুইধারে জমির বুকে পাকা ধানের সমারোহ। যতদূর চোখ যায়, শুধু ধানক্ষেত। শুধু ধান, ধান আর ধান। লালচে, হলুদ, সবুজ, বিচিত্র রংয়ের ধানের শীষগুলি থরে থরে নুয়ে আছে। দিনের প্রথম আভাস আকাশে। পরিচ্ছন্ন আলোর তলায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভরা ক্ষেতের লক্ষ্মীমন্ত শ্রী। প্রাচুর্যের শোভায় মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না ওরা—"উঃ! কত ধান—শুধু ধান।" তবু কৃষকের ঘরে কোনও শ্রী নেই। আধপেট খাওয়া হাড় গিলগিলা উলঙ্গ ছেলেমেয়ে সারি-বেঁধে এগিয়ে আসে সহরের ছেলেদের দেখতে। শ্রীহীন দেহের অলঙ্কার—মাদুলী তাবিজ কবজ প্রতি অংশে তিলাসূতায় বাঁধা। মমতাচ্ছন্ন চোখে গ্রহণ করে ফন্তু ঘরের মেয়েদের শ্রদ্ধালু চোখের নীরব অভ্যর্থনা। দাওয়ায় "ঠাঁই" করে দেয় তিনখানা—এক সাথে নাস্তা খেতে বসে তিনজনে—পান্তাভাত আর নুন। কোনও আড়ম্বর নেই, আছে শুধু আন্তরিকতা। সহরের ছেলে অভিভূত হয় গ্রামের মানুষের প্রথম আতিথ্যের সরলতায়।

বসন্ত এক ফাঁকে একটু তামাক টেনে নেয়। সারারাত জাগানা গেছে। আবার সারাদুপুর মিটিং হবে বিনোদের ঘরে পাশের গাঁয়ে।

সত্যব্রতও দুইটি বিড়ি বের করে পকেট থেকে।

"নাও ফন্তুদা, একটু অভ্যেস কর। না হ'লে চোখের ঝিমুনি কমবে না।"

ফন্তু অনভ্যস্ত গলায় বার কয়েক টান মেরে—কিছুক্ষণ কেশে নেয়। তারপর আবার টানে—তীব্র গন্ধটা মন্দ লাগে না। মাথার ঝিম ঝিম ভাব অনেকটা মরে যায় যেন এই ঝাঁঝালো ধোঁয়ায়। "হাটবার কিন্তু আজ, ঘর থেকে বসন্তের বৌ স্মরণ করিয়ে দেয়।"

বিকেলে বসন্তের সাথে হাটে যায়—ফল্গু। গ্রামের হাটের সেই একই পরিচিত ছবি। হাতে বোনা রং বেরংয়ের শাড়ি, গামছা বিছিয়ে বসেছে এক বৃদ্ধ তাঁতী। সহরের লোক এসেছে শুনি একটু এগিয়ে আসে—

"পত্রিকা এনেছেন? স্বাধীনতা?" ফল্গু তার কাগজের মোড়ক থেকে বের করে এগিয়ে দেয় গত সপ্তাহের পত্রিকাখানা।

পত্রিকাটা একটু উল্টে পাল্টে দেখে ফিরিয়ে দেয়—"পড়ে শুনান। আমরা কি আর লেখাপড়া জানি।" ম্লানস্বরে বলে অর্জুন।

পড়তে জানে না তবু পত্রিকার জন্য কি আগ্রহ! 'স্বাধীনতা'র জন্য কি অদম্য উৎসাহ।

মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারে না ফল্গু।

ছোট্ট একটি ভীড় জমে যায়—পত্রিকা পড়া শুনতে। ফল্গু পড়তে আরম্ভ করে। গম্ভীর সংযত কণ্ঠস্বর দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর হতে থাকে। শ্রোতারা তন্ময় হ'য়ে বারে বারে তাকায় পত্রিকার দিকে আর পড়ুয়ার মুখের দিকে। যেন অদূরবর্তী মুক্তির বাণী বয়ে আনছে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাপার অক্ষর।

সব ভাষা বোধগম্য হয়নি। ফল্গু বুঝিয়ে দেয় পড়ার ফাঁকে ফাঁকে। তারপর শুরু হয় আলোচনা।

দেশ বিদেশের ফসলের লড়াইর কথা।

সেই একই লড়াই শুরু হবে এখানেও—ঐ বীজ বোনা মাটির বুকে—ফসল কাটা জমির বুকে, ঐ গাঙভেড়ীর গায়ে। নীরব উত্তেজনা ঝলসে ঝলসে উঠে চোখে মুখে। বৃদ্ধ চাষীরা শোনে মন দিয়ে ওদের কথা। থেকে থেকে বুক ঠেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে সকলের অলক্ষ্যে। বয়স ঝিমিয়ে এসেছে—চামড়া ঢিলা, শরীরের হাড়পাঁজরায় জোর নেই আর। সেই কবে কোন জুয়ান বয়সে লাঙল ধরা-কব্জি শীর্ণ হয়ে গিয়েছে

ক্ষেতের কাজ করতে করতে। তবু একদিনের জন্যও প্রাণভরে ধান ঘরে তুলতে পায়নি তারা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের খাটুনিতে কত সোনার ফসল ফলিয়েছে ঐ ধূ ধূ করা গাঙের শেষ বাঁক পর্যন্ত!

কিন্তু সে ফসল গোলায় উঠেছে ধনী জোতদারের, জমিদারের। তাদেরই মেহনতের মুনাফা ভাঙিয়ে দালান কোঠা উঠেছে, দেখে দেখে ছানি পড়েছে চোখে—তবু চোখ খোলেনি তাদের। না হলে এত ধান চারদিকে তবু আজও শালুক সিদ্ধ দিয়ে পেট ভরাতে হয়? বর্ষা শেষ না হতেই ঘরের ধান ফুরিয়েছে। ছেলেপুলেগুলি ভাত ভাত করে চেঁচাতে আরম্ভ করে। অসহায় বিরক্তি ফুটে উঠে মা মাসীর চোখে।

কৃষকেরা চলে গেল পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাতব্বর লাঠিটা মাটিতে রেখে বসে নেয় ভাল করে। তারপর একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে আরম্ভ করে। "একটা কথা আমরা ভাবছিলাম। কমরেড যে কথাগুলি বললেন, খুবই ঠিক কথা। আমরা মেহানত করি, আর সুখ ভোগ করে বড়লোকেরা। এ কথাত ঐ মাথার উপরের চন্দ্র সূর্যের মত সত্য কথা। তবু আমার মনে হয়—এই সব হাঙ্গামার মধ্যে গেলে অনেক রক্ত পাত হ'বে—হয়তো প্রাণহানিও হ'তে পারে। কাজেই একটু ভেবে দেখবেন, আপস একটা করা যায় কিনা। তারাও কিছু নিল আমরাও কিছু পেলাম।..."

কথা আর শেষ করতে দেয় না সুখেন্দু। গর্জে উঠে সে, "আপসের কথা দিয়ে আর ভুলাতে আসবেন না আপনারা। আপসের ভ্রান্ত আশা দিয়ে বহু লড়াই ব্যর্থ করেছেন আপনাদের মত দালালরা। আর ওকথা মুখেও উচ্চারণ করবেন না। দালালী করে করে ত চুল পাকিয়েছেন—এবার চোখ যদি ফুটে থাকে তবে লাঠি ধরুন হাতে—লাঠিতে লাঠিতে যা কিছু কথা হবে—সাহস থাকেত আসবেন সেইদিন।"

সুখেন্দুর চোখে আগুন ঝরে যেন।

গুম হ'য়ে যায় মাতব্বর দু'জন। তাদের'ও চোখে নেমে আসে কঠিন আক্রোশ। আর কোনও কথা না বলে নেমে যায় তারা পূবের ভেরী ধরে।

মাতব্বরেরা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় ক্ষেতের ভিতরে। এ গ্রামের ছেলে মহেন্দ্র—কৃষক কমরেড সে। একটু ইতস্তত করে বলে, "একটা কথা কিন্তু আমারও বলার ছিল। ধনী জোতদারের সাথে আপস করার কোনও প্রশ্নই উঠেনা আজ—কিন্তু ঐ গোপীনাথ, বটকৃষ্ণ এদের মত মাঝারি জোতদারের গোলা ভাঙাটা ঠিক হ'বে বলে মনে হয় না।"

বড় ভাই মহেশও সায় দেয় কথাটা।

সুখেন্দু আর কথা শেষ করতে দেয় না। বাধা দিয়ে বিরক্তির স্বরে বলে, "আজ যে যুগ পড়েছে—এ যুগে পৃথিবীর কোনও তৃতীয় দল থাকতে পারে না। পরিষ্কার দু'ভাগে ভাগ হ'য়ে গিয়েছে পৃথিবী। এক ভাগ সর্বহারার দিকে আরেক দল আমাদের চিরশত্রু ধনীদের দিকে। তাই মাঝামাঝি কোনও মানুষও থাকতে পারে না আর—"

সুখেন্দুর গলার স্বর গম্ভীর হ'য়ে উঠে, "আর যারা এইসব ছদ্মবেশী শত্রুদের পক্ষে কথা বলে, তারাও আজ সর্বহারাদের শত্রুই।"

এ রুঢ় আঘাতে চুপ ক'রে যায় মহেন্দ্র। আর কথা বলে না—অপমানিতবোধ করে নিজেদের। গভীর বিষাদের ছায়া নেমে আসে অভিজ্ঞ চাষীর চোখে মুখে।

ধানক্ষেতের বুকেও নেমে এসেছে গোধূলি আকাশের ম্লান ছায়া। মহেন্দ্র ও মহেশ বাড়ীমুখী পা চালায়। ফল্গু ও সত্যব্রতকে পৌছে দিতে যায় হারান। বসন্ত চলে গিয়েছে আগেই। মেয়ের শ্বশুর বাড়ীর কুটুম আসবে বাড়ীতে। ফল্গু হেঁটে চলে ওদের পিছু পিছু। মহেশ, মহেন্দ্রের

বিষন্ন ক্লিষ্ট চেহারাটা লক্ষ্য করে বারে বারে। ঘুরে ঘুরে নাড়া দেয় তারও মনে মহেন্দ্রের কথাগুলি। অভিজ্ঞ কৃষক ও কমরেড। তার অভিজ্ঞতার মূল্য আছে নিশ্চয়। কিন্তু ভীরুতাও ত হ'তে পারে। হয়তো হাঙ্গামা এড়াতে চায়।

তবু মনের তলায় একটা খটকা থেকে যায়। আবার মনকে শাসন করে ফল্গু—এসব বাজে যুক্তি। দুর্বল মনের চিত্ত-বিকার। মধ্যবিত্ত মন—তাই শত্রুরও এত ছোট, মাঝারি, বড়, সেজর বিচার।
আর বিচার নয়। স্পষ্ট দুইটি শিবির আজ। কোন দ্বিধা কোনও প্রশ্নই নয় আর।

কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অন্ধকার এরই মধ্যে ছেয়ে ফেলেছে গ্রামের পর গ্রাম। আবার সেই কোমর ভাঙা জল, কাদা, জোঁক। এক হাতে লাঠি আরেক হাতে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলে তিন জনে। মাঝখানে বোধ হয় কিছুক্ষণ বৃষ্টিও হ'য়ে গিয়েছে এ অঞ্চলে। পিছল পথে টিপে টিপে পা ফেলে এগুতে থাকে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে হারান "সাপ সাপ"।

আঁতকে পেছনে সরে যায় ওরা—সত্যি প্রকাণ্ড বিষাক্ত সাপ। বুকের ভিতরেও যেন ঐ সাপের শরীরের মত শির শির করতে থাকে। উঃ অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে। সাপটা এঁকে বেঁকে সরে যায় ক্ষেতের ভিতরে।

"মস্ত একটা ফাঁড়া গেল আপনার।" বলে হারান। চোখেমুখে তখনও আতংকিত ভয় লেগে আছে। সাপের ভয় কাটাতে সাপের গল্প আরম্ভ করে। পাশের গ্রামের ওঝার কেরামতি। এইত মাসখানেক আগে মহেশের মেয়েকে সাপে কামড়িয়েছিল—মেয়েত ঢলেই পড়েছিল। তারপর সেই ওঝার ঝাড় ফুঁকের চোটে বিষ নেমে আসে মা মনসার দুধের বাটিতে। নীল হ'য়ে গেল সাদা দুধ।

"মেয়েটা বেঁচেছিল ?" প্রশ্ন করে ফল্গু।

"বাঁচবেনা আবার। ওরকম ওঝা দশ বিশ গ্রামের মধ্যে নেই।"

মনে মনে ভাবে ফল্গু, হয় তো বিষাক্ত সাপ ছিলনা। আর যা রাস্তা এদেশে, এতে সাপ না থাকাইত আশ্চর্য।

হারান অন্ধকারের মধ্যেও আঙ্গুল দিয়ে দেখায় "ঐ যে ডাইনের দিকে বাতি দেখছেন, অনেক দূরে—এই অঞ্চলের সবচাইতে ধনীর বাড়ী ওটা।···তবে তার গোলা ভাঙাও খুব সোজা কাজ নয়। পুলিশ দারোগা সব ওর হাতের মুঠায়। ঘুষ দিয়েই বশ করে ফেলে। এমন কি একটা খুনের মামলাও জিতে গেল শুধু টাকা ঢেলেই।

পিটিয়ে মারা চন্দ্রকান্তের লাসটা কেনা দেখেছে গাঙের ধারে। জলেই ভাসিয়ে দিত—সারতে পারেনি, তাই ভেরীর মাথায় ফেলে রেখে পালিয়েছিল শয়তানরা। কিন্তু কোনও শাস্তি হ'ল ? একটা চোর ছেঁচরারওত ছয়মাস জেল হয়। আর একেবারে খুনী আসামী।"

"খুন করলো কে ?"

"অনাবৃষ্টি গেছিল সেবার। ফসল ফলেছে কম। তার উপর ছেলেপুলের ঘর। বোঝেনইত। আগেই খেয়ে বসে আছে ধান, বাকী খাজনা শোধ করবে আর কি দিয়ে। জমিজমা নেই। তাই পাইক পাঠিয়েছিল ছেলের বৌকে খামারে এনে অপমান করতে। সহ্য করবে কেন ? মানুষের রক্তত। সেও শাসিয়ে দিয়েছে। তারপর একদিন ছেলে গিয়েছে জোগান খাটতে—সেই সময় তাকে বেঁধে গোলাবাড়ীতে ধরে নিয়ে মার লাগায় হিন্দুস্থানী দারওয়ান দিয়ে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে দেহ ছিল কাহিল, তার উপর বুড়ো হাড়। চোট সামলাতে পারলোনা।"

কাহিনী শুনে স্তব্ধ হ'য়ে যায় মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে।

কাহিনী নূতন নয়। তবু মনে হয় সেই বৃদ্ধ চন্দ্রকান্তের অন্তিম আর্তনাদগুলি এই অন্ধকারের ভিতরে আজও কেঁপে কেঁপে উঠছে ধানের শীষের প্রতিটি মাথায়। হাজার বছরের গোলামীর অভিশাপ যেন ছায়ামূর্তি ধরে ধেয়ে ধেয়ে আসছে এই জলকণাভরা বাতাসে বাতাসে। টর্চ ফেলতে ফেলতে হেঁটেই চলেছে তিনজনে। দিনের বেলার সেই একই পথের সীমানা যেন দ্বিগুণ হ'য়ে উঠেছে এই ভয়াল রাত্রির অন্ধকারে। বড় বড় ব্যাঙ বসে আছে পথের মাঝ-খানে অলসভঙ্গিতে। মানুষের পদশব্দে মাঝে মাঝে ত্রস্ত ছুটে পালাচ্ছে শিয়াল-শুয়োর আর নিশাচরী জানোয়ারেরা।

দু'একটা নিস্ফলা গাছের ডগায় বাতজাগা পাখীর ডানা ঝাপটার বিশ্রী শব্দ আর এই অপমৃত্যুর নির্মম কাহিনী। ছোট বেলা হ'লে— এ রাস্তায় এখন ভুতের ভয়ে হাত পা ঝিমঝিম করতো।

ভূতের ভয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে, কোন যুগে। কিন্তু চন্দ্রকান্তের গলিত লাসের নিঃশব্দ ক্ষুধিত ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছে কি ফল্গু ঐ দূর বিদ্যাধরীর বুক চিরে চিরে? প্রতিহিংসার ব্যর্থ বেদনা।

ক্ষমা নেই আর ক্ষমা নেই। গোলা তারা ভাঙবেই। লাঙ্গল যার জমি শুধু তারই।······

রাত্রিতে অতিথিদের জন্য যে বিশেষ রান্নার আয়োজন হ'য়েছে, খেতে বসে টের পায় ফল্গু। ভাত আর পুঁইয়ের ডাঁটা দিয়ে, কাঁকড়ার তৈলহীন চচ্চরী। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেরা নাকি সারা দুপুর ভ'রে কাঁকড়া ধরেছে তাদের জন্য। ফল্গু তাকিয়ে দেখে, বসন্ত পরম তৃপ্তিতে কাঁকড়ার ঠ্যাং চিবুচ্ছে।

মায়ের হাতের রান্নাখাওয়া জিভকে শাসন করে ফল্গু মনে মনে। এদের এই অকৃত্রিম আন্তরিকতার কাছে হার মানতেই হ'বে এই পর শ্রেণীর রান্নার অনভ্যস্ত স্বাদকে। ধান ফুরিয়ে এসেছে ঘরের—তবু

ভাত দিয়েই অভ্যর্থনা করছে অতিথিদের। কুন্ঠিত চিত্তে প্রতিটি ভাতের কণা খুটে খুটে খায় ফল্গু আর সত্যব্রত। আর মমতামিশ্রিত কাতর চোখে তাকিয়ে দেখে বসন্তের বাবার তৃপ্তিপূর্ণ হাত চাটা। জিভ দিয়ে চেটে চেটে যেন স্বাদ গ্রহণ করছে প্রতিটি গ্রাসের।

রাত্রিতেও আবার ভাত! এ যেন নিমন্ত্রণ বাড়ীর ভোজ ছেলে-পুলেদের কাছে। অথচ উঠোন পার হ'লেই ধান—ধান শুধ্ ধানের মাতন।

খাওয়ার পর বসন্ত শোওয়ার জায়গা দেখিয়ে বলে, "আপনারা শুয়ে পড়ুন—সারা রাত জাগন গেছে কাল। আমরা একটু পরে ঘুমাব।" ফল্গু আপত্তি জানায়, "সারারাতত আপনিও জেগেছেন। এক সঙ্গেই শোব। কাজ সেরে আস্থন।"

"না না, আপনারা ঘুমিয়ে পড়ুন। বিদেশে এসেছেন, আবার অসুখ বিসুখ না করে যায়। তাছাড়া কুটুম এসেছে, আমাদের একটু দেরি হ'বে।"

সত্যপ্রিয় চোখে চোখে অর্থপূর্ণ ইশারায় কি যেন জানায় ফল্গুকে, "চল ফল্গুদা শুয়েই পড়া যাক।" ঘরে এসে ফল্গু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, "কি ব্যাপার বলত?"

"বোঝনা—একটু ড্রিঙ্ক ট্রিঙ্ক হবে হয়তো। কুটুম এসেছে বাড়ীতে। বেয়াইর সাথে একটু তাড়ি টাড়ি দিয়ে আমোদ স্ফূর্তি হবে। শহরের কর্মীদের সামনে কি ওসব চলতে পারে। শ্রেণী ত্যাগ করলে কি হ'বে—ভদ্রখোলসটাত আছে আমদের।" শুতে গিয়ে সত্যব্রতর চোখে চিন্তার ছায়া নেমে আসে। চিন্তিতস্বরেই বলে, "তা' না হয় আমোদ স্ফূর্তি করুক রাত ভ'রে। কিন্তু এই বিছানায়ত শোয়া চলবে না কিছুতেই। আর যাই হোক, তেভাগার লড়াইয়ে এসে সিফিলিস বয়ে নিয়ে যেতে পারবো না, ফল্গুদা। লক্ষ্য করেছ এ বাড়ীর বুড়িকে! 'সিওর',

সিফিলিস আছে এর। হয়তো বাপ-ঠাকুরদার সঞ্চিত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ। আমারত মনে হ'চ্ছে এখানকার বেশীর ভাগেরই এ রোগ আছে। হয়তো হেরিডিটারী। বংশানুক্রমে চলেছে।" ফল্গুর মুখেও চিন্তার কালি ঢেলে দেয় সত্যব্রতর কথায়। "একটা সমস্যার কথাইত তুলেছ। আবার এদের বিছানায় না শুলেও হয়তো ভুল বুঝবে। কৃষক আন্দোলন কবতে এসেও যদি নিজেদের শুচিবাই ছাড়তে না পারি, তবেত চলবে না। এক কাজ করা যাক। সঙ্গের সুজনীটা বিছিয়ে নাও বিছানার উপর। কাল থেকে বলবো, যা গরম—আমাদের আর কাঁথার দরকার নেই—শুধু 'হোগলা'তেই চলবে।"

সুজনী বিছিয়ে শুয়ে পড়ে দুইজনে। ক্লান্ত চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে শুতে শুতেই। কিন্তু মাথায় যেন কেবলই কিলবিল করতে থাকে সিফিলিসের জীবাণুরা। ঠাকুরদার আমলের এই নোংরা পুরু কাঁথার ভাঁজে ভাঁজে যেন হাজার হাজার জীবাণু সার বেঁধে আছে তাদের কুমারী রক্তের শুচিতা নষ্ট করতো। বসন্তের বুড়ি মায়ের ফোলা ফোলা হাতের দূষিত ব্যাধিগুলি জরিয়ে ধরতে আসছে নাকি তাদের এই নিষ্পাপ দেহকে—মধ্যবিত্ত ঘরের সুপ্ত আভিজাত্যকে।

দুপুরবেলা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে গল্প বলছে ফল্গু—রাশিয়ান কিশোর গরিলার কাহিনী—সেই নাইটিঙ্গেলপাখীর ডাক ডাকা বীর শিশু—বীর মেয়ে তনিয়া, লীজা, ঝগরাটে শাশুড়ীর জীবনাহুতির বিচিত্র কাহিনী শোনে শিশুরা তন্ময় বিস্ময়ে। ফল্গুর চারদিকে ঘিরে বসেছে তারা যেন জন্মগত পরিচয়ের আপন অধিকারে।

মাত্র পাঁচদিন—তবু মনে হয় ফল্গুর, যেন কত বছরের পরিচয়!

গল্প বলা শেষ হ'লে শ্লেট পেনসিল নিয়ে বসে তারা—'লেখাপড়া'

শেখার অদম্য আগ্রহ চোখে মুখে ছাপিয়ে উঠেছে। ফল্গু পড়া শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে দেখে, মেয়ে বৌরা দল বেধে কলসী কাঁখে চলেছে জল আনতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের টিউবওয়েল হ'তে। পুকুরের নোনা জলে তৃষ্ণা মিটতে চায় না। তাই গৃহকর্ম শেষে প্রতি বৈকালে জল আনতে যেতে হয় ভিন্নগ্রামে। সেই "জলকে চল" এর টানে নয় এই রোদে-পোড়া দ্রুত পথচলা। জীবনের তাগিদেই—তৃষিতের তৃষ্ণা মেটাতে এই রোদ্র বৃষ্টি মাথায় ক্রোশাধিক পথ হেঁটে নিত্যকার পানীয় জল আনতে হয় ঘরের মেয়েদের। ফল্গুর চোখের তারায় ভেসে ভেসে যায় কৃষক রমণীর জীবন সংগ্রামের বাস্তব চিত্র গুলি।

চমক ভাঙে ফল্গুর। এক হাঁটু কাদা মাথা হাঁ,র উপবে কাপড় তুলে, দুইটি ডিম হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে হারানের ছয় বছরের মেয়েটি। "বাবা পাঠিয়ে দিয়েছে। হাঁসে ডিম দিয়েছে আজ।"
অভিভূত হাতে গ্রহণ করে সে কৃষকের প্রীতির উপহার।

ছোট্ট মেয়েটির বড় বড় সরল চোখে শিশুচিত্তের অফুরন্ত প্রীতিব ভাষা। পলকহীন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে সে ফল্গুর দিকে।

সত্যব্রত ঠাট্টার স্বরে বলে ইংরাজীতে, "প্রেম প্রথম দর্শনেই?" ফল্গুও হেসে ফেলে মেয়েটির সপ্রশংস মুগ্ধ চাউনি দেখে। সস্নেহে জিজ্ঞাস করে সে, "কি নাম তোমার?"

"ফুলটুসী" স্পষ্ট উচ্চারণে নামটা বলেই কি মনে করে এক দৌড়ে বাড়ী চলে যায় সে। কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে দুইজনে।

বসন্ত খেতে বসেছে এত বেলায়—একটা জরুরী কাজে গিয়েছিল সে অনেকদূরে। ছেলেদের ছুটী দিয়ে উঠে আসে ওরা রিপোর্ট শুনতে।

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে দুইটি ছেলে। "পুলিশ দেখা যাচ্ছে এই গাঙভেড়ীর মাথায়।" হাঁপাতে হাঁপাতে বলে "এই দিকেই আসছে।"

বসন্ত খাওয়া ফেলে লাফিয়ে উঠে। লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখে—ক্ষেতের আড়ালে পুলিশই দেখা যাচ্ছে—লাল পাগড়ির সারি।

"দৌড়ান আমার পিছু পিছু।" জঙ্গী কৃষকের দৃঢ় আদেশ ফুটে উঠে কণ্ঠে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যায় তিনজনে।

বসন্তের ছোট মেয়ে অভুক্ত বাবার এঁটো থালাটা সরিয়ে ফেলে তাড়াতাড়ি।

নন্দলালের ঘরে ডেকে পাঠিয়েছে সাগরীকে। টাইপ করা বন্ধ রেখে উঠে যায় সে।

নন্দলাল ঘরে নেই—একজন কম বয়সের নূতন নেতা টেবিলের ধারে বসে একাগ্র মনে কি লিখছে। আসল নামটা জানে না সাগরী, ছদ্মনাম মন্মথ। নন্দলালের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। কলম রেখে মৃদু সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে বসতে বলে মন্মথ সাগরীকে।

"আপনার সাথে জরুরী কথা আছে, সেজন্যই ডেকেছি।" গলার স্বরের সংকোচটুকু কাটিয়ে নেয় সে এই ছোট্ট ভূমিকাটুকু দিয়ে। সম্পূর্ণ চোখে তাকিয়ে দেখে একবার সাগরীকে। তারপর গলার স্বরকে প্রয়োজনমত গম্ভীর করে নিয়ে আর কোনও ভূমিকা না করে বলে ফেলে প্রয়োজনীয় কথাটা—"আপনার উপর অর্ডার এসেছে—স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবে আপনাকে।" একমুহূর্তে বিবর্ণ হ'য়ে উঠে সাগরীর চোখমুখ। দুঃসংবাদের সবটুকু শোনার জন্য ভীত চোখে অপেক্ষা করে। আরও কোনও অন্যায় কাজ করেছে কি রথী? সমস্ত চেষ্টা দ্বারা নিজেকে সংযত রেখে প্রশ্ন করে সে—"আর কোনও প্রমাণ পেয়েছেন কি তার বিরুদ্ধে।"

মন্মথ উত্তর দেয়—"যে প্রমাণের ভিত্তিতে আপনি তাকে ছেড়ে এসেছেন, তার বেশী আর কি প্রমাণের অপেক্ষা থাকে। তার স্বরূপ আপনার চাইতে আর বেশী কে জানবে—এক বাড়ীতে থাকা পর্যন্ত সম্ভব হল না আপনার। আর কি তার সাথে মিলিত হবার আশা রাখেন আপনি। বিচ্ছেদই যখন হ'ল পাকাপাকি ভাবেই বিচ্ছেদ হওয়াটা ভাল নয় কি। যা'তে তা'কেও তার অন্যায়ের চূড়ান্ত জবাব জানান হয় আর আপনিও মুক্ত হ'তে পারেন।"

নির্বাক হ'য়ে কথাগুলি শুনে যাচ্ছে সাগরী—হাতুড়ির আঘাতের মত প্রতিটি বাক্যকৌশল একটি একটি করে আঘাত করে যাচ্ছে তার নির্বুদ্ধিতার চেতনাকে। প্রত্যেকটি কথা বলার নিগূঢ় অর্থ ক্রমশই বিবশ করে ফেলছে যেন তাকে—কি ঘোরাল উকিলী বুদ্ধির প্যাচ। "যে প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে ছেড়ে এসেছেন আপনি! যে কারণে এক বাড়ীতে থাকা পর্যন্ত সম্ভব হ'ল না আপনার।" ধৈর্য আর বিস্ময়ের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে সাগরী, তবু নিজেকে সম্পূর্ণ সংবরণ করেই কথার মাঝখানে আপত্তি তোলে—"আমার মুক্ত হবার কথা অবান্তর এ প্রসঙ্গে।"

"অবান্তর কেন। আপনি যদি আবার বিয়ে করতে চান।"

কথা আর শেষ করতে দেয় না। সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় সাগরীর। প্রতিবাদ করে উঠে সে দৃঢ় কণ্ঠে—"আমাকে অপমান করার জন্যই যে ডেকেছেন এখানে আমি আশা করিনি।"

মন্মথ মুহূর্তের জন্য একটু থমকে যায়; পর মুহূর্তের মধ্যেই সামলে নিয়ে মৃদু হেসে উত্তর দেয়—"অপমান করার জন্য নিশ্চয়ই ডাকিনি। আপনারও নিশ্চয়ই অজানা নেই যে নন্দলাল is waiting for you."

গর্জে উঠে সাগরী "ষ্টুপিড্।"

বলেই ছুটে বেরিয়ে আসে যে ঘর থেকে—চোখ মুখ ফেটে পড়ছে ক্রোধে আর অপমানে। নিজের ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

সমস্ত শরীর কাঁপছে তার উত্তেজনায়। আজ স্পষ্ট হ'য়ে মনে পড়ছে সেই জ্বরের রাত্রিতে ঘুম ভাঙা চোখে দেখা নন্দলালের ছবিটা। সেদিন সন্দেহ করেনি সে। কিন্তু আজ যেন বিচ্ছুর মত বিঁধছে সেদিনের সেই দৃশ্যটি।
মন্মথের কথাগুলি বিচ্ছু স্পর্শের মত জ্বলছে যেন মস্তিস্কের শিরা উপশিরায় "নন্দলাল is waiting for you"

একটা কদাকার সরীসৃপ প্রবেশ করেছে যেন তার কর্ণকুহরে। দুষিত ক্ষত ঝরা রক্তের ক্লেদাক্ত স্পর্শের মত।

কান্নায় ভেঙে পড়ে সাগরী—কতবড় অমানুষের কথায় বিভ্রান্ত হ'য়ে ত্যাগ করে এসেছে সে রথীকে। অকূল সমুদ্র বক্ষে শেষ অবলম্বনটুকু হাত থেকে খসে যাওয়ার মতই অসহায় লাগছে নিজেকে। রথীর সাথে মিলিত হবার আর কোনও পথ নেই। আর কোন আশা নেই। মিথ্যার চকমকি দেখে ঘর ছেড়ে এসেছে সে সত্যনিষ্ট একটি কমরেডের মুখে কালি ছিটিয়ে। আজ এই কালীমাখা মুখে কি করে আর ফিরে যাবে সে তার কাছে। চোখের জলে ভিজে চলেছে বালিশ।

নিঃশব্দে কাঁদে সাগরী। প্রাণ খুলে কান্নারও উপায় নেই তার। পৃথিবীর গৌরবময় পার্টির এই কালী ঢালা অপমানকে ঘোষণা করবে সে কার কাছে।

নিজেকে এত একা এমন করে কোনদিন অনুভব করে নাই সাগরী এর আগে।

দুয়ারে টোকা পড়ে।—চোখমুছে উঠে গিয়ে দুয়ার খুলে দেয়।

অরুণাংশু ঘরে ঢোকে রেশনের থলে হাতে।

স্থইচটা টিপে দেয় সে—"একি এই অন্ধকার ঘরে বসে কি করছিলেন।"

"শুয়েছিলাম শরীরটা ভাল নয়।"

অরুণাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে বলে" শরীর ভাল নয়, না মন ভাল নয়। চোখমুখত ফুলিয়ে ফেলেছেন কেঁদে। যান কলতলায় গিয়ে ভাল করে চোখমুখ ধুয়ে আস্থন কর্তারা এসে পড়ার আগেই। না হ'লে মনের এসব দুর্বলতার পরিচয়ে আবার কোন্ সংস্কার-বাদী ছেঁদা বেড়িয়ে পড়বে।" শ্লেষের স্থরে বলে সে। কয়দিন ধরেই লক্ষ্য করছে সে সাগরীর মনের বিরূপভাবকে। সাগরীও বোঝে অনেক বারুদ জমা হয়েছে ওরও মনে, এবার ফেটে পড়বে একদিন। বিদ্রোহের স্থরে বলে যায় অরুণাংশু "আমি বেশী দিন এ বেগাড় খাটছিনা। আপনাকেই প্রথম বল্লাম কথাটা। একেবারে সংগ্রামী এলাকায় চলে যাব ঠিক করেছি। উঠতে বসতে এসব আমলাতান্ত্রিক চোখ-রাঙ্গানি সহ্য করার চাইতে পুলিশের সাথে মুখোমুখী 'ফাইট' করা অনেক সহজ। এখানে যা করছি এত নিজেকে ছলনা করারই নামান্তর।"

অরুণাংশুর বহু কথার ভিতরে একটি কথাই লেগে থাকে সাগরীর কানে—"সংগ্রামী এলাকায় চলে যাব।"

উত্তাল সমুদ্রে একটা আশার কাষ্ঠ খণ্ডের মতই যেন সে আঁকড়ে ধরে কথাটা। কৃষাণ এলাকায়ই চলে যাবে সেও, মনে মনে ভাবে সাগরী।

গম্ভীর মুখে ঘরে ঢোকে নন্দলাল। কুৎসিত সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় একবার দুজনকেই। কদর্থময়ী স্থর ফুটিয়ে কণ্ঠস্বরে, ধমকে উঠে সে—"এখানে কি হ'চ্ছে দুজনের।"

দাঁতে দাঁত চেপে ঘর থেকে বেড়িয়ে যায় অরুণাংশু। প্রতিরোধ করার এক দুর্নিবার শক্তি নিয়ে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ায় সাগরী। চোখ দিয়ে আগুন ঝলসে বের হ'চ্ছে যেন। আর একটাও কথা বলার সাহস হয় না নন্দলালের। এক ভয়ংকর মূর্তি নিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে যায় সেও।

দু'দিন পর অরুণাংশু এসে জানিয়ে যায় সাগরীকে, নৈতিক কারণে বহিষ্কৃত হ'য়েছে সে। চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠেছে অপমানে তবু দুঃখের হাসি হাসে, "এক চাকরিত আগেই ইস্তাফা দিয়ে এসেছি। দ্বিতীয় চাকরিটিও গেল। এবার এক কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি আরেক কাঁধে দুর্ণামের ঝুলি নিয়ে ঘরে ফিরে চল্লাম। রাজনীতি আর নয়। ঘরে বসেই আপনাদের বিজয় ভেরীর অপেক্ষা করবো"।

ফল্গুর কুর্ণীয়ার এসে পড়ে। বৃন্দাবন। বছর তেরো বয়স। ফল্গু বিশেষ দৃষ্টি দিয়েই চিনে রেখেচে তাকে। রাধার ভাই সে রাধার নাম এ অঞ্চলে কৃষকদের মুখে মুখে। লেখাপড়া জানে, একটা প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারণীর কাজও করেছে কিছুদিন। ঘরের বৌ, ঝিরা সম্মানের চোখে দেখে রাধাকে, ঈর্ষার চোখেও। পুলিশের খাতায় নাম পড়েছে তারও।

প্রথম যেদিন লাল সেলাম জানিয়ে কমরেড্ বলে সম্বোধন করল রাধা—সাঁওতালী ঢংয়ে চুল বাঁধা এক কৃষক মেয়ে, মনে মনে অভিভূত না হ'য়ে পারেনি ফল্গু। একেবারে কৃষকের ঘরের খাঁটি সর্বহারা বিপ্লবী মেয়ে।

ভাইকেও এই বয়সে পথ ধরিয়েছে তার দিদিই। দৌত্যগিরি

করে, শহরের কর্মীদের পথ চিনিয়ে এ গ্রামে ও গ্রামে নিয়ে যায়। বাকি সময় শুয়োর পালে। প্রতিবেশীদের পালা শুয়োরদের বনকচু খাইয়ে আনাটাই এতকাল প্রধান জীবিকার পথ ছিল তার। কিন্তু এখন স্বতন্ত্র পথে পা দিয়েছে—যা ঘটেনি এতকাল, তাই ঘটবার অপেক্ষার উদগ্র হ'য়ে রয়েছে তার কিশোর মন। তারই চোখের সামনে রোগা বাপকে ঠেঙ্গিয়েছে—জমিদার বাড়ীর ভুরিওয়ালা মানুষগুলি। বিনা প্রতিবাদে শুধু সহ্যই করে গিয়েছে তার বাপ জ্যেঠারা সে অত্যাচার। আজ তার জবাব দেবার দিন আসছে। আর শুধু কাদামাখা শুয়োর তাড়িয়ে দিন কাটাতে হ'বেনা। ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান খুটে বের করা নিয়ে ঝগড়াও করতে হ'বে না। ধান বের করে আনবে তারা ধামায় ধামায় বস্তায় বস্তায় খামারের গোলা থেকেই।······চোখে সোণালী স্বপ্নের রূপালী রেশ নেমে আসে।······

ফল্গু ঘর থেকে সার্ট বের করে গায়ে দিয়ে নেয়। ঘরের সামনে উঠোনে বসে মহেন্দ্রের মা বিচালি কাটছে মোষের জন্য। ডেকে বলে দেয় সে, "ফেরার সময় কাউকে নিয়ে এসো বাবা, সাথে করে। দিন কাল ভাল নয়।"

ফল্গু একটু চমকে উঠে ভিতরে—যেন প্রমীলারই কণ্ঠোচ্চারিত সাবধানী। সেই একই স্নেহ ঝরছে চোখেমুখে।

রওয়ানা হয় দুজনে। মাইল পাঁচেক পথ হাঁটতে হ'বে। ফল্গু গল্প বলতে বলতে এগিয়ে চলে—চীনা গরিলা বাহিনীর গল্প। তারাও এমনি চাষার ছেলেই ছিল। পাহাড়ের কোল ঘেষা কঠিন জমির বুক চিরে বীজ বুনতো। তারপর পাকা শস্যের মদালু গন্ধ নাক ভ'রে টেনে টেনে নিয়ে কাস্তে চালাত। কিন্তু সে শস্য গোলায় উঠতো জোতদারের খামারে। ঠিক বৃন্দাবনের বাপ্ জ্যেঠার মত উঠতে-বসতে ঠেঙ্গানি খাওয়া ভূমিহীন চাষী ছিল তারাও। এদেরই মত নিরক্ষর।

কিন্তু সেই চাষীর ছেলেরাই আজ কাস্তে রেখে রাইফেল কাঁধে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ী উপত্যকার গা বেয়ে।.........

তন্ময় হ'য়ে শুনে বৃন্দাবন নবজীবনের বীজাংকুরিত মুক্তির কাহিনী।

গল্প বলা শেষ হ'লে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে ফল্গু, "আর তোমরা হ'বে বিদ্যাধরীর কিশোর গরিলা।" সূর্য সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে দু'জনে। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে ঝলসে যাচ্ছে চোখমুখ। তবু একবিন্দু ক্লান্তি নেই মনে। চোখে মুখে ছাপিয়ে উঠেছে কোন দূর উপত্যকার চীনা গরিলার সেই একই অনমনীয় অটল প্রতিজ্ঞা। সেই একই অপরাজেয় মনের দৃঢ় অঙ্গীকার। চোখে ভাসছে সেই দুর্দমনীয়, রাইফেলধারী চীনা সৈনিকের দীপ্ত ছবি।

মৃদুস্বরে সুর টানে একটু ফল্গু "কাস্তেটারে দিও জোরে টান ওরে কৃষাণ ভাই, কাস্তেটারে দিও জোরে টান।"

দূর সুন্দরবনের উপর দিয়ে বয়ে আসছে সামুদ্রিক হাওয়া। চড়াই উতরাই আলভাঙা মেঠো পথ। চারদিকে স্বপ্ন জড়িয়ে রয়েছে যেন হরিদ্রাভ ধানী জমির বুকে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে জোড়ায় জোড়ায় তাল গাছ। দূরে বয়ে চলেছে বর্ষার ভরা নদী।

"ঐ যে তালগাছের মাথা দেখা যাচ্ছে ঐ গ্রামে" আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে বৃন্দাবন।

ফল্গু তাকিয়ে দেখে প্রসন্ন চোখে, ঘন বন্যগুল্ম, বনবনানীর প্রাচীরে ঢাকা ভূমিহীন চাষীর দুর্গ—ঝোপঝাড় জঙ্গলের পরিখা বেষ্টিত উন্মুক্ত কেল্লা। দ্রুত পায়ে হাঁটে ফল্গু—ঘামে ভিজে গিয়েছে গায়ের জামা। কপাল কাচিয়ে ঘাম ঝাড়ছে বারে বারে। এখনও কতদূর।

ক্ষেতী জমি ছেড়ে এবার গাছ গাছালীর ভিতরে ঢুকে পড়ে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় আরামে স্বাদ। তৃষ্ণায় গলা কাঠ হ'য়ে আছে। কিন্তু ভাল পুকুর চোখে পড়ে না একটাও। চারদিকে শুধু পচা পাগাড়।

"কোথায়ও খাবার জল পাওয়া যায় ?" জিজ্ঞেস করে ফল্গু। বৃন্দাবন একটু স্নেহের চোখে তাকিয়ে দেখে সঙ্গীকে, "এসে পড়েছি—এই যে ঘর দেখা যাচ্ছে।"

একসার তাল গাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখে ফল্গু, সংগ্রাম পরিষদের সভা আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। হঠাৎ বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে পড়ে সে—কথা বলছে সাগরীদি না ?

সাগরীই তাহলে কমরেড জবা ? দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় সে—চোখে ঝরে অভিনন্দন। সাগরীর চোখ দু'টি মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে। কিন্তু লক্ষ্য করে ফল্গু, একটা বিষাদের ছায়া যেন লুকিয়ে রয়েছে সাগরীর এই সানন্দ দৃষ্টির অভিনন্দনে।

বৃন্দাবন এক ঘটি জল নিয়ে আসে ভিতর থেকে। জল খেয়ে নিঃশব্দে বসে পড়ে সে কৃষকদের মাঝে। একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় সভার চেহারাটা। জোড়া জোড়া ক্ষুধিত চোখ। দলবদ্ধ নওজোয়ানের দৃঢ় কবজি, পুঞ্জ পুঞ্জ বারুদের আভাস তামাক টানা কাল পুরু ঠোটে।

আলোচনা শুরু হ'য়ে গিয়েছে আগেই। অবাক হ'য়ে সাগরীর মুখের দিকে তাকায়, এ কি বিধর্মী কথা বলছে সে ?

"জোতদার মাত্রই আমাদের শত্রু নয়। ধনী জোতদার আর মাঝারি জোতদারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তা অস্বীকার করা চলে না। প্রতি-দিনের তিল তিল করে গড়ে উঠা অভিজ্ঞতা দিয়ে যে সহজ কথাটা বুঝতে পেরেছেন আমাদের বৃদ্ধ কমরেড ইব্রাহিম—তা' অস্বীকার করার অর্থ, সত্যকেই অপব্যাখ্যা করা।"

শাণিত হয়ে উঠেছে কমরেড জবার দৃষ্টি—প্রতিটি অক্ষরে প্রতিটি কথায় যেন তার শেষ শক্তি ঢেলে দিয়ে বলে চলেছে সে, "কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে ভাল করে ভেবে দেখতে হ'বে, প্রত্যেকটি সংগ্রাম

পরিষদের সভ্যকে যে গোপীনাথ মণ্ডলের মত জোতদারদের গোলা ভেঙে শুধু শত্রুর সংখ্যাই বৃদ্ধি করা হ'বে কিনা।"

"শুধু এই এক জন্ম ধরেই আমরা ভেবে দেখিনি, জন্ম, জন্ম ধরেই আমরা ভেবে দেখ্‌ছি—" সভার ভিতর থেকে আহত ফণিনীর মত দাঁড়িয়ে গর্জে উঠে রাধা, "আমাদের বাপ ঠাকুরদার ঘামঝরা, রক্ত-ঝরা দুঃখকষ্ট, চোখের জলের কথা শহরের দুধ ননী খাওয়া মেয়ের জানার কথা নয়।"

ফল্গু একবার তাকিয়ে দেখে সাগরীর ব্যথিত মুখের দিকে। তার চোখের তলায় বেদনার রক্ত ঝরছে যেন। এমন ভেঙেপড়া বিষাদ মূর্তি সাগরীর কোন দিন দেখেনি ফল্গু এর আগে।

দূরে তাল গাছের মাথায় পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়েছে। দিনান্তের শেষ ক্লান্তি যেন জমা হ'য়েছে সাগরীর চোখের ম্লানিমায়।

রাধার কথা শেষ হয়নি তখনও—"আমাদের এতকালের জমানো দুঃখ ঘোষণা করার দিন এসেছে এতদিনে—চোখের জলে নয়, কান্নায় নয়, আপসে নয় শুধু লাঠির মুখে—"

সভায় বসা কৃষকদের চোখগুলি জ্বলে উঠে—তাদের মনের কথাগুলিই টেনে টেনে বের করছে তাদেরই ঘরের মেয়ে। সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, গোপীনাথের গোলা দিয়েই শুরু হ'বে গোলা ভাঙার অভিযান। সাগরী ছাড়া সবাই হাত তুলেছে স্বপক্ষে। সুখেন্দু ক্ষুরধার দৃষ্টি দিয়ে চোখ বুলিয়ে নেয় প্রত্যেকের মুখের দিকে। তারপর যেন তীরের ফলক দিয়ে বিদ্ধ করে বিদ্রূপ মেশান স্বরে বলতে থাকে, "খুবই দুঃখের বিষয় যে কমরেড ইব্রাহিম আমাদের সংগ্রাম পরিষদের আগামী সিদ্ধান্তের বিপক্ষে মত জানিয়েছেন। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই কারণ বুড়ো মানুষরা চিরকালই সংগ্রামের শত্রু। তারা চিরকালই

আপসকামী। আসলে এ শুধু ভীরুতারই আত্মছলনা মাত্র। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে, বুড়োদের এই ভীমরতির দৃষ্টান্তের অভাব মিলবে না।

কিন্তু নিতান্তই অনুশোচনার কথা—কমরেড জবাও সেই একই সংস্কারবাদী মনোভাব পোষণ করছেন। এভাবে সংগ্রামী কৃষকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা খুবই অনুচিত তার পক্ষে।"

ফল্গুকেও বলতে হ'বে এখন। আগামী সংগ্রামে এ সংগ্রাম পরিষদের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে বলতে হ'বে তাকেই।

সাগরীর আবেদন ভরা গভীর দৃষ্টির গভীরে তার ডুবারু দৃষ্টিকে তলিয়ে দেয় একবার ফল্গু। মনের ভিতরে কোথায় যেন কি একটা খটকা বিঁধে রয়েছে। বুকের অন্তঃস্থলে যক্ষ্মাজীবাণুর মত অনুপ্রবেশ করছে যেন সাগরীর বেদনার্ত দৃষ্টির কণিকাগুলি।

তবু উপায় নেই। সাগরীকে আহত না করার কোনও পথ নেই। বলতে শুরু করে সে "আজ এই বিপ্লবী মুহূর্তে এ সংগ্রাম পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করছি—"

নিমেষের জন্য একবার তাকায় ফল্গু সাগরীর মুখের দিকে। স্তিমিত হ'য়ে আসে গলার স্বর। আবার জোর করেই মন শক্ত করে নেয় সে। আশু বিপ্লবের তরঙ্গায়িত বন্যার ছবিতে তলিয়ে যায় সাগরীর ভাসা ভাসা চোখের আকুল ভাষা।

সভা শেষ হয়। কৃষকেরা ফিরে চলে নিজ নিজ গ্রামে প্রতিজ্ঞা বহন করে।

সাগরী নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে দেখে, দূরে ক্ষেতী জমির বুক বেয়ে সারি সারি ধূসর মূর্তিগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে আরও দূরের অন্ধকারে।

পুকুর থেকে স্নান করে আসে ফল্গু।

পার্শ্বনাথের বুড়ো বাপ চিন্তিত স্বরে বলে, "এই অবেলায় স্নান করলেন। অসুখ বিসুখ আবার না করে।"

বারান্দার এককোণায় সরে যাওয়া রোদটুকুতে বসে ধুঁকছে সে। ফল্গু তাকিয়ে বলে, "আজও জ্বর এসেছে? আমাদের ডাক্তার কমরেডের সাথে দেখা হ'লে ওষুধ চেয়ে আনবো। হাঁপানীও আছে, তাই না।"

সামান্য একটু সহানুভূতির স্পর্শে ছলছল করে উঠে বৃদ্ধের গলার স্বর "ওটাইত কাল রোগ। এই কষ্ট পাওয়ার চাইতে প্রাণটা যদি বেড়িয়েও যেত—তাহ'লেও বাঁচতাম।"

রোগে পঙ্গু এই বুড়োদের জন্য বড় দুঃখ হয় ফল্গুর। বাকি জীবন শুধু যন্ত্রণাই সইবে এরা।

বারান্দার ঠিক নীচে উঠোনের উপরও গড়িয়ে পড়েছে খানিকটা রোদ। সেখানে গুটিসুটি হ'য়ে চোখ বুজে রয়েছে একটা লোমওঠা কুকুর। বারে বারে মাছি এসে বিরক্ত করছে তাকে। আর মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে কুকুরটা। "নাঃ এই কুকুরটা জ্বালাল আরও। সারা বাড়ীতে আর জায়গা পায় না—ও এইখানটায়ই শুয়ে থাকবে দিনরাত।"

হঠাৎ কুকুরটার উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠলো কেন বুড়ো—বুঝতে পারে না ফল্গু। উঠে গিয়ে কুকুরটা সরিয়ে দিয়ে আসে।

তাকিয়ে দেখে, ভাত নিয়ে আসছে বসন্তের মেয়ে বাতাসী—পার্শ্বনাথের বৌ সে।

বুড়ো সস্নেহে আতিথেয়র স্বরে বলে, "নিন খেয়ে নিন—বেলাত নেই। গরীবের ঘরের মোটা ভাত। কিছুই যোগাড় করতে পারিনি। আর করবেই বা কে। পার্শ্ব ছাড়া আরত কেউই নেই আমার। ঐ ছেলেটুকুকে ক্ষেতের ধারে বসিয়ে বসিয়ে ক্ষেতের কাজ করেছি। কত ক'রে ঐটুকুকে বড় করে তুলেছি। গরীব চাষীর দুঃখের কথা

বলতে আরম্ভ করলে আর শেষ করা যায় না। না হ'লে আপনারা যে আর কবে আসবেন আমাদের মত গৃহস্থের বাড়ী, তাও কিছুই একটু খাওয়াতে পারি না।"

বিহ্বলতায় কথা হারিয়ে ফেলে যেন ফল্গু। ভাতই যে পরমান্ন এদের, তাকি আর জানে না সে। সেই সামান্য পুঁজিটুকুও উজার করে' আতিথ্য করছে এরা। অতিথির সুখ সুবিধার জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই— তাও যেন মন ভরছে না।

লক্ষ্য করে ফল্গু, বুড়ো তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে তার খাওয়া। কোনও অসুবিধা না হয়, চারদিকে আন্তরিক দৃষ্টি।

ফল্গু সংকুচিত হ'য়ে বলে "ভাত যে পাব এই অবেলায় আশাই করিনি। যা ক্ষিধে পেয়েছিল—ভাত পেয়ে ঠাণ্ডা হ'ল শরীরটা।" হাসি ফোটে বৃদ্ধের চোখে—এতক্ষণে আশ্বস্ত হ'ল যেন, মনে হয়।

বসন্তের মেয়ে বাতাসী। বাপের বাড়ীতে পরিচিত মানুষ, তাই মাথার ঘোমটা কিছু কম। ফল্গু লক্ষ্য করে, তার কথায় সত্যি খুশির আভা ফুটেছে তার মুখে। অতিথি—তার উপর স্বামীর সহকর্মী। তাকে তৃপ্ত করে খাওয়ানর তৃপ্তি ঝরে নীরব চোখে।

খাওয়া হ'লে মুখ ধুতে যায় সে পুকুরে। বুড়ো আপত্তি জানায়, "কেন জল এনে দেবে। বারে বারে ঘাটে যাওয়ার কি দরকার।"

"পা দুটো রয়েছে কেন?" হেসে উত্তর দেয় ফল্গু।

ঘাটে এটো থালা মাজছে বাতাসী। পুকুরের আরেক দিকে হেলাঞ্চে শাক তুলতে তুলতে গলা ছেড়ে গান ধরেছে একটি নয় দশ বছরের অবিবাহিত মেয়ে। বহু পরিচিত জলভরার গান।

"চল্‌লো নাগরী লয়ে ঘাগরী যাই সুরধনী তীরে।
জল ভরতে যাই চল্, চল্ ধীরে ধীরে —আজ গৌরের বিয়ে।"

বুকের ভিতরে কোন জন্মান্তরের দুরাশা যেন হুহু করে উঠে

বাতাসীর। পার্শ্বনাথের তামাটে মুখখানা ভেসে ভেসে উঠে যেন চোখের তারায়। পুকুরের জলের কাঁপুনিতেও সেই একই ছায়া। কতদিন আসেনা সে। একমাস হ'ল। কিন্তু মনে হয় যেন কত বছর ধরে বাতাসীকে ছেড়ে গেছে সে।

ফল্গু অলক্ষ্যে পড়ে নেয় বৌটির এ নম্র চোখের গোপন কথা। ভালবাসার রক্তিম বিন্দুর মত টলটল করছে সিন্দুরের ফোঁটাটা। তারই নীচে কাল চোখ দুটিতে বয়ে চলেছে শান্ত প্রতীক্ষার নীরব ফল্গুধারা। ফল্গু জানে, পার্শ্বনাথ আসবে আজ রাতে। বৌটির কচিমুখখানা দেখে মায়া লাগে মনে। মুখ ধুতে ধুতে চাপা গলায় বলে সে, "আজ রাতে সে আসবে।" উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে নীরব চোখ দুটি, আড় চোখে লক্ষ্য করে ফল্গু।
খুশির আমেজ চুঁইয়ে উঠে ফল্গুর মনে—ক্ষুধার্তের পাতে পরিতৃপ্ত আহার পরিবেশন করাব মতই আনন্দ।

সন্ধ্যার আগে বাতি ঠিক করতে গিয়ে' 'ডিবাটা'য় একটু বেশী তেল ভ'রে রাখে বাতাসী। তারপর আবার উনুন ধরিয়ে ভাত বসায়। সত্যি যদি আসে সে। হয়তো সারাদিন খাওয়াই জোটেনি তার। সত্যি আসবে কি। অন্ধকার না জ্যোৎস্নারাত আজ। এখনও চাঁদই উঠে নাই। অধীর প্রতীক্ষায় বারে বারে আকাশের দিকে তাকায়। এতক্ষণে মাত্র দুটি তারা চোখে পড়লো।

বাতাসী উঠে যায় ঘরে বাতি ধরাতে। ঘরে ঢুকে অবাক হ'য়ে যায়, পার্শ্বনাথ কথা বলছে ফল্গুর সাথে। মানুষটি যে কখন এসে বসেছে ঘরে, টেরও পায় নাই।

মাথায় ঘোমটা আরও একটু টেনে দিয়ে বাতি রেখে যায় সামনে। পার্শ্বনাথ একবার একটু তাকিয়ে দেখে। চোখে চোখ মিলে যায়। লাল সিন্দুর বিন্দুটি আরও টল টল করে উঠে

যেন গৃহস্থবধুর চোখে-মুখের রক্তিমাভায়। বুকের ভিতরে উঠেছে পুলকিত দোলা।

ঘরের আরেক দিকে বুড়ো বাপও তার ঢেলা ঢেলা চোখের স্নেহ দিয়েই যেন চেপে ধরতে চাইছে ছেলেকে, সেই মা-মরা ছোট্ট ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরার মতই।

"আজই আবার চলে যাবি নাকি?" কাশি থামিয়ে একবার প্রশ্ন করে। আবার নিজেই বিড় বিড় করে বলে, "চলে যাওয়াই ভাল। বাতাসেরও কান আছে। চৌকিদার ঢেঁড়া পিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে তোকে ধরার জন্য।"

রাত্রিতে শুতে গিয়ে কপট রহস্যের সুরে প্রশ্ন করে পার্শ্বনাথ, "সন্ধ্যাবেলা ভাত চাপিয়ে ছিলে কার জন্য।" "বল দেখি কার জন্য?" সপ্রতিভ খুশির উত্তর। কয়মাস আগের নূতন বৌয়ের সেই লজ্জার রেশও নেই এ মধুঝরা চঞ্চল চাউনিতে? আবার সহস্র শংকার ভীড় জমে উঠে চোখের কোণায়, "কালই চলে যাবে?"

"কাল পর্যন্তও থাকা চলবে না। আজ ভোর রাতেই রওয়ানা হ'বো।"

মনে হয় কত দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কত দুর্লভ এ রাত। সংগ্রামী কৃষকের অটল দৃঢ়তা কোন অদৃশ্য মায়াবিনীর যাদুস্পর্শে অবশ হ'য়ে আসছে। আরক্ত স্বরে বলে বৌকে, "ডিবাটা নিবিয়ে দাও। মিছামিছি তেল পুড়ছে।" লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠে নববধু।

ঘোমটা-খসা নববধুর সে সলজ্জ রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ে চাষীর ছেলের বাড়ন্ত যৌবনে। দম্পতী হৃদয়ের নিবিড় বাহুবন্ধন। আকাশের ফালি চাঁদের সরু সরু জ্যোৎস্নার রেখা পড়েছে পাড়ের সূতোর নক্সা তোলা বালিশ ঢাকনিতে। দূরে কোন ঝোপের ভিতর থেকে সময়ের হুঁশিয়ারি জানাচ্ছে রাতের চৌকিদার পাখীরা। আর সহস্র

নীরব জিজ্ঞাসার তুফান উঠেছে বুকের দোলায়—আবার কবে, আবার কবে আসবে এমন উষ্ণরাত।

শুধুমাত্র সান্ধ্যরাত্রির অপেক্ষাই নয়, গৃহস্থবধুর দিনমান সূচীতীক্ষ্ণ এ কল্যাণী অপেক্ষার শেষ আসবে কবে। কত দেরি আর সেই কুসুমিত কল্পনার দিনগুলি আসতে।...

চাঁদের ফালিটা সরতে সরতে আকাশের আরেক প্রান্তে নেমে গিয়েছে। শেষ বারের মত ডেকে উঠেছে চৌকিদার পাখীগুলি। রাত্রি শেষের শীতস্পর্শে হালকা হ'য়ে এসেছে স্বপ্নময় নিদ্রা।

চমকে জেগে উঠে পার্শ্বনাথ। কাদের পায়ের শব্দ না। কুকুরটাও ভুকছে কেন এত ?

বাতাসী উঠে বসেছে—বুকের ভিতরে ঢেকির পাড় পড়ছে যেন তার—পাতার উপরে জুতোর মচমচানি না! নিঃশ্বাস-গোণা নিস্তব্ধতা আতংকিত চোখের পাতায়। কান পেতে শোনে দুজনে। "না ও কিছু না।" নিশ্চিন্ত হ'য়ে বলে পার্শ্বনাথ, 'মুরগি খেতে এসেছিল হয়তো শিয়ালে।'

আধা অন্ধকারের মধ্যেও বাতাসীর ভীত মুখখানা লক্ষ্য করে বলে সে, "ভয় করছে? কোনও ভয় নেই। চাষীর ছেলেকে ধরার সাধ্য নেই পুলিশের।"

আকাশের রং বদলাচ্ছে ধীরে ধীরে।

"বাবাকে ডাক, কমরেডকে ডেকে দিক—এখন রওয়ানা হ'তে হ'বে।" বৌকে বলে সে। আতংক, শংকা আর ভালবাসা ঝরে পড়ছে বৌয়ের ডাগর চোখ দুটির গভীর অতল থেকে।

ফল্গু উঠে এসেছে, চোখের ঘুম কাটে নাই। তবু এখন এই আকাশের আবছা থাকতেই হাঁটতে হ'বে কয় ক্রোশ পথ।

বুড়ো বাপও উঠে বসেছে।

দুই জোড়া তৃষিত চোখের কল্যাণী দৃষ্টির ছায়াপথ ধরে এগিয়ে চলে দু'জনে গাঙভেরীর দিকে।......

নদীর বুক থেকে বাষ্প উঠছে—হৈমন্তিক পলিমাটির বুকে ঘুমভাঙা প্রকৃতির প্রথম নিঃশ্বাস।

গাঙ পক্ষীদের প্রভাত কাকলিতে মিলিয়ে গিয়েছে রাত্রিচর প্রাণীদের শেষ পদধ্বনি।

পূবের আকাশে ভোরের আভাস।

একখানা খেয়া নৌকো এসে ভেড়ে লালমাটি গাঁয়ে। নৌকো থেকে একে একে নেমে পড়ে লাঠি হাতে উনিশ জন বাছাই করা লাঠিয়াল। তাদের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে একই ঐক্য তানে মিশে যায় আরও একটি সংগ্রামী বাহিনীর আওয়াজের সাথে। উদ্দীপ্ত চোখে তাকিয়ে দেখে লাঠিয়ালরা প্রত্যেকেই, পার্শ্ববর্তী গ্রামের কৃষকরাও এগিয়ে চলেছে গাঙভেরী দিয়ে একই গন্তব্যের দিকে। পড়োজমির বুকে আগাছার মাথায় আটকে-পড়া ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা কুয়াশাগুলি পায়ের তলায় দলে দলে এগিয়ে চলে লাঠিয়ালরাও। লক্ষ্য তাদের ধানীজমির শেষ মাথায় গোলাবাড়ীর চুড়া।

লাঠিয়ালরা সবাই এসে জড়ো হয় কালীখোলার মাঠে। শ্মশান কালীর পূজো হ'য়ে গিয়েছে মাসখানিক আগে। রং ক্ষয়ে যাওয়া কালী মূর্তিটা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অদূরে গোপীনাথের ধানের গোলা। গোম্বুজ ঘরটায় একবার সব কয় জোড়া চোখই ছুঁয়ে যায়।

সংগ্রাম পরিষদের সভ্যরা আগেই এসেছে—রাধা, ফল্গু, প্রার্শ্বনাথ সুখেন্দু, বসন্ত, মহেন্দ্র। সাগরী ও এসেছে। আরেকটা গ্রামের কৃষকরা এসে পড়লেই গোলাভাঙা শুরু হবে। ঝড়ের পূর্বের থমথমে আবহাওয়া। উদগ্র প্রতীক্ষায় স্থির গম্ভীর মূর্তি সকলের। তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় সবাই

দূর জমির দিকে। কুয়াশায় ফাঁক দিয়ে লাল পাপড়ি দেখা যাচ্ছে যেন। আরও দৃঢ় হাতে ধরে লাঠিগুলি। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হ'য়ে আসে মূর্তিগুলি। পুলিশ নয়। মাঠ ভেঙে মেয়েরা আসছে ধান নিতে। গ্রামশুদ্ধ ছেলে বুড়ো সবাই ছুটে আসছে—বস্তা হাতে। একটা অজানা আশংকায় বুক কাঁপছে বুড়োদের। আশায় জ্বল জ্বল করছে শিশুদের চোখগুলি। মেয়েদের প্রত্যেকেরই হাতে বস্তা। ধান বিলান হ'বে আজ। উপোসী ছেলেমেয়েদের ভরা পেট ভাতও দিতে পারে না তারা। আর তাদের চোখের সামনে ঐ গোলাঘরটা ধান আগলে রয়েছে এতকাল। তাদের সারা জীবনের দীর্ঘশ্বাসও ঐ ঘরের দুয়ার ফাঁক করতে পারেনি, আজ লাঠির বাড়িতে সে ঘর ফাঁক হবে। পেশীমান লাঠিয়ালদের কবজির দিকে সশ্রদ্ধ চোখে বারে বারে তাকায় মেয়েরা। সূর্য দেখা যাচ্ছে কুয়াশার ফাঁক দিয়ে।

হঠাৎ ফাঁক হ'য়ে যায় গোলাঘরের দুয়ার। দুয়ারের ফাঁক দিয়ে চোখের সামনে একেবারে স্পষ্ট ধান বেড়িয়ে পড়ে। জোড়া জোড়া লোলুপ চোখের তারায় ঝলসে উঠে ভিতরের স্তূপীকৃত ধান।

ধান দেখা যাচ্ছে! গোলা ভরা ধানের নয়ন জুড়ানো ছবি। ঝংকার দিয়ে উঠে রুগ্ন শিরাগুলিতে—রক্তে রক্তে অস্থির কাঁপুনি।

পরিষদের সভ্যরা কোনও সিদ্ধান্ত করবার আগেই নিমেষের মধ্যে সবগুলি প্রার্থী চোখ সুইচটেপা বাতির মত জ্বলে উঠে "ধান বিলুচ্ছে।"

সিন্ধুর আকর্ষণে জলপ্রপাতের মত ছুটে যায় জনপ্রপাত গোলার দিকে। "ধান বিলুচ্ছে গোপীনাথ নিজে।" বস্তা ভরতি ভরতি ধান নিজ হাতে বের করে দিচ্ছে সে গোলাঘর থেকে।

সুখেন্দু চেঁচিয়ে বলে, "কৃষক ভাইরা, এভাবে ভিক্ষার দান গ্রহণ করে নিজেদের অধিকারকে অপমান করবেন না। ভিক্ষার দান নয়। আপনাদের প্রাপ্য ধান আপনারা নিজে আদায় করে নেবেন—কেড়ে নেবেন।"

কিন্তু সুখেন্দুর এ মেঘগর্জন, উল্লসিত, উদ্ভাসিত ধান প্রার্থীর ব্যাকুল প্রার্থনায় কোথায় তলিয়ে যায়। কৃষক রমনীর ক্ষুধিত গুঞ্জনে হারিয়ে যায় সুখেন্দুর শেষ উচ্চারণটিও।

"আমি পাইনি ধান।" "আমার ছেলে আসতে পারে নি।"

একজন কৃষক ধান নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করে গোপীনাথকে, "শুনেছিলাম আপনি নাকি পুলিশে খবর দিয়েছেন।" গোপীনাথ উত্তর দেয়, "পাগল, তোমাদের জন্যই সংগ্রাম করছে আমার ছেলেরা। কৃষক সভার সভ্য হ'য়ে কৃষক ভাইদের উপর লাঠি চালাতে পুলিশ ডাকবো আমি!"

বস্তা ভর্তি ধান নিয়ে ঘরে ফিরছে গৃহস্থরা। মেয়েদের চোখে স্নেহের ঢেউ। তবু কয় সন্ধ্যা ভরাপেট ভাত খাওয়াতে পারবে বাছাদের—হৃৎপিণ্ডের টুকরাগুলিকে।

নিস্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘসে সুখেন্দু—"শালা. শয়তান। এমন করে ভুলিয়ে দিল এদের। কৃষক সভার সভ্য নাকি আবার এরাই। কৃষকদরদী। এভাবে আর বেশীদিন ভুলিয়ে রাখতে পারবে না এসব দালালরা। এর প্রতিশোধ আমরা নেবই।"

ধান প্রার্থী ভিড় সব ঘরে ফিরে গিয়েছে। খালি হ'য়ে গিয়েছে মাঠ। ওদিকে লাঠিয়ালদের সর্দার হাই তুলছে। রং উঠা কালী মূর্তির গায়ে স্মৃতির রং লেগে রয়েছে। একমাসও বোধ হয় হয়নি—এখানে এই কালীখোলার মাঠে রাত ভ'বে নেশা করে গিয়েছিল তারা গোপীনাথেরই বাৎসরিক পুজোর উৎসবে। সে পুজোর বাজনায়ও ত এর চাইতে বেশী রক্ত গরম করেছিল। একি পানসে লড়াই। লাঠিটা পর্যন্ত তুলতে হোল না।

সংগ্রাম পরিষদের সভ্যরা আবার নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আরও ভয়াল প্রতিশোধের জন্য ধারাল হ'য়ে উঠে মন।

"হয় লুট করবো। না হয় আগুন ধরিয়ে দেব গোলায়। হাত পেতে নেওয়া হ'বে না শত্রুর দালালদের ধান।"

ঠিক হয় পরদিন—বসন্তদের গ্রামের বটকৃষ্টের গোলা ভাঙা হ'বে। বটকৃষ্টের পঞ্চাশ বিঘা জমি—চাষবাস নিজেই করে, তবে ধান কাটার সময় দুই একজন মাহিন্দা রাখে। গরু লাঙ্গলও আছে।

সুখেন্দু বলে, "আর লখিনপুরের গোলাও সেদিনই ভাঙা হ'বে একসঙ্গে।" কিন্তু ঘরে ফিরে ফল্গুকে ডেকে বলে বসন্ত, "বটকৃষ্টের গোলাভাঙাটা ঠিক হ'বে বলে মনে হয় না। বিপদ আপদে আমাদের উপকার করে সে—চাঁদাও দেয়। বরং কেওরাখালির পাঁচ আনিদের গোলা ভাঙতে পারলে একটা কাজের মত কাজ হো'তে। কমপক্ষেও দুই তিন হাজার মন ধান আছে তাদের গোলায়।'

লখিনপুর গ্রামের মহেন্দ্রও ঠিক একই সুরে আপত্তি তোলে। বহু আলোচনার পর ঠিক হয় লখিনপুরের জোতদারদের গোলাই আগে ভাঙা হ'বে—কারণ সেখানে পরপর তিনটা গোলা রয়েছে।

লখিনপুরের কৃষকরা এ সিদ্ধান্তকে খুশি মনে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তকে অমান্য করারও উপায় নেই। অসন্তোষ চাপা মনে বাড়ী ফিরে চলে মহেন্দ্র ও তার গ্রামের কৃষকরা।

বেলা গড়িয়ে পড়েছে। ব্যাঙ ডাকছে যেন কোথায় এ অসময়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, বৃষ্টির ত কোন লক্ষণই নেই। তবু ব্যাঙ্ ডাকছে কেন।

"বৃষ্টি একটু হ'লেত ভালই হ'ত" বলে মহেন্দ্রের ভাই "শীতের তরিতরকারি কিছু লাগান চলতো" "কলাই দিছত বাড়ীর ক্ষেতে?" প্রশ্নকরে মহেন্দ্রের শ্বশুর।

"আর কালাই। যা নিয়ে আছি।" মহেন্দ্রের স্বরে চিন্তা ছাপিয়ে আসে।"

"কিন্তু ক্ষেত খামারের দিকে লক্ষ্য না রাখলে চলবে কেন গৃহস্থ ছেলের।" মহেন্দ্রর শ্বশুরের স্বরে সংসারী চিন্তার আভাস। "ঘরে যখন গরু মোষ রয়েছে—সেগুলির জন্যও ত কালাই লাগবে।" কুঞ্চিত বলিরেখার ভাঁজে ভাঁজে অভিজ্ঞতার দূরদৃষ্টি। জমির লড়াইয়ের সাথে সাথে ক্ষেতিখোলার দিকেও নজর রাখা চাই—না হ'লে অজন্মার শাপ লাগবে বসুন্ধরায়।

কিন্তু মহেন্দ্রের কানে পৌঁছায় না শ্বশুরের গম্ভীর উপদেশ। তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন রয়েছে স্বতন্ত্র চিন্তায়।

প্রতিবেশী জোতদারদের সাথে একসাথে জমি চাষ করেছে, একসাথে কাস্তে চালিয়েছে, একসাথে তামাক টেনেছে ক্ষেতে বসে। তাদেরই গোলা ভাঙাটা ঠিক হ'বে কিনা।···একটা অস্বস্তিকর সংশয় উঁকি মারছে ভিতরে—। নীতিবোধের গোপন কামড়।

পরদিন ভোর হ'তেই সংগ্রামী কৃষকেরা দল বেঁধে জড়ো হয় লখিনপুব গ্রামে—প্রত্যেকের হাতে মজবুত লাঠি, কুরুল, দাঁও, খন্তা। তাদেব মিলিত কণ্ঠের লড়াইয়ের আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠে বনবনানী।

শুরু হয় আঘাত। দৃঢ় মুঠিবদ্ধ আঘাতের শব্দে ঐক্যতান উঠে। গোলাঘরের মরিচা ধরা কবজা মড়মড় করে উঠে—ভেঙে পড়ে সেগুন কাঠের বহু অভিশপ্ত দুয়ার। সংগ্রামী চোখে জ্বলে বিজয়ের আনন্দ। একজন উৎসাহী লাঠিয়াল ভিতরে ঢুকে যায়—বস্তায় বস্তায় ধান নামিয়ে দেয় নীচে কৃষকদের হাতে। গোম্বুজের উপর একটা বিজয় নিশানা লালপতাকা বেঁধে দেয়। উত্তাল হাওয়ায় পৎপৎ করে উড়তে থাকে পতাকাটা—ক্ষুধার্ত চোখের স্বপ্নের রংয়ে রাঙা। নীচে সবগুলি চোখ একসঙ্গে চক্ চক্ করে উঠে। সারাটা বর্ষা শুধু শালুক সিদ্ধ দিয়ে পেট ভরাতে হ'য়েছে। এতদিন পর ভাত পড়বে পেটে।

বস্তায় বস্তায় ধান নিয়ে চলেছে কৃষক মেয়েরা—উত্তেজনার শিহরন বয়ে চলেছে যেন শরীরে—একদিনের মধ্যেই ধান ভাঙা হ'য়ে যাবে—রাতভরে ঢেকি চলবে আজ। গরমভাতের ধোঁয়ার কুণ্ডলি চোখের সামনে। একজন ঢেকুর তুলবে আরেক জনে না খেয়ে মরবে। এ অবিচার আর চলবেনা। এখন থেকে মেহানত যার, ধান তার।

গুরু গম্ভীর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে আকাশের বিস্তৃর্ণ নীলিমায়, ফেটে পড়ে ফাঁকা জমির বুকে—

"কাস্তে যার ধান তার।···লাঙ্গল যার জমি তার।"

ভোর রাতে হঠাৎ চমকে উঠে সাগরী...দুয়ারে টোকা পড়ছে—মহেন্দ্রের গলা।

তাড়াতাড়ি বালিশের তলা থেকে একটা কাগজ ব্লাউজের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বেড়িয়ে আসে বাইরে—মহেন্দ্র আর একজন কৃষক এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায় "কি ব্যাপার পুলিশ আসছে নাকি।"

"এখনও আসে নাই—তবে আসবে মনে হ'চ্ছ শীগগীরই।" উত্তর দেয় মহেন্দ্র। "গোপীনাথের গোলায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে কে মাঝরাতে। আগুন জ্বালিয়ে রেখে একটা লাল নিশানও পুতে রেখে গেছে ঘরটার সামনে। তাই এলাম। হয়তো পুলিশ এসে পড়তে পারে। আপনার আর এখানে থাকা চলবেনা।"

পথ চলতে চলতে দূব থেকে দেখে সাগরী, গোলার আগুন তখনও নিবু নিবু হয়ে জ্বলছে। ধোঁয়ার ক্ষীণ কুণ্ডলী। পোড়া ধানের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। কলসী কলসী জল ঢালছে মেয়ে পুরুষে। সাথে সাথে মেয়েলী কণ্ঠের বিলাপ। নির্বাক হ'য়ে শোনে সাগরী গোপীনাথের দিদির বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না, "রাত বেরাতে তোদের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে পাহাড়া দিচ্ছিলাম কি এই জন্যই।"

সাগরীও একরাত কাটিয়েছে গোপীনাথের ঘরে। ঘরের মেয়েদের আন্তরিক ব্যবহারটুকু এখনও জড়িয়ে রয়েছে মনে। কিছুদিন আগেও বেশ মোটা চাঁদা নিয়ে এসেছে সে গোপীনাথের বৌয়ের কাছ থেকে। লজ্জায় বেদনায় মুখ নীচু করে হাঁটে সাগরী।

আকাশ ফর্সা হ'য়ে আসে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গৃহস্তদের মাঝে।

"এত মেহানতের ধান কি এ ভাবে পুড়িয়ে নষ্ট করতে হয়।"

"ধান হল গৃহস্থের লক্ষ্মী। তার গায়ে আগুন দেওয়ার শাপ লাগবে নিশ্চয়ই" বৃদ্ধাদের ক্ষীণ দৃষ্টির আড়ালে এক অদূরবর্তী অমঙ্গলের আশংকা।

"তাছাড়া গোপীনাথ ত অর্দ্ধেক ধান বিলিয়েই দিয়েছিল তখন আর তার গোলায় আগুন দেওয়ার কি দরকার ছিল।"

আরেকজন প্রতিবাদ করে, "হয়তো বা কোনও দালালেরই এ কাজ। গৃহস্থদের চোখে কম্যুনিষ্টদের হেয় করার উদ্দেশ্য"

সাফুই বাড়ীর গোলা ভাঙা হ'বে আজ। লাল ঝাণ্ডার মিছিল এগিয়ে আসছে গ্রামের ভিতর দিয়ে। আওয়াজের পর আওয়াজ কাঁপিয়ে তুলছে গ্রামের নিস্তব্ধতাকে। কাকপক্ষীগুলিও যেন তটস্থ হ'য়ে উঠেছে এ স্লোগান মুখর প্রতিধ্বনিতে। গৃহস্থ বৌদের হাতের কাজ শিথিল হ'য়ে আসে—না জানি কি অঘটনই ঘটবে আজ। রক্তারক্তি নাকি হ'বে আজ, পুলিশ খোঁজ করে গেছে কাল বাড়ী বাড়ী—এদের ধরিয়ে দিলে বকশিস দেবে।

কিন্তু কেন। কি দোষ করেছে এরা। একজনের ঘরে গোলা ভরা ধান আর পাঁচজনকে বিলিয়ে দেয়—অন্যায়টা কোথায়। বুঝে উঠে না গৃহস্থবধু। ধানের জ্বাল নিবে রয়েছে— খেয়াল নেই।

কেমন একটা পূর্বজন্মের স্মৃতির মত দূরে মিলিয়ে যাওয়া মিছিলের

আওয়াজ কানে লেগে রয়েছে। চোখ ভিজে ভিজে আসে—বোঝেনা কেন। জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ যেন ওদের সাথে।

মনের ভিতরে কেবলই তোলপাড় করে—ওদের কি ধরে নিয়ে যাবে পুলিশে।...

ফন্তু চালিয়ে নিয়ে চলেছে এ ভুখ মিছিল—কাঁধে লাল নিশান। পৃথিবীতে বাঁচার ন্যায্য দাবী আদায় করতে চলেছে তারা—তাদেরই প্রাপ্য ধান।

কাস্তের গান দিয়ে ধান কাটে তারা, কিন্তু পেটে জ্বলে অনল ক্ষুধা।

এই লালঝাণ্ডার ডাকে তাই তারা কাস্তে রেখে লাঠিধরেছে হাতে। অধিকার বোধে সচেতন হয়ে উঠেছে নিষ্পেষিত মন। ধান তাদের চাইই।

গোলা বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছে মিছিল। আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠেছে গুরু গর্জন আওয়াজে। পুলিশের সাথে লড়াই হবে আজ। কিন্তু গোলার সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় ফন্তু—সে গ্রামের কৃষকরাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাঠি হাতে। একজন এগিয়ে এসে আপত্তি জানায়—"সাহস যদি থাকে তবে সত্যিকারের বড়লোকের গোলা ভাঙুন। পাঁচ আনি ছয় আনির গোলা থাকতে—"

প্রতিপক্ষ দল বাধা দিয়ে বলে "সেগুলোও ভাঙা হ'বে। আগে ঘরের শত্রুদের ঘায়েল করতে পারলেত জোর বাড়বে। খালি পেটেত আর রুই কাতলাদের সঙ্গে লড়াই করা চলেনা।" গর্জে উঠে গ্রামের কৃষকরা, "কে শত্রু, কে মিত্র সে বিচার পরে হ'বে। এখন একটা লাঠির বাড়ীও যদি কেউ দেয় এদের গোলায়—তবে এসব লাঠিই পড়বে তার মাথায়।"

রুখে উঠে বিপক্ষদল, "ব্যাটা, দালাল। ঘুষ খেয়ে বশ করা হ'য়েছে—"

"মুখ সামলে কথা বলবে—"

আগুন জ্বলে উঠে দুপক্ষেরই চোখে মুখে। যার যার লাঠি তুলে ধরে। খুনোখুনিই হ'য়ে যায় বুঝি। ফল্গু মনে মনে প্রমাদ গনে। দুপক্ষের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়—মরিয়া হ'য়ে শেষ চেষ্টায় চেঁচিয়ে বলে, "ভাই সব, নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি করার সময় নয়—ভয়ংকর বিপদ দাঁড়িয়ে রয়েছে কৃষকের সামনে। এ সময়ে এ ভাবে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যে কত বড় ক্ষতিকর, তা কি আপনারা বুঝতে পারছেন না।"

লজ্জিত হ'য়ে লাঠি নামিয়ে ফেলে সবাই। ফল্গু বলে চলেছে, "কৃষকদের স্বার্থের জন্যই এ গোলা ভাঙতে আসা। তাঁরাই যখন এ গোলা ভাঙা চাননা, তখন নিশ্চয়ই তা' ভাঙা হ'বেনা। কারণ শুধু হামলা করার উদ্দেশ্যে এ অভিযান নয়।···

কিন্তু এটাও দুঃখের বিষয় যে কৃষকভাইরা তাঁদেরই একমাত্র ঝাণ্ডা এই লাল ঝাণ্ডার উপরে লাঠি তুলেছেন। এ যে কতবড় পরিতাপের বিষয় আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন।"

সেদিনের মত গোলা ভাঙা স্থগিত রেখে ফিরে চলে ফল্গু। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনা করে নতুন কার্যস্থচি তৈয়ার করতে হ'বে। বহু প্রশ্নের ভীড়, জমেছে মনের তলায়। যেন একটা ব্যবধান নাড়া দিয়ে উঠছে যুক্তিতর্ক আর অভিজ্ঞতার মাঝখানে। কোথায় যেন চির ধরে উঠেছে আন্দোলনের মধ্যে।···হঠাৎ পেছন থেকে কার গলার আওয়াজে ফিরে তাকায় ফল্গু—বৃন্দাবন ছুটে আসছে তার দিকেই।

"পুলিশ এসে পড়েছে কালীতলায়—প্রত্যেকের হাতে বন্দুক—শুয়োর নিয়ে বেড়িয়ে ছিলাম আমি, দূর থেকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসেছি খবর দিতে।"

ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে বৃন্দাবন। কিন্তু তখনই আবার ছুটে চলে, তার দিদির আজ আসার কথা পিসীর বাড়ীতে।

ছুটতে ছুটতে চোখ পড়ে তার একটা ঘরের দিকে। প্রায় সপ্তাহ দুই আগে সুখেন্দু থেকে গেছে সেই ঘরটায়। কি একটু ভেবে নিয়ে ঘরে ঢুকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে। একখানা ছাপান কাগজ পড়ে রয়েছে কোণায়। মাত্র ফলাবানান শিখেছে বৃন্দাবন, বানান করে করে পড়তে পারে সে। কিন্তু অত তাড়া-তাড়ি আর অত উত্তেজনার মধ্যে পড়ে উঠতে পারেনা কাগজ-খানা। হয়তো দরকারী কাগজ মনে করে কোমরে গুঁজে নিয়ে চলে আবার। কিন্তু পিসীর বাড়ীতে পৌছুবার আগেই দেখে, পুলিশে ভরে গিয়েছে পাড়াটা। বন্দুকধারী পুলিশ। দলবলসহ দারোগা সোজা চলে যায় পার্শ্বনাথের বাড়ী।

একটা গরুর ঘরের পিছন দিয়ে সরে পড়ে বৃন্দাবন। কিন্তু শিব মন্দিরের পেছনে পা দিতেই থমকে দাঁড়ায়—একটা পুলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানেও।

আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে দেয়, "রাধার ভাই ও।"

বুকের ভিতরে হাতুড়ির পিটুনি শুরু হ'য়ে যায়—একেবারে বাঘের থাবার সামনে।

তাড়াহুড়োতে কোমরেব কাগজখানাও লুকিয়ে আসেনি—কি আছে তা'তে লেখা, তাওত জানেনা। কিন্তু আর পালাবার উপায় নেই—শক্ত একখানা হাতের মুঠির ভিতরে আটকে পড়েছে তার হাত। "ওদিকে কোথা চলছিলি ?"

চোখমুখ ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে। তবু প্রাণপণ শক্তিতে গলার স্বর স্বাভাবিক করে উত্তর দেয় বেন্দা, "শুয়োর খুঁজতে।"

"শয়তান। এই শিবমন্দিরে তোর শুয়োর পূজো দেখতে এসেছে।" বলেই এক চড় মারে গালে।

"বল তোর দিদি কোথায়।"

কি শক্ত হাত—এক চড়েই মনে হয় গালটা জ্বলে যাচ্ছে।

হাত দিয়ে গালটা ডলতেই আরেক চড় পড়ে।

"বল্, তোর দিদি কই।" বাঘের গর্জনের মত হুংকার দিয়ে উঠেছে যেন লোকটা।

ওদিকে দারোগা তখন পার্শ্বনাথের বাড়ীতে ঢুকে হুংকার ছাড়ছে ঘন ঘন। "বাড়ীতে কে কে আছিস, ঘরের ভিতর থেকে সব বেরিয়ে পড়।"

পার্শ্বনাথের বৌ ভাত বসিয়ে পাতা দিয়ে জ্বাল ঠেলছিল—সামনে বসা মা-মরা কোলের ভাইঝিটি লোলুপ চোখে তাকিয়ে রয়েছে কখন ভাত সিদ্ধ হ'বে।

পার্শ্বনাথের বুড়ো বাপ ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে—কয়দিন ধরে হাঁপির টান বেড়েছে। উঠতে কি আর পারে। তবু অতি কষ্টে দেহটা টেনে তুলে দাঁড়ায় দারোগার সামনে। যেন চোখ দিয়ে কুটি কুটি করে দেখে দারোগা বুড়োর হাড় পাঁজরা গুলি। তার আকাঙ্ক্ষিত সংবাদগুলি সব লুকিয়ে রয়েছে যেন বুড়োর চোখের কোটরে।

"বল্, পার্শ্বনাথ কই আছে।"

এর আগে যতবার ছেলের খোঁজে এসেছে চৌকিদার— বলে দিয়েছে সে, হাটে গিয়েছে কলাই বেচতে। কোনওবার বলেছে কুটুম বাড়ী গেছে। কখনও বলেছে শ্বশুরবাড়ী গেছে।

কিন্তু এখন আর মিথ্যা বলে এড়াবার উপায় নেই। তার নাড়ী নক্ষত্র সবই পুলিশের খাতায়। বুড়ো বয়সে কত না জানি দুর্ভোগ আছে—হয়ত তাকেই ধরে নিয়ে যাবে। মনে মনে প্রস্তুত হ'য়েই উত্তর দেয় সে, "জানিনা।"

"জানিস না—তোর ছেলের খবর তুই জানিস না। এ বাড়ীতে কে কে ছিল কাল রাতে।"

"কেউ না।"

"তোর ছেলে ছিলনা রাতে ?"

"না।" "আচ্ছা ঘরগুলি দেখি আগে।" ঘরে ঢুকে পা দিয়ে বাসনপত্র সব লাথি মেরে তছনছ করে তোলে। মাটির কলসী ভরা ধানগুলি টেনে ফেলে।

বাইরে উনুনের উপর ভাতের জাল নিবে রয়েছে—। ভাতশুদ্ধ হাঁড়িটা তুলে এনে ছুঁড়ে ফেলে উঠোনে—মাটির হাঁড়িটা ভেঙে ভাতগুলি সব ছিটকে পড়ে চারদিকে—সঙ্গে সঙ্গে এক পাল কাক এসে খুঁটে খেতে আরম্ভ করে ভাত। ছোট মেয়েটি ভয়ে কেঁদে ফেলে। এতক্ষণ ধরে আশা করেছিল—কখন ভাত সিদ্ধ হ'বে —কখন ভাত খাবে সে। দারোগা একটা ধমক লাগায় "চুপ কর শীগগীর, না হ'লে পেট ফুঁড়ে দেব।" ধমকের গর্জনে মেয়েটি কেঁপে উঠে, ভয়ে কান্না থেমে যায়—চোখের পাতাটিও আর নড়েনা আতংকে। "পার্শ্বনাথের বৌ কোথায়—তাকে ডেকেদে।" আবার চেঁচিয়ে উঠে দারোগা।

বাতাসীর হাতপা অবশ হ'য়ে এসেছে আগেই দারোগার জেরা শুনে। পার্শ্বনাথকে পেলে আর রক্ষা রাখবেনা। বুকের ভিতরে নিশ্বাসও যেন জমে গিয়েছে—নড়বার শক্তি নেই। ঘোমটা টেনে উঠে এসে দাঁড়ায় সে। ঘোমটার ভিতর থেকেই টের পায়— সবগুলি চোখ যেন গিলে খাচ্ছে তাকে।

"তোর সোয়ামী কই। ভাল চাসত এখনও বল্। আমাদের চোখ থেকে কোন ঘুঘুরই পালাবার উপায় নেই। তখন কিন্তু আর আস্ত রাখবোনা তাকে।"

নিরুত্তর কৃষক বধূ। ভয়ার্ত চোখের দৃষ্টি কঠিন হ'য়ে উঠেছে। তার এ কঠিন নীরবতায় আরও ক্ষেপে উঠে দারোগা। "বল্ শীগ্‌গীর তোর সোয়ামী কই—রাতে বাড়ী থাকেনা ?"

কোনও জবাব নেই।

একটা নিরক্ষর চাষীর বৌয়ের এত তেজ। এতগুলি পুলিসের সামনেও এত বড় ঔদ্ধত্য। রাগে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে দারোগার। একটা হিংস্র জন্তু খাঁড়া হয়ে উঠেছে যেন তার লোমশ বুকের ভিতরে।

"কথার জবাব দিবিনা—মাগী বদমাইস।" বলেই বুটের তলা দিয়ে লাথি লাগায়।

আচমকা আঘাতের টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায় সে। "এখনও বল্।" লাথির পর লাথি চলেছে তার পিঠে। বুড়ো শ্বশুরের চোখের সামনেই এ দৃশ্য। হাড়ের গিঠায় গিঠায় কাঁপুনি উঠেছে—আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে সে—"ওর পেটে ছেলে আছে—মরে যাবে বৌটা।" আর বলতে পারেনা—হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে "মেরে ফেল্লগো"—অজ্ঞেন হয়ে গিয়েছে বৌটি। তবু বীভৎস পিশাচের মত চেঁচিয়ে উঠে দারোগা "ওর স্বোয়ামী বাড়ী আসে না—তবে পেটে ছেলে আসে কি করে—নাগর আসে রাতে তোর ছেলের বৌয়ের ঘরে।"

ঘৃণায় আর ক্রোধে আঁতকে উঠে বুড়ো—ভদ্রলোকের মুখেও এমন কথা বের হতে পারলো। এমন বদবমির মত দুর্গন্ধ কথা। নির্বাক হ'য়ে গিয়েছে পুলিশগুলিও তাদের উপরওয়ালার এ অশ্রাব্য গালাগালিতে।

এরই মধ্যে একজন এসে খবর দেয়—"ঐ ছোঁড়াটার কাছে একটা কাগজ পাওয়া গেছে।"

পার্শ্বনাথের বাবা গলার স্বর শুনে চমকে উঠে—এ ত পাশের গ্রামেরই চাষী। হাটে হাটে সব সময়ই দেখা হয় তার সাথে। নাম জানে না।

কিন্তু মুখটা স্পষ্ট চেনা। চাষীর ছেলে হ'য়েও চাষীর এমন সর্বনাশ করতে পারলো।

দারোগা শোনামাত্র ছুটে চলে সেইদিকে। আতংকে চোখের পাতাটিও নড়ছে না অন্যসব ঘরের মেয়েদের।

একটা পুরুষমানুষও নেই কারও বাড়ীতে—সব গিয়েছে গোলা ভাঙতে পাশের গ্রামে। চারদিকে শুধু ধানী জমি, একটা জনপ্রাণীও নেই কোথাও। গলা ফাটিয়ে ডাকলেও সারা পাওয়া যাবেনা কারও। বৃন্দাবনের পিসী ছুটে চলে খবর দিতে।

শাপ দিতে দিতে চলে সে—"কুষ্ঠ রোগ হইব ওর সর্বাঙ্গে। যে পা দিয়ে পোয়াতী বৌয়ের পেটে লাথি মারলো—সেই পা খসে পড়বে।"

ইচ্ছে করছিল বঁটিটাই ছুঁড়ে মারে ওর গায়ে।

চারদিকে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেন্দাকে কি ঐ বন্দুক দিয়েই মেরে ফেলবে নাকি ক্ষেতে নিয়ে।

পথেই দেখা হয় তাদেরই গ্রামের একটি ছেলের সাথে।

তাকে দেখে কেঁদে ফেলে ক্ষেমঙ্করী, "ওরে হারান, পার্শ্বর বৌটাকে মেরে রেখে গেছে রে। বেন্দারেও বুঝি মেরে ফেল্লরে।"

বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এ লোমহর্ষণ সংবাদ। কিন্তু গ্রামের কৃষকরা এসে পৌছুবার আগেই দারোগা দলবল সহ অন্য গ্রামে ছুটে যায়। "টিকটিকি" আরও টাটকা মালের খবর নিয়ে এসেছে—মহেন্দ্র রাধা, সব পাশের গ্রামেই আছে। চক্ চক্ করে উঠে দারোগার চোখ। বৃন্দাবনকে ফেলে ছুটে চলে সে। অচৈতন্য দেহটার দিকে তাকিয়ে বলে, "একেবারেই মোমের শরীর। কয় ঘা চাবুকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।" এর কাছে কিছু পাবার আশাও নেই, মনে মনে ভাবে। আর ইস্তাহারটায় শুধু গরম গরম কথাই আছে, এদের ঠিকানার কোন হদিশ নেই।

গ্রাম্য পথ ভেঙে ছুটে চলে দারোগা নূতন শিকারের সন্ধানে। রাস্তার মাঝে একপাল শুয়োরে আটকে যায় পথ: ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে মাটি শুঁকে শুঁকে ফিরে আসছে চালকহীন শুয়োর গুলি।

পথের মাঝে বাধা পেয়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত লাগায় একটার গায়ে এক পুলিশ। আর্তনাদ করে চেঁচিয়ে উঠে শুয়োরের বাচ্চাটা।

অদূরেই একটা জিকা গাছের সাথে বাঁধা বৃন্দাবনের জ্ঞান ফিরে আসছে। বাতাস করছে কে যেন চোখেমুখে। পাখার বাতাস নয়। ধানক্ষেত থেকে হাওয়া এসে লাগছে চোখেমুখে। আর কানে প্রবেশ করছে পোষা শুয়োরের আর্তডাক। চোখ মেলে তাকায় বৃন্দাবন— তারই শুয়োরগুলি এগিয়ে আসছে গা ঠাসাঠাসি করে।

নড়তে গিয়ে খেয়াল হয়, হাত পা বাঁধা। রক্ত ঝরছে সর্বাঙ্গে। আবার কেঁপে উঠে —পুলিশটা ধরছে বুঝি পায়ে—আবার শুরু হবে বুঝি চাবুকের উঠা-নামা। উঃ কি ধারাল শীষ চাবুকের।

শরীরটা গাছের দিকে টেনে নেয় সে সহজাত আত্মরক্ষার আকর্ষণে।

"ব্যথা লাগছে?" কে যেন জিজ্ঞাসা করে।

চমকে উঠে বৃন্দাবন—কার গলা শুনছে? পুলিশত নয়। শরীরের বাঁধন খুলে যাচ্ছে। অর্থহীন চোখে তাকিয়ে দেখে, দারোগা পুলিশ গুলি সব তাদেরই গ্রামের লোক হয়ে গিয়েছে। একটা কাপড় চেপে ধরেছে ফল্গু ক্ষততে।

পাঁজকোলা করে তুলে নিতে যায় বৃন্দাবনকে হারান।

বাধা দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে "আমি নিজেই যেতে পারব।"

আচ্ছন্ন ভাব সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছে। ফল্গুর দিকে তাকিয়ে মুঠিবদ্ধ হাত তুলে বলে, "লাল সেলাম কমরেড্।"

সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে। তবু তার ক্ষতবিক্ষত চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে আত্মতৃপ্তির লাল আভা—কোনও কথা বের করতে পারেনি দারোগা তার কাছথেকে।

সামগ্রিক দায়িত্ববোধের অপরাজেয় গর্ব ঝরে পড়ছে যেন কিশোর কিষাণের রক্তস্রাবী প্রতিটি ক্ষতের মুখে। বাণ্ডিজ বাঁধতে বাঁধতে তার দিকে প্রশংসমান চোখে তাকিয়ে বলে ফল্গু।

"মনে আছে, সেই গরিলা চীনা কিশোরের গল্প। আজ থেকে তুমি হ'লে বিদ্যাধরীর কিশোর গরিলা।'

সন্ধ্যার পর থেকেই পার্শ্বনাথের বৌয়ের অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে উঠে। ডাক্তার কমরেডের ফার্স্ট এডের বাক্সোটির সাধ্যকে ছাড়িয়ে যায় রোগী।

সন্তান নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। রক্তের ধারা বয়ে চলেছে ঘরের 'পৈঠা' বেয়ে—কাটাপাঠার মত তাজা রক্ত। জ্বরে অচৈতন্য। চোখমুখ বিবর্ণ, ভয়াবহ।

গ্রামের বুড়ী ধাত্রীও প্রমাদ গণে—প্রথম পোয়াতী তার উপর কাচা মাস। নূতন পাশকরা সংগ্রামী ডাক্তারের চোখেও একই আশংকার কালপর্দা।

বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে কোনও ডাক্তারী দোকান নেই। শুধু শেষ সান্ত্বনা দেবার মতই ইন্‌জেকসন ফুঁড়ে দেয় রগে। ডাক্তারী ছোট্ট অ্যাটাচীটির শেষ পুঁজি। বৃথা চেষ্টা। তিনদিনের মধ্যে মারা যায় প্রসূতি।

ঘরের ভিতরে ডুকরে কেঁদে উঠে বাতাসীর মা। শ্মশান বন্ধুদের সাথে নদীর ঘাট থেকে ফিরে আসে পার্শ্বনাথ। শেষ দেখার জন্যই হয় তো এসেছিল সে! নতমুখে ঘরের দাওয়ায় এসে বসে থাকে—বৌয়ের জন্য লুকিয়ে রাত বেরাতে আর ঘরে আসতে হ'বেনা তাকে। বৌয়ের সেই আকুল বিদায় দেওয়া দৃষ্টি আর কোনদিন

পিছু ডাকবেনা তাকে। ভালবাসার তীক্ষ্ম অনুভূতি ছুড়ির ফলকের মত এ ফোঁড় ও ফোঁড় করছে বুকের ভিতরে। এক বিন্দু জল নেই চোখে। প্রতিহিংসার তপ্ত নিঃশ্বাসে শুকিয়ে গিয়েছে চোখের শেষ ফোঁটা জল। কঠিন দৃষ্টির শূন্যতায় প্রতিচ্ছায়া পড়ছে শুধু প্রতিহিংসার।

ফল্গু কাছে এসে বসে। কিসের অন্তর্জ্বালা জ্বলছে তার এ চোখের বাষ্পে, বোঝে সে। বিদীর্ণ মুখের দিকে তাকাতে পারছেনা। কথা দিয়ে সান্ত্বনা দেবার নয় এ দুঃখ—এর একমাত্র সান্ত্বনা প্রতি-শোধে।

নন্দলালের কাছে রিপোর্ট দিতে আসে সুখেন্দু।

ডেন বদলিয়েছে নন্দলাল—বিরাট বাড়ী। আয়নার মত চকচকে মেঝে। মস্ত মস্ত ঘর। ঘর ভর্তি দামী দামী আসবাবপত্র। স্প্রিংয়ের খাটে নরম বিছানা, সোফা বুকশেল্প, সেক্রেটারীয়েট টেবিল, টেবিল ল্যাম্প, অ্যাসট্রে, টাইপরাইটার। আর টাইপরাইটারের দ্রুত খটাখট শব্দ।

সবে মিলে একটা আমলাতান্ত্রিক গাম্ভীর্য গমগম করছে ঘরখানায়। সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘরে ঢোকে সুখেন্দু। নন্দলাল নৈশভোজনে বসেছে। সুখেন্দুকে ডেকে পাঠায়। "বোস একটু।" আদেশমিশ্রিত স্বরে বসতে বলে আবার আহারে মনোনিবেশ করে। আধাসাহেবী খানা। কৌটার মাছের পরদেশী গন্ধ।

সুখেন্দু সেই ভোরে খেয়ে রওয়ানা হ'য়েছে। এখানে এসে সারাদিন শুধু ঘুরছেই। এক কাপ চাও জোটেনি এর মধ্যে। চোখের সামনে এমন লোভনীয় মাছের স্বাদু গন্ধে পেটের ক্ষুধাটা যেন হঠাৎ চিনচিন করে উঠে।

কিন্তু চুপ করেই অপেক্ষা করে সুখেন্দু।

খাওয়া শেষ হ'লে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে টাইপিষ্ট কমরেডটিকে ডেকে বলে, "বিমলকে ডেকে দাও।"

"সেত অসুস্থ। মাথাই তুলতে পারছেনা জ্বরে।"

কথার মাঝখানেই বিদ্রূপের সুরে আদেশ জানায় নন্দলাল, "বিপ্লব করতে এসেছে। সামান্য একটু জ্বরেই মাথাই তুলতে পারছেনা। ডেকে দাও তাকে।"

কমরেডটি আর দ্বিতীয় কথা না বলে উঠে চলে যায়। নন্দলাল ঘরের মধ্যে কি চিন্তা করতে করতে পায়চারী করে। মুখ নীচু করে বসে আছে সুখেন্দু—। নন্দলালের পালিস করা জুতোর দীর্ঘ পদক্ষেপটুকু প্রতিবিম্বিত হ'চ্ছে চোখের তারায়। মেঝের উপর জুতোর গোড়ালির ভার সাম্য শব্দ।

কোলকাতায় এখনও শীত পড়েনি।

কিন্তু পরণে গরম টাউজার—গরম জ্যাকেট গায়ে। ভাল দরজীর কাটা। সুন্দর ফিট্ করেছে। স্বাস্থ্যবান লম্বা চেহারা।

কিছুক্ষণের মধ্যে অসুস্থ কমরেডটি হাজির হয়। আবার চেয়ারে গিয়ে বসে নন্দলাল। কমরেডটির আপাদমস্তক একবার তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ করে, উপরওয়ালার স্বরে প্রশ্ন করে, "আজ ডেনের রান্না হয়নি কেন। এতগুলি কমরেড কি না খেয়ে থাকবে?" তাকিয়ে দেখে সুখেন্দু, অসুস্থ কমরেডটির চোখমুখ লাল হয়ে উঠছে জ্বরের তাপে। জ্বরের ঘোরে মাথাও কাঁপছে। প্রাণপণ শক্তিতে চেয়ারের হাতলটা ধরে বসে থাকে সে।

টাইপিষ্ট কমরেডটিই উত্তর দেয়, "ওরত কাল রাত থেকে পাঁচ ডিগ্রি জ্বর। অচৈতন্য হ'য়ে হয়ে গিয়েছিল শেষ রাত্তে।"

গর্জে উঠে নন্দলাল "তোমাকে উত্তর দিতে বলিনি।" উঠে গিয়ে

অসুস্থ কমরেডটির সামনে টান হ'য়ে দাঁড়ায়। দাঁতে দাঁত চেপে ভেংচানোর সুরে বলে "আর মরবার জায়গা পেলে না তুমি। মরতে হয় রাস্তায় গিয়ে মর। ডেনের ভিতরে মরলে তোমার দায়িত্ব নেবে কে ?"

এ অপ্রত্যাশিত আচরণে ভিতর শুদ্ধ কেঁপে উঠে যেন কমরেডটির। চোখ কুঁচকে উঠে। কিন্তু মুখে একটিও কথা আর না বলে টলতে টলতে চলে যায় সে তার ঘরে। ভয়ে চুপ ক'রে থাকে সবাই।

আবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করে কিছুক্ষণ নন্দলাল।

গম্ভীর ভয়ংকর মূর্তি। একটানা ভারী পায়ের শব্দ।

তার মুখের দিকে তাকাতেও যেন সাহস হয় না সুখেন্দুর।

এবার ডাক আসে তার। "তোমার রিপোর্ট, কি বল শুনি।" এখন মনমত সংবাদ না শুনলে হয়তো তাকে গলাধাক্কা দিয়েই বের করে দেবে, ভাবে সুখেন্দু

মনে মনে একেবারে ঢেলে সাজিয়ে গুছিয়ে ফেলে সে তার রিপোর্ট। মন দিয়ে শোনে নন্দলাল লখিনপুরের কৃষকদের অপূর্ব প্রতিরোধ কাহিনী. দারোগার অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

দ্বিধাহীন সুরে বলে চলে সুখেন্দু, লখিনপুর কৃষকদের মনোবল এত দৃঢ় ছিল যে আমরা আশা করেছিলাম—ধান কাটার ঠিক আগে থেকে গোলা ভাঙার আন্দোলন চালিয়ে, একেবারে ধান কাটার সময় ধানদখল করার শ্লোগান হ'বে। এবং ধান দখলের আন্দোলন থেকেই একেবারে মুক্ত এলাকার স্লোগান দেওয়া হ'বে।··· কিন্তু লখিনপুর কৃষকদের পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্বেও এক বিরাট মিছিলকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে ফল্গু—গোলাভাঙা স্থগিত রেখে। ফলে তাদের মধ্যে যে একতা গড়ে উঠছিল তা' ভেঙ্গে যাচ্ছে। সন্দেহ চাড়া দিয়ে উঠছে নিজেদের মধ্যে।"

"কার আদেশে গোলা ভাঙা স্থগিত রাখলো সে।"

টেবিলের উপর হাতের মুঠি দিয়ে জোর আঘাত করে' চেঁচিয়ে উঠে নন্দলাল। টান হয়ে উঠে দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধ অগ্নিমূর্তি। সুখেন্দুর ভিতর শুদ্ধ যেন হিম হ'য়ে আসে। মিথ্যার-আশ্রয়ই যখন ধরেছে—শেষ পর্যন্ত এ মিথ্যাকেই কামড়ে থাকতে হ'বে। উত্তর দেয় সে, "আমার মনে হয়, কমরেড জবার আর ইব্রাহিমের সাথে যোগ রয়েছে তার।"

"কমরেড জবা।" মনে মনে আওড়ায় "সাগরী"। ওখানেও শত্রুতাই করছে সে।

আর যেন স্থির থাকতে পারছেনা নন্দলাল। ক্রোধাগ্নি ঠিকরে বের হ'চ্ছে যেন নাসারন্ধ্র দিয়ে।

"তাকে আর আগলে রাখায় কি প্রয়োজন। হয় জেলে গিয়ে পচুক না হয় তো—"
বাকি কথাটা আর উচ্চারণ করে না। মনে মনে বলে—"না হয়তো পুলিশের গুলিতেই মরুক সে।"

সুখেন্দুকে নির্দিষ্ট সময়ে নিতে আসে সুজয়। ট্যাক্সীর ভিতরে বসা নন্দিতা। নন্দিতাকে বহুকাল আগে দেখেছে একবার সুখেন্দু ছাত্র-কনফারেন্সে। আলাপ নেই। নিজে যেচে কথা বলে না এখন, শুধু একবার তাকিয়ে দেখে। ছিপছিপে ধরণের চেহারা ছিল আগে, এখন অনেকখানি মোটা হ'য়ে গিয়েছে।

একটা নিরালা রাস্তার মোড়ে সুখেন্দুকে নামিয়ে দিয়ে বলে সুজয় "এই রাস্তা ধরেই চলে যান স্টেশনে। ক্যানিংএর গাড়ী এখনই পাবেন।"

সুখেন্দুকে নামিয়ে রেখে ট্যাক্সী ঘুরিয়ে আবার চলে, "চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি তোমার আস্তানায়।" লেকের ধার দিয়ে চলেছে ট্যাক্সী—লেকের জলে মুঠো মুঠো রূপালী আবির ছড়াচ্ছে

যেন আকাশ থেকে। সাদার্ণ এভিনিউ দিয়ে ঘুরিয়ে আনে গাড়ী শিখ ড্রাইভার। জ্যোৎস্না রাত ছড়িয়ে পড়েছে ঘুমন্ত রাজধানীর বুকে। সাদা গোলাপী দালানগুলির গায়ে জ্যোৎস্নার আস্তরণ।

নন্দিতার বন্ধুর বাড়ী পর্যন্ত যাবার আগেই ট্যাক্সী বিদায় করে সুজয়। "এইটুকু হেঁটেই যাই।"

রাজপথের নরম ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে চলে দুজনে। রাত্রির আবেশ ঘনিয়ে এসেছে নন্দিতার মদির চোখে। পার্শ্বচারী সুজয়ের মুগ্ধ দৃষ্টি যে বারে বারে অনুপ্রবেশ করতে চাইতে তার মনের অভ্যন্তরে, টের পায় তা' নন্দিতা। মোহময় চেতনায় অস্পষ্ট হ'য়ে এসেছে দূর মানুষের হুঁশিয়ারি পদধ্বনি। বহুদূরে সরে গিয়েছে রোজ দুবেলা দেখা পরিচিত দীপ্ত মুখগুলি।

প্রশ্রয় পাওয়া মন অনুভব করতে পারছে শুধু তার নিকটতমার উষ্ণ স্পর্শ। সুজয় আলতোভাবে ধরে নন্দিতার হাতখানা। আপত্তির মৃদু দোলাও ওঠেনা এ স্খলিত মুহূর্তে। নন্দিতার ঠোটের কোণায় মৃদু হাসি ফুটে উঠে—ছদ্মবেশী কামনার রাঙ্গা পাপড়ি একটি খসে পড়লো যেন পাতলা ঠোটে। আত্মবিস্মৃত শিথিল মুহূর্ত।

ভুলে গিয়েছে নন্দিতা, জেলের গারদের ভিতরে আরেকটি হৃদয় তাকেই অনুভব করছে এখন—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সুব্রতের গভীর চোখের সে ঘন প্রত্যাশা।

কৃষকদেরর মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপরাধে ফল্গুর উপর সাস-পেনসন আদেশ আসে। ঐ সাথে কোলকাতায় ফিরে যাওয়ারও নির্দেশ এসেছে। তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগে বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে যায়। বিমূঢ়ের মত পড়ে দেখে বারে বারে নির্দেশপত্রখানা। ভেবেই পায়না সে, তার এ অভিযোগের উৎস কোথায়।

তার স্থানে নূতন যে কমরেডটি পাঠান হয়েছে—তার কাছ থেকে পার্টির পত্রিকাখানা নিয়ে চোখ বুলায়। কিন্তু পড়তে পড়তে মনে সন্দেহ ঘোরাল হ'য়ে উঠে। এ অঞ্চলে কৃষকদের অপূর্ব অভ্যুত্থান কাহিনী কোলামে কোলামে।......

লাল এলাকা বলে অভিহিত করা হ'য়েছে এ এলাকাকে।

ফল্গু বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে ভাবে, এত বড় অত্যাচার হয়ে গেল, একজন অন্তঃসত্বা বৌকে মেরে রেখে গেল দারোগা, তাও আগুন জ্বলে উঠা দূরে থাক একটা আন্দোলন পর্যন্ত করা গেলনা গত একমাসের মধ্যে।

বরং প্রতিদিনই কৃষকরা শুধু গ্রেপ্তারই হ'চ্ছে। পার্শ্বনাথের বৌকে যেদিন মেরে রেখে যায়, সেইদিনই মহেন্দ্রসহ পাঁচজন কৃষক কমরেড ধরা পড়েছে। রাধা ধরা পড়েছে। বসন্তকে ধরার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ঘরে ঘরে মেয়েদের চোখে অনিশ্চিত জীবনের গাঢ় চিন্তা। ধানকাটার সময় এসে পড়েছে—ধানকাটার লোক নেই। বেশীর ভাগ চাষীরাই হয় জেলে না হয় পলাতক।

তার চোখের সামনের এ অভিজ্ঞতা কি একেবারেই ভ্রান্ত। দূর দর্শিতার অভাব।

কৃষকরা নিজে থেকেই যে সেদিন লাঠি তুলেছিল তাদের গ্রামের গোলা ভাঙ্গার বিরুদ্ধে তাও কি শুধু দালালদের চক্রান্ত বলেই আখ্যা দিতে হ'বে।

মনের মধ্যে সারাদিনই বারে বারে নাড়া দিচ্ছে—কৃষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত সে।

এ সংবাদ গোপন থাকবেনা সে জানে। ছাত্র মহলে ছড়িয়ে পড়বে এ অপবাদ। হয়তো বিশ্বাসও করবে তারা; সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করবে তাকে।

আহত আত্মাভিমানের ক্ষতটা খচ খচ করছে অনুক্ষণ। তবু নির্দেশ

মত কোলকাতায় চলে যাওয়াই স্থির করে ফল্গু। বোঝে সে, এখানে এ নিয়ে আলোচনা করলে ফল আরও খারাপ হবে। ম্রিয়মান হ'য়ে কাগজখানা নিয়ে বসে এসে দাওয়ায়।

মায়া জড়িয়ে গিয়েছে এদের সাথে। বিষণ্ণ করুণ চোখে তাকায় ফল্গু ধানক্ষেতের দিকে। সুদূর বিস্তৃত ধানক্ষেত। পাকাধানের ভারে থরে থরে নুয়ে রয়েছে শীষগুলি। কাস্তের অপেক্ষায় অধীর হ'য়ে উঠছে যেন পাকাধানের শীষগুলি।

ভিতরে ভিতরে বেদনা অনুভব করে ফল্গু। কত আশা, কত উন্মাদনা নিয়ে এসেছিল সে এখানে। জমির লড়াই শুরু হ'বে—এখানে এই ধান কাটা জমির বুকে। আর আজ কি মন নিয়ে ফিরে যাচ্ছে সে।

যাবার দিন ঠিক হ'য়ে যায় ফল্গুর। আর দুদিন আছে।

যাবার আগে মনটা কেমন থেকে থেকে ব্যথিয়ে উঠছে। মনের নিরাশার মাঝেও বারে বারে স্পর্শ করছে কৃষকদের আন্তরিকতাটুকু। এদের অকপট বন্ধুত্বকে কোনদিন ভুলতে পারবেনা ফল্গু। কুয়াসার ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্রের ঝিলিমিলির মতই চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে—মহেন্দ্র, বসন্ত, পার্শ্বনাথ, পার্শ্বনাথের বুড়ো বাপের প্রীতিমাখা মুখগুলি।

মহেন্দ্র, রাধার সাথে আর কোনদিন দেখা হবে কিনা—বলা যায় না। আর এদের সাথেও আর আর দেখা হবে যে কবে। মনটা ভিজে উঠে।

দূর থেকে লক্ষ্য করে ফল্গু, কে যেন এদিকে আসছে—বৃন্দাবনের মত মনে হ'চ্ছে—ফল্গু একটু এগিয়ে যায়। বৃন্দাবনই।

"আপনি নাকি চলে যাবেন?" এসেই প্রথম প্রশ্ন করে।

ফল্গু তার ম্লানমুখের দিকে তাকিয়ে হাসে একটু।

"আর আসবেন না?" মুখ তুলে তাকাতে পারছেনা বৃন্দাবন। লক্ষ্য করে ফল্গু—কাঁদছে ও। এমন করে জড়িয়ে ফেলেছে তাকে—চোখের পাতা ভিজে আসতে যায় ফল্গুরও। বৃন্দাবনের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে। "কাঁদছো কেন বৃন্দাবন। আমরা একই পথের মানুষ যখন আবার দেখা হ'বে নিশ্চয়ই।"

দেওয়ালি উৎসবে মুখর নগরী।

রাস্তার ভীড়ে তলিয়ে যায় পৃথ্বী। পথচারী মানুষের সাথে সাথেই চলেছে সে কিন্তু চিন্তার পদক্ষেপে তাদের কাছ থেকে বহুদূর পথ দিয়ে চলেছে।

দেওয়ালি! অমাবস্যার অন্ধকারকে আতশবাজি দিয়ে আলোকিত করতে চাইছে ভারতবর্ষের মানুষ। কিনতু তাদের জীবনের চার-পাশে যে সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, দেখছে নাকি তারা। উৎসবের দিন আজ নয়।

কিন্তু শিশুরা বুঝবে কেন তা'। উৎসবহীন জীবন তাদের জন্য নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে, গলিতে গলিতে বাজি পোড়াচ্ছে। তাদের চিৎকারে চিন্তার খরস্রোত কেটে যায়—"ছুঁচোবাজি, ছুঁচোবাজি, সরে যান।" উৎসব মত্ত ছোট ছোট মিঠুরা সবাই ঘর ছেড়ে বেড়িয়েছে।

উৎসবহীন জীবন শিশুদের জন্য নয়।

কিন্তু সব শিশুই কি সাড়া দিতে পেরেছে এ উৎসবে? রাস্তার দুপাশের আধা উলঙ্গ শিশুদের হাতে একটি ফুলঝুরিও পড়লো কিনা, দেখবার অবসর আছে কি এই আধ্যাত্মিক দেশের পূজারীদের?

সুন্দর সুকুমার শিশুমনগুলিকে ঘুমপাড়ানীর গান দিয়ে শুধু

ভুলিয়ে রাখার জন্যই কি এত পূজার ধূম, এত দেওয়ালির উৎসব এদেশে ?

রাত গভীর। ঘরে ফিরছে পৃথ্বী দিনান্তের কাজ সেরে। দেওয়ালির বাতি জ্বলে জ্বলে নিবে এসেছে। উৎসব মত্ত শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে ঘরে ঘরে। আর একটি বাতিও জ্বলেনি যাদের ঘরে তাদের শিশুরাও ঘুমিয়ে পড়েছে—কামনার রাঙা আতশবাজী স্বপ্নের ফুলঝুরি হ'য়ে ফুটে উঠছে হয় তো ভিখারী শিশুদের অবসন্ন চোখের তারায়।

শিশুদের উৎসব থেমে গেছে। কিন্তু থামে নাই ব্যভিচারীদের উৎসব আয়োজন—বোমাফাটার উৎকট আওয়াজে আর মাতালদের বীভৎস চিৎকারে তাদেরই জয়ধ্বনি শুরু হ'য়েছে। এই ধর্মানুষ্ঠানের আড়ালে আড়ালে প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্র আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। মানুষের শুভবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করার এক বিরাট আয়োজন শুরু হ'য়েছে পর্দার আড়ালে।

কালুর তাড়ির আড্ডায় মধুবাবু এসে উপস্থিত। তারই খোঁজে নাকি এসেছে। কালুত অবাক। সেই ডেটিনিউবাবু—এতবড় পণ্ডিত মানুষ, সারাদিন বই নিয়ে থাকতেন জেলখানায়, তিনিও তারই খোঁজে এসে হাজির এই তাড়ির আড্ডায়। জেলখানাতে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল কালু মধুবাবুদের ঘরে—সে ঘরের ফালতু ছিল সে। জেলে জেলেই বেশীর ভাগ কাল কেটেছে কালুর। ছোট বেলা থেকেই হাত খুব সই তার।

কালু দুঃখ করে গল্প বলতো ডেটিনিউ বাবুদের কাছে—আজ কালকার মেয়েরা চালাক খুব। দামী দামী শাড়ি তারা পরে, কিন্তু আগের মত পাঁচ লহরী সাত লহরী আর কেউ এখন পরেনা।

আগে তার এই হাতে কত সোনার মফচেন ছিঁড়ে এনেছে সে মেয়ে বৌরা টের পাবার আগেই। এইত কয় বছর আগেও সেবার শেষ জেল খেটে এল। মেলায় দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে এক গ্রামের বৌ। গলার ফাঁক দিয়ে সোনার চেনটা চিক্ চিক্ করতেই কালু তাকে তাকে আছে। মাথার ঘোমটা একবার একটু খসে যেতেই বাস একেবারে একটানে সোনার চেন কালুর মুঠোয়। মুঠো থেকে জিভের তলায়।

কিন্তু সে হার শুদ্ধই ধরা পড়লো কালু তার দোস্তর এক আড্ডা থেকে। দোস্তের দোস্ত বেইমানি করে ধরিয়ে দিয়েছিল। গলার ভিতর সে হারছড়া লুকিয়ে নিয়ে কয়েদ খাটতে এল কালু। কিন্তু তা,তেও রেহাই নেই। হঠাৎ একদিন কানে এল ডাক্তাররা নাকি কি যন্ত্র বের করছে, মানুষের চামড়ার তলার জিনিষও তাতে দেখা যায়। কালুরও ডাক পড়লো। দেহ পরীক্ষা করবে সে যন্ত্র দিয়ে। মাথায় হাত দিয়ে বসলো কালু, কি করা যায়।

কাউকেই বিশ্বাস নেই। অনেক ভেবে ঠিক করলো, ডেটিনিউ বাবুদের বিশ্বাস করা যেতে পারে। সেই হ'তে মধুবাবুদের সাথে কালুব পরিচয় কৃতজ্ঞতায় রূপান্তরিত হ'ল। হারছড়া সেদিন লুকিয়ে রেখে মধুবাবু তার ধন, মান রক্ষা করেছিলেন।

অকৃতজ্ঞ নয় কালু। মধুবাবুর সে উপকার আজও ভোলে নাই সে। একেবারে নিজের ঘরে নিয়ে বসায় ডেটিনিউ বাবুকে—দামী সিগারেট বের করে।

ঘরময় তাড়ির গন্ধ ভুর ভুর করছে। মাঝারি গোছের একখানা টিনের ঘর।

মধু মুখার্জী সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায় কালুর চওড়া বুকের ছাতির দিকে।

কালুও দেখে ডেটিনিউবাবুর বেশভূষার পরিবর্তন। খুশি হ'য়ে বলে সে, "যাক্ এত দুঃখের পর স্বদেশীবাবুদের সুদিন এসেছে।"

"তোমাদেরও দিন ফিরবে এবার।" আশা দেয় প্রাক্তন স্বদেশীবাবু। তারপর সপ্রশ্ন সুরে বলে "গত দাঙ্গায় বুঝি বিশেষ সুবিধা করতে পার নাই।" যাবার আগে কালু দিন তারিখ ঠিক করে দেয়—মধুবাবুকে নিয়ে যদু ডাকাতের বাড়ী যাবার দিন। তাকে রিকসা করে নিয়ে যাবে সে। রিকসাটাত আজও বিক্রী করে নাই এই কারণেই।

এক কুটুম্বকে আরেক কুটুম্ব বাড়ীতে আনা নেওয়ার কাজে লাগে। মধুবাবু যাবার আগে বলে দেয়। "কেউ যেন টের না পায় এ খবর।"

হেসে বলে কালু, "কালু বেইমান না। আমরা চোর গুণ্ডা মানুষ। আমাদের বাড়ীতে আপনাদের মত মানী ভদ্রলোকদের দেখলে লোকে সন্দেহ করবে জানি। কিন্তু যদু ডাকাত ত ভদ্রলোকই। গেলেই দেখবেন—কত টেবিল চেয়ার দালান কোঠা ভর্তি।"

একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে মধু মুখার্জী।

মনে মনে ভাবে, যদু ডাকাতের নাম এ অঞ্চলে যথেষ্ট। তাকে দলে পেলে খুব একটা জবর কাজ হয়। শোনা যায় পুলিশের নজর বন্দী সে এখন। ওসব নজরবন্দীর টন্দির ভয় মধু মুখার্জীর করে না। সামান্য একটা বিড়ি দিয়ে কত সিপাইর নজর ফাঁক করে দিয়েছে তারা জেল খানায়। আর এখনত হাতে মুঠো মুঠো টাকা।

গুণ্ডার দলগুলিকে সংঘবদ্ধ করাটাই এখন প্রধান কাজ। বস্তিতে বস্তিতে কুস্তির আখড়া আছেই—তাছাড়া মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-দের ক্লাবগুলিতেও নজর দিতে হবে। মূর্খ গুণ্ডা দিয়ে সব কাজ হ'তে পারে না। রাজনীতির যুগ এটা। তাই শিক্ষিত ছেলেদের দলে টানতে হ'লে দস্তুরমত রাজনীতির শিক্ষা দেওয়া চাই। হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা,

বৈশিষ্ট্য, উদারতা—আর্যসভ্যতার মর্মকথা, গীতা-উপনিষদ বেদ থেকে শুরু করে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান পর্যন্ত। না হ'লে এই সর্বগ্রাসী ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে মুস্কিলে পড়তে হ'বে।

স্বদেশীদের পার্টির একটি ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছে প্রমীলা পশ্চিমের ঘরে। পুরানো অব্যবহার্য জিনিসপত্র হাঁড়ি-কুড়িতে ভরা সে ঘর। বাড়ীর চারদিকেই ঝোপ, জঙ্গল।

প্রমীলা এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে ভাতের থালা নিয়ে ঢোকে ঘরে। এককলসী জল এনে দেয়, "নাও, মাথাটায় একটু তেল জল দাও ঘরে বসেই।"

আবার বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে যায় ঘরে। সারাদিন তালা দেওয়া ঘরে আটকা থাকে ছেলেটি। ঘরের পেছন দিয়ে আরেকটা দুয়ার আছে। রাত্রি হ'লে বের হয় ঘুরতে। প্রমীলা ঠাট্টা করে নাম দিয়েছে, 'নিশাচর।' কি তুমুল ঝড়বৃষ্টি সেদিন। মুহু মুহু বাজ পড়ছে। জানলা, দরজাই যেন ছুটিয়ে নিতে চায় সে ঝড়ে। তারই মধ্যে একমাথা জল নিয়ে ঘরে ঢোকে ছেলেটি।

প্রমীলা তাড়াতাড়ি শুকনো কাপড় বের করে দেয়। "এই দুর্যোগে মানুষ ঘর থেকে বের হয়।"

হাসে ছেলেটি, "আপনাদের দুর্যোগ, আমাদের সুযোগ।"

একটা ছাপান কাগজ দেয় সে প্রমীলার হাতে, "এটা কাল শুকিয়ে দেবেন।" প্রমীলা ভেজা কাগজখানা সযত্নে সরিয়ে রেখে এসে বলে, "ভাত এনে দেই।"

"এত রাতে ভাত কোথায় পাবেন?"

প্রমীলা হাসে। "দেখোই না কোথায় পাই।" চারটি করে ভাত

রেখে দেয় সে রোজই হাঁড়িতে। কোন রাতে কে কখন আসে। হয় তো সারাদিন না খেয়েই আসবে। যদি কেউ না আসে; পরদিন পান্তা খাবে রাখালী। এদের কি উপোস করিয়ে রাখা যায়? তার ফল্গুওত এমনি করেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দীঘির পার দিয়ে পিয়ন হেঁটে চলেছে, আকুল নয়নে তাকিয়ে থাকে বিশ্বেশ্বর। শুকনো পাতার উপর দিয়ে তার পায়ে চলার শব্দটুকুও যেন প্রত্যাশামুখর। কিন্তু পিয়ন তার বাড়ীর উঠোনের উপর দিয়ে চলে যায় অন্য বাড়ীতে। করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে বিশ্বেশ্বর পিয়নের গতিপথের দিকে। বুক ফেটে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে—হৈমন্তী, শরৎ, ফল্গু, একজনও কি খোঁজ নেবে না তাদের?

ফল্গুর আত্মগোপন করা জীবন—চিঠিপত্র লেখা নিষিদ্ধ। শীতার হয়তো লেখার সব কথাই শুকিয়ে গিয়েছে। আবার বুক ফেটে নিঃশ্বাস পড়ে।

কিন্তু হৈমন্তী? সে কি বড়লোক বলেই অবজ্ঞা করছে তার পিতাকে। দারিদ্র্যের এ অভিশাপকে এমন কবেত কোনদিন চিন্তা করেনি বিশ্বেশ্বর তার ছাত্র পরিবেষ্টিত জীবনে।

দীপু এসে খবর দেয়, আক্রম খাঁ দেখা করতে এসেছে। বিশ্বেশ্বর তাড়াতাড়ি উঠে আসে বাইরের বারান্দায়।

আক্রমখাঁ বুকে শাণিত কুটিল ইচ্ছা, মুখে যথাসাধ্য মোলায়েম হাসি হেসে বলে, "ইউনিয়ান বোর্ডের একটা মিটিং আছে—ভাবলাম পথে আপনার সাথে দেখা কইরা যাই।"

দু'চার কথার পরই উঠে পড়ে, কিন্তু হাতের পত্রিকাখানা দেখাতে ভুল হয় না, "দেখেন ত, আপনার মাইয়ারই ছবি নাকি। শুনছি তিনি নাকি সিনেমায় নামছেন।" আর কিছু বলে না আক্রমখাঁ বাকিটুকু

আর বলার নয়—উপভোগ করার। বিশ্বেশ্বর প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে প্রকাশ না করার চেষ্টা করছে—তবু মূক বেদনায় ধরা দেয় এক অবর্ণনীয় যাতনার আভাস। হৈমন্তী! তারই হৈমন্তী!

আক্রমখাঁ বিদায় নিয়ে চলে যায়। পত্রিকাখানা ফিরিয়ে নিতে ভুল হয় না।

বিশ্বেশ্বর স্তব্ধ হ'য়ে কল্পনা করে, কত অবাঞ্ছনীয় আলোচনা হ'বে হৈমন্তীকে নিয়ে এই দুঃশ্চরিত্র আক্রমখাঁর ঘরেও। শ্রুতিকথা কানে এসেছে তারও, ভদ্রঘরের মেয়েরাও নাকি নামছে সিনেমায়। কিন্তু তার গুরুত্বকে এমনভাবে ভাবতে হয়নি তাকে। কখন কেউ এ প্রশ্ন সামনে তুললেও আমলে দেয়নি বিশ্বেশ্বর—ভেবেছে, হয়তো এসব ছেলেমেয়েরা ঠিক তাদের মতই বুদ্ধিজীবী ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে নয়। স্বতন্ত্র তাদের সমাজ—স্বতন্ত্র তাদের শ্রেণী।

কিন্তু আর ত স্বতন্ত্র সমাজের, স্বতন্ত্র কাহিনী বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিদেশী প্রভাবান্বিত আই, সি, এস; বি, সি, এসদের মেয়ে নয়। এদেশেরই জল বায়ুতে বড় হওয়া মেয়ে হৈমন্তী—তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হ'চ্ছে তারই পরিচয়।

পিতৃপরিচয়! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিশ্বেশ্বর। হয় তো দরিদ্র পিতার পরিচয়ে সে আজ কুণ্ঠিত—হয়তো তাই স্বেচ্ছাই গোত্রান্তর করেছে সে সেই স্বতন্ত্র শ্রেণীর মাঝে। প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে নিজেকে সেই স্বতন্ত্রদের মাঝে।

বিশ্বেশ্বরের বেদনাতুর চোখের তারায় ভেসে উঠে এক কিশোরী বালিকা মূর্তি।

শীতের সকালে রোদে বসে 'অ্যাটলাণ্টাস্ রেস' পড়ে শোনাত হৈমন্তীকে। পড়াশোনার তন্ময়তার হারিয়ে যেত ছোট্ট মেয়েটি। অতি সাধারণ একখানা গরম চাদর গায়ে সেই গ্রাম্যবেশ কি

অপূর্ব সরলতায় ভ'রে উঠতো। কিন্তু সেই গ্রাম্য মেয়েটির মধ্যে লুকিয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি এত ঘৃণা—দরিদ্র শিক্ষক পিতার প্রতি এত করুণা—জানতো না ত সেদিনের সেই স্নেহাতুর বিশ্বেশ্বর। বিশ্বেশ্বর জানে, ফল্গুরাও সমর্থন করেছে একে। যে কোনও নূতনের প্রতিই ওদের মোহ। ওরা বলবে, এত শিল্পীর সাধনা।

কিন্তু ঐ পত্রিকার বিজ্ঞাপন ছবির এ চপল ভঙ্গিমা—একেও স্বীকার করতে হ'বে শিল্পীর সাধনা বলেই?

তার বক্ষপঞ্জরে এত বেদনা কেন? এ কি শুধু যুগসন্ধিক্ষণের বেদনা? অনেকদূরে পিছিয়ে রয়েছে কি সে নিজেই। তার দৃষ্টি-হীনতারই কি দুঃখ এই। সৃষ্টির উন্মাদনাই কি তবে ছুটে চলেছে হৈমন্তীও? কুঞ্চিত বলিরেখার মাঝে অস্পষ্ট আলোর আভাস দেখা দেয় মুহূর্তের জন্য।

পরক্ষণেই মিলিয়ে যায় সে আলো। হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে বিশ্বেশ্বর—"না, না। ভ্রান্ত আমি নই। ভ্রান্ত ওরাই। একে শিল্পীর সাধনা বলা বাতুলতা। প্রগতির সূর্যরশ্মি নেই, ফল্গু, প্রগতির ছায়াও নেই হৈমন্তীর ঐ লঘু কটাক্ষে। এ শুধু তার স্বশ্রেণীর প্রতি সুপ্ত অবজ্ঞার পূর্ণচ্ছটা। অতীত পরিচয় ধুয়ে মুছে ফেলতে চায় হৈমন্তী। দরিদ্র পিতৃপরিচয়ের অভিশাপকে দূর করবে সে ধনীর কণ্ঠে বরমাল্য দিয়ে।

গোত্রান্তর করবে সে নিজেকে ধনী গোষ্ঠির মাঝে। দরিদ্র সমাজের প্রতি অবজ্ঞায় কুঞ্চিত কুণ্ঠিত পদক্ষেপে কোথায় চলেছে হৈমন্তী—ফল্গু, তুমি জান না। আমি তার আত্মবিক্রয়ের ঘোষণা শুনতে পাচ্ছি আমার আত্মার ধ্বনিতে।

ফল্গু আর হৈমন্তী—ওরা ত আর আজ ভাইবোন নয়। দুই শ্রেণী। বঞ্চিত জীবনের কলংক ঘুচাতে ছুটে চলেছে দুইজনে একেবারে

বিপরীত দুইদিকে। ফল্গু, তোমাদেরই মুখে শোনা তত্ত্বকথাকে আজ এমনভাবে গ্রহণ করতে হ'বে আমাকে! এ কি নিদারুণ শেল বিঁধছে আমার বুকে—হৈমন্তী আর আসবে না তার পিতার গৃহে।

তার দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে শুধু ধনী সমাজের স্বর্ণ তারকারা?...

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ শুনে ছুটে আসে প্রমীলা। দীপুকে ডাকে, "দীপু শীগগীর বরুণকে ডাক, ওনারত জ্ঞান নাই বুঝি।"

শীতার নামে টেলিগ্রাম আসে প্রমীলার "তোমার বাবার অসুখ বেড়েছে, ফল্গুকে নিয়ে রওয়ানা হও।" টেলিটা নিয়ে পৃথ্বীর সাথে দেখা করে শীতা, ফল্গুকে এ সংবাদ পাঠানর ব্যবস্থা করা যায় কিনা, জানতে।

"ফল্গুর জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। তুমিই বরং রওয়ানা হ'য়ে যাও। ফল্গুকে সংবাদ পাঠাবার চেষ্টা আমি করবো। কিন্তু একাই বা যাবে কি করে তুমি? তোমার দিদি যদি যায়। হৈমন্তী এখানে না?" টেলিটা হাতে নিয়ে বলে পৃথ্বী।

"দিদির ঠিকানাও জানি না। তাছাড়া সে যাবে বলেও মনে হয় না। আমাদের সাথে তার সম্পর্ক নেই বল্লেই চলে।" উত্তর দেয় শীতা।

পৃথ্বী কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে, "কিন্তু একা যাওয়াটা কিছুতেই ঠিক নয়। নৌকোতেওত যেতে হ'বে অনেক পথ। চলনদার যদি না পাও, তবে আমিই যাব সাথে।"

পৃথ্বীর সাথেই রওয়ানা হয় শীতা। মিঠুকে কুরীর কাছে রেখে

যায়, নদীতে ডাকাতি নাকি হ'চ্ছে মাঝে মাঝে, প্রমীলাই লিখেছিল কিছুদিন আগে চিঠিতে। মিঠুকে নিয়ে যেতে সাহস হয়না। বহুদিন পর শীতা দেশে যাচ্ছে। পথঘাটের অবস্থা কেমন ভাল জানাও নেই।

পাকিস্তানে ওষুধপত্র পাওয়া দুষ্কর ভেবে কতকগুলো প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়েছিল সাথে, ডাক্তারের নির্দেশমত। কিন্তু 'কাষ্টম্স' অফিস থেকে প্রথমেই বাদ পড়ল ওষুধগুলো।

আবার দ্বিতীয়বার সার্চ হ'বে দর্শনায়। দুশিশি হরলিক্স নিয়েছে সাথে—উতরাতে পারলে হয়। পৃথ্বীর সাথে এক স্যুটকেশ "বুকলেট" দিয়েছে ফল্গুর বন্ধুরা পাকিস্তানে চালান করার জন্য।

শিয়ালদাতে কারসাজি করে 'পার' করিয়ে দিয়েছে কুরী।

একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বাঙ্কের উপর শুয়ে পড়ে পৃথ্বী—মন রয়েছে বেঞ্চের তলায় অনামী স্যুটকেশের উপর। বে-আইনী পুস্তিকা ঠাসা।

অসম্ভব ভীড় গাড়ীতে। যাত্রীরা সব নড়ে চড়ে বসে—দর্শনা আসছে। "দর্শনা দর্শন দিচ্ছেন।" একজন ব্যঙ্গোক্তি করে। দর্শনা!

পৃথ্বী ঘুরে দেখে আসে শীতাকে মেয়েদের কামরায়। শীতাদের কামরা সার্চ হ'য়ে যায়। স্যুটকেশ, বাক্সো, বিছানা, তোরঙ্গ সব লণ্ডভণ্ড। মনে মনে শাপান্ত করে মেয়েরা। পৃথ্বীদের কামরা সার্চ করা স্বুরু হতেই ঘণ্টি সেটি পড়ে যায়।

গাড়ী নড়ে উঠে। নিশ্চিন্ত হয় পৃথ্বী—যাক্ ফাঁড়া কাটলো।

মুসলমান যাত্রীরা এবার একটু দেহ বিস্তার করে বসে। আর এতক্ষণ যারা জাঁকিয়ে বসেছিলে, তারা এবার একটু ভদ্রভাবেই সরে বসে, মুসলমান যাত্রীদের খানিকটা জায়গাও ছেড়ে দেয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত এক ভদ্রলোক একাই কথা বলে চলেছিল। গরমে গায়ের জামা খুলে দিয়েছে। অনাবৃতদেহে শুধু উপবীতটি ঝুলছে। একদমে বলে চলেছে ভদ্রলোক পাকীস্তানে যাতায়াতের অস্থবিধার কথা

বর্ণনাতীত। গাড়ীতে বাতি নেই। তাই দিনের গাড়ীতে আসা। বাড়ীতে যাচ্ছে মেয়েদের নিয়ে আসার জন্য। খাবে কি? চাউলের মন ৪০৲ টাকা, সরষের তেল ৪৲ টাকা। আটা চিনির ত বংশও নেই।

এবার ভদ্রলোকটি চুপ করে। তার পাশে বসা মুসলমান সঙ্গীটি এতক্ষণে প্রথম প্রশ্ন করে, "হিন্দুস্থানে মাছ পান কেমন?"

এইবার চুপ করতেই হয় উপবীতধারীর। কোলকাতার মাছের বাজারের কথা মনে হ'লে দীর্ঘশ্বাসই ঠেলে উঠতে চায় বুক থেকে। ভদ্রলোকেরা তবু দিনে একবার করে মাছের বাজারের আঁশ পচা গন্ধ শুঁকে আসতে পারে, কিন্তু গিন্নীদের ভাগ্যে তাও জোটেনা।...

বিকেল চারটায় গোয়ালন্দে এসে পৌছায়। আরেক দুশ্চিন্তায় পড়ে পৃথ্বী। তাড়াহুড়ো করে রওয়ানা হওয়ায় টাকা বদলে আনা হয়নি। শীতার কাছে যে পাকিস্তানী টাকা ছিল, তা দিয়েত টিকিট কেনা হ'ল কোনমতে। কিন্তু এর পরওত আবার ষ্টীমার আছে। নৌকোতে যদি যাওয়া হয়, তাহ'লেও টাকা লাগবে। হিন্দুস্থানী টাকা যে একেবারেই অচল—কয় ঘণ্টায়ই টের পায় তা।

ষ্টীমারেও একই রকম ভীড়, তিল জায়গা নেই।

রেলিংয়ের ধারে একখানা শতরঞ্জি বিছিয়ে দিয়ে বলে পৃথ্বী, "এই গরমে আর মেয়েদের কামরায় না ঢুকলে। এখানেই বোস, হাওয়া পাবে। আমি যাই দেখে আসি—টাকাটা ভাঙাবার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।"

শীতা উঠে যায় নীচে কলে মুখ হাত ধুতে। কলের কাছেও লোকের ভীড়। শীতা সরে এসে ষ্টীমারের ইঞ্জিনের সামনে দাঁড়ায়। মনে পড়ে ছোটবেলায় কত তন্ময় হ'য়ে দেখতো সে ইঞ্জিনের এই চাকা ঘোরা। আজ চোখে পড়ে প্রথমেই আগুনের তাতে ঝলসান খালাসীদের কালীমাখা মূর্তিগুলি এই অসহ্য গরমের মধ্যে সিদ্ধ

হ'য়ে কয়লার ছাই টেনে ফেলছে অগ্নিকুণ্ডের মত বিরাট 'ফারনেস' থেকে।

সমস্ত পৃথিবীর জীবনসেতু আজ ঘাম-ঝরা খাটুনির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক একরকমই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর বনিয়াদ রচনা করছে এরা মানুষের অলক্ষ্যে অগোচরে।... ..তন্ময় হয়ে ভাবে শীতা।

পৃথ্বী এসে বলে "যাও মুখ ধুয়ে এসো, কলের ভীড় কমে গিয়েছে।"

খালাসীরা মাছ ধুতে এসেছে কলে। পদ্মার তৈলাক্ত ইলিশ। সাদা ফটফটে টাটকা মাছগুলি যাত্রীদের ক্ষুধাটাকে আরও যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শীতা পৃথ্বীকে বলে, "আপনি এ ষ্টীমারেই ভাত খেয়ে নিন। ও ষ্টীমারে কিন্তু কিছু পাবার আশা নেই। দিব্যি ইলিশ মাছের ব্যবস্থা আছে দেখে এলাম।" পৃথ্বী হাসে, "কোনও ষ্টীমারেই কিছু খাওয়া চলবে না। মাত্র সাতটি পাকিস্তানী টাকা আছে সাথে। তিনটাকা বাটা দিয়ে একখানা নোট ভাঙিয়েছি। তাও অতি কষ্টে।"

শীতা মনে মনে ভাবে, বাবার অসুখ কি অবস্থায় আছে কে জানে। আজও যদি সারাদিন না খেয়ে থাকে পৃথ্বী—সেটা ঠিক হ'বেনা।

মুখে বলে, "পরের ব্যবস্থা একটা হ'বেই। আপনি এখানেই খেয়ে নিন।"

"ব্যবস্থা হওয়া অত সোজা নয় এখন। এই কয়ঘণ্টায়ই তা' টের পেয়েছি। আর তুমিও ত কিছু খাচ্ছ না, কাজেই এত ব্যস্ত হবার কি আছে। পেটের কলকারখানা গুলো ত সব মানুষেরই একই রকম।"

"কিছু খাবনা কেন? চা ত নিশ্চয়ই খাব। যা মাথা ধরেছে।" পৃথ্বী খুশি হ'য়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে আসে। আর কিছু কলা কিনে আনে।

"আজকের দিনটা এই দিয়েই চালাতে হ'বে ডি ভ্যালুয়েসনের কৃপায়। মিঠুকে না এনে ভালই করেছ।"

ভাগ্যকূলে এসে আবার ষ্টীমার বদলায়। একেবারে ফাঁকা ষ্টীমার। সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে পদ্মার বুকে। কতকাল পর আবার সেই পদ্মার বুকে।

সন্ধ্যাকাশের গাঢ় ছায়ায় আরও প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি ধরেছে পদ্মা। কূল দেখা যায় না—বিশাল ধাবমান নদী।

পদ্মার এই সুদূর গাম্ভীর্যের সাথে পৃথ্বীরও সমস্ত চিন্তাস্রোত নিঃশেষে মিশে যায়। একেবারে মৌন হ'য়ে পড়ে পৃথ্বী। যেন এক অনন্ত-কালের নীরবতায় বিলীন হয়ে গিয়েছে তার আত্মা। নদীর এত অপরূপ গম্ভীর সৌন্দর্য আর কোথাও খুঁজে পায়নি সে। পূর্ববাংলার সম্পদইত এই, এই তরঙ্গমেখলা-বিশাল স্রোতস্বিনী।

শীতাকে দেখে ঠোট কেঁপে উঠে প্রমীলার, "শীতা এসেছিস।" বড় ছেলে, বড় মেয়ে এখনও আসে নাই। হয়ত তারা আসবেও না। শরৎ ছুটি পায় কিনা সন্দেহ। আর হৈমন্তীকে হয়তো আসতেই দেবে না জামাই। কিন্তু ফল্গু? "ফল্গুও আসতে পারলো না?" চোখ ভিজে উঠে প্রমীলার। আধা-অচৈতন্য বিশ্বেশ্বরের কাছে বলে, "দেখো, কারা এসেছে।"

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় বিশ্বেশ্বর পৃথ্বীর দিকে। চৌদ্দ বছর আগের অস্পষ্ট স্মৃতিকে আয়ত্তে আনতে পারছেন না, বুঝে এগিয়ে গিয়ে বলে পৃথ্বী, "আমি পৃথ্বী, আপনার ছাত্র।"

উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে রোগীর মুখ। বোঝা যায় চিনতে পেরেছে। অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে বলে একবার "পৃথ্বী?"

আবার চারদিকে তাকায়। প্রমীলা বুঝতে পেরে বলে, "ফল্গু, শরৎ, হৈমন্তী ওদেরও খবর পাঠান হ'য়েছে—ওরাও আসবে।"

হৈমন্তী! মনে মনে উচ্চারণ করে একবার নামটা। বুক ঠেলে

একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে—একটা চিন্তাক্লেশের অবসাদে জড়িয়ে ধরে। আবার ধীরে ধীরে চোখ মুদে আসে। পার্থিব অনুভূতির বাইরে এক তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘোর। সারাদিন একভাবে কাটে। শীতা ওষুধ নিয়ে ডাকে 'বাবা, ওষুধ খান।" ডাক শুনে হঠাৎ চমকে উঠে রোগী। কাকে যেন লক্ষ্য করে উঠে বসতে চায়। ঘোলাটে হ'য়ে উঠে চোখ। পৃথ্বী অবস্থার পরিবর্তন বুঝে তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিয়ে চেপে ধরে বিশ্বেশ্বরকে। শীতাকে ডেকে বলে "শীগ্‌গীর জল নিয়ে এসো। মাথায় জল ঢালতে হ'বে।"

পৃথ্বীর দিকে বড় বড় চোখে প্রলাপ বকে চলেছে বিশ্বেশ্বর।

"আন্‌সার মাই কোশ্চেন, বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানা কি। গো টু দি ম্যাপ। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। পাকিস্তানের নয়, বঙ্গ দেশের সীমানা বল।"

অবচেতন মনের তলা থেকে অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ভর করেছে উত্তেজিত মস্তিষ্কের রক্ত চাপে।

সমস্ত রাত জেগে রোগী পাহারা দেয় পৃথ্বী, শীতা। দুইদিন এই অর্দ্ধবিস্মৃত স্তরে ভেসে চলে মন। পৃথ্বীকে বুঝাতে চেষ্টা করে বিশ্বেশ্বর "অড়হর গাছে গাছে মধুমক্ষিকার বাসা হ'বে। মধু মক্ষিকার চাষ করবো। বি হাইভিং। শিক্ষিত মানুষরা যদি গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, পল্লী উন্নয়ন করবে কারা ?"

চোখের ঘোলাটে ভাব লক্ষ্য করে বোঝে পৃথ্বী, স্মৃতির এ জড়তা কাটতে সময় লাগবে।

তিনদিনের দিন সংকট কেটে য়ায় রোগীর। কিন্তু ফল্গুর কোনও সংবাদ নেই। হয়তো এ সংবাদ এখন পর্যন্ত পৌঁছায়নি তার কাছে। শরৎ এসে পৌঁছায়নি। শরৎ না আশা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, ঠিক করে পৃথ্বী। এদের এ অবস্থায় একা ফেলে রেখে যাওয়াটা সঙ্গত নয়।

প্রমীলার সাথে পরামর্শ করে, "আমার মনে হয়, আপনাদের আর এখন এখানে থাকা ঠিক নয়। এখনকার মত ভাল হ'লেও এ রোগের আবার আক্রমণ হ'তে পারে।"

প্রমীলাও বোঝে তা'। ডাক্তার বৈদ্য পর্যন্ত পাওয়া যায় না সময়মত। একলা এই নির্জন পুরীতে এই রোগী নিয়ে পড়ে থাকাটা দুঃসাহসিকতা।

কয়দিনের দুশ্চিন্তার পর স্বস্তির নিঃশ্বস ফেলে পৃথ্বী। দুপুরবেলা ঘাটলায় এসে বসে। মৌন মধ্যাহ্নের নিথর নিস্তব্ধতা। চারদিকের এই নীরবতার মতই যেন নীরব হ'য়ে যায় পৃথ্বীও। নিস্তব্ধ অতীত। পুকুরের ওপারে শীতার পিসীমার আশ্রমের চিহ্নও নেই আজ। শুধু অন্ধকার ঝোপ জঙ্গলের মাঝে একমাত্র চিহ্ন বহন করে রেখেছে সেই রাধাচুড়ার গাছটা।

বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে দেখে, গাছের চিকন শাখায় শাখায় হলুদ বর্ণের ফুল ফুটে রয়েছে এখনও।

পৃথ্বী উঠে যায় পুকুরের ওপারে, নিশ্চিহ্নিত আশ্রমের ভিটায়। চৌদ্দ বছর আগের পরিচিত স্পর্শ ভিজামাটির বুকে।

প্রমীলা দূর থেকে চেঁচিয়ে বলে "দেখো পৃথ্বীর কাণ্ড, আশ্রমের ছাড়া ভিটার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে—সাপ কোপেরও ভয় নেই।" মায়ের কথায় চমকে তাকায় শীতা। পৃথ্বীর মনকেও প্লাবিত করে চলেছে কি একই অনুভূতির জোয়ার। সুদূর অতীতের দীর্ঘালাপ বয়ে চলেছে চারদিকের আরণ্যক অন্ধকারে। সুদূর স্মৃতির কুলুকুলু ধ্বনি। ঘাটলায় এসে মধুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে সেও রাধাচুড়ার গাছটা। আশ্রমের ঘরের পেছনের এই গাছতলায়ই পৃথ্বীর সাথে তার প্রথম পরিচয়। পিসীমার পুজোর ফুল পারছে সে। একটা উঁচু ডাল কিছুতেই নামাতে পারছে না। এক অপরিচিত ছেলে সামনে এসে দাঁড়ায়—"দাও আঁকশিটা, আমি নামিয়ে দিচ্ছে।"

সেই মনমুগ্ধকর দেহভঙ্গি জীবনে ভুলতে পারলো না শীতা। আজও কানে বাজে সেই মধুর কণ্ঠস্বর। আঠার বছরের পৃথ্বীই যেন আবার এসে দাঁড়িয়েছে ঐ রাধাচূড়ার তলায়। সেই একই মধুর দেহভঙ্গি। অনিমেষ চোখে দূর থেকে তাকিয়ে দেখে শীতা।

চোখে ঝরে অতীতের প্রেম, সেই বেদনা। পুরানো দিনের স্মৃতি।

পৃথ্বী ঘুরে এসে বসে সিঁড়িতে। "এখান থেকে যেদিন চলে যাই, মনে আছে? সে যাওয়ার পর আর এই এলাম। একযুগেরও বেশী।" শীতা মনে মনে ভাবে, শত যুগ কেটে গেলেও বুঝি ভুলতে পারবে না সেদিনের সে কাহিনী।

পুকুরের কিনারায় সাদা সাদা রাশি রাশি জলজ ফুলের বুকে কোন অসম্পূর্ণ অতীতের চূর্ণ চূর্ণ রেণু।

চা নিয়ে আসে প্রমীলা, "এখানে বসেই খাও। ঘরের যা অবস্থা হ'য়ে রয়েছে কয়দিনে।"

দীপু বঁড়শি নিয়ে বসেছে—পৃথ্বীকে পুকুরের মাছ খাওয়াবে।

মহাশান্তিতে ঘুমাচ্ছে বিশ্বেশ্বর। প্রমীলা তাই রান্নাঘরে ব্যস্ত। পৃথ্বী যে আসবে আবার এই মধুবনে, কল্পনার অতীত এযে। একটু কিছু করে খাওয়াতে না পারলে মন ভ'রে না। প্রমীলা, বিশ্বেশ্বরের প্রথম সাংসারিক জীবনত এদের সাথেই জড়িত। স্বুবর্ণ-ঝরা গ্রামের স্কুল থেকে প্রথম জলপানি পায় পৃথ্বী। বিশ্বেশ্বরের কত প্রিয় ছাত্র।

পরদিন শরৎ এসে পৌছায়। তারও ঐ একই মত—বিশ্বেশ্বরকে নিয়ে যাওয়া। "দর্শনার কথা মনে হ'লে পাকিস্তানে আসার ইচ্ছা জন্মের মত ত্যাগ করতে হয়। তার উপর টাকা বদলান আরেক হাঙ্গামা। তোমাদের এখানে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে কি কম বেগ পেতে হয় আমাকে।"

বোঝে প্রমীলা। কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে পারে না। বেদনায় বিদীর্ণ মূর্তি। অবসন্ন হাতে জিনিস পত্র গোছায় প্রমীলা। যাবার দিন স্থির হ'য়ে যায়। বাঁশের তৈয়ারী ষ্ট্রেচারে করে তুলে নেওয়া হয় বিশ্বেশ্বরকে। খালের জল শুকিয়ে এসেছে। নৌকো আসে না কামার বাড়ীর খালে। প্রমীলা চোখের জল মুছে গোঁসাই ঘরে প্রণাম করে নেয়। কোণায় দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছে বামুন ঠাকরুণ। মোচর দিয়ে উঠে প্রমীলার বুকের ভিতরে, এই জনহীন চালাটুকুতে এই বৃদ্ধা কি করে দিন কাটাবে। "ছেলের কাছেই চলে যাইয়েন।" বারে বারে বলে প্রমীলা, যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই।

মফির মা কেঁদে আকুল হয়। আর আসবেন না ওনরা— আর কোনদিন আসবে না!

জন্মের মতই শেষ দেখা এদের সাথে ভাবতেই ফুলে ফুলে উঠে বুকের ভিতরে। অঝরে চোখের জল পড়ে।

ষ্ট্রেচারের পিছু পিছু মুসলমান পাড়ার ছোট ছেলে মেয়েরা ভীড় করে চলে। করুণ কাতর দৃষ্টি শিশুদের চোখে। চোখের স্তব্ধ মৌনে ঝরে একই প্রশ্ন," আর ফিরবে না।"

ষ্ট্রেচারে শায়িত বিশ্বেশ্বরের চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে—চোখের সামনে থেকে সরে সরে যাচ্ছে পরিচিত আকাশ গাছ গাছালি, পরিচিত মুখগুলি। পৃথ্বী ব্যস্ত হ'য়ে বলে "চোখ বন্ধ করুণ। মাথা অস্থির করবে।"

চোখ মুদে সমস্ত রোমকূপ দিয়ে অনুভব করে বিশ্বেশ্বর গৃহ ছায়ার শেষস্পর্শ। বুকের পাঁজর ভেঙ্গে যেন চুরমার হ'য়ে আসে অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগ। শ্মশানখোলা, শিববাড়ী, কালী বাড়ী, ইট খোলার মাঠ, চৌধুরীর ভিটা সব ফেলে চলেছে সে জন্মের মত।

কোলকাতায় ফিরে এসেছে ফল্গু।

নূতন আরেকটা জমি দখল করছে ফল্গুরা। পূর্ববঙ্গের নিঃস্ব মানুষদের মাথা গুঁজবার শেষ ঠাই। চারদিকে ঝলসে যাচ্ছে রুক্ষ জমি।

ফল্গুরা ঘর তুলছে—হোগলাপাতার ঘর। চারটা বাঁশের খুঁটির উপর হোগলার বেড়ায় ঘেরা ছোট ছোট ঘর সারি সারি—। ছোট বেলার সেই "বুড়ির ঘর পোড়ান"র ঘরের মতই প্রায় খেলাঘর সব।

তবুও ত ঘরই। মাথা গুঁজবার ঠাঁই। তাতেই কত আশার নিঃশ্বাস ঝরছে পুরুষদের চোখে, মেয়েদের চোখে আগ্রহের বাঁধুনি নিপুণভাবে ঘর "লিপ্‌ছে" মেয়েরা। বহুদূরের এক ডোবা থেকে জল বয়ে আনছে কাঁখে কাঁখে। ঘরের ভিত বাঁধছে, খুঁটি পুতছে পুরুষেরা।

ফল্গুরা পালা করে পাহাড়া দিচ্ছে।

তাদেরই একখানা অসমাপ্ত ঘরে তোলা উনুনে ছেলেদের জন্য ভাত রান্না করছে কুরী মাটির হাঁড়িতে। বোধন একটা বাঁশ চেঁছে দেয় "দেখ, কেমন চমৎকার খুন্তি তৈয়ার করে দিলাম। এখন তাড়াতাড়ি ভাতটা নামিয়ে ফেল। এদিকে জঠরাগ্নিত ধমধমায়তে"।

"কিন্তু শুধু নুন ভাত কিন্তু।'

পাশেরই বেড়াশূন্য ঘব থেকে এক বুড়ি আধখানা বেগুন দিয়ে যায়, নাও, "এটা পুড়িয়ে নাও। বেগুন পোড়া দিয়ে রাজভোগ খাও, ছেলেরা, অন্নপূর্ণার হাতের গুণে।"

ছেলেরা খুশির চোখে তাকায় বৃদ্ধার দিকে। ঢিলা ঢিলা চামড়ার আড়ালে কোথায় যেন কি লুকিয়ে আছে। বুকের কাপড় আগোছাল হ'য়ে গেয়েছে। ঝুলেপড়া স্তনদুটি স্নেহপ্রসবিনী মাতৃহৃদয়েরই প্রতীক যেন।

শুধুমাত্র চারখানা খুঁটির সীমানা কবা বৃদ্ধার ঘরেও ভোজ আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে।

বৃদ্ধার কোলের ছেলেটির বয়স বছর বাইশ হ'বে। পরমতৃপ্তির সাথে মায়ের হাতের ফেনা ভাতের গ্রাস তুলছে মুখে, "পরমায়ুরেও কয় ওদিক থাক।"

এ পাশের ছেলেরা দূর থেকে দেখে, কি তৃপ্তির আহার চলছে শুধু বেগুন সিদ্ধ আর ভাতে। তাদেরও যেন জিভে জল আসে। পেটেত অনল জলছেই। সারারাত গেছে অনাহারে। অনিদ্রায় ও গুণ্ডাদের প্রতীক্ষায়।

"শীগ্‌গীর হাত চালাও কুরী"

"ফক্কর, গৃহ প্রবেশের খাওয়া বেগুন পোড়া আর ভাত। আমারাও আরম্ভ করি কি বল।"

কলা পাতা নিয়ে সারি সারি বসে পড়ে ছেলেরা।

কয়েক গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই মনে পড়ে, "এই যা, জল ত এনে বসা হল না।"

"কিন্তু জল পাওয়া এখন সোজা নয়। ও ঘরের ত খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেল। ধোওয়া পোছা উপুর করা সব ঘটি বাটি।"

সমীর করুণ সুরে বলে, "বোধনদা, জল ছাড়া যে এই আটা আটা ভাত আর গলা দিয়ে নামছেনা।" "ভাত যে পেয়েছো এই বেশী এই মানুষ নির্বাসিত জমিতে। আর একান্ত যদি গলা দিয়ে নাই নামে, তবে মাটির খুরি থেকে ভাতের মাড়টুকু দিয়ে মেখে নাও।" "তার চাইতে গোটা কয়েক ডাব পেড়ে নিলে মন্দ হয় না।"

"বুদ্ধিটাত ভাল দিলে, বুদ্ধিজীবির ছেলে। কিন্তু গাছে উঠবার কাজটিত শুধু মাথা দিয়ে চলে না।"

দ্রুপদ ঘুরে এসে বলে, "পঁচিশ ঘর বসেছে। আরও পাঁচ ছয় ঘর বসান যাবে।"

বোধন একটু ঠাট্টার সুরে বলে, "ঘর তোলা হ'চ্ছে কার জমিতে

জানত ?" "জানি।" বিদ্রূপের সুরে উত্তর দেয় দ্রুপদ—"ফল্গুদার জামাইবাবুর জমি। তা' শ্যালকের কুটুম যখন এরা সব, নিশ্চয়ই গুণ্ডা দিয়ে আপ্যায়ন করবেন না।"

ফল্গু হাসে, "তাতেও আশ্চর্য হ'বার কিছু নেই। বরং আদর জানানর কায়দাটা একটু স্বতন্ত্রও হ'তে পারে। শুধু গুণ্ডার লাঠি নয় পুলিশের গুলি পর্যন্তও যেতে পারে।"

শীতা তার মা বাবার সাথে দেখা করতে আসে নিউ কলোনীতে। এই প্রথম মিঠুর মামার বাড়ীতে আসা।

অপরিচিত পথে চলতে চলতে বারে বারে প্রশ্ন করে মিঠু। "মা, কার বাড়ীতে চলেছো ?"

"তোমার দাদুর বাড়ী।"

"দাদু তোমার বাবা ?"

পরবর্তী প্রশ্নের আশঙ্কায় নীরব থাকে শীতা। সে জানে, এর পরই প্রশ্ন হ'বে—"আমার বাবা কবে আসবে মা"

একই প্রশ্নের একই উত্তর কতবার শুনেছে সে তার মায়ের মুখে। হয়তো তার বাঞ্ছিত উত্তরটি কোন দিনই পায় না বলে স্নেহ-পিপাসু মনের জিজ্ঞাসাও কোনদিন মেটে না।

সহস্রধারায় মিঠুর তথ্য সংগ্রহী মন ছুটে চলে। তাই সে আবার প্রশ্ন না করে পারে না, "মা, সব ঘরগুলিই একই রকম কেন।"

আধাবোঝা বিস্ময়ে নীরব হ'য়ে যায় শিশুমনও। ঘরের পর ঘর। সবই লাল টালির ঘর।

কোন এক অথৈ বিস্ময়ের অতলে হারিয়ে গিয়েছে মিঠুর সকল প্রশ্ন, বোঝে না শীতা। কিন্তু তার চিরনীরব মনও যেন আরও নীরব হ'য়ে যায় এক বিয়োগান্ত মহাকাব্যের অবরুদ্ধ বেদনায়।

দেশী টালির চালার ছায়ায় ছোট ছোট নিকান উঠোন ঘিরে নিস্তেজে লতিয়ে উঠতে চাইছে মূল-ছেঁড়া গার্হস্থ্য জীবনের প্রাণলতা। এত করেও জীবনের শিকড় উপরে ফেলা যায়নি। আমসত্ব, আমচুর কাটা তেঁতুল, তেঁতুলের আচারে আবার রোদ পড়েছে নিউ কলোনীর ছোট ছোট চেরা বাঁশ দিয়ে সীমানা করা আঙ্গিনায়।

শেষবেলার রোদ এসে পড়েছে দুর্দিনের চরম আশ্রয়, এই অসমান বাঁশের খুঁটিতে। খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসা এক বৃদ্ধার লোলচর্মের ভাঁজে ভাঁজে রৌদ্র-রেখা। মমতাকুল চোখে তাকায় শীতা।
বয়স যাদের আছে, তারা আবার ঘর বাঁধবে, ভিত বাঁধবে···বাঁধবে জীবনের নীড়। কিন্তু এই বৃদ্ধারা? তাদের স্মৃতির অবসাদ জড়ানো চক্ষুকোটরের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবে শীতা—এই বাঁশের খুঁটি ধরে বাঁচতে পারবে কি এরাও।

"এই যে দিদি এসেছে।" ফল্গুর গলা শুনে ফিরে তাকায় শীতা। দেখে, বিশ্বেশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন বাঁশের খুঁটি ধরে—সেই একই স্মৃতির অবসাদ জড়ানো চোখে হঠাৎ খুশির প্রলেপ।

"শীতা এসেছে। আর কে। আমার মিঠুদিদি আসে নাই?"

"এই যে আমি।" এক মুহূর্তে অন্তরঙ্গ হ'তে পারা মেয়ে মিঠু এগিয়ে যায়।

"তোমাকে দাদু ডাকবো। বুড়ো মানুষদের দাদু ডাকতে হয়।"

বিশ্বেশ্বর শিশুর মতই খুশি হ'য়ে উঠে মিঠুর কথায়। তার নরম হাত দু'খানা বুকে টেনে নিয়ে বলে, "এই খানটায় হাত দিয়ে দেখ—বুড়া হই নাই। এখনও নূতন গিন্নীদের দেখার আশ মেটে নাই। আরও কত নূতন সাজে সাজবি তোরা, এখনও দেখার কত বাকি আছে।" অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠে বিশ্বেশ্বর।

বিহ্বল চোখে তাকায় শীতা—এই সেই বিশ্বেশ্বর। পরীক্ষার্থী

ছাত্রদের ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল বুঝিয়ে দেওয়া অভিজ্ঞ শিক্ষকের চোখে জমাট বেঁধেছে একি অপ্রকৃতিস্থ করুণ আকুলতা।

দীপক ধূলো মাখা হাতে এগিয়ে আসে।

"মা কোথায়?"

"মা গেছেন কুমড়ো বীচি আনতে অন্নমাসীর বাড়ী? ঐ দেখনা ক্ষেত বানাচ্ছি, লঙ্কা আর বেগুন চারা লাগান হ'য়েছে।"

"যা তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি।" একটু অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে বিশ্বেশ্বর "বল শীতা আসছে, আমার মিঠুদিদি আসছে। যা শীগ্‌গীর যা।"

বোঝে শীতা, খুশির প্রকাশ এই এত জোরে কথা বলা।

ফল্গু এগিয়ে আসে, "কেমন হ'য়েছে, দিদি, ঘরখানা।"

শীতা লক্ষ্য করে, ফল্গুর প্রশ্নে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে বিশ্বেশ্বরের প্রসন্ন হাসির আড়ালে।

ফল্গুর উৎসাহিত প্রশ্নটা এড়িয়ে যায় শীতা। স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করে, "এটা বুঝি তোদের কলোনী।" "সেই জন্যই পাহারা দিতে হ'চ্ছে রোজই রাতে পালা করে। কখন এসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যায় গুণ্ডা দিয়ে ঠিক কি।"

"আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে নাকি এই ঘরটুকুও। তা'হলে আমরা থাকুম কই।" ব্যাকুল সুর ফুটে উঠে বৃদ্ধার স্খলিত কণ্ঠস্বরে।

"অত সহজ নয় জ্বালিয়ে দেওয়া।" জবাব দেয় ফল্গু। অনমিত দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হ'য়ে আছড়ে পড়ে যেন নিউকলোনীর প্রতিটি বাঁশের খুঁটির গায়ে—"অত সোজা নয় জ্বালিয়ে দেওয়া"

লোহার চাইতেও দৃঢ় এ বাঁশের খুঁটি, জানে তা ফল্গু। বিশ্বেশ্বরের হৃতশক্তি বুকের পাঁজরেও হয়তো পৌঁছেছে এ আশ্বাসবাণী। নিউ কলোনীর প্রতিটি টালির ঘরের অশান্ত আত্মায়ও পৌঁছেছে কি এ

অমোঘবাণী। সেইজন্যই কি এত নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে অঙ্কুর গজিয়ে উঠেছে নূতন জমির বুকে। শশা, ঝিঙ্গা, পুঁইয়ের মাচায় নূতন পাতার শিহরণ। দোপাটি, নন্দদুলাল ফুলের লাল সাদা রংয়ে যেন জীবনের মৃদু হিল্লোল আর তুলসী চারার মঞ্চে গৃহ-শান্তির স্থির কামনা।

প্রমীলা দ্রুতপায়ে ছুটে আসে। প্রায় আধমাইল দূরে অন্নপূর্ণার ঘর। বাস্তুহারা, তার উপর একই জেলায় বাড়ী ছিল, তাই পথের পরিচয়কে দৃঢ় করে তুলতে দেরি হয় না কোন পক্ষেরই। পাতানো বোনের বাড়ী গিয়েছিল কুমড়ো বীচি আনতে, ভাদুরে কুমড়োর বীচি।

প্রমীলার চোখমুখ ছাপিয়ে উঠেছে ব্যথা ও খুশির মিশ্রিত প্লাবন, "কি বাড়ীঘর ছাইড়া কি ঘরে মাথা গুঁজছি দেখ।"

সুইচ টেপা বাত্তির মত মধুবনের বাড়ীর ছবিটা জ্বলজ্বল করে' উঠে সব কয় জোড়া চোখের তারায়। সেই বড় বড় আটচালা ঘর, বাঁধানো ঘাটলা, আড়াই বিঘার দীঘি। আম জাম কাঁঠাল আমলকীর দূর হাতছানি। আর উঠোনে বিছানো ধানের স্বপ্নময় ছবি। তবু প্রমীলা এই দেশী টালির কুঁড়েখানার দিকে মমতার চোখে তাকায় বারে বারে...এইত তাদের শেষ আশ্রয়।

তবুও ত তাদের মাথা গুঁজবার মত একখানা ঘর। আর কত মানুষ যে কি দুর্দশায় মাসের পর মাস কাটাচ্ছে শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। এমন ভয়াবহ করুণ দৃশ্য দেখতে হ'বে জীবনে কে ভেবেছিল সে কথা।

অন্ধের লাঠির মতই নিবিড়ভাবে আকড়ে ধরছে প্রমীলা এই ঘরখানাকে। শিকড় শুদ্ধ উপড়ে আনা জন্মগার্হস্থ্যমন, ছিটে ফোঁটা জলের ধারা পেলেই আবার লতিয়ে উঠে গৃহধর্মের অবলম্বনে।

তাই আধ মাইল দূরে পথে পাতানো বোনের বাড়ী ছুটেছে প্রমীলা ভাদুরে কুমড়ো বীচি আনতে, এই গৃহধর্মের আকর্ষণেই।

কিন্তু বিশ্বেশ্বরের আশা আর বিশ্বাসের শিকড় একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে হোঁচট খাওয়া রাজনীতির প্যাঁচে। বিশ্বেশ্বর চোখের উপর দেখছে আজ, সুতো কেটে যাওয়া ঘুড়ির মতই শুধু ঘুরছে পূর্ববঙ্গের মানুষ—এ যাযাবরদের আর কোনদিনই মাটিতে শিকড় গাড়বার উপায় রইল না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সংস্কৃতি, তার বিরাট বৈশিষ্ট্য এমন ভাবে লোপ পাচ্ছে—চোখের উপর এ দৃশ্য দেখতে হ'চ্ছে। এ যে কি ব্যথা কথায় বোঝান যায় না। বুকটা টনটনিয়ে উঠেছে ব্যথায়। এত শুধু স্মৃতির বেদনাই নয়। অতীত ঐতিহ্যের মৃত্যুশোক এ যে।

এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কঙ্কাল পর্যন্ত নিশ্চিহ্নিত হ'য়ে যাবে, একথা ভাবতে পারে না বিশ্বেশ্বর। তবু একথাই আজ তার কাছে সব চাইতে সত্য, সব চাইতে স্পষ্ট। তাই গৃহজীবনের নূতন কোন কিছুরই আকর্ষণ আর অনুভব করতে পারে না সে। আধা জড় মনের তলায় কোনও গৃহসুরই বাজে না।

কিন্তু প্রমীলা তার ছোট্ট টালির ঘরখানার সংলগ্ন উঠোনটুকু গোবর দিয়ে লিপে মুছে ঝকঝকে করে ফেলেছে এরই মধ্যে।

প্রমীলা দুঃখ পেয়েছে জীবনে, কিন্তু দুঃখের সুর দিয়েই জীবনের তার বাঁধা নয় তার। আত্মমুখী মনও নয়। তাই তার সামনে রয়েছে ফল্গুর কর্মোদ্দীপনা, রয়েছে দীপকের জীবনারম্ভ। আর বহুদূর কর্মস্থলে রয়েছে তার শরতের চাকরি জীবন।

প্রমীলা নাতনীকে উপলক্ষ্য করে মেয়েকে শুনাতে চায় যেন একটু, "কিলো এই ঘরে থাকতে পারবি না দাদুর সঙ্গে ?"

মিঠু মাথা নাড়ে, "হ্যাঁ পারবো। একটা বাগান করবো দীপু মামার মত।"

শীতা মনে মনে লক্ষ্য করে মায়ের কথার প্রচ্ছন্নসুরটুকু। বোঝে

সে, মা-মেয়ের সম্পর্কের মাঝেও সচেতন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সেই একই ধনী আর দরিদ্রের মাঝের চিরন্তনী বৈরীভাব।

ধনীর গৃহে গোত্রান্তর হ'য়েছে তার—একথা আর পাঁচটি অবন্ধু আত্মীয়ের মত তার মাও যে মনে করে রেখেছেন, টের পায় শীতা। এতে দুঃখ পেলেও আজ আর আশ্চর্য্য হয় না সে।

প্রমীলা মোয়ার টিন নামায় মাচার উপর থেকে, নারকেল বের করে ছুলতে দেয় দীপককে। মিঠু এসেছে তার বাড়ী—কি দিয়ে যে মিষ্টিমুখ করায় ভেবে পায় না।

প্রমীলার নিপুণ হাতে সাজান ঘর।

মিঠু একটু অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করে, "এর উপরে রেখেছ কেন জিনিসপত্র ?"

ঠাট্টার স্বরে হেসে বলে প্রমীলা, "এটাই আমাদের মিটশেলফ, ডিনার ওয়াগন—সব কিছু।"

শীতা হাসে মনে মনে, দুঃখও পায়। বোঝে, এ আত্মবিদ্রূপ অস্বাভাবিক নয় প্রমীলার পক্ষে।

প্রমীলা বড়লোকের মেয়ে হ'য়েও আজীবন স্বামীর দরিদ্র সংসারে জীবনের রস নিঃশেষে শেষ করেছে।

আর প্রমীলার বড় মেয়ে হৈমন্তী, বড়লোকের বৌ—বড় জামাই গত যুদ্ধে প্রচুর টাকা করেছে। মস্ত বাড়ী করেছে, গাড়ী করেছে। কিন্তু হৈমন্তী মা বাবাকে একখানা চিঠি দিয়েও প্রণাম জানায় না।

মামাত বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে বছর দুই আগে দেখা হয়েছিল শীতার তার দিদির সাথে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আইসক্রীম পরিবেশন করেছিল শীতা। আইসক্রীমের গ্লাসটি হাতে নিয়ে নীরবে দাঁড়ায়

শীতা হৈমন্তীর কাছেও। গ্লাসটি তুলে নিয়ে ধন্যবাদ জানায় হৈমন্তী, "থেনি থাঙ্ক্‌স"। তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অবাক হ'য়ে যায় সে, "আরে, শীতা, তুই এসেছিস কবে?"

শীতা বহুক্ষণ ধরেই দেখেছে তার দিদিকে করুণ চোখে। গা-ঠাসা গয়না আর রুচিহীন অঙ্গরাগের আড়ালে এ মানুষটিই কি তার দিদি। নিজেকে অ্যাডভারটাইজ করার ক্রটীহীন চেষ্টায় শুধু বিকৃতই করেছে নিজের সত্যকারের সৌন্দর্যকে।

শীতা মৃদু হেসে ঠাট্টার স্বরে বলে "ঠিকত চিনতে পেরেছ। প্রায় ছয় বছর পর দেখা—তাওত ভোলনি।"

হৈমন্তী বোনের বিদ্রূপটুকু লক্ষ্য করে উত্তর দেয় কৈফিয়ত দেওয়া স্বরে, "বুঝেছি, সেদিন গাড়ী থামাইনি বলে রাগ করে আছিস। কিন্তু বড় তাড়া ছিল সত্যি সেদিন—।"

শীতা বাকি কথাটা বলে দেয়, "পার্টিতে যাচ্ছিলে ত? তবে গাড়ী না থামিয়ে ভালই করেছিলে সেদিন, কারণ আমারও সেদিন বড় তাড়া ছিল—মিটিং ছিল একটা।"

হৈমন্ত অবজ্ঞার স্বরে বলে উঠে, "তুইও ইজম টিজম করছিস নাকি? কেন তোরত বেশ বড়লোকের ঘরে বিয়ে হ'য়েছে। মস্ত জমিদার নাকি শুনি। তোর আবার ওসব করার দরকার কি?"

বিবাহ-বাসর এটা, বিতর্ক সভা নয়, খেয়াল রাখে শীতা। তাই বোনের কথায় শুধু করুণার হাসিই হাসে। জবাব দেয় না আর। প্রবৃত্তিও হয় না। এমন ঘোষণা করে কি জীবনেরই পরিচয় জানাচ্ছে, মনে মনে ভাবে সে।

তারপর আর দেখা হয়নি হৈমন্তীর সাথে। শুনেছে, আরও বড়লোক হ'য়েছে তার স্বামী সুখময়। সাথে সাথে আরও নৈতিকপতন

হ'য়েছে দুজনেরই। তাই অসুস্থ বৃদ্ধ মা বাবার খোঁজ খবর নেওয়াটা অপ্রয়োজনীয়ের বাজে খাতায় পড়ে গিয়েছে।

এ ব্যথা যেন সহস্র কাঁটায় বিঁধছে দিবারাত্র মা বাবাকে। নিজের আত্মজার কাছ থেকে এ অবজ্ঞাকে সহজসুরে গ্রহণ করতে পারছে না বিশ্বেশ্বর। শীতাকে লালন পালন করে নাই বিশ্বেশ্বর। নিঃসন্তান বালবিধবা অগ্রজার আশ্রমেই বড় হ'য়েছে শীতা। তারপর নিজের চেষ্টায়ই পড়াশুনা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল। পিত্রালয় থেকে বিচ্ছিন্ন সে জন্ম থেকেই। কিন্তু হৈমন্তীকে তিল তিল করে বড় করেছিল স্নেহের উত্তাপ দিয়ে। সেই হৈমন্তী, তার প্রথম সন্তান, বৎসরান্তে একখানা পত্র দিয়েও খোঁজ নেয়না বৃদ্ধ পিতার।

পিতৃসম্মান, শ্রদ্ধা, ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্খাটুকুও কি থাকতে পারে না তার, শুধু দরিদ্র বলেই।

হৈমন্তীর সাথে যে শীতাকেও একই শিবিরে ফেলেছে তার মা বাবা, শীতা টের পায় তা'। প্রমীলার জীবনের সবকিছু প্রত্যাশাই অপেক্ষা করেছিল সন্তানদের কাছে। কিন্তু তার মেয়েরাও যে তার দিকে তাকাল না, এ দুঃখের কাছে হার মানতে চায় না প্রমীলা। তাই ছেলেদের দিকেই সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সগর্বে সংগ্রাম করে চলেছে সে এ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।

সন্তানই-হোক আর যেই হোক, ধনী লোক কখনও দরিদ্রের সম্মান করে না—এ কথাটাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে সে। তাই অতি অনায়াসেই সংসারী প্রমীলা ছেলেদের আদর্শকে গ্রহণ করতে পেরেছে। সে জানে, শীতা তার ব্যথার জন নয়। তার ব্যথার জনেরা রয়েছে এই প্রতিটি টালির ঘরে, শিয়ালদহের প্লাটফর্মে আর রাণাঘাটের গুদাম ঘরে।

শীতাও জানে, মায়ের এ ক্ষতর সংবাদ। আপন জনের কোনও

দাবীই এখানে নেই তার। তাই মা বাবার কাছেও অজানা তার জীবনের গোপনতম বেদনার স্বরটি।

অর্থাভাবের সাথে লড়াই করছে সেও যে, আত্মীয়দের চোখের সামনেই অথচ চোখের আড়ালেই—এ কথা আর পাঁচটি আত্মীয়ের মত মা বাবার কাছেও অপ্রকাশিতই রাখে।

সবাই জানে, বিমাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দেবজ্যোতির বৌ সে! চাকরিত করছে সে আধুনিকতা দেখাবার জন্য।

জমিদার বাড়ীর বৌ সে। এইত তার আত্মীয়দের চোখে একমাত্র পরিচয়। সেই একই পরিচয় মায়ের চোখেও। কিসের যেন একটা ব্যথা—কি একটা অভাব অনুভব করে শীতা তার ঘরে ফিরে এসে। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবে, বুকের কাছের এই শিশুটিই তার একমাত্র অবলম্বন। এই নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র শিকড় এই শিশুটি।

•

সপ্তাহ খানিক পরই আবার আসে শীতা। তার মা বাবা তাকে বিপক্ষ শিবিরের লোক বলেই জানবে। তবু তার ত না এসে উপায় নেই। হৈমন্তীর কাছ থেকে পাওয়া ক্ষততে প্রলেপ মাখাতে হ'বে তাকেই। পথ চলতে চলতে ভাবে শীতা, মাতৃহৃদয়ের স্নিগ্ধ উত্তাপ পায় নাই কোনদিন সে। স্নেহপিপাসু মনের চাহিদা মেটে নাই কোনদিন জীবনে। তার শাশুড়ী আর মা। দুজনই শুধু বঞ্চিত নারী হৃদয়ের দাহ দিয়েই উত্তাপ ঢেলেছে তার জীবনে। আর তাদেরই হৃদয়ের দাহতে জল ঢালাতে হ'বে শীতাকেই।

দূর থেকে দেখতে পায় দীপক। চেঁচিয়ে উঠে সে "মা দিদি এসেছে। মিঠু।"

আরও শ্রী ফুটেছে উঠোনের চারধারে।

হাঁসের খাঁচা তৈয়ার করছে দীপক—হাঁস কিনেছে সে চম্পাহাট থেকে। মুরগি কিনেছে।

"এই নিউকলোনীকেই আমরা মধুবন বানিয়ে ফেলেছি। ভোর না হ'তেই মুরগি ডেকে উঠে।" বলে দীপক।

ঢাকের বাড়িও আরম্ভ হ'য়েছে। শীতলা পূজো হচ্ছে ঐ মাঠে এক 'বাচারি' ঘরে। ঢাকের শব্দে মনটা ছুটে চলে যেতে চায় যেন ছেড়ে আসা বহুদূর গ্রামে।

দীপুর সাথে প্রমীলাও যোগ দেয়, "খুব কীর্তন শুনি। রোজ রাতে ঐ 'নম'বাড়ীর বারান্দায় কীর্তন বসে।" "ছেলেপুলেরা হরি-লুটের বাতাসা আমাকেও দিয়ে যায়।" বলে' শিশুর মত হেসে উঠে বিশ্বেশ্বর।

শীতা দেখে, হাসিত নয়—যেন ক্ষুধিত শিশুর আর্তনাদ।

প্রমীলা বলে, "কলোনীতে ওনাকে কিন্তু সবাই সম্মান করে। বলে, এত বড় বিদ্বান প্রতিবেশী পাওয়াত আমাদের সৌভাগ্য। পাড়ার ছেলেরা ঠিক করেছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছেলেরা সবাই মিলে একটা কোচিং স্কুল খুলবে। ওনার কাছেও আসবে পড়া বুঝতে সপ্তাহে দু'দিন করে'। মন্দ কি, যেটুকু পারেন সাহায্য করবেন। সমস্ত জীবনইত এই করলেন, এখন শেষ বয়সেও এই নিয়েই না হয় রইলেন। তবু যদি একটা স্কুল গড়ে তোলা যায়। অন্যসব কলোনীতে স্কুল হ'য়ে গেছে এরই মধ্যে।" গর্বের সুরে বলে প্রমীলা। যেন কলোনীর সমৃদ্ধি তারও সান্ত্বনার বিষয়। বাস্তুহারাদের কেউ সহায় নেই, তবু তারা কোন অংশেও পিছিয়ে নেই। স্কুল, ডিস্পেন্সারী, দোকানপাট সবই উঠে গিয়েছে। সগর্বে ঘোষণা করে বলেছে যেন প্রমীলা শীতার কাছে। "এখানেও হবে সব।" স্বামীকে সান্ত্বনা

দেওয়া সুরে বলে, "এখনইত তরীতরকারি সব নিয়ে বসে ঐ বটতলায়। মাঝে মাঝে মাছও আসে। আস্তে আস্তে হ'বে সব।"

"তবে সে সোনার বাড়ী ঘর কি আর হইব।" মিঠুর দিকে তাকিয়ে বলে প্রমীলা, "গেলে না ত একবারও দাদুর বাড়ী। দেখতে—কত বড় বড় নদী আর কতবড় পালতোলা নৌকা।" প্রমীলার চোখের সামনে ঝলকে ঝলকে বয়ে চলেছে যেন পদ্মার বুকের ছোট ছোট ঢেউগুলি।···

শীতা সে রাতে এখানেই থেকে যায়। শনিবার। পরের দিন ছুটি আছে।

মিঠু আর দীপু খুশির যেন আর নাগাল পায় না। মিঠু নেচে উঠে, "বেশ হ'বে দীপু মামা আমাকেও একটা হাঁসের খাঁচা বানিয়ে দিতে হ'বে।"

"তোমাদেরত পুকুর নেই—হাঁস সাঁতার কাটবে কোথায়?"

"কেন চৌবাচ্চায়? অনেক জল আছে।"

দীপক হাসে ভাগ্নির অজ্ঞতায়।

খুশির সুরে মাকে বলে দীপু, "মা, দিদি থাকবে, আমি বাজার করে নিয়ে আসি। রাতে খুব ভাল করে রান্না করবে কিন্তু।"

দীপক আবদারের সুরে আবারও বলে, "দাও না মা টাকা।"

মনে মনে একটু বিরক্ত হয় প্রমীলা ছেলের কথায়, যেন কত টাকা রয়েছে তার বাক্সভর্তি। সবইত খুইয়েছে সে ওদের সংসারের জন্য। হাতের শাঁখাজোড়া ছাড়া আর কিছুই নেই সম্বল আজ।

বড় ছেলে গুণে গুণে পঞ্চাশটি টাকা পাঠায় মাসে। তার উপর নির্ভর চারজনের খোরাক।

সাধ আহ্লাদ কি তারও হয়না? কিন্তু একটি আস্ত টাকাও যে আজ নেই ঘরে, সে কথাটাই বারে বারে বিঁধছে মনে। তার উপর ছেলের এ কি আবদার।

মৃদু ঝাঁজের সাথে বলে প্রমীলা, "তোমার সে চিন্তা করতে হ'বে না। মিঠুর জন্য আজ তার ছোট মামার হাঁসের ডিমের রসা রাঁধবো।"

এতেই খুশি হয় দীপু। তারই পালা হাঁসের ডিম রাঁধা হ'বে। সগর্বে জানায় সে "জান দিদি এই নিয়ে সাতটা ডিম দিয়েছে। এত বড় বড় ডিম। বাজারে এ ডিম পাঁচ আনা করে জোড়া।"

প্রমীলা শীতাকে নিয়ে কলোনীতে বেড়াতে যায়। "সেদিন ওরা সবাই তোকে দেখতে চেয়েছিল। ওরা বলছিল, আপনার মেয়েকে বলে দেখবেন, এ পাড়ার মেয়েদের নিয়ে একটা স্কুল করতে পারেন কি না।"

মধুবনের অনেকেই ঘর বাড়ী বিক্রী করে চলে এসেছে। কিন্তু এই বিরাট শহরে কে যে কোথায় ছড়িয়ে রয়েছে। একমাত্র নমপাড়ার তুলসীরা আছে এই কলোনীতেই। শীতাকে নিয়ে তুলসীর বাড়ীতে যায় প্রমীলা। ডাক দেয় সে, "দেখ গো বৌ, কাকে নিয়ে আসছি।"

তুলসীর বৌ তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে একখানা পাটি পেতে দেয় বারান্দায়।

"ও ঘরের মানুষ কই?"

"ক্ষেতে বেড়া দিতাছে।" নীচু স্বরে উত্তর দেয় বৌ-টি।

"এই যে গো আমি।" বলে' ঘরের পেছন থেকে বেরিয়ে আসে ক্ষেত্রমণি।

প্রথম ধাক্কায়ই বেড়িয়েছিল সে দেশ থেকে। কিন্তু কোলকাতার মাটিতে এই প্রথম আসা।

"ছাগলের জ্বালায় কার সাধ্য যে কিছু লাগায়। কয়টা মরিচ চারা লাগাইছিলাম। তারে ছাগলে দিল শেষ কইরা। এইটা না

শুনছিলাম সভ্যদেশ। তাও ছাগলের গলায় দড়ি দেয় না কোনও মিনষ-ই।" মনের জ্বালা ঝরে উচ্চারণে।

"দুইটা চারটা গাছগাছালি যদি না লাগাই সময় থাকতে, তবে খামু কি? পেটটাত আছে লগে লগেই।" শীতাকে দেখে বলে, "এই বুঝি আপনার ছোট মাইয়া? এই অল্পবয়সেই বিধবা হইছে মাইয়া? বাপমায়ের বুকে শেলত কম বেঁধে নাই। এই দুঃখে দুঃখেই বুঝি বাপ শয্যা লইছে?"

শীতার আত্মার সুরের সাথে এদের এই সমবেদনার সুর মেলে না কোনদিন। তবু সম্মানের সাথেই গ্রহণ করে সে দেশের মানুষের এই অন্তরঙ্গ বিলাপী সুরকে।

প্রমীলা দেখায় তুলসীদের ঘরখানা—"তুলসী আর তার বৌ দুজনে মিলে নিজের হাতে তুলছে এ ঘরখানা।" গর্ভবতী বৌটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে শীতা, গর্ভস্থিত ঐ সন্তানইত ঢালছে নির্বাপিত মনে এ সংসার প্রেরণা। চোখে ঝরে শুভ কামনা।

"শীতের মুখেই আতুর পড়বে। তাই আগে থাকতেই সব গুছিয়ে নিচ্ছে।" বলে প্রমীলা।

প্রমীলা উঠে পড়ে। "চলি আজ। বামুন বাড়ীর গিন্নীর সাথেও একটু দেখা করে আসি। না হ'লে আবার অনুযোগ দেবে।"

ক্ষেত্রমনি ডেকে বলে, "আসেন যেন মাঝে মাঝে। আপনাগো লগে কথা কইয়াও প্রাণটা জুড়ায়। কথা কওয়ার সুখ পাই। কারও সঙ্গে প্রাণ খুইলা মনের কথাটা পর্যন্ত কইতে পারি না। "যাচ্ছি" "থাচ্ছি" এ কি আর এই বয়সে মুখ দিয়া বাইর হইতে চায়? দুঃখের কথাটা পর্যন্ত না পারি বোঝাইতে।"

সমর্থনের হাসি হাসে প্রমীলা।

শীতা বোঝে, মানুষের কথ্য ভাষাটাই হ'ল প্রাণের ভাষা—

বেদনার ভাষা। "কথা কওয়ার সুখ।" শুধু ভাষাই নয়, সুখদুঃখের সুরটিও যে একই। এই সুরটি এক বলেই "কথা কওয়ার সুখ" এত।

শুধু ভাষা নয়, শুধু কথাও নয়—মর্মস্থলের সুখদুঃখের সুরটিতে যোগাযোগ না থাকলে সহজ কথাটিও দুর্বোধ্য লাগে। তাই এদের দুঃখের কাহিনীকে কবিতার ভাষা দিয়েও বোধ হয় বোঝাতে পারবে না ভিন্নদেশের মানুষকে। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার পারের মানুষ—কথাই এদের প্রাণ। এদের সেই রোদবিছান শীতের উঠোনে কথার ছড়া দিয়েই বাঁধা থাকতো সকাল দুপুর। প্রতিবেশীনীদের সুখদুঃখের নিত্যকার কাহিনীর আলাপে দারিদ্র্যদগ্ধ জীবনের বীণার তার সাধা থাকতো। আর আজ এতবড় দুঃখের দিনে কি করে নীরব থাকতে পারে সে কথার বীন? কিন্তু এদেশের মানুষ কথা বলতে চায়না। গায়ে পড়া কথা শুনতেও চায় না। দুঃখ করে বলে ক্ষেত্রমনি, "বাসে ট্রামে মেয়েমানুষের গায়ে মেয়েমানুষ ঠেসাঠেসি কইরা বইসা থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিন্তু মুখে 'রা' টি নাই।"

রাত্রিতে ঘরে ঘরে ছেলেরা পড়াশেখা আরম্ভ করে—নরঃ নরৌঃ নরাঃ।

"আকবর বড় মহানুভব সম্রাট ছিলেন।"

"Let A.B.C be a triangle"।

ছাত্রদের পড়াশেখার এই পূর্ববঙ্গীয় টানা টানা সুর কান পেতে শোনে বিশ্বেশ্বর। শিক্ষক জীবনের স্মৃতির কাকলি যেন।

প্রমীলা হেসে বলে, "মধুবনেই ফিইরা আসলাম নাকি আবার।"

অদূরেই ঝিলের ঘাটে 'কুপি' জ্বালিয়ে বাসন মাজছে কোন ঘরের বৌরা। ক্ষীণতরঙ্গ ঝিলের বুকে বাসন মাজার সে শব্দটুকুও দ্রুতলয়ে জলতরঙ্গের মত যেন কাঁপিয়ে তুলছে অতীত রাগিনীর হারান সুরকে।...

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই শোনে শীতা, বামুনগিন্নীর বুড়ি মা লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে এসেছে পঞ্জিকার খোঁজে। বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে, "দেখতো বাবা, আজই একাদশী নাকি। একবেলা ঐ ত চারটি ভাতের জোরে নড়ি চড়ি। আর যে কত কাল এ একাদশীর মুখ দেখতে হ'বে। কপালে মরণ লেখা যে আছে কবে।"

পঞ্জিকার পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে দেখে বিশ্বেশ্বর, "আজই একাদশী।"

সঙ্গে সঙ্গে কি কথা মনে পড়ে' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিশ্বেশ্বর, শীতার লক্ষ্য এড়ায় না।

সে এসে জানায় তার মাকে, "আমারত এখনই চলে যেতে হ'বে। মনেই ছিলনা, আজ ভোরেই একজনের সাথে দেখা করার কথা আছে।"

মিঠু খুশি হয়না মায়ের এ মত পরিবর্ত্তনে।

শীতলা দেবীর পূজোটা দেখে যাওয়া হ'বেনা তাহ'লে। মাটি দিয়ে কি সুন্দর প্রতিমা বানাচ্ছে মাঠে ঐ ঘরে।

কিন্তু শীতা আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজী নয় এখানে। একাদশী দিনের এই দীর্ঘ শ্বাসে ভারী আবহাওয়াকে সহ্য করতে পারেনা। একমাত্র একাদশী পালনটাই কি তার জীবনের চরম লাঞ্ছনা? পঞ্জিকা খুলে একটি মাত্র তিথির হিসেব মিলিয়ে একাদশী পালন সে করেনা। মনের একাদশীত চলছে তার প্রহরে প্রহরে।

শীতা মিঠুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু নিজের ঘরে যায়না। বড় অশান্ত লাগছে মন। মা বাবার কাছ থেকে যখনই ফিরে আসে শীতা, তার সমস্ত সত্তায় সত্তায় ছড়িয়ে পড়ে একটা সচেতন একাকীত্বের ব্যথা। তার মাতাপিতাও সাথী নয় তার। জন্ম মাতাপিতৃহীন বালিকার মতই স্রোতের গায়ে ভেসে চলেছে সে।

ব্যথার জন কেউ কি নেই তার। একটি মাত্র প্রশ্নই যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চরণে ঘুরছে তার চার দিকে। কেউ কি নেই?

একটি ঘনিষ্ঠ মন অদৃশ্য ছায়ার মত স্থির হ'য়ে দাঁড়ায় এসে অশান্ত চেতনায়। তার ক্ষুধিত চেতনার সমস্ত ভাষা দিয়ে সেই একটি মানুষেরই কাছে জানাতে চায় এই স্নেহকাঙ্গাল মনের ব্যথাকে।

কিন্তু জানাবার উপায় তার নেই। সে পথ বন্ধ করেছে সে নিজেই।

তার এই ক্রন্দনময়ী বিধবা আত্মার একটি দুঃখের কলিও শোনাবার উপায় নেই কারও কাছেই। সমস্ত দুঃখচেতনা একমাত্র যার কাছে সবোলা হ'য়ে উঠতে চায় তারও কাছে মূক হ'য়েই থাকতে হ'বে তাকে চিরদিন। এর চাইতে বেশী সংযম, বেশী ক্লেশসাধনা হয় কি একাদশীর উপবাসে?

পৃথ্বীর বাড়ীটা চোখে পড়ে দূর হ'তে। পুরানো গাঁথনির গা ফুঁড়ে অশ্বত্থ চারা বেড়িয়েছে স্থানে স্থানে। মহাসমুদ্রের আহ্বানের মতই প্রশান্ত আহ্বান ভেসে আসছে যেন ঐ প্রাচীন বাড়ীটা থেকে।

চুম্বকপর্বতের মত টেনে নিয়ে যায় শীতাকে ঐ পুরানো বাড়ীটা।

ঘরে ঢুকতে স্মিত হাস্যে বলে পৃথ্বী, "এস সুমিত্রার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।"

এই প্রথম সুমিত্রাকে নাম ধরে ডাকলো পৃথ্বী, লক্ষ্য করে শীতা। শীতা স্নিগ্ধ, নিবিষ্ট চোখে তাকায় সুমিত্রার দিকে। মনে মনে শুভ কামনা করে' বলে, "পৃথ্বীরই যোগ্য জীবন সঙ্গিনী।"

প্রসন্ন চোখেই অভ্যর্থনা করছে সুমিত্রা তাকে। তবু হৃদয়ের কোন স্তরে যেন একটা ব্যথার ইঙ্গিত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পৃথ্বীকেও লক্ষ্য করে

দেখে শীতা—মনে হয়, ওদের দু'জনেরই মনের তলায় যেন কি-এক একই দুঃখের স্রোত বয়ে চলেছে নিঃশব্দে।

নিজেকে হুঁশিয়ার করে শীতা, "ওদের নিজেদেরই স্বতন্ত্র সুখদুঃখের সুরে বাঁধা জীবনের তার। তার উপর আবার তোমার জীবনের ব্যথার সুর দিয়ে মথিত করতে চেওনা। এই অগনিত মানুষের ভীড়ে একাই চলতে হ'বে তোমাকে। ব্যথার জন খুঁজতে চেওনা এ পৃথিবীতে।"

পৃথ্বী শীতার চোখের এ গাঢ়ছায়া লক্ষ্য করে' প্রশ্ন করে আন্তরিক স্বরে, "কি হয়েছে শীতা।"

এ কি অকুণ্ঠিত হৃদয়ের আত্মপ্রকাশ পৃথ্বীর এই প্রগাঢ় সুরে। ভাবী বধূর কাছেও গোপন করার প্রয়োজন হয় না এদের অন্তরের কোনও সংঘাতই ?

উঠে পড়ে সুমিত্রা, "চলি আজ।" "পরিচয়ই হ'ল শুধু, আলাপ আর হ'ল না। আমাদের বাড়ীতে যাবেন একদিন।"

শীতা সম্মতি জানায়।

সুমিত্রা চলে গেলে পৃথ্বী শীতাকে দেখে তাকিয়ে। মনে হয় তার, ও যেন বলতে এসেছে কিছু তারই কাছে। পৃথ্বী তন্ময় হ'য়ে কি একটু ভাবে আবার। তারপর আবারও বলে শীতাকে, "শীতা, কি হ'য়েছে তোমার বল্লে না ? বুঝলাম বলতে পারবেও না। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমাকে ভুল বুঝে' কিন্তু দুঃখ পেওনা কোন দিন।"

"আপনাকে ভুল বুঝবো না আমি কোন দিনই।"

জবাব দেয় শীতা স্থির সংযত কণ্ঠে।

"কথা দিলে তা'হলে। এবার বল, এত ভোরে উঠে এখানে

এসেছিলে কেন। কোনও কিছুর প্রয়োজন থাকলে বলতে. কুণ্ঠিত. হ'য়ো না।"

শীতা হেসে ফেলে, "কোনও কিছুর প্রয়োজন অর্থত টাকার প্রয়োজন? না, টাকার প্রয়োজনে আসিনি।"

"তা' যে তুমি আসনি, তা' জানি। না হ'লে মিঠুকে পর্যন্ত একবেলা খাইয়ে রেখেছো, তবু কি একবার আসতে পারতে না। মিঠু কি একা তোমারই মেয়ে, আমাদের কি সে কেউ নয়?"

"আপনাকে কে দিল এ সংবাদ। বিনু নিশ্চয়?"

"যেই দিক সেটা বড় কথা নয়। তোমার কাছেও যে এতখানি আগন্তুক আমি, সে কথাটিই ভেবেছি কয়দিন ধরে।"

শীতা লজ্জিত হয় মনে মনে। মুখে বলে, "আমার দুনিয়ার সব আত্মীয়রা জানেন, বড়লোকের বাড়ীর বৌ আমি। আর আমি আমার মেয়েকে অর্থাভাবে না খাইয়ে রাখবো একথা লোকে মানবে কেন। তাই নিজে যেচে আপনজনদের কাছে, একথা ঘোষণা করেই বা লাভ কি। কাউকেই জানান যায় না যে কথা সে কথা আপনাকে জানালে, সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রম হ'য়ে যায় না কি?"

"বুঝলাম।" ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে' বলে পৃথ্বী—"যাক সে প্রশ্ন। আজ তবে কি জন্য এসেছিলে?"

"এখানেই ছিলাম রাতে মার ওখানে। ভোর থেকেই মনটা বড় খারাপ লাগছিল। তাই আপনার কাছে এলাম একটু কাজের কথা শুনতে। রাজনীতির কথা।"

"ভোরে উঠেই মনটা খারাপ হয়ে গেল—।" একটা সূক্ষ্ম কাঁটার মত বেঁধে যেন কথাটা। তবু ঠাট্টার সুরে প্রশ্ন করে পৃথ্বী, "আর এখানে এসে বুঝি আরও মন খারাপ হ'য়ে গেল।"

ব্যক্তিগত কথা দিয়ে হালকা করতে চায় পৃথ্বী ভারী আবহাওয়াকে। অনুসন্ধানী চোখে তাকায় সে শীতার দিকে।

শীতা লক্ষ্য করে পৃথ্বীর প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন অর্থ। কি জানতে চাইছে পৃথ্বী বোঝে সে। তাই উত্তর দেয়, "না আরও মন খারাপ হয়নি। বরং খুশিই হয়েছি।"

অস্পষ্ট প্রশ্নের অস্পষ্ট উত্তর।

হালকা কথাবার্তা, পরিহাস, জীবনের সুখদুঃখের প্রশ্ন সবই করে যাচ্ছে পৃথ্বী। কিন্তু ভিতরের অতল গভীরে স্থির হ'য়ে রয়েছে এক অব্যক্ত নৈর্ব্যক্তিক ব্যথা—বিরাট পৃথিবীর যবনিকার অন্তরাল থেকে ভেসে আসা করুণ সঙ্গীতের মত।

পৃথ্বী বলে, "রাজনীতির কথাই শোন তবে। এজন্যই এসেছো যখন।"

"এজন্যই এসেছো যখন।"—কথাটায় একটু সংকুচিত হয়ে উঠে শীতা মনে। যেহেতু সে জানে, কথাটা মিথ্যা আত্মছলনা মাত্র। তবু এই ছলনার আশ্রয়েই বাঁচতে হবে তাকে—পরিপূর্ণ করতে হ'বে জীবনের স্বাদকে এই দিয়েই।

"শোন তবে—" স্তিমিত হ'য়ে আসে যেন কণ্ঠস্বর। গম্ভীর গলায় বলতে থাকে পৃথ্বী, "সুমিত্রা আজ প্রায় একবছর পর আমার সাথে এই প্রথম দেখা করলো। তার বোন সাগরীকে চিনতে ত—একই স্কুলে ত কাজ করতে তোমরা।

রাজনৈতিক কারণে সে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। তার পরবর্তী সব খবরও নিশ্চয় জানতে।

মৃদু বিরক্তি দেখা দেয় শীতার কুঞ্চিত চোখে, "জানি, স্বামীকে ত্যাগ করেছিল সে রাজনৈতিক মিথ্যা অভিযোগে।"

"তারই শেষ পরিণতির সংবাদ এসেছে সুমিত্রার কাছে সাতদিন

আগে। এক কৃষক এলাকায় সাগরীর মৃত্যু হ'য়েছে গুলিতে—পুলিশের সাথে সংঘর্ষে।"

একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেড়িয়ে আসে শীতার ভিতর থেকে। পৃথ্বী বলে যায় "আর এই তার শেষ চিঠি।" পকেট থেকে ভাঁজ করা এক টুকরো চিরকুট বের করে। "খুবই অস্থির মন নিয়ে লেখা স্পষ্ট বোঝা যায়।"

শীতা পড়ে যায় নিঃশব্দে। সাগরীরই হাতের লেখা—"প্রিয় দিদি, আমরা যে কত বড় ভুল পথে চালিত হ'য়েছি তার আর কৈফিয়ত দেবার কিছু নেই। এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছি এদেরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। আর কিছু লেখার সময় নেই। একটি মুহূর্তের সংগ্রাম এখন একটি যুগের সংগ্রামের মতই মূল্যবান।

ভালবাসা—সাগরী।"

চিঠির শেষে "রথীকে" লিখে আবার কেটেছে। রথীকে কিছু জানাতে চেয়েও আবার হয়তো সংকোচে কেটে দিয়েছে কথাটা। কিংবা হয়তো গুছিয়ে বলতে যাওয়া বহু কথার ভীড়ে কোনও কথাই আর লিখে যেতে পারেনি সময়াভাবে।

পৃথ্বী মনে মনে উচ্চারণ করে—"একটি মুহূর্তের সংগ্রাম এখন একটি যুগের সংগ্রামের মতই মূল্যবান।"

শেষদিন পর্যন্ত রথীর প্রতি তার প্রেম অমলিন রয়েছে জানে তা' পৃথ্বী। তবু তার কাছে ক্ষমা পাবার চেষ্টায় একটি অক্ষরও লিখে এ মূল্যবান মুহূর্তের ক্ষয় করতে চায়নি সে।

শেষ সংবাদ একটি সংগ্রামী ছেলের রিপোর্ট থেকে পাওয়া। পৃথ্বী পড়ে যায় লেখাটা। "একমাস যাবত এ কৃষক এলাকায় কাজ করছিল সাগরীদি। মৃত্যুর আগের দিনও কমরেডদের সাথে রাত ভ'রে তর্ক করেছে ছোট ছোট গোলাভাঙার বিরুদ্ধে। বহু তর্ক বিতর্কের

পর ঠিক হ'ল—স্থানীয় কৃষকদের নিজস্ব মতের ভিত্তিতেই স্থির হ'বে—গোলাভাঙা হ'বে কি না হ'বে।

"পরের দিন বেলা প্রায় আটটা তখন। এরই মধ্যে পাশের গ্রাম হ'তে খবর আসে—সেখানে একটি কৃষকের গোলাভাঙা হ'বে সেদিনই—সবাইকে প্রস্তুত হ'য়ে যেতে হবে। এমন কিছু অবস্থাপন্নও নয় সে কৃষক। সাগরীদি শোনামাত্র সেই মুহূর্তে ছুটলো বাধা দিতে। রুখে দাঁড়াল সে, 'অসম্ভব। এভাবে আমাদের বহু রক্ত দিয়ে গড়া আন্দোলনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে দেওয়া হ'বে না।'

"সাত মাইল্ পথ। খানা ডোবা, ঝোপ, জঙ্গল ভেঙে উঁচুনীচু গ্রাম্যপথে দম না ফেলে যেন ছুটে চলেছে সে। পিছু পিছু আমরাও চলছি এ গ্রামের দল নিয়ে।'

"সাগরীদির মুখের দিকে তাকান যাচ্ছিল না যেন। মনে হচ্ছিল—উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে তার চোখমুখ। মাথার উপর প্রখর সূর্যের তেজ। দরদর করে ঘাম ঝরছে। গায়ের সেই উজ্জ্বল রং যেন সূর্যের তেজে ঠিকরে বের হ'চ্ছে।

"পথেব মাঝে একটা চেরা বাঁশে পা কেটে গেল। বেশ খানিকটা ঢুকে গিয়েছে কঞ্চিটা। সেটাকে টেনে বের করে শাড়ির আঁচল থেকে খানিকটা ছিঁড়ে বেঁধে নিয়ে আবার চলতে থাকলো।

"রক্তে ভিজে যাচ্ছে শাড়ির পাড়—ভ্রূক্ষেপ নেই তার। আমরা বল্লাম, 'আপনি না হয় একটু পরে আসুন। আমরা এগিয়ে যাই।'

"এক মুহূর্তও নষ্ট করার সময় নয় এখন। তাড়াতাড়ি পা' চালাও।' বল্ল সে।

"দূর থেকে আমাদের আওয়াজ কানে আসছে, 'লাঙ্গল যার ধান তার।'

"ওদিকে পুলিশও প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। দুপক্ষই শুধু ইঙ্গিতের

অপেক্ষায়। আমাদের এগুতে দেখে আমাদের কমরেডরা ভাবলো, আমরাও প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি।

"দূর থেকেই বুঝলাম, আমাদের পক্ষের নেতা ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন। গর্জে উঠলো নেতার কণ্ঠ—'ভাঙো গোলা—কাস্তে যার ধান তার।' সঙ্গে সঙ্গে লাঠি সড়কি নিয়ে ছুটলো সবাই। সাগরীদি দূর থেকে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছে—'এক মিনিট অপেক্ষা কর কৃষক ভাইরা—'কিন্তু আর এগুনো হ'ল না। একটা গুলি এসে বি'ধেছে বুকে। শেষ কথা বলতে চেষ্টা করছে সে 'কৃষক ভাইরা—' কিন্তু লক্ষ্য করা অব্যর্থ গুলি। আর বলা হ'ল না বাকী কথাটা।"

পৃথ্বীর চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। গলার স্বরও ভিজে এসেছে। নিজেকে সংযত করে সে বলে, "কাঁদছো শীতা, কিন্তু শুধু কান্নায় নয় এর উত্তর। লক্ষ্য করা অব্যর্থ গুলি। তার উত্তর দিতে হ'বে আমাদের। সাথে সাথে উত্তর চাইতেও হ'বে, এ মৃত্যুর জন্য দায়ী যারা তাদের কাছে।"

পৃথ্বী বলে যায়, "শুনলাম, সাগরীর মৃত্যু সংবাদ শুনে নন্দলাল নাকি বলেছে, শত্রুপক্ষকে 'মিনিমাইজ' করার ফল। এতে আর দুঃখ করে লাভ নেই।"

বেদনায় কথা থেমে আসে যেন পৃথ্বীর। "তার ব্যাগে রথীর একখানা ফোটোও পাওয়া গিয়েছিল। তার পেছনে ছোট্ট একটি উদ্ধৃতি ছিল। "Everyday I love you twice I loved you before".

তাই পড়ে নন্দলাল বলেছে, "রথীই মাথাটি শেষ করেছে।"

পৃথ্বী আত্মমগ্ন স্বরে বলে, "নন্দলালের কথার জবাব দেবার দিন এগিয়ে আসছে। কিন্তু একটি ছত্রও লিখে যেতে পারলো না সাগরী রথীকে। হয়তো কাজের ভিতর দিয়েই আবার ফিরে আসতে চেয়েছিল সে রথীর কাছে।"

মধুবাবুর বাসার নিকটেই একটা বেশ উঁচু ফালি জমি। সেই জমিটা এক বন্ধুর সাথে কিনে নিয়েছে মধু মুখার্জী। তার অংশে বাড়ী ওঠা শুরু হ'য়ে গিয়েছে। ইট, সুরকি, বালুর স্তূপ জমান রয়েছে। মজুররা মাথায় করে ইট এনে দিচ্ছে, মশলা মেখে দিচ্ছে রাজমিস্ত্রীকে। রাজমিস্ত্রী ইটের উপর ইট লাগিয়ে যাচ্ছে। ভিত তোলা হ'য়ে গিয়েছে। বেশ বড় বাড়ি। মধুবাবু বাড়ীর নক্সাখানা নিয়ে কনট্রাকটারকে বাড়ীর একটু অদল বদল করার পরামর্শ দিচ্ছে— 'প্ল্যান' মঞ্জুর করানর সময় গ্যারেজের কথাটা ভাবে নাই। কিন্তু সম্প্রতি নূতন আরেকটা জমি দখল করা হ'লো। সে ব্যাপারেও সেক্রেটারী তাকেই করা হ'য়েছে। কাজেই পিছন দরজা দিয়ে বেশ ভাল টাকাই হাতে আসছে। মোটর কেনা এমন কিছু অসম্ভব নয় এখন তার পক্ষে।

মধু মুখার্জীর এক বন্ধু ঠাট্টা করে, "ব্রিটিশ সার্জেণ্টের লাথি খাওয়াটা তাহ'লে সার্থকই হ'য়েছে, কি বল মধুদা।"

একে রাজবন্দীর রাজটিকা কপালে, তার উপরে উপবীত ধারী ব্রাহ্মণ। এর চাইতে বড় সার্টিফিকেট আর কি হ'তে পারে সততা সম্বন্ধে।

একজন বাস্তুত্যাগী ভদ্রলোক জমির জন্য দেখা করতে আসে মধুবাবুর কাছে। আরও দুজন জমিপ্রার্থী আগেই এসে বসে রয়েছে ঘরে। নূতন ভদ্রলোকটি একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় তার পূর্বাগতদের মুখের ছবি। তাদের মধ্যে একজনের চোখে মুখে কিছু কম হতাশা। (তার কোমরে যে ভাল অঙ্কেরই টাকা গোঁজা রয়েছে, বাকী দুজন অবশ্য তা' জানে না।)। তাদের নিরাশ্রয় ম্লান চোখের তারায় আশার জোনাকি মাঝে মাঝে জ্বলজ্বল করছে। যদি দুই কাঠা করেও জমি পাওয়া যায়!

মধুবাবু কনট্রাকটারকে গ্যারেজের 'প্লান' বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে ঢোকে। বিনীত মৃদু হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করে আগন্তুকদের। ভদ্রলোকদের দুঃখ দুর্দশার কথায় সমবেদনা ফুটে উঠে চোখে মুখে।

কিন্তু জমির কথা তুলতেই দুঃখ প্রকাশ করে বলে, "আর একদিন আগেও যদি আসতেন। এরপর যদি আবার কোনও জমি দখল করা হয়, তখন আপনাদের কথা মনে রাখবো। ঠিকানাটা রেখে যান।"

অন্ধকার হতাশ চোখে নিবু নিবু আশার কাঁপুনি। কম্পিত হাতে ঠিকানা লিখে উঠে পড়ে দুইজন। একটু নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলে যেন তৃতীয় দল—যাক্ দুইজনত কমলো। ভদ্রলোকটি এতক্ষণে আসল কথায় নেমে আসে। কিছু গোপন সেলামীও বয়ে এনেছে সে।

চোখটা একটু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে মধুবাবুর। আর এদের লোকসানই বা কি। আড়াই হাজার দামের জমি দু'শ টাকা করে পাচ্ছে। তাও কিস্তিবন্দিতে শোধ করতে হ'বে সে টাকা।

মনে মনে ভাবছে ভদ্রলোকটি, জমিটা হাতছাড়া না হ'য়ে যায়, তবেই হয়। না হ'লে এতগুলি ছেলেপুলে নিয়ে কি শেষে ঐ শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মের উদ্বাস্তুদের অবস্থাই হ'বে।

ভদ্রলোক চলে যেতেই একখানা মোটর এসে থামে দুয়ারে। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে মধুবাবু, "কি ব্যাপার সুখময়। হঠাৎ এ অভাগার দুয়ারে।"

"তোমরাই যদি অভাগা তবে ভাগ্যবান আর কারা আজকাল।" হেসে উত্তর দেয় সুখময়, "অনুযোগ দিতে পার, তা আমার প্রাপ্য বলে মাথা পেতে নেবো। কিন্তু সত্যি মরবারও ফুরসুত নেই এখন।"

মধুবাবু ঠাট্টার সুরে বলে, "মাত্র ত ইট খোলার জন্য জমি কিনেছো কয়েক বিঘা, এখনই মরবার সময় খুঁজছো?"

"ঐ জমিটি উদ্ধারের জন্যই ত তোমাব কাছে এলাম। আমার বহু আশা কল্পনা জড়িয়ে রয়েছে ঐ কয় বিঘা জমির সাথে।"

"আর বহু কালবাজারের ধূলোও নিশ্চয়।"

"সে ধূলো আজকাল কোন জিনিসে নেই বল।"

সমর্থনের প্রাণখোলা হাসি হাসে মধুবাবু।

সুখময়ের মুখে তার জমির বিস্তারিত কাহিনী শুনে, কি একটু ভেবে নিয়ে প্রশ্ন কবে মধু মুখার্জী, "কয় ঘর উঠেছে বল্লে তোমার জমিতে?"

"পঁচিশ তিরিশ ঘর। তবে ঘরও ঠিক বলা যায় না। কুঁড়ে ঘর বললেই ঠিক কাব্যিক আখ্যা দেওয়া হয়।" "কি আন্দাজ খরচ করতে পারবে?" চোখের কোণায় অর্থ ঠাসা গাম্ভীর্যময় ইঙ্গিত।

চালাক ছেলে সুখময়। বোঝে, বঁড়শির ফাৎনা নড়ে উঠেছে।

প্রিয়ার কটাক্ষে হৃদয় নাচা থেমে গিয়েছে এই বয়সেই। মারোয়ারী ব্যবসাদারের কটাক্ষে হৃদয় দোলে তার। কাজেই মানী, জ্ঞানী, গুণী মধু মুখার্জীর এহ গম্ভীর ধীব স্থির, চোখের তারকার ইঙ্গিত ধরতে না পারাব ছেলে সে নয়। এ স্থানে দরাদরি করলে নিজের প্রেস্টিজ থাকে না। তাই একবারেই বলে সে, "হাজার দুই।"

মধু মুখার্জী বলে, "আরও একটা কথা। তোমার কমুনিস্ট শ্যালকটিও কিন্তু রয়েছে ঐ জমির পিছনে।"

"তা' জানি। কিন্তু কি আর করা যাবে। সে যদি জেনে বুঝে নিজের সর্বনাশে পা দেয়।"

মধু মুখার্জী মনে মনে চিন্তা করে, সুখময়ের মত ছেলেকে দলে পেলে লাভ অনেক। কাজেই এইটুকু উপকার ত করতেই হ'বে। কালুর ওপরে সব ভার থাকবে। এ সব ব্যাপারে ওস্তাদ লোক কালু—ঘুনাক্ষরেও তার নাম প্রকাশ করবে না সে।

সুখময় উঠে পড়ে। "চলি আজ। কাজ আছে।"

রাজমিস্ত্রীদের কাজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "ইট পাচ্ছেন কত করে।"

"আশী টাকা। সিমেণ্ট ত কণ্ট্রোল দরেই পাচ্ছি। ডিটেনসন ক্যাম্পে থাকার সময় একঘরে থাকতাম এক দাদার সাথে। তার কৃপায় সিমেণ্টের জন্য ভাবনা নেই। কিন্তু ইটই শেষ করে দিল।"

"আচ্ছা ইটের ব্যবস্থা আমি করে দেবো। ফার্স্ট ক্লাস ইট পঞ্চাশে পেতে পারেন আমার কাছে। এ ত ভেজাল ইট দেখছি।"

মোটরে উঠতে উঠতে সুখময়কে স্মরণ করিয়ে দেয়, "দেখো সাবধান।"

"সে আর বলে দিতে হবে না। গভীর জলের মাছ কখনও জলের উপরে ভাসে না জানি।"

সেইদিনই কালুর সাথে দেখা করে মধুবাবু। কালু অভয় দেয়, "এত সামান্য কাজ। মাত্র পঁচিশ ঘর।"

সন্ধ্যার দিকে সোনা রিক্সা নিয়ে ফিরছে। আবছা অন্ধকারের মধ্যেও দূর থেকে লক্ষ্য করে, মধু মুখার্জী বের হ'চ্ছে কালুর ঘর থেকে। মনে মনে একটু বিস্মিত হ'য়ে রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করে।

রাস্তার মোড়ে আসতেই সোনা ডেকে বলে, "রিকসা লাগবে নাকি বাবু।"

"মেন ক্যাম্প কত নিবি ?"

"বারো আনা।"

"দিনে দুপুরে ডাকাতি করতে চাস। আট আনা পাবি চল্।"

একটু এগিয়ে এসে আরেক ভদ্রলোককে তুলে নেয় রিকসায়।

"সব ঠিক।" বলে মধু মুখার্জী।

ভদ্রলোকটি চিন্তিত সুরে উত্তর দেয়, "সবত ঠিক। কিন্তু ছাত্রদের তুমি চেন না। একটা ডাক দিলেই একসাথে পাঁচ-শ বেরিয়ে আসবে।"

"তা'তেও কিছু ভাববার নেই ও হাতে থাকতে। তাছাড়া কলোনীর মধ্যেও আমার লোক আছে।"

নীচু গলাই সব কথাবার্তা হয়। কিন্তু সোনা কান খাড়া করে রেখেছে। সব কথাই কানে আসে তার।

বাড়ী ফিরে পৃথ্বীকে জানায় সব। "আমার যেন কেমন কেমন মনে হ'চ্ছে মধুবাবুকে। কালুকে আমি ভাল করেই চিনি। ব্যাটা একটা পাকা গুণ্ডা। তার ঘরে অত বড় মানী মানুষ যান কেন।"

মধু মুখার্জীর স্বরূপ পৃথ্বী ভালভাবেই জানে। কাজেই তার গুণ্ডার বাড়ীতে যাওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নেই। বোঝে, প্রস্তুত হচ্ছে এরাও।

কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস আসছে—ভোর রাত থেকে রেকর্ড চালাতে শুরু করেছে ছেলেরা। অ্যামপ্লিফায়ারে সে সুর শীতের রাত্রিশেষের কুয়াশার পর্দায় কেঁপে কেঁপে ভেসে চলেছে যেন কোন দূর অন্তরীক্ষের আকর্ষণে।

শীতার ঘুম ভেঙে যায় রাত্রিশেষের এ সুর স্পর্শে। ঘুমভাঙা চেতনার সন্ধিক্ষণে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সুরতরঙ্গ জন্ম জন্মান্তরের বিরহগীতির মত। এক মধুর বেদনা মেশান অনুভূতির অনুরণন। ঘুম থেকে উঠে বেদনা বুলান আবেশ নিয়ে কাজ শুরু করে শীতা।

প্রমীলা টমেটো চারায় জল দিচ্ছে। মিঠুও আছে সাথে।

প্রতিবেশীদের কপি ক্ষেতের উপর শিশিরকণার হালকা আবরণ। দূর থেকে ভেসে আসা সুরলহরী যেন ঐ শিশির-সিক্ত কপিক্ষেতের উপরও ছড়িয়ে পড়ছে। মোহময় দৃষ্টিতে দেখে শীতা এই শীতের পৃথিবীকে।

পূবের রোদ লুটিয়ে পড়েছে বারান্দার মাটিতে। বিশ্বেশ্বর লাঠিতে

ভর দিয়ে দিয়ে এসে বসে বারান্দায়, রোদে। কান পেতে কি যেন লক্ষ্য করে প্রশ্ন করে, "তোর মা কার সাথে কথা বলছে রে। পৃথ্বী এসেছে নাকি ?" শীতা চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে বসেছে বারান্দায়।

তাকিয়ে দেখে, পৃথ্বীই কথা বলছে মায়ের সাথে—শীতের চাদর জড়ানো গায়ে। ঘুমভাঙা চোখে তারও যেন রাত্রির বেদনা। এ সুরস্রোত স্পর্শ করেছে হয়তো পৃথ্বীকেও।

শীতাকে ডেকে বলে, "আরও এক কাপ চা বেশী করতে হবে। তোমাদের আসরে ভাগ বসাতে এলাম।"

"বেশ করেছ, ভাল করেছ। এত কাছে থাক, যখন তখন এলেই পার। তোমার কাকীমার হাতের রান্না খেয়ে যাবে ঘরের ছেলের মত।" বলে যায় বিশ্বেশ্বর। ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়ে সকলের অলক্ষ্যে। পৃথ্বী তার কত আদরের ছাত্র। কোথায় গেল সে-সব দিন ! সেই স্কুল আর স্কুলের বোডিং বাড়ী—ছাত্রদের সেই কলধ্বনি।

প্রমীলা এগিয়ে আসে, "শুধু চা দিলি কেন ? একটু কিছু কর। একটু আটা মাখ। প্রাণভ'রে যে কিছু খাওয়াব তার সাধ্যি কি আর আছে।"

পৃথ্বী বাধা দেয়, "কিছু আর করতে হ'বে না। যদি চা খাওয়াও কাপ দুই তবেই খুশি হ'বো বেশী।"

বিশ্বেশ্বর কিছু বলে না। সংসারের ব্যাপারে কি আছে কি নাই, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার শক্তি তার নেই। তবে তার পুরানো ছাত্রদের খাওয়াতে আনন্দ পায় সে। প্রমীলার দিকে তাকিয়ে বলে, "পৃথ্বীকে আজ দুপুরে এখানে খেতে বলে দাও। তোমার হাতের রান্না কত ভালবাসতো ওরা।"

আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিশ্বেশ্বর, পৃথ্বীর লক্ষ্য এড়ায় না। বোঝে সে, স্মৃতির খুঁটি ধরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষটি—ভবিষ্যতের

সুখকল্পনাকে জড়িয়ে ধরার শক্তি আর নেই। তার পুরানো ছাত্র পৃথ্বীকেই এ অভ্যর্থনা করছে বিশ্বেশ্বর—আজকের পৃথ্বীকে নয়। বিশ্বেশ্বরের কথায় সায় দেয় প্রমীলা "তাই ভাল। দুপুরে তুমি এখানেই খাবে আজ। ডালভাতই খাবে, তবু একসাথে বসে খাওয়াই আনন্দ।" গ্রহণ না করে উপায় নেই পৃথ্বীর এ সাগ্রহ নিমন্ত্রণ। বলে সে, "আর একদিন এসে খাব। আজ ত আমি বাড়ী থাকবো না।"

পৃথ্বী চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ে পুরানো কলোনীর শেষ ওয়ার্ডে একটা ঠিকানার খোঁজে।

কয় বছর আগেও এ অঞ্চলে ধূ ধূ করতো মাঠ। তারপর গত যুদ্ধের সময় মিলিটারী ক্যাম্প উঠেছিল কিছু সেই মাঠের বুকে। আজ সেই ক্যাম্পগুলি বাস্তুহারা শিবিরে পরিণত হ'য়েছে। আর তারই সংলগ্ন আরও বহু ঘর উঠেছে। টালীর ঘরই বেশী। মাঝে মাঝে টিনের ঘর। তিন কাঠা চার কাঠা জমির উপর বাড়ী। চেরা বাঁশের সীমানা করা গৃহ প্রাঙ্গণে শীতের তরকারি প্রাণভরে গ্রহণ করছে সূর্যের উত্তাপ। অনভ্যস্ত মধ্যবিত্ত হাতে তৈয়ারী জমির বুকে মটরশুটি, টমেটো, কপি, বেগুনচারার মিঠা-সম্ভাষণ আর ঘরের চালায় লাউ শিমের সতেজ লতার নিবিড় বেষ্টন।

পৃথ্বীর লেখক দৃষ্টি প্রতিনমস্কার না জানিয়ে পারে না ঘর ভাঙা মানুষের এ জীবন সাড়াকে। মানুষের প্রাণের শিকড় আবার গজিয়ে উঠেছে ধূ ধূ করা অকর্ষিত রুক্ষ জমির বুকে।

জীবনকে আঁকড়ে ধরতে চায় মানুষ কত ঐকান্তিকভাবে।

ডালের বড়ি রোদে দিয়েছে ছোট ছোট টিনে। রোদে দেওয়া কয়লার গুল গোবরের ঘুঁটের পাশেই হলুদবর্ণ গাঁদাফুল ফুটে রয়েছে অজস্র। লাউশিমের লতায় লতায়, বিলিতি বেগুনের চারায়, স্তবকিত কলাবতী ফুলের এই বিচিত্র বর্ণ শোভায় আর তারই পাশে

রোদে দেওয়া ডালের বড়িতে গুনগুন করছে একই মর্মকথা—সর্বহারা মানুষ, কিন্তু "জীবনের পরমলগ্নকে" বয়ে যেতে দিতে যায় না তারা। পৃথ্বী কান পেতে গ্রহণ করে যেন সর্বলুণ্ঠিত মানুষের এ নিঃশব্দ আশার গুঞ্জন—"এই পৃথিবীকে ভোগ করতে চাই—এই পৃথিবীরই আলো বাতাস মাটি আর মাটির সম্পদ।"

শুধু ভিটা হারা পূর্ববঙ্গের মানুষেরই হৃৎপিণ্ডের সংঘবাণী নয় এ—সমস্ত পৃথিবীব্যাপীই গৃহহারা মানুষের প্রাণস্পন্দনে বয়ে চলেছে এই জীবনপিপাসা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই পৃথিবীরই মাটিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে মানুষ।

ঝাবি দিয়ে জল ঢালছে গাছে বছর কুড়ি বয়সের একটি বৌ। আবার নূতন করে ঘর সাজাবার আগ্রহ জমে উঠেছে বহুদুঃখের কালিপড়া চোখের তলায়। নিরাভরণা অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের কান্না তবু স্বপ্ন মিলিয়ে যায়নি। ঘর বাঁধবার কত কামনা!

জীবনকে কত গভীরভাবে ভালবাসে মানুষ তা' উপলব্ধি করে পৃথ্বী, প্রতি পদক্ষেপে।

মাটিকে আশ্রয় করেই বেঁচে ছিল এই পদ্মা মেঘনার মানুষ। নিজের হাতে জমি তৈয়ার করে, বীজ বোনে, গাছ লাগায়—তারপর সে বীজথেকে মাটি চিরে অঙ্কুর গজায়, ফুল ধরে, ফল ধরে। মাটির সাথেই মেশান তাদের জীবনের অনুভূতি। শস্যক্ষেতের শ্যামলতায় জীবনের রোমাঞ্চ। সে মাটি থেকেই ছিনিয়ে আনা হয়েছে আজ তাদের আত্মাকে। মায়ের বুক থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নেওয়ার মতই আর্ত ক্রন্দনরোল উঠেছে তাই শিয়ালদহ স্টেশনে। ভারী হ'য়ে উঠেছে নগরী।

"পৃথ্বীদা, ও পৃথ্বীদা।" এত খুশি হয়ে কে ডাকছে তাকে? তাকিয়ে দেখে, ঊর্মি দাঁড়িয়ে আছে কালিমাখা হাতে, এক টালির

ঘরের সামনে। মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হ'য়ে পড়ে পৃথ্বী, রথীর বোন, উর্মিকেও আশ্রয় নিতে হ'য়েছে বাস্তুহারা কলোনীতে! রোজ সকালে একটি গানের স্বর-সাধা মেয়ে উর্মিও কয়লার গুল দিতে বসেছে এ শীতের সকালে!

এক ঝলক রোদের মত প্রসন্ন অভ্যর্থনা ফুটে উঠে উর্মির হাসিভরা চোখেমুখে।

"এত জোরে ডাকছি তাও শুনতে পাচ্ছেন না।"

পৃথ্বী বাঁশের গেট ঠেলে ভেতরে ঢোকে। ছোট একটি ছেলে দৌড়ে ঘর থেকে একটা মোড়া এনে দেয় বসতে। অনুমানেই বোঝে, উর্মিরই ছেলে। বছর সাতেক বয়স। "কি নাম তোমার?"

"ভাস্কর।"

"লাল ভাস্কর ত?" মৃদুহাস্যে প্রশ্ন করে পৃথ্বী।

"প্রাণের তাগিদেই লাল না হ'য়ে উপায় নেই আর", হেসে জবাব দেয় উর্মি, "দেখছেন না, কেমন আছি। মনে হয় এই বয়সেই বানপ্রস্থ ধরেছি।"

"কেন বেশ ত রয়েছ। দিব্যি মটরশুঁটি হ'য়েছে ক্ষেতে। চায়ের সাথে মটরশুঁটির কচুরি। খারাপ কি?" ইচ্ছে করেই নাড়া দিতে চায় একটু পৃথ্বী।

"লাউ শিম মটরশুঁটি বুনেই যদি জীবনের সব ক্ষুধা মেটান যেত তা'হলে নিশ্চয়ই খারাপ নয়। কিন্তু জীবনের ক্ষুধা দূরেব কথা পেটের ক্ষুধাও মেটে না এতে।"

উর্মি হাত ধুয়ে চা করে আনে, "শুধু চাই দিলাম পৃথ্বীদা। এত দিন পর দেখা, একটু মিষ্টিমুখও করাতে পারলাম না।" একটু থেমে আবার বলে—"মটরশুঁটির কচুরি বানান ভুলেই গেছি মনে হয়, তবে মটর শাকের ঝোল দিয়ে যদি খেয়ে যান দুপুরে—খুব খু'শি হ'তাম।"

জিজ্ঞাসাভরা চোখে তাকায় ঊর্মি।

সেই একই দরদ আন্তরিক সুরে। গ্রহণ না করে পারে না পৃথ্বী এ অভ্যর্থনাও। "তোমার সাথে দেখা হ'ল এতদিন পর, এর চাইতে বেশী মিষ্টি মুখ আর কি হ'ত?" সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলে পৃথ্বী, "আরেকদিন এসে খেয়ে যাব তোমার ক্ষেতের মোটর শাক।" তারপর প্রশ্ন করে, "কল্যাণ কোথায় কাজ করছে এখন?"

"পত্রিকা অফিসে একটা কাজ পাওয়া গেছে, তাই ত কোন মতে বেঁচে আছি।"

একটু চুপ করে' থেকে আবার বলে ঊর্মি, "মাউন্ট্‌ ব্যাটন রোয়েদাদের ফলে দেশের বাড়ীত গেছেই। শহরেও যে জমিটা বাবা দিয়েছিলেন, সেখানেও একখানা বাড়ী করেছিলাম। শখ করে কত ফুলগাছ লাগিয়েছিলাম আমি নিজ হাতে। চন্দ্রমল্লিকা দিয়ে ভরা থাকতো বাগান এ সময়ে।"

"সে বাড়ীও বুঝি দখল করে নিয়েছে।"

"তা'হলেও ত তবু আশা থাকতো। পুড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ী ছিল কাঠের—বাংলো ধরনের। ফুলগাছগুলির জন্য দুঃখ হয়। এখানেও ফুলগাছ লাগিয়েছি। রক্তকরবীর ডাল পুঁতেছি। ঠাট্টা করবেন নিশ্চয়ই আপনারা।"

"জমি তৈয়ার করে নাও আগে।" দ্ব্যর্থ সুরে বলে পৃথ্বী।

ঊর্মি লক্ষ্য করে না পৃথ্বীর কথার অর্থ। সে বলে, "এ ধরনের জীবনের জন্য ত প্রস্তুত ছিলাম না, পৃথ্বীদা। একটুও ভাল লাগে না।"

কুণ্ঠিত হাসির তলায় ছলছল করে উঠে একখানা নীড় ভাঙা মন। ঊর্মি বলে যায়, "বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, কি সুন্দর ছবির মতো সাজান ঘরবাড়ী। কিন্তু বাস করতে মোটেই

সুন্দর নয়। এক বালতি জলের জন্য এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় টিউওবওয়েলের ধারে। তাও সহ্য করা সম্ভব—কিন্তু তার উপর যখন মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়া শুরু হ'য়ে যায়, এক বালতি জলের জন্য মেয়েদের চোখমুখও যে কত হিংস্র হ'য়ে উঠতে পারে, তা আপনারা ধারণা করতে পারবেন না। কিন্তু দোষও দেওয়া যায় না। বাস্তুহারা মানুষের জীবন-সংগ্রামের কথা বুঝবে একমাত্র বাস্তুহারারাই।"

নিঃশব্দে শোনে পৃথ্বী, এক সৌন্দর্যানুরাগী মেয়ের সঙ্গীতের তাল কেটে যাওয়া বেসুরা জীবনের সুর। রক্ত করবীর ডাল পুঁতেছে যে মেয়ে এই বাস্তুহারা শিবিরেরও গৃহ-আঙ্গিনায়, তার পক্ষে এক বালতি জলের অপেক্ষায় অসহিষ্ণু মেয়েদের ক্রোধ-কটাক্ষকে সহনীয় করে নেওয়া সহজ নয়।

তোমার মত মেয়ের জন্য আজকের পৃথিবী নয়। মনে মনে বলে পৃথ্বী—'তোমার সন্তানদের জন্যই তৈয়ার কর এ পৃথিবীকে। রক্তকরবীর ডালে ডালে ফুটে উঠবে ফুল একদিন, ঠিকই। কিন্তু আজ তার শিকড় গাড়ার জন্য জমি তৈয়ার কর। না হ'লে এ রক্তকরবীও যে সেই চন্দ্রমল্লিকার মত একই বর্বরতার আগুনে ঝলসে পুড়ে যাবে।'

"জমি তৈয়ার কর আগে।" আবারও বলে পৃথ্বী। কথার অর্থ লক্ষ্য করে উর্মি। উত্তর দেয় সে, "ঠিকই বলেছেন। এতদিন বৃথাই অনেক ফুলচারা লাগিয়েছি কিন্তু জমি তৈয়ার করাটাই সে সব চাইতে শক্ত কাজ। এবার আপনাদের কাছে শিখবো সে কাজ। তাইতো বলছিলাম—প্রাণের তাগিদেই লাল না হ'য়ে উপায় আছে?"

পৃথ্বী উঠে পড়ে, "চলি আজ। বাড়ীটা যখন চেনা রইল, আসবো নিশ্চয়ই। আর রথীটাও এমন হতচ্ছাড়া, তোমরা যে এখানে রয়েছ বলেনি একদিনও।"

"সে নিজেও কি আর আসে নাকি। বৌদির সাথে বিচ্ছেদ হওয়ার পর আর দেখা করে নি।"

সাগরীর প্রসঙ্গে ম্লানছায়া ঘনিয়ে আসে দুজনেরই চোখের তারায়। কিন্তু এ নিয়ে কথা বলে না কেউই।

পৃথ্বী উঠবার আগেই এক আধা বয়সী স্ত্রীলোক গালাগালি দিতে দিতে উর্মির দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। আধা-ময়লা কাপড় পরা, হাতে মোটা মোটা শাঁখা।

উর্মিই এ আক্রমণের লক্ষ্য। অভিযোগ, তার কুড়ানো গোবর এ বাড়ীতে নিয়ে আসা হ'য়েছে।

একটানা বলেই চলেছে সে, "সেই ভোরে উইঠা গোবরগুলি আমি ভুর দিয়া রাখছি। ভদ্রলোকের বেশ পইরা থাকলেই ভদ্রলোক হয় না। একটা সামান্য জিনিস গরুর গোবর। আই, আই, কি ঘিন্নার কথা। গোবর পর্যন্ত চুরি করা আরম্ভ হইছে। তাও আবার ভদ্রলোকের বাড়ীতে।"

অদূরেই একচাপ গোবর পড়ে রয়েছে কয়লায় গুল দেবার অপেক্ষায়।

উর্মির মুখের উপর যেন এক পোঁচ কালি ঢেলে দিয়েছে এ অদ্ভুত আক্রমণে। বিশেষ করে পৃথ্বীর সামনে এমন একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে বকেই চলেছে তাকে, এ নিয়ে উত্তর দিতেও লজ্জা করছে। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "আমিত এ সব কিছু জানি না। আমাদের ঠিকে ঝিটিকে পয়সা দেই, সেই গোবর কুড়িয়ে এনে দেয়। তা' আপনি নিয়ে যান গোবরগুলি।" এ উত্তর আশা করে আসে নি সে। তবু হার মানা চলে না—হ'লই বা শিক্ষিত। ভিটা-ত্যাগীদের এ জোয়ারে শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব এক নদীর জলে মিশে গিয়েছে। বাঁকা চোখে কিছু তেতো হাসি মিশিয়ে বলতে বলতে চলে যায় সে গোবরগুলি তুলে নিয়ে। "হাই জানি, হুই জানি, গৃহস্থ

পাতানের নাম না জানি। এদিকে ত বিবিটি সাইজা থাকন হয়

লজ্জায় আর অপমানে উর্মি তাকাতে পারছে না যেন পৃথ্বীর দিকে। পৃথ্বী বোঝে ওর মনের অবস্থা। তাই স্মিতকণ্ঠে বলে, "সব হারানোর ব্যথায় এমন হিংস্র হ'য়ে উঠেছে ওরা।"

"আপনি জানেন না, পৃথ্বীদা, কিভাবে দিন কাটাচ্ছি। প্রতিদিন এ ধরনের জঘন্য আক্রমণ সহ্য করছি মুখ বুঁজে। এত হীন আক্রমণ যে তার উত্তর দিতেও রুচিতে বাধে। এ দিনের কি আর শেষ হ'বে না, পৃথ্বীদা।" আকুল মিনতি স্বরে।

পৃথ্বী মনে মনে বলে 'দেরি আছে, বহু দেরি—'। স্নেহের সুরে বলে "একটা জিনিস বুঝতে পারছ না কেন? এত সর্বস্বান্ত মানুষের ভিতরে দেবত্ব আশা করা যায় না। ঠকে ঠকে এরা মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। তাই সন্দেহের বিভীষিকায় এদের দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে গেছে।"

পৃথ্বী বেরিয়ে পড়ে। মনে মনে আওড়ায় উর্মির কথাটা, "এবার আপনাদের কাছেই শিখবো জমি তৈয়ার করার কাজ।" বরং অনাবাদী জমিতে বীজ বুনতে গিয়ে ফসল ত হারিয়েছিই, জমি পর্যন্ত নষ্ট করেছি আমরা। রব উঠেছে সংগ্রাম আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে, প্রস্তুতির জন্য আর অপেক্ষা করার দরকার নেই--সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই একমাত্র পথ, সে পথেই সব সমস্যার সমাধান এনে দেবে। মানুষের জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন যে সংগ্রাম, সে সংগ্রাম আমাদের জন্য নয়—একথাটা ভুলে গেছে আজ কমরেডরা। তার ফলে মাৎস্যন্যায়ের মত স্বার্থান্বেষীরা এসে গ্রাস করছে সাধারণ মানুষকে। তাই তারা কোন পতাকার তলে মাথা গুঁজবে, ঠিক পাচ্ছে না।

অপ্রশস্ত রাস্তার বুক কাঁপিয়ে ইঁট সুরকি বোঝাই লরীর পর লরী ছুটে চলেছে। পৃথ্বী একটু সরে দাঁড়ায়। খোলা মাঠের বুকে বাঁশের

স্তূপ, টালির স্তূপ। দুইধারে দোকানের সারি। কাঠের দোকানে জানলা দরজা, কড়ি বরগা, ছোট ছোট আসবাবপত্র। ডালা, কুলো মাটির হাঁড়ি কলসী, চিত্রিকরা সরা ঘট।

মনে মনে ভাবে পৃথ্বী, এই সংগ্রামী জীবনের পাশে পাশেই বয়ে চলেছে কাল বাজারের দূষিত নিঃশ্বাস। "কাল" ব্যবসায়ীরা নিঃশব্দ সরীসৃপের মত চোরাপথে প্রবেশ করে' তাদের বিষ দাঁতের কামড় বসাচ্ছে এই পথেবসা মানুষের বুকে।

এদের ঘর পুড়িয়েছে, ভিটা ছাড়িয়েছে, স্ত্রী-পুত্র কন্যার বুকে ছুরি বসিয়েছে। তবু রেহাই নেই। ব্যাঙ্কের খাতায় অঙ্কের গায়ে শূন্যের পিঠে শূন্য বসিয়ে চলেছে এরা মানুষকে শূন্য করে। শুধু ব্যাঙ্কের কাগজেই সীমাবদ্ধ নয় এদের বিষদন্তলালসা। রাজনীতিতেও চোরাপথ ধরেছে—বিভ্রান্ত করছে গৃহ-কামী মানুষকে।

এ বিভ্রান্তির আবরণ থেকে দৃষ্টিদান করার দায়িত্ব ছিল যাদের, তারাও ত আজ শুধু পথভ্রষ্ট করছে এদের গণচেতনাকে। পতঙ্গের মত আগুনের শিখা দিয়ে প্রলুব্ধই করছে শুধু।

চিন্তাস্রোত কেটে যায় কার এক পরিচিত ডাকে। একজন পরিচিত কমরেড। গত দুবছর বহুবার তার সাথে দেখা, কিন্তু কথা বলে নাই এই অজিতবাবু পৃথ্বীর সাথে।

একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে। ডেকে বলে, "কি পৃথ্বীবাবু, কথাই যে আর বলেন না।"

"কথা বলি না না, কথার জবাব পাই না।" পৃথ্বীও দোকানের ভিতরে ঢুকে বসে। বাঁশের বেড়া-দেওয়া কাঠের পাটাতন করা মেঝের উপর একটি কেরোসিন কাঠের টেবিল। একধারে একখানা বেঞ্চি, আরেক দিকে দুটো লোহার চেয়ার। বাইরে দোকানের সংলগ্ন একটা চুলাতে চায়ের জল ফুটছে। একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক বসে

বসে চা তৈয়ার করছে এক অভিনব কায়দায়। স্ত্রীলোকটির কাপড় পরার ধরন দেখেই বোঝে, পূর্ববঙ্গের লোক। যুগের চাকার সাথেই জড়িত এই ক্ষুদ্র চায়ের দোকানও। তাই ঢেঁকিতে ধান বানা, চিরা কোটা, ঝাঁজুর ছাপনিতে মুড়ি ভাজা, গৃহস্থ মায়েরাও আজ চায়ের দোকানে বসে চা তৈয়ারি করছে ছেলের সাথে—খোলা রাস্তার মাথায়। বার তের বছরের একটি ছেলে কাঁচের গ্লাসে চা রেখে যায় টেবিলে।

গা-ঢাকা অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বসন্ত। এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে।

পার্শ্বনাথের জমির পাশ দিয়ে চলেছে। উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে দেখে, এখনও কাটা হয়নি ধান। ধান কাটার সময় হ'য়ে গিয়েছে।

ক্ষেতি-খামারের দিকে আর সে মনই নেই পার্শ্বের। আর তারওত এই একই অবস্থা—ঘর সংসার দেখার কি আর উপায় আছে। কোথায় লুকিয়ে রয়েছে কে জানে। বুড়ো বাপটাকে কেই বা চারটি ভাত ফুটিয়ে দিচ্ছে। বাতাসীর মুখখানা বুকের ভিতরে আকুলি বিকুলি করে।

বুক ঢেলে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কত আশা নিয়ে নেমে এসেছিল তারা জমির লড়াইয়ে। স্বপ্নের মত ভাসে চোখে সে-সব দিনের ছবি। লাল ঝাণ্ডার সেই দীর্ঘ মিছিল। পুলিশ দারোগারা তখন তাদেরই ভয়ে তটস্থ। কিন্তু আজ বুকের পাঁজরের সে জোরই যেন ভেঙে গিয়েছে।

নিজের ঘর, নিজের বাড়ী, তাও একরাত কাটাবার উপায় নেই ঘরে। চৌকিদার এসে শাসিয়ে গিয়েছে, তাকে না পেলে গরু মোষগুলি নিয়ে যাবে।

একটা জঙ্গলের আড়াল পথে নেমে যায় বসন্ত। বোনের শ্বশুর বাড়ী চলেছে। কয়টা দিন যদি সেখানে থাকা যায়। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে

সে গ্রামের সীমানা—তালগাছের মাথাগুলি। গরু বাছুর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে এক রাখাল। তার নিজের গরু বাছুরগুলিকে কতদিন দেখে না সে। সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে দেখে ঘরে-ফেরা গরুগুলিকে।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। দূর থেকে আজানের সুর ভেসে আসছে। শাঁখ বাজছে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে। এক বাড়ীর পেছন দিয়ে হেঁটে চলেছে বসন্ত। বাড়ীর উঠোনে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিচ্ছে ঘরের বৌ। নিজের অজান্তে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। পুত্রবধূর মুখখানা মনে পড়ে।

হাট থেকে বাড়ী ফিরছে পাঠশালার মাস্টার। বসন্ত ডেকে জিজ্ঞেস করে, "খবর কি সব? হারাণের খবর কিছু পেলে?" "সেইজন্যই ত দেরি। হাটে এক কমরেডের কাছে শুনলাম হারাণের চিঠি এসেছে। তাই গিয়েছিলাম তার মায়ের কাছে। গিয়ে শুনি হারাণের মা আবার আমার বাড়ীতে এসে বসে রয়েছে। যাই দেখি, কি সংবাদ এসেছে।" "খবরটা আমাকেও একটু জানিয়ে যেও। আজকের রাতটা ত তোমাদের কাছেই থাকছি।"

চিঠিখানা আঁচলের খুঁট থেকে বের করে হারাণের মা। ঘরে পুরুষ কেউ নেই। দু দুটো ছেলেই জেলে। ধারে কাছের সব বাড়ীতে ঐ দশা। জুয়ান ছেলেগুলি জেলে। কবে যে খালাস পাবে তারা, কবে যে ভিটা মাটি, ছেলে, বৌয়ের মুখ দেখবে! যারা পালিয়ে পালিয়ে ঘুরছে, দিনের মধ্যে কয়বার এসে চৌকিদার ঘুরে যাচ্ছে তাদের খোঁজে। ঘরে ঘরে শুধু মেয়ে মানুষ। লেখাপড়া কি কেউ জানে। চিঠিখানা পড়ানর জন্য তাই এই এক ক্রোশপথ ভেঙে ছুটে এসেছে হারাণের শ্বশুরের কাছে। পেছন পেছন বড় নাতনী ফুলটুসীও এসেছে। বাপের বড় আদরের মেয়ে। বাপের জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে।

অতি যত্নে চিঠির ভাঁজ খুলে ধরে বৃদ্ধা। এ-ঘর, ও-ঘর থেকে আরও দু'চারজন এসে বসে।

"জেল থেকে চিঠি পাঠিয়েছে হারাণ? কি লেখেছে গো মাস্টার? ভাল আছে ত?" মাস্টারের বড় জামাই হারাণ।

হারাণের শাশুড়ী কেরোসিনের ডিবাটা নিয়ে এসে বসে সামনে "জোরে জোরে পড় দেখি চিঠিখানা।"

চাষীর হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষর। মাষ্টার পড়ে শুনায়: "শ্রী শ্রী হরি সহায়। শতকোটি প্রণাম পূর্বক নিবেদন এই—"

"তাহ'লে চিঠিপত্র লিখা চলে?" প্রশ্ন করে হারাণের খুড়শ্বশুর।

"লেখা কি আর চলে? লুকিয়ে লেখা। শুনলে না, লিখেছে এক কমরেডের দয়ায় এ চিঠি পাঠানর ব্যবস্থা হয়েছে।"

"ঐ জায়গাটা আবার একটু পড় ত বেয়াই. ঐ জামিনে খালাস করার কথাটা।"চোখ মুছে বলে হারাণের বুড়ীমা।

আবার পড়ে শুনায় মাষ্টার, "ঘটি বাটি বন্ধক রাখিয়াও যেমন করিয়া পারেন আমাদের জামিনে খালাস করার ব্যবস্থা করিবেন। চাষ আবাদের সময়ও যদি এভাবে আটক থাকিতে হয়, তবে সারা বছরের কি উপায় হইবে? চাষ আবাদের জন্যই বড় দুশ্চিন্তায় কাটাইতেছি। চাষের চিন্তায় ঘুম নাই চোখে। টুসী মা কেমন আছে? তার জন্য বড় পরাণ পোড়ে······"

দুই চোখ জলে ভ'রে উঠে বৃদ্ধার। পরাণ আর পুড়বে না! সন্তানের জ্বালা যে কি জিনিস!

কেরোসিনের আলোতে স্পষ্ট হ'য়ে উঠে উদ্বিগ্ন মুখগুলি।

"একটা ব্যবস্থা করাই দরকার। একবার সদরে গেলে পার মাষ্টার। কোনও মোক্তারকে ধরে কয়ে যদি রাজী করান যায় জামিন হ'তে।"

হারাণের খুড়শ্বশুরের ঘরে এক কুটুম এসেছে মাতলা থেকে।

তারও শালা জেলে। উঠে এসে বসে সে দাওয়ায়। বলে, "মোক্তারদের জামিন করিয়েও নিশ্চিন্তি নেই। ঐ ত আমার শালার জামিন হ'য়েছিল এক মোক্তার। দর, দস্তুর, অনুনয় বিনয় করে দুই কুড়ি টাকাতে রাজী হয় জামিন হ'তে। কিন্তু এক তারিখ ঘুরে যেতেই আবার টাকা চায়। বলে আরও বিশ টাকা না দিলে জামিন ছেড়ে দেবে। টাকা ছাড়াও এক কুড়ি হাঁসের ডিম দিয়ে এসেছে। তাছাড়া আজ লাউ, কাল কুমড়ো এ ত যতবার যাচ্ছে, দিয়ে আসছে আমার বড় শালা। তা'তে ও কি তাদের মেজাজ খুশি করা যায়? বলে দিয়েছে, 'মাছ নিয়ে আসবি—পুকুরের মাছ।' কখন হুকুম হ'বে, 'গুড় নিয়ে আসবি—নূতন খেজুরে গুড়।' ভদ্রলোক হ'লে কি হ'বে, শকুনের আত্মা চামড়ার নীচে।"

চিন্তিত সুরে বলে মাস্টার, "একশো টাকার জামিন লাগবে দুজনকে ছাড়াতে। এত টাকা যোগাড় করাও ত সোজা নয়। চাষীর ঘরে টাকাই যদি থাকবে, তবে আর, তারা গোলা ভাঙতে যাবে কেন।"

বাড়ী এসে বহু পুরানো এক পোর্টম্যান টেনে বের করে হারাণের মা মাচার উপর থেকে। এক রাশ পুরানো কাঁথা, কতকগুলি পাড়-জোড়া দেওয়া বালিশ ঢাকনি আর খান দুই কাঁসার বাসন বের হয়।

আপন মনে বির বির করে সে, "ঘটি বাটি বন্ধক দিয়ে টাকার ব্যবস্থা করতে লিখছে ছেলে আমার। যেন কত কাঁসা পেতল থৈ থৈ করছে ঘরে।" কাঁথাগুলির তলা থেকে একটা পুটলি বের করে। পুটলিটা খুলে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে বুড়ী। একছড়া রূপোর কোমর বিছা। হারাণের বাপ কিনে দিয়েছিল হারাণ যখন সবে হাঁটতে শিখেছে। গত অকালেও বিক্রি করেনি সে এ অমূল্য ধন। যেন কত লুকান দৌলত খুলে বসেছে, এমনি ভাবে অতি সন্তর্পণে বেঁধে রাখে পুটলিটা।

মাচি থেকে নেমে হঠাৎ কার উদ্দেশ্যে গালি দিতে থাকে বুড়ী, "নির্বংশ হবে। ওদের সবগুষ্টি নির্বংশ হবে।"

পরের দিন ভোরে উঠেই ছোট বৌকে ডেকে বলে, "নাও, থালা গেলাস কয়টা মেজে নিয়ে এসো। প্রাণে বেঁচে থাকলে থালা গেলাস ছাড়িয়ে আনা যাবে। আগে ঐ পেটের শত্তুর দুটোকে ত ছাড়িয়ে আনি।"

"বৃন্দাবনীখানাও নেবেন।" মৃদু আপত্তির সুরে বলে ছোটবৌ। তার মরা মায়ের স্মৃতিচিহ্ন।

বুড়ী ঝাঁঝিয়ে উঠে, "না নিলে চলবে কেন। দু এক টাকা হ'লে অমনি ধার চাওয়া যায়। এতগুলি টাকা কি অমনি অমনি ধার দেবে কেউ আমাদের মত চাষাভুষার ঘরে?"

বড় নাতনীকে ডেকে বলে, "কই টুসী এই কলসীটা নিয়ে চল দেখি আমার সাথে।" রূপোর বিছাছড়া শক্ত করে বেঁধে নেয় আঁচলে।

মহেন্দ্রের বড় ভাই মহেশের সাথে আলীপুর আদালতে আসে মাস্টার। এক রকম সব কিছুই বন্ধক রেখে অর্দ্ধেক টাকার যোগাড় করেছে সে। এমন কি ঢেঁকি-ঘরের টিন কখানাও। বাকী অর্দ্ধেক টাকা যোগাড় করছে হারাণের মা।

এক কমরেড তদারক করছে সব। তাদের বসিয়ে রেখে উকিলের সাথে কি পরামর্শ করতে গিয়েছে ভিতরে।

আদালতের ঘেরাও করা মাঠ। গিজ গিজ করছে লোক—বাদী ফরিয়াদীর ভিড়। চোর, ডাকাত, খুনী, বাটপার, ভদ্রলোক, ছোট লোক সব রকমেরই আসামীর আত্মীয় স্বজন ছেলে, বুড়ো মেয়েতে ভরা মাঠটা

ধুধু-করা মাঠে লাঙ্গল চষা গ্রামের চাষী আদালতের এই পিয়ন উকিল মোক্তারের কর্ম চাঞ্চল্যে কেমন যেন খেই-হারা হ'য়ে যায়।

একটা গাছতলায় এক ঠোঙ্গা জিলিপী নিয়ে বসে রয়েছে এক বুড়ী। ছেলের সাথে দেখা হবার আশায় এসেছে। চোখের কোটরে বিদীর্ণ ব্যাকুলতা।

মহেশ একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "এসব দিতে দেবে ?"

"কেন, হাকিম মোক্তারদের কি ছেলেপুলে নেই। মায়ের হাতের খাবার ফিরিয়ে নিতে কেমন লাগে, বুঝবে না তারা।" খোঁজ নিয়ে শোনে মহেশ, বুড়ীর ছেলেও লাল ঝাণ্ডারই লোক। জুতোর কারখানায় কাজ করতো।

কথাটা শুনে বুড়ীকে যেন আপন আত্মীয়ের মত মনে হয় মহেশের। লাল ঝাণ্ডার আসামী ওর ছেলে!

একটি বৌ কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসে কোর্ট থেকে। সঙ্গের পুরুষটির কাছে জিজ্ঞেস করে মহেশ "কি হ'য়েছে ?"

"ফাঁসির হুকুম।"

"কার ?" চমকে প্রশ্ন করে।

"ওর স্বামীর।"

হাত পা যেন অবশ হ'য়ে আসে মহেশের। ফাঁসি! কথাটা শুনতেই শির শির করে বুকের ভিতরে। মহেন্দ্রর মুখখানা ভাসে চোখে। সোমত্ত বৌটা ঘরে। এই সেইদিন বিয়ে দিয়েছে ভাইয়ের।

হঠাৎ চাঞ্চল্য ছাড়িয়ে পড়ে সারা প্রাঙ্গণে। সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে পুলিস পল্টনরা।

রাণীর চরের কৃষক আসামীদের আনা হ'চ্ছে। সসম্ভ্রম গুঞ্জন।

বুকের ভিতরে ঢিব ঢিব করে মাস্টারের। হাত পা যেন আটকে দিয়েছে কে মাটির সাথে, চোখের পাতা নড়ে না। তার স্তব্ধ চোখের

সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছে তাদেরই আশে পাশের গ্রামের চাষীরা —কোমরে দড়ি বাঁধা, জোড়ায় জোড়ায় হাতে শিকল।

হারাণরা দুভাইও রয়েছে সাথে।

সারাদিন ঘুরছে পৃথ্বী মামুদপুর মামলার আসামীদের জন্য টাকা সংগ্রহ করতে। দশহাজার টাকা তুলে দিতে হ'বে তিনদিনের মধ্যে। পাকিস্তান থেকে আত্মগোপন করে পালিয়ে এসেছে নিখিলেশ এ টাকা সংগ্রহ করতে। একটা ডিফেন্স কমিটিও গঠন করতে হ'বে।

পার্বতীসহ সতের জন কৃষকের বিরুদ্ধে মামুদপুর থানার দারোগা হত্যার মামলা চলছে।

নিখিলেশের মুখেই শোনে, প্রায় দুইমাস আগে পার্বতী ধরা পড়ে একেবারে ভিন্ন এলাকা হ'তে। একেবারেই সাজান কেস। এতদিন পর তাদের কোর্টে হাজির করা হয়েছে।

সমস্ত কাজের ভিতরে পৃথ্বীর মাথায় ঘুরছে পার্বতীর জবানবন্দী। আজই পত্রিকায় বেরিয়েছে তার উপর অকথ্য অত্যাচারের বিবরণ।

গলিত অগ্নিস্রোতের মত প্রতিহিংসার লাভাস্রোত ধাবিত হ'চ্ছে পৃথ্বীর মস্তিষ্কের শিরা উপশিরায়।

শীতের রাত্রিতে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে লোহার পেরেক ঢুকিয়েছে সর্বাঙ্গে। তা'তেও চরিতার্থ হয় নাই সরকারের জিঘাংসা। হাত-পা বেঁধে কনেষ্টবল দিয়ে পাশবিক অত্যাচার করিয়েছে তার উপর।

এরই নাম গণতান্ত্রিক শাসন! অগ্নিস্রাবের মত জ্ব'লছে সর্বাঙ্গে। পার্বতীর জবানবন্দীর প্রতিটি অক্ষর সর্পদংশনের মতন বিষ ঢেলে দিয়েছে পৃথ্বীর রোম কূপে রোম কূপে।

জীবনে ভুলতে পারবে না মানুষ সর্পদংশনের মত এ লাইনগুলি—

"Then they pushed hot eggs one after another into my…"

নারীত্বের এ অপমানে প্রতিশোধোন্মুখ মন স্ফীত হ'য়ে উঠে বারে বারে। "উঃ! কি ভীষণ অত্যাচার।" মনে মনে গর্জে উঠে পৃথ্বী। "এ অত্যাচারের উত্তর আসবে একদিন এ দেশেরই মানুষের কাছ থেকে।"

কোর্টের উকিল মোক্তাররা অপমানে লজ্জায় মুখ নীচু করেছে পার্বতীর এ জবানবন্দী শুনে। সভ্য সমাজের মুখেই কালী ঢেলেছে এ বে-আইনী অত্যাচার।

ছেলে কোলে মিঠুর ছোটমার সেই পার্কে-বসা প্রথম দেখা ছবিটা বারে বারে স্পর্শ করছে পৃথ্বীকে। সেই স্নিগ্ধ কমনীয় শ্রীর আড়ালে এই অনমনীয় দৃঢ়তা কোথায় লুকিয়ে ছিল।

মিঠুর হাত ধরে চলেছে শীতা; রাস্তার বুকে ছায়া পড়েছে দু'জনের। ছোটবড় দুইটি ছায়া। এক স্পষ্ট জীবনানুভূতি জড়িয়ে রয়েছে যেন ঐ নিঃশব্দ সঞ্চারী ছায়া দুইটির মাঝে। দৃশ্যমান লোকালয়ের অন্তঃরালে এক অবিচ্ছেদ্য জীবনের গ্রন্থিজাল রচনা করতে করতে এগিয়ে চলেছে তারা সম্মুখে।

স্নেহমথিত অনুভূতি জমাট বেঁধে উঠে মনের তলায়—এই ছোট্ট শিশুটি একান্ত নির্ভরে তারই হাতখানার আশ্রয়ে এগিয়ে চলেছে। অসহায় শিশুর নিরাপত্তার এই যে আশ্বাস, এই ত একমাত্র জীবন প্রেরণা তার। অনুভব করছে বেঁচে থাকার তাগিদ, এই সন্তানদের বাঁচাবার জন্য। মনটা ব্যথিয়ে উঠে শীতার। এমন দেবশিশুর মত সুন্দর সরল শিশুদের চলার পথও আর আজ নির্বিঘ্ন নয়। লাখে লাখে বোমারু প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে এদের মাথার উপরে। আগুন ঢেলে দেবে যে কোনও মুহূর্তে।

ব্যথাতুর চোখে রাস্তার দুইধারে তাকিয়ে দেখে শীতা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ধূলোকাদা মেখে খেলা করছে।

এদের নিরাপদ জীবনের জন্যই ত নওজোয়ানরা বেরিয়ে এসেছে সংগ্রামের ডাকে। সংগ্রামের ডাক নয়। জীবনেরই ডাক এযে। তাই বেরিয়ে এসেছে শান্তিবাদী, দুঃখবাদী মানুষও। বেরিয়ে আসতে হ'য়েছে এ ডাকে আত্মবিমুগ্ধ মানুষকেও। এ ভাঙা-মন নিয়ে সেও ত বেরিয়েছে একই জীবনসংগ্রামে। এক বন্ধুর বাড়ী চলেছে সে মামুদপুর মামলার জন্য চাদা চাইতে।

বড় বড় গাছের শাখা প্রশাখার ছায়ায় ছায়ায় মসৃণ পিচের রাস্তা। দুইধারে চিত্রতারকা ও ধনী ব্যাবসাদারদের অট্টালিকার সারি। মাঝে মাঝে আমেরিকান স্থাপত্য পরিচয়।

বাড়ীর সংলগ্ন ফুল বাগিচায় মরসুমী ফুলের বাহার। বিধাতার অকৃপণ আশীর্বাদ সবটুকু নিঃশেষে ঝরে পড়ছে যেন ডালিয়া সুইটপি আর ক্রিসেনথমামের বর্ণ বিন্যাসে।

পিয়ানোর মিষ্টি আওয়াজ ভেসে আসছে ভিতর থেকে। ভিতরে হয়তো এখন প্রাতরাশ শুরু হ'য়েছে—প্রোটিন, ফ্যাট্ ভিটামিনের অপূর্ব সমন্বয়ে।

টাটা বিড়লার উত্তরাধিকারী, উত্তরাধিকারিনীদের স্বপ্নসৌধ। মনে হয়, যেন এ অঞ্চলে 'স্বর্গীয়' শান্তি বিরাজ করছে অনন্তকাল ধরে। স্বপ্নলোকের নিথর নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে।

কিন্তু এই স্বপ্নসৌধের 'স্বর্গীয়' শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতেই শত শত মির্ঠু আজ গৃহহারা মাতৃহীন, অনাথা।

হৈমন্তীও বাড়ী করেছে এখানেই। ঐ ত হৈমন্তীই দাঁড়িয়ে রয়েছে বারান্দায়। চোখে চোখ পড়ে যায়। অগত্যা ঢুকতে হয় বাড়ীতে।

হৈমন্তী অবাক হ'য়ে যায় শীতাকে দেখে, কিছুটা খুশিও হয় "কোন দিকে সূর্য উঠেছে আজ?"

স্মিতহাস্যে গ্রহণ করে শীতা তার অগ্রজার এ গৃহ-অভ্যর্থনা। মৃদু হেসে বলে, "সূর্য পূর্বদিকেই উঠছে আজ পর্যন্ত। তবে যে স্বপ্নজগতে বাস করছো, তা'তে সূর্য পশ্চিমদিকে উঠলেও আশ্চর্য হ'বার কিছু নেই।"

হৈমন্তী খুশির আমেজ মাখা সুরে উত্তর দেয়, "জায়গাটা সত্যি ড্রিমল্যাণ্ড ছিল। তবে এই মাঝে মাঝে রেফুজিরা এসে বিভ্রাট বাধাচ্ছে। এত কুৎসিত লাগে—বড় বড় মেয়ে বৌরা সব ঐ খোলা কলতলায় এসে স্নান করে।"

শীতা মনে মনে বলে, "ড্রিমল্যাণ্ড না ব্লাইণ্ডল্যাণ্ড।" ঠাট্টার সুরে বলে, "একটা বাথ্‌রুম করে দিলেই পার।"

খোঁচাটা হজম করে' নিয়ে হেসে বলে হৈমন্তী, "আচ্ছা, তোর উপদেশটা না হয় ভেবে দেখবো সময় মত। এখন বল্ কি জন্য এসেছিস। বিনা কারনে যে আসিসনি, তা'ত নিশ্চয়ই জানি।" "বেরিয়েছি কিছু টাকা সংগ্রহ করতে।" প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে বলে শীতা।

"হঠাৎ টাকার এতো প্রয়োজন হ'ল কেন। বিজনেস করছিস নাকি?" কোন রাজ্যে বাস করে এরা—মনে মনে আওড়ায় শীতা। "বিজনেস করছি না। কন্তুদের বহু কমরেডদের টাকার অভাবে জামীনে খালাস করে আনা যাচ্ছে না। প্রচুর টাকার প্রয়োজন। মেয়েদের উপরও পুলিস দিয়ে অকথ্য অত্যাচার করা হ'চ্ছে।"

হৈমন্তী বাধা দিয়ে বলে, "কিন্তু আমরা ত বিপরীত কথাই শুনি। কম্যুনিস্টরাই নাকি ঘরবাড়ী সব আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে— শীতা বলে, "তোমরা শোন; আর এরা ভুক্তভোগী।"

হৈমন্তী আবার বলে, "ও ত ভয়ানক চটা কম্যুনিস্টদের উপর। ফন্তুও যে ঐ দলেই ঢুকলো, এই জন্যই ত এত রাগ মা বাবার উপর। বাবাকে অফার দিয়েছিল—ফন্তু এখানে থেকে বিজনেস শিখুক ওর সাথে। তার উত্তর পর্যন্ত দেননি বাবা। এতদিনে ঘরবাড়ী উঠে যেত।"

শীতা জবাব দেয়, "ঘরবাড়ীই ত উঠতো শুধু, তার বেশী আর কিছুত হোত না।"

"কিন্তু ও একটা ঘর নাকি। একটু ঝড় উঠলেই ভেঙে পড়বে।"

শীতা মনে মনে ভাবে, সত্যিকারের ঝড় যেদিন উঠবে তোমাদের এ প্রাসাদই টলবে আগে। দাঁড়িয়ে থাকবে ঐ খোলার ঘরগুলিই।

হৈমন্তীর হঠাৎ খেয়াল হয় শীতার মেয়ের কথা। "তোর মেয়ে আসেনি?" "সে তোমার ফুল বাগান দেখছে নীচে। বোধ হয় এতক্ষণে তোমার মালীর সাথে ভাব জমিয়ে তুলেছে।"

হৈমন্তী বাঁকা বিদ্রূপের সুরে বলে, "মেয়েকেও কম্যুনিস্ট করছিস বুঝি। তাই এই বয়সেই ঝি চাকরদের সাথী করা শিখছে।"

দুঃখের হাসি হাসে একটু শীতা। এই সেই হৈমন্তী! এক দিন বিপ্লবী দাদাদের গোপন কাজের সহায়তা করতো এই হৈমন্তী!

সে ও মৃদু বিদ্রূপ মিশিয়ে উত্তর দেয়, "দোষ কি? চোর বদমাইস ত আর নয়। কালোবাজার সাদাবাজার কোনও বাজারেরই চোর নয় এরা।"

শীতার কথায় একটা কালো ছায়া দ্রুত মিলিয়ে যায় হৈমন্তীর শুভ্র মসৃণ কপোলে। চোরাকারবার করছে যে সুখময় এ সংবাদ অজানা নেই শীতারও।

এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চায় না শীতা। কথা ঘুরিয়ে দেয় সে, "মা বাবার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে একদিন, শুনলাম।"

"একদিনই মাত্র গিয়েছি। যা বিশ্রী রাস্তা। ও রাস্তা দিয়ে মোটর চালান মুস্কিল। আর ট্রামে বাসে ঘোরাটা পছন্দ করেন না তোর জামাইবাবু।"

শীতা ঠাট্টার সুরে বলে, "এভাবে বোরকার আড়ালে আর কত কাল থাকবে। খুব পর্দানশীন হ'য়ে উঠেছেন বুঝি সুখময়বাবু?" ঠাট্টাটা লক্ষ্য করে না হৈমন্তী। অবাক হ'য়ে বলে সে, "পর্দানশীন বলছিস কি। পাবলিক স্টেজে অভিনয় করলাম এই ত সেদিনও। বন্ধুরা আপত্তি তুলেছিল। তার উত্তরে বলেছেন 'স্ত্রীর নিজস্ব রুচি, নিজস্ব মতামতে হস্তক্ষেপ করাটা সভ্য জগতে অচল।'

স্বামীগর্বে গর্বিতা স্ত্রীর সুরটুকু লক্ষ্য করে বলে শীতা আঘাত দেবার জন্যই—"চলি আজ। কম্যুনিস্টদের উপর ভয়ানক চটা সুখময় বাবু। কিন্তু তুমি ত চটা নও বরং এককালে ত অনুগতই ছিলে। তাই ভেবেছিলাম, তোমার কাছেও কিছু চাঁদা চাইব।"

কিসের ধাক্কা খায় যেন হৈমন্তী বোনের কথায়। একটা কালছায়া দ্রুত মিলিয়ে যায় চোখেমুখে। ইতস্তত করে' বলে, "দাঁড়া একটু।"

একজোড়া সাবেক ফ্যাসানের কানপাশা বের করে আনে হৈমন্তী। "এই কানপাশা জোড়া নিয়ে যা। বিক্রি করলে এ বাজারে অন্তত, পঞ্চাশ টাকা পাবি। কিন্তু তোর জামাইবাবু যেন জানেন না এ খবর।"

মনে মনে বলে শীতা, 'এই ত স্বাধীনতা চূড়ান্ত আধুনিকা স্ত্রীদেরও। এক টুকরো সোনাও তারা স্বামীর মতের অপেক্ষা না করে দান করতে পারে না।'

'শুধু কি স্বামী দুঃখ পাবে বলে এ গোপনতা? না ভয়ে। তবুও স্বাধিকার গর্বের শেষ নেই চোখেমুখে। আত্ম প্রতিষ্ঠার সমারোহ লিপষ্টিক বুলান ঠোঁটের কোণায়। ঘোমটা শিথিল কবরীতে শ্বেত করবীগুচ্ছ। দেখে মনে হয়, কত সুখী, কত স্বাধীন জীবন। খাঁচা ভাঙা মুক্ত পাখীর অবাধ আনন্দ। কিন্তু সূক্ষ্ম একটি সুতো বাঁধা রয়েছে যে পায়ে তা' কি টের পাচ্ছে না এই আকাশ বিচারী বিহঙ্গমা!'

আবার নাকি আরও রেশন কমান হ'বে!

বিপদের ঢেঁড়া শোনার মতই উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে সারা শহরের লোক খাদ্য মন্ত্রীর এই নূতন ঘোষণা। আবার রেশন ছাঁটাই! বিস্ময়ে বিমূঢ় মানুষ ব্যস্ত হ'য়ে ছোটে থলি হাতে শহরতলির চাউলের ক্ষুদ্র দোকানগুলিতে। অফিসে কলমপেশা মেয়েরাও বাদ নেই এই চাউলের শিকারে। তফাত শুধু হাতের থলিটি চটের না হ'য়ে হয়তো কোনও মণিপুরি মেয়ের হাতে বোনা মনোরম হাত-ঝোলা।

নূতন কলোনীর ক্ষেত্রমণি তার ক্রমলঘীয়ান্ রেশনের থলিটি হাতে বির বির করতে করতে চলেছে। পথে শীতাকে দেখে অভিমানী বেদনায় গাঢ় হ'য়ে উঠে স্বর, "বড়লোকরা না হয় বেশী দাম দিয়া চাউল কিন্না খাইব। কিন্তু আমরা গরীব মানুষরা কি খাইয়া বাচুম—বল দেখি। খাইটা খাওয়া মানুষের কি আর দেড় ছটাক চাউলে পেট ভরে।"

কি জবাব দেবে শীতা। ক্ষেত্রমণির স্খলিত বসনের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করে, পেটের ঢিলা ঢিলা চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে ক্ষুধার কামড়। এ ক্ষুধাই রূপ নিবে একদিন আগুন জ্বালানো প্রতিহিংসায়। কিন্তু আজ এর জবাবের ভাষা খুঁজে পায় না শীতা।

বাসে এসে দেখে সে, একতিল জায়গা নেই বাসে। চাউলের-বস্তা নিয়ে সারি সারি বসে গিয়েছে বস্তির মেয়েরা।

কনডাক্টার বাসে উঠেই আপত্তি জানায়—"চাউল নেওয়া চলবে না।"

"চার আনা করে দেবো প্রত্যেকে। বাপ্ আমার এ কটা চাউল মাত্র।" হাত জোড় করে আকুল সুরে মিনতি জানায় এক বুড়ী।

"না চাউল নেওয়া হ'বে না। বলছি ত, পুলিস আছে মোড়ে।" অসহিষ্ণু সুর কনডাক্টারের স্বরে। জোর করে টেনে নামাতে যায় সে চাউলের বস্তাগুলি।

তাড়াতাড়ি বস্তাটা বুকে আঁকড়ে ধ'রে বাধা দেয় আর একটি মেয়েমানুষ। আর একজন ঝাঁঝিয়ে উঠে, "পুলিস আছে। এই কটা চাউল বেচে আমরা ত আর দালান বালাখানা তুলতে যাচ্ছি না। এই দিয়ে দু'চার আনা রোজগার করি আমাদের বালবাচ্চাদের জিইয়ে রাখতেই।"

আর একজনও সমর্থন করে' চেঁচিয়ে বলে, "যত চোট এই গরীব-গুরবার উপরই। আর বড় লোকরা যে লরী ভর্তি ভর্তি চাউল নিয়ে বেচছে, কই তা' ত কোনও পুলিসের চোখে পড়ে না।"

মনের যত জমানো জ্বালা মিটিয়ে নিচ্ছে যেন মেয়েমানুষটি। আধা বয়সী। অন্ধকার ভোরে খালি পেটে ছুটে এসেছে এই চাউল নিতে। ক্ষুধার্ত পেটের থুতু উঠছে ক্রমাগত মুখে। বারে বারে থুতু ফেলছে সে জানালা দিয়ে।

বাস ছাড়ার সময় হ'য়ে গিয়েছে। ড্রাইভার উঠে এসে বসে। অধীর হ'য়ে উঠছে কেরানীরা। লেট হয়ে যাবার আতঙ্ক আর বিরক্তি কুঁচকে উঠে চোখে।

কনডাক্টার কিছুতেই চাউল নিতে দেবে না। একটি মেয়ে গর্জে উঠে, "না হয় জেলেই যাব। এমনিতেও না খেয়ে মরছি। জেলে গেলে তবু ত ভাত পাব।" মুখ দিয়ে এক ঝলক খালি পেটের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে শীতার মুখের উপর। মুখের পচা গন্ধে পেটে যেন মোচর দিয়ে উঠে। মনও মোচর দিয়ে উঠে, সাথে সাথে। খালি পেটে এত ছুটোছুটি করছে শুধু ত জীবিকার তাগিদেই। তৈলহীন চুলে কয় সহস্র উকুনের বাসা, কে জানে। গাময় চুলকানি—খাদ্যাভাবেরই ছোপ সব।

হৈমন্তীর বসবার ঘরের ছবিটা উঁকি মেরে যায় মনে। দুইশ্রেণী মানুষের ভিতরে জীবন সংগ্রাম কত তফাত। বাস ছেড়ে দেয়।

পুরুষদের সিটে দুঃখালাপ শুরু হ'য়ে গিয়েছে। "রেশন নাকি আরও কমান হ'বে। কিন্তু কথা হ'চ্ছে মন্ত্রীরা কি ভাত খায় না। তাদের কি একটুকুও বোধ নেই যে ঐটুকু চাউলে একটা খেটে খাওয়া মানুষের পেট ভরে কি করে।" ছোট্ট একটি স্কুলে-চলা ছেলে উত্তর দেয়, "মিনিষ্টাররা ত আর শুধু ভাতই খায় না। ফল দুধ মাছ মাংস ডিম খেয়েই পেট ভর্তি হ'য়ে যায় তাদের। তাই তারা বোঝে না কতটুকু চাউলের ভাত দরকার মানুষের।" ছেলেটির মুখের দিকে তাকায় শীতা সমর্থনের চোখে। এতটুকু ছেলের মনেও প্রতিবাদ জমে উঠেছে কম না।

হকারের কাছ থেকে একখানা পত্রিকা কিনে নিয়ে চোখ বুলাতে বুলাতে বলে উঠে একজন প্রবীণ ভদ্রলোক। দেখে মনে হয় শিক্ষক "শিক্ষা বল, কৃষি বল, শিল্প বল, সবার উপরে পেটের চিন্তা। খালি পেটে কতকাল আর আদর্শ ধরে চলা যায়। নেতারা ত সমানে উপদেশ দিয়ে চলেছেন দেশের যুবক সম্প্রদায়ের কাছে—তাদেব ঐতিহ্যময় আদর্শের মর্যাদা রাখতে। কিন্তু ভাত পেটে না পড়লে যুবক আর যুবক থাকবে কয়দিন।"

মাঝরাতে একটা গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙে যায় বিশ্বেশ্বরের। প্রমীলাকে ডেকে তোলে, "শোন ত কিসের গোলমাল হ'চ্ছে।"

প্রমীলা চমকে উঠে, সত্যি ত এইদিকেই এগিয়ে আসছে, মনে হ'চ্ছে যেন অনেকগুলি লোক হৈ হৈ করতে করতে ধেয়ে আসছে এইদিকেই।

মুহূর্তের মধ্যে ঘরে ঘরে ঘুম ভেঙে যায়, সবাই দুয়ার খুলে বের হয়। কিছু ভাববার আগেই কোন একটা ঘরের চালায় দুমদাম শব্দ শুরু হ'য়ে যায়—ঘর ভাঙার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলী গলার চিৎকার "সব শেষ করে ফেললো গো—ভেঙে ফেললোগো।"

কলোনী আক্রমণ করেছে গুণ্ডারা—একসাথে শাঁখ বেজে উঠে ঘরে ঘরে। বিপদের সংকেত।

হাতের সামনে যে যা পায়, লাঠি বাঁশ হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে জুয়ান ছেলেরা। প্রতিবাদ ঝলসে উঠে তাদের চোখে মুখে—"এ জুলুম সহ্য করা হ'বে না। রাতদুপুরে গুণ্ডা দিয়ে ঘর ভাঙবে এসে। দেখি কার সাধ্য ঘর ভাঙে।"

বিপক্ষদলও প্রস্তুত হ'য়েই এসেছে। মদে জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠে এক গুণ্ডা—"এটা কি তোদের শ্বশুরের জমি। ভাঙ ঘর, ভাঙ শালাদের ঘর।" "আমাদের শ্বশুরের জমি নয়—কিন্তু এটা কি তোদের শ্বশুরের জমি?" জবাব আসে ভীড়ের ভিতর থেকে।

মারামারি শুরু হ'য়ে যায়।

কলোনী আক্রমণ করেছে শুনে ছাত্ররাও বেরিয়ে আসে হোষ্টেল থেকে।

ইটপাটকেল, লাঠি, বাঁশ হকিস্টীক দিয়ে পাল্টা আঘাত চালায়। মাথা ফেটে যায় একটি ছাত্রের। তুলসী তাড়াতাড়ি তার ঘরে নিয়ে যায় ছেলেটিকে। বৌ ন্যাকড়া বের করে দেয় পুঁটলি থেকে। ঠকঠক করে শরীর কাঁপছে তার ভয়ে আর শীতে, লক্ষ্য করে সমীর। ছাত্রটির মাথাটা বেঁধে দিতে দিতে সাহস দিতে চেষ্টা করে সে বৌটিকে,

"এর শিক্ষা না দিয়ে ছাড়বো না আমরাও। এত জুলুমের রাজত্ব চলবে না। সব ছাত্ররা এসে পড়লে ওরা পালাবার পথ আর পাবে না।"

একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দেয় সাইকেল দিয়ে, "এক্ষুণি ছুটে যাও

অসীমদের হোস্টেলে। বলবে, সব রেডি হ'য়ে আসে যেন এই মুহূর্তে।"

কিন্তু হোষ্টেলের ছেলেরা আসার আগেই এসে পড়ে পুলিস-বাহিনী। বাস্তুহারাদেরই গ্রেপ্তার শুরু করে। গুণ্ডাদের উৎসাহ আবার বেড়ে যায়। "আগুন ধরিয়ে দাও শালাদের ঘরে। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সব।" বলেই তুলসীর ঘর ভাঙতে শুরু করে দেয়। বাধা দিতে না দিতেই অতর্কিতে গুলির আওয়াজ শোনা যায়। দিশেহারা হ'য়ে সবাই ছুটতে থাকে যে যেদিকে পারে।

তুলসীর বৌ ঘর থেকে বেরিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। তারই চোখের সামনে তার ঘরে আগুন ধরান হ'চ্ছে। ক্ষেত্রমণি তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে ছুটতে থাকে—"ছোট্ শীগগীর গুলির শব্দ শোনস না।" অন্ধকারে দিশে পাওয়া যায় না কিছুই—কোলে কাঁখে শিশু নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে মেয়েরা। তাদের ঘর ভাঙার আওয়াজ, শিশুদের কান্না আর মেয়েদের আর্ত চিৎকারে ভ'রে উঠে অন্ধকার মাঠটা।

বৃদ্ধারা বুক চাপরে চিৎকার করতে করতে ছুটছে, "সব শেষ করে ফেললোগো। ভগবান সহ্য করবে না।"

বিশ্বেশ্বরও তার অথর্ব দেহটা টেনে নিয়ে ঘর থেকে বের হ'য়েছে প্রমীলার কাঁধে ভর দিয়ে। দীপুর কাঁধে ভর দিয়েছে আর এক-খানা হাতে।

তার বিস্ফারিত বাকরুদ্ধ চোখের সামনে জ্বলে উঠেছে তুলসীর ঘরখানা। চারদিকে অট্টরোল।

ঘরভাঙার দুমদাম শব্দ। শীতের রাত্রির কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া আর গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে শিশুদের দিশাহারা কান্না সমস্ত রোমকূপ দিয়ে যেন শুনছে বিশ্বেশ্বর। হঠাৎ চমকে উঠে, "গুলির শব্দ না?"

"আবারও হল।" গুলিই চলছে। কানপেতে শোনে তিনজনেই, কোনদিকে হল।

ঘরের পেছন দিক দিয়ে তখন ভীত পশুর মত ছুটছে তুলসীর পূর্ণ গর্ভবতী বৌ আর ক্ষেত্রমণি। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখছে না। ক্ষেত্রমণির মুঠি ধরে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে তুলসীর বৌ করুণ একটা আর্তনাদ করে। আঁতকে উঠে ক্ষেত্রমণি। অন্ধকারের ভিতরেও কার গোঁঙানি শুনে চমকে উঠে সে, "তুলসীর গলা না।" হাতড়ে দেখে—রক্তে ভিজে গিয়েছে কাপড়।

হঠাৎ গোঁঙানি থেমে যায়। বিকৃত গলায় প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে' ডাকে, সে—সর্বাঙ্গ কাঁপছে তার। "ওগো কে আছ তোমরা এইদিকে আস। শীগগীর দেখ আইসা, কি সর্বনাশ বুঝি হইয়া গেল।" প্রমীলাই প্রথম শুনতে পায়। বিশ্বেশ্বরকে বসিয়ে রেখে ছুটে যায় সে বাতি নিয়ে। চিৎকার শুনে আর কয়জন ছেলেও ছুটে এসেছে। টর্চ টিপে আলো ধরতেই একসাথে চমকে উঠে সবাই—গুলি লেগেছে। সামনেই একটা জলের বালতি কাত হ'য়ে পড়ে রয়েছে। বোঝে সবাই, ঘরের আগুন নেবাতেই গিয়েছিল তুলসী বালতি নিয়ে।

নাড়ী দেখে তাড়াতাড়ি ধরাধরি করে তুলে নিয়ে আসে তাকে প্রমীলার ঘরের বারান্দায়। আর ও পাঁচজন আহত হ'য়েছে। একটা গরুর পায়ে গুলি লেগেছে। যন্ত্রণায় দাড়ি ছিঁড়ে ছুটে বেরিয়ে গরুটা ঘুরছে মাঠের চারদিকে।

একজন ছাত্র ছুটে চলে যায় সাইকেল নিয়ে ডাক্তার বাড়ী। ডাক্তারের নিজের মটরগাড়ী আছে। গাড়ী নিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে আসে। তলপেটে গুলি লেগেছে তুলসীর। অবস্থা দেখে বিবর্ণ হ'য়ে উঠে ডাক্তারের মুখ, "এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হ'বে। আমার গাড়ীতেই নিয়ে যান। আমিও যাচ্ছি সাথে।"

সাইকেল রিক্সাওয়ালাদেরও মধ্যেও অনেকেই ছুটে এসেছে আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দিতে।

তুলসীর বৌয়ের দিকে তাকাতে পারছে না যেন কেউ। ভয়ে একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে মুখ। রক্তের লেশ নেই মনে হ'চ্ছে। হাত কাঁপছে। তুলসীকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে মোটরটা চলে যায়। প্রমীলাও যায় তুলসীর বৌয়ের সাথে।

চারদিকে সদ্য ঘরভাঙা স্ত্রী পুরুষের দল—হারিকেনের অস্পষ্ট আলোতে ঘরভাঙা মানুষের বীভৎস করুণ মুখগুলির দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় বিশ্বেশ্বর খুঁটি ধরে। কঠিন হ'য়ে উঠে তার অথর্ব দেহও।

"এর জবাব নিশ্চয়ই দেবে এরা—নিশ্চয়ই দেবে এরা। এক পাও আমরা নড়বো না এ কলোনী ছেড়ে।" বলে উঠে বিশ্বেশ্বর।

জিহ্বা-জড়ানো স্বরে ফুটে উঠে অপরাজেয় দৃঢ়তা। সামগ্রিক চেতনায় জ্বলে উঠছে তার দৃষ্টিক্ষীণ চোখগুলিও।

"তোমরা সব ঘরে উঠে এস। যতবার ঘর পোড়াবে ততবার ঘর তুলবে তোমরা। তবু নড়বো না।"

পরদিন বিকেল বেলা শ্মশান থেকে ফিরে আসে প্রমীলা চোখ মুছতে মুছতে।

"বাঁচান গেল না। কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে ভরা মাসের বৌটা। তার হাত থেকে টেনে নেওয়া কি যায় তাকে দাহ করতে। কি শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে স্বামীর পা দুটো। দু'টো জুয়ান ছেলে জোর করে সরিয়ে নেয় বৌটাকে, তবে তাকে চিতায় তোলা যায়।"

ভাঙা ঘর মেরামত করছে; নূতন করে খুঁটি পুঁতছে ছেলেরা। মেয়েরা অবশ্য হাতে হাঁড়িকুড়ি গুছায় আর শাপান্ত করছে পুলিসের।

একটা জুয়ান মানুষকে এ ভাবে মেরে রেখে গেল। পশু-পক্ষীর একমাত্র বাস ছিল এসব জায়গায়! চারদিকে ছিল শুধু নলবন, ঝোপ, ঝাড় জঙ্গল। নিজের হাতে তারা ঝাড় জঙ্গল সাফ করে' ডোবা খানা বুজিয়ে মনুষ্যের বাস যোগ্য করেছে সে গহন বনকে। নিজ হাতে মাটি কুপিয়ে, মাটি টেনে ভিটা তৈয়ার করছে মেয়ে পুরুষে মিলে। আজ সে ভিটাটুকুও কেড়ে নিতে এসেছে বড়লোকেরা গুণ্ডা লাগিয়ে। আর পুলিসও বড়লোকদের দিকেই যোগ দিয়েছে। ক্ষোভে, দুঃখে গুমরে উঠে মন।

ক্ষেত্রমণি ঘরের বারান্দায় গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। ভাত-চারটি ফুটাতেও ইচ্ছে করছে না। তুলসীর ঘরের আধাপোড়া খুঁটিগুলি দিকে চোখ পড়লেই চোখের সামনে ভেসে উঠে সমস্ত রাত্রির বিভীষিকা। তুলসীর বৌ স্বামীর সাথে মাটি টেনে টেনে ঘরখানা তুলেছিল। পোয়াতী বৌটার অবস্থা যে কি হ'বে ভাবতেও পারছে না কেউ।

প্রমীলার ঘরেও একই অবস্থা। অসার মন। কোনও কাজেই ভাল মন বসে না। তার উপর পুলিস এসে ফন্তুর খোঁজ করে গেছে। অদ্ভুত বিচার। গুলিও করবি তোরা? আবার জেলেও পুড়বি তোরাই।

সমস্ত কলোনীতেই ক্ষুব্ধ উত্তেজনা। মেয়েদের মনে দুঃখ-বিমূঢ় অবসাদ।

বিকেল বেলা বাস্তুহারা মাঠে প্রতিবাদ সভা ডাকা হ'য়েছে। সবাই এসে জড়ো হয় মাঠে। মেয়েরাও এসে বসে কোলে কাঁখে ছেলে-পুলে নিয়ে।

ক্ষেত্রমণি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় বক্তৃতা-দেওয়া ছেলেটির মুখের দিকে। কি তেজ ঐটুকু ছেলেরও চোখেমুখে। শূন্যে ঘুষি মেরে

মেরে বক্তৃতা দিয়ে চলছে, "এ ভাবে গুলি চালিয়ে মানুষের ন্যায্য দাবীকে প্রতিহত করবে ভেবেছে আমলাতান্ত্রিক সরকার। কিন্তু সরকারের এ দম্ভকে সহ্য করতে পারে না জনসাধারণ।"

"এই ধনিক সরকার বাস্তুত্যাগীদের কোনও সমস্যাই সমাধান করতে পারে না। তাই আজ তারা নিরীহ দেশবাসীর বুকে গুলি চালিয়ে সে সমস্যা মিটাতে চাইছে। সর্বহারা সমস্যার সাথেই একই স্বার্থে জড়িয়ে আছে এই বাস্তুহারা সমস্যাও। একমাত্র সমাজ বিপ্লবের পথেই এ সমস্যার মীমাংসা আসতে পারে। তাই সমাজবিপ্লবই আমাদের একমাত্র পথ—একমাত্র লক্ষ্য।"

ঠিক একই সময়ে মধু মুখার্জীও বক্তৃতা দেয় স্কুলের মাঠে এক প্রতিবাদ সভায়। আবেগে, উত্তেজনায় ভারী হয়ে আসছে কণ্ঠস্বর। বাস্তুহারা মাঠের সভা-ভাঙা উদ্বাস্তুরা ফেরার পথে এখানে দাঁড়িয়েও শোনে বক্তার কথা। তাদের মনে হয়, এই বক্তার কথাগুলিই বেশী খাঁটি, বেশী সত্যাশ্রয়ী।

কম্পিত কণ্ঠে বলে চলছে বক্তা, "গুলির জোরে বাস্তুহারাদের শেষ আশ্রয়টুকুও কেড়ে নিতে চাইছে আজ সরকার। হিন্দুসরকারের পক্ষে এর চাইতে কলঙ্কের কথা আর হ'তে পারে না। নিজধর্মী মানুষের বুকে গুলি চালিয়ে সরকার কখনও এ সমস্যা মিটাতে পারবে না। হিন্দু বাস্তুহারা সমস্যার সমাধান হ'তে পারে পশ্চিম বঙ্গে নয়, পূর্ববঙ্গে। হিন্দুস্থানে নয়, পাকিস্থানে। ঘরবাড়ী হারিয়ে পথে পথে ঘুরছে আজ হিন্দুরা—তাদের সেই ঘরবাড়ী পুনরুদ্ধার করাই এখন একমাত্র কাজ সরকারের। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পূর্ব-পুরুষদের ভিটামাটি ফিরিয়ে পাওয়ার দাবীই আজ একমাত্র দাবী আমাদের।" শ্রোতাদের চোখে, ছেড়ে আসা পরিচিত মাঠ ঘাট নদী প্রান্তরের ছায়া নেমে আসে। জ্বলে উঠে আশার দ্যুতি।

সত্যি যদি ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়—সেই পূর্বপুরুষদের ভিটা-মাটি জোত জমি ক্ষেত খামার! সেই স্বপ্নের মত হারান দিনগুলি!

দূর থেকে ভেসে আসে বক্তৃতার কথাগুলি তুলসীর বৌয়েরও কানে। অর্থহীন লাগে সবই তার কাছে। জীবনেরই আকাঙ্খা ফুরিয়ে গিয়েছে তার। শুধু অন্ধকার চতুর্দিকে। আধা-পোড়া ঘরের মেঝের উপর পড়ে' পড়ে' কাঁদে। সমস্ত জীবন ভ'রে কাঁদলেও বুঝি শেষ হ'বে না কান্না। বুকের পাঁজরই ভেঙে রেখে গেছে মানুষটি।

প্রমীলা এসে বসে কাছে—মাথায় হাত বুলায়। সান্ত্বনা দেবার নয় এ দুঃখ। চোখ ভেঙে জল গড়িয়ে পড়ে তারই। আরও ফুলে ফুলে কাঁদে তুলসীর বৌ।

কি কথা বলবে প্রমীলা এই সদ্য-স্বামী হারা বৌটিকে? অসুখ বিসুখ রোগ বালাই ত' না—জলজ্যান্ত জুয়ান মানুষ! তাকে গুলি করে মেরে রেখে গেল পুলিসে। এ দুঃখ ও ভুলবে কি করে।

প্রমীলা দুপুরের এঁটো বাসন মাজছে ঘাটে বসে—দীপু এসে খবর দেয়, "মা, পুলিস এসেছে বাড়ীতে ফন্তুদার খোঁজ করতে।" প্রমীলা বাসন রেখে তাড়াতাড়ি উঠে আসে—বুকের ভিতরে 'ঢেঁকির' পাড় পড়ছে যেন—আবার ফন্তুর জন্য এসেছে। ফন্তুকে না ধরেই কি ছাড়বে না ওরা। ভাগ্যিস ফন্তু বাড়ী নেই। মনে মনে ভগবানকে ডাকে। ভগবানই বাঁচিয়েছেন।

উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন সশস্ত্র পুলিশ। আর বারান্দায় বসে একজন অফিসার জেরা করছে বিশ্বেশ্বরকে। বিশ্বেশ্বর প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে চেষ্টা করছে। বড় বড় হয়ে উঠেছে চোখের তারা। কোনও বেফাঁস কথা না বলে ফেলে—প্রমীলা এগিয়ে গিয়ে বলে, "উনি ত অসুস্থ মানুষ।"

পুলিস অফিসারটি লক্ষ্য করে দেখে বিশ্বেশ্বরকে। তারপর প্রমীলাকেই প্রশ্ন করে, "আপনার ছেলেই কি ফল্গু চৌধুরী?" "তার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। তাকে কোর্টে হাজির হ'তে বলবেন।"

যাবার সময় নারকেল গাছের সাথে একটা নোটিশ টাঙিয়ে রেখে যায়।

প্রমীলা হাতে পায়ের যেন জোর হারিয়ে ফেলেছে। ফল্গুকে ধরে নিয়ে যাবে? ওদের মুখ চেয়েই ত দাঁড়িয়ে আছে সে। রোদের দিকে তাকিয়ে খেয়াল হয়—গম ভাঙতে যেতে হ'বে। এক ছিটা আটা নেই ঘরে যে রাত্রিতে রোগী মানুষটিকে খেতে দেবে। সপ্তাহে মাথা পিছু সতের ছটাক চাউল দেয় রেশনের দোকানে। একটা শিশুরও ত পেট ভরে না ঐটুকু চাউলে! গমের থলি নিয়ে রৌদ্রের মধ্যে বের হয় প্রমীলা।

দীপু এই এক সকাল রোদে রোদে ঘুরে পত্রিকা বিলি করে এসেছে। তাকে আবার এই রোদের মধ্যে পাঠান যায় না।

দুমাস ধরে শরৎ টাকাও পাঠাচ্ছে না চিঠিপত্রও লিখছে না। কি যে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে কার মুখে নাকি শুনেছে ফল্গু, শরৎ ভালই আছে।

গমের থলি নিয়ে দাঁড়ায় প্রমীলা গমভাঙান কলের সামনে। দোকানটি চেনা হ'য়ে গেছে। আর এসময়ে ভীড়ও কম থাকে।

ভদ্রঘরের মেয়েমানুষ বলে একটু তাড়াতাড়িই ভাঙিয়ে দেয় গমটা।

ফেরার পথে কলেজের ক্যাণ্টিনের সামনে দিয়ে হাঁটে প্রমীলা—যদি ফল্গুর কোনও বন্ধুর সাথে দেখা হয়, জানিয়ে দেবে, ফল্গু যেন এখন আর বাড়ীতে না যায় কিছুদিন।

ফল্গুর সাথেই দেখা হয়। দূর থেকে প্রমীলাকে দেখে এগিয়ে

আসে। স্বেশনের থলিটা হাত থেকে তুলে নেয়—"ভারী ত কম না। চল আমি দিয়ে আসি।"

"আমাদের বামুনবুড়ীর গমটাও একসাথেই ভাঙিয়ে আনলাম—বুড়োমানুষের সাধ্য কি এত হাঙ্গামা করা।"

প্রমীলা ফল্গুর মুখের দিকে তাকায়। চোখ যেন ভিজে আসতে চায়। মনে মনে বলে "তোদের মুখের দিকে তাকিয়েই ত কোন খাটুনিই আর খাটুনি মনে হয় না।"

একটু ফাঁকা রাস্তায় এসে পুলিস আসার কথাটা বলে প্রমীলা, "তুই আর না গেলি।"

ফল্গু জিজ্ঞাসা করে, "নোটিশে কি লিখে গেছে দেখেছ?"

"ইংরাজীতে লেখা। আর ওনাকে ইচ্ছে করেই পড়তে দেইনি। আরও যদি অস্থির হ'য়ে পড়েন।"

"দেখে আসি কি নোটিশ দিল। রাত্রিতে আর বাড়ীতে থাকব না।"

পিয়ন চলছে। প্রমীলা ডেকে জিজ্ঞেস করে, "আমাদের চিঠিপত্র আছে? নূতন কলোনীর—"

"চিনি আমি। দিল্লী থেকে টাকা আসে। না, কোনও চিঠি নেই আপনাদের।" চিঠির পাঁজাগুলোয় আবার একটু দেখে নিয়ে বলে পিয়ন। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ফল্গুর মনটা খারাপ হয়ে যায়। দাদা আর টাকা পাঠাবে বলে মনে হয় না তার। সংবাদ পেয়েছে সে, তার দাদা এক বন্ধুর স্ত্রীকে বিয়ে করছে। কোর্টে ডাইভোর্স কেস্ 'সু' করেছে বন্ধুপত্নী। সেটা হ'য়ে গেলেই বিয়ে করবে।

ফল্গুর কাছে নতুন নয় এ সংবাদ। কিন্তু মা, বাবা সহ্য করতে পারবে না।

চরিত্র শিথিলতা বলেই মনে করবে।

প্রমীলা যেন তার মায়ের মন দিয়েই এক অকল্যাণের পূর্বাভাস পাচ্ছে ভিতরে। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর যেন চেপে রাখতে পারছে না। অর্দ্ধেক চুলই পেকে গিয়েছে এরই মধ্যে। অকাল বার্দ্ধক্যের কুঞ্চিত রেখা পড়েছে চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে।

মনটা বড় দমে যায় ফল্গুর। তারই মুখের দিকে আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে দুইটি অসহায় মানুষ।

দীপুকে এই বয়সেই পড়া ছেড়ে কাজে ঢোকাবার চেষ্টা করছে প্রমীলা, এও ত কম দুঃখ নয় তার। এতবড় বিদ্বান স্বামী, ছেলে মেয়েরাও শিক্ষিত। তার আদরের কনিষ্ঠ সন্তান, দীপু ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পড়তে পারলো না সংসারের চাপে—এ দুঃখ কার কাছে প্রকাশ করবে প্রমীলা? ফল্গু বড় অপরাধী মনে করে নিজেকে—পত্রিকা বিলি করছে আজ ছোট ভাইটি। দীপুর পড়াব ভার ত নেওয়া উচিত ছিল তারই।

অথচ চাকরি করাও সম্ভব নয় এখন তার।

মনে মনে ভাবে ফল্গু, বাড়ীতে এলে নিজেকে শুধু দুর্বলই করা হয়। এতদিন যখন বাড়ীর সাথে জড়াইনি, আর নূতন করে এখন জড়িয়ে লাভ কি। আর পাঁচজনের যা অবস্থা, তার মা বাবারও তাই হ'বে।

গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে লাভ কি? আন্দোলন থেকে সরে এসে ব্যক্তিগতভাবে কি আর সমস্যার সমাধান করতে পারবে সে? বাস্তুহারাদের জন্য সংগ্রাম করাটাই এখন আসল কর্তব্য।

বিশ্বেশ্বর সোজা হ'য়ে বসেছে ফল্গুকে দেখে।

"প্রায় একমাস পর এলি তাই না?"

"হ্যাঁ। আর শীগগীর আসবো না।"

প্রমীলার বুক ফেটে যায় যেন, ফল্গুকে ধরে নিয়ে যাবে ভাবতেও। ব্যগ্র সুরে বলে সে, "না এলি। আমাদের জন্য ভাবতে হ'বে না। একভাবে দিন চলবেই। তুই সাবধানে থাকিস।"

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসে ফল্গু। প্রমীলা পিছন পিছন রাস্তার মোড় পর্যন্ত আসে।

"তুমি এবার বাড়ী যাও।" বলে মাকে। দ্রুত পা চালায় সে। পিছন ফিরে না তাকালেও টের পায় ফল্গু, প্রমীলা দাঁড়িয়ে রয়েছে তখনও। তার স্নেহদৃষ্টি অনুসরণ করছে তাকে।

রথী পৃথ্বীকে অনুরোধ জানায়, "পৃথ্বীদা, তুমি এবার বিয়ে কর সুমিত্রাকে। সাতপাক ঘোরা ত হ'য়েই গিয়েছে; আর দেরি কেন। জোর দিয়েই বলছি আমি, তোমাকে যত শ্রদ্ধা করে সে, এত শ্রদ্ধা সে আর কাউকে করেনি জীবনে। অথচ তুমি কেন তা টের পাচ্ছ না তাই বুঝতে পারছি না।" "টের আমিও পেয়েছি। সেই জন্যই ত ভাবছি, এ শ্রদ্ধার মর্যাদা দেবার যোগ্য আমি কিনা।" "দিনরাত বসে অত ভাববার কিছু নেই। অকারণে একটি মেয়েকে দুঃখ দেওয়া তোমার উচিত নয়। তোমরা দুজনেই কেউই ত কোনদিন কিছু প্রকাশ করতে পারবে না, জানি। তাই আমাকেই ঘটকালিটা করতে হ'চ্ছে।"

"এ বড় জটিল ব্যাপার। একটু ভাবতে সময় দে।" "বুঝেছি. বিয়ে আর কপালে ঘটবে না তোমার। শুধু ভাববেই চিরকাল। অথচ এর চাইতে যোগ্য মেয়ে আর হ'তে পারে না।"

পৃথ্বী হেসে বলে, "আমি কি বলছি অযোগ্য।"

কয়দিন ধরেই ভাবছে পৃথ্বী রথীর কথা। কিন্তু মন স্থির করতে পারছি না। রথীর কথাটা নাড়া দিচ্ছে মনে বারে বারে—'একটি

মেয়েকে অকারণে দুঃখ দেওয়া উচিত নয় তোমার।' তবু মনস্থির করতে পারছে না পৃথ্বী। কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধছে মনে।

গড়িয়াহাটার মোড় থেকে একটা পত্রিকা কিনে উল্টিয়ে দেখে। মনটা দমে যায়। মফঃস্বলের টুকরো টুকরো সংবাদ। শুধু গুলি আর গ্রেপ্তার। সুন্দর প্রকাশও এসেছে পত্রিকা কিনতে রাস্তার মোড়ে। দু'জনে 'স্বাগতমে' গিয়ে বসে। মন-মরা কমরেডদের আড্ডাটা এখন এখানেই বসে।

"এরা যে কি করছে সব।" বলে, পৃথ্বী, "যুদ্ধ লাগে লাগে, এ সময়ে এভাবে কৃষক আন্দোলনকে 'স্ম্যাস্' করে দেওয়ার ফল যে কি হ'বে, ভারতে পারছেন।"

ঠাট্টার সুরে জবাব দেয় সুন্দর প্রকাশ, "স্ম্যাস্ করছে, বলছেন কি আপনি। গেরিলা যুদ্ধ হ'চ্ছে নাকি এখন মুক্ত এলাকা থেকে।"

"তারই নমুনা দেখছি, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ঝেটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সোশ্যালিষ্ট পার্টি।" উঠে পড়ে সুন্দর প্রকাশ "চলি, চাকরি আছে আবার। আপনি কোন দিকে?"

"প্রেসে যাব একটু। বইখানার কদ্দুর হ'ল দেখে আসি, বলা ত যায় না—কোনদিন হয় তো শুনবো পুলিস এসে গ্যালি ফ্যালি সবশুদ্ধ নিয়ে গিয়েছে। ওদেরই ত অবাধ রাজত্ব এখন।"

দুঃখের সুরে বলে পৃথ্বী, "নিশ্চিন্ত মনে আইনের পিঠে আইন চালিয়ে যাচ্ছে—বাধা দেবে কে আর এখন। পত্রিকাগুলির স্বাধীনতায় কি ভাবে কাঁচি চালাচ্ছে দেখছেন ত।"

আলোচনা করে মনের উত্তাপ আরও বেড়েই চলে। একটা 'অর্গেনিজেসন'ও আর রইল না। অথচ এসময়ে শ্রমিকদের মধ্যে নিজেদের জোর থাকলে কি আর এত নিশ্চিন্তে জনমতের গলা টিপে ধরতে পারে।...

প্রেসের ম্যানেজারের সাথে দেখা হয় না। দারওয়ান জানিয়ে দেয়— "সন্ধ্যার সময় আসবেন। আজ ত কাজ বন্ধ।" বিরক্তি-চাপা মনে ফিরে আসে পৃথ্বী।

রাস্তায় রথীর সাথে আবার দেখা হয়। ম্লান মুখে জানায় সে, "আমাদের শীতাংশু নাকি আত্মহত্যা করেছে পটাসিয়াম স্যায়নেড খেয়ে।"

বিস্ময়ে, বেদনায় স্তব্ধ হ'য়ে যায় পৃথ্বী। শীতাংশুর মত প্রাণবন্ত ছেলেও আত্মহত্যা করে মরলো!

কিছুদিন আগে একবার দেখা হ'য়েছিল তার শীতাংশুর সাথে। লক্ষ্য করেছিল তখনই, সে স্ফূর্তি আর নেই, সে সতেজ হাসিও আর নেই। বড় বিষণ্ণ।

কিসের অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল তার ভিতরে ভিতরে, জানতো না পৃথ্বী। হয়তো জানতো না কেউই।

একটা করে বাস আসছে, আর আশাতুর চোখে তাকিয়ে দেখছে রিকসা ষ্ট্যাণ্ডে অপেক্ষমান সাইকেল রিকসাওয়ালারা।

যার যার রিকসায় বসে ঝিমুচ্ছে সবাই। মাঝে মাঝে বাস আসার শব্দে সচকিত হ'য়ে উঠছে। ভাল সাজ গোজ করা মেয়ে দেখলে আশায় লোলুপ হ'য়ে উঠে চোখগুলি।

কেউ একটু এগিয়ে যায় সামনে, "রিকসা লাগবে নাকি। ক্যাম্পে যাবেন নাকি?"

সোনাও তার রিকসায় বসে দিবানিদ্রায় ঢুলছে। হঠাৎ কান খাড়া হ'য়ে উঠে, "কি বলে গেল লোকটি? মারামারি লেগেছে নূতন কলোনীতে?"

"ঐ যে নূতন দখল করেছে যে জমি, সে জমিতে গুণ্ডাদের সাথে ছাত্রদের লাঠালাঠি চলেছে। রক্তারক্তি হ'চ্ছে।"

ছোট ছোট দোকানগুলিতে ক্রেতা ও বিক্রেতারা চঞ্চল হ'য়ে উঠে সংবাদ শুনে। মধ্যাহ্নের অবসাদ এক মুহূর্তে কেটে যায়। তাকিয়ে দেখে, ছাত্ররা সব ছুটে চলেছে লাঠি হাতে।

সোনা মনে মনে কয়দিন ধরেই এরকমই একটা গোলমালের আশঙ্কা করছিল। সেও ছুটে চলে তার সাইকেল রিকসা নিয়েই।

কিন্তু পথের মাঝেই থমকে থামিয়ে দেয় রিকসা। ফন্তুর সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে—দুইটি ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে চলেছে সে একটা বাড়ীর পিছন দিয়ে। দূর থেকে লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি ছুটে যায় সোনা "চলুন আমি পৌছে দিয়ে আসি, আমার রিকসা আছে সাথে।"

ফন্তু সঙ্গীদের বলে, "যেতে পার, আমার চেনা লোক।" আর চলার অবস্থাও ছিল না তার।

ফন্তুকে ধরে রিকসায় উঠিয়ে পাশে বসে ধ্রুপদ। আরেকটি ছেলে চলে যায় কোথায় যেন সংবাদ দিতে।

সোনা দ্রুত চালিয়ে দেয় রিকসা। ঝাঁকুনিতে রক্ত ঝরে আরও বেশী। তবু উপায় নেই। পথে ধরা পড়ে গেলে আরও বিপদ।

সোনা একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠে, "উঃ এত রক্ত। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মেরেছে নাকি?"

"শুধু ডাণ্ডা কি! গুলি লেগেছে পায়ে। পুলিস এসে পড়েছে। শুধু লাঠি হলে কি আর আমরা হেরে আসতাম। তবে খুব সাহস দেখিয়েছে বাস্তুহারারা। এতটাও আশা করিনি। মাত্র ত তিরিশ ঘর। তার মধ্যে কাচ্চা বাচ্চাই বেশী।"

ডাক্তারের বাড়ীতে এসে পড়ে—নিজেদেরই ডাক্তার। ফন্তুকে দুজনে ধরে ভিতরে নিয়ে যায়।

সোনা একটা বালতি চেয়ে জল এনে রিকসার রক্তগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলে—জমাট বাঁধা রক্ত।

ফন্তু ডেকে বলে, "বাড়ীতে কিন্তু জানাবেন না।"

সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। অস্পষ্ট হ'য়ে আসছে গাছপালা। সোনা রিকসা নিয়ে ফিরছে বহুদূরের এক সোয়ারী নামিয়ে রেখে। ফন্তুর রক্তাক্ত চেহারাটা ঘুরছে মাথায়। ভাবতেই রক্ত গরম হয়ে উঠে বারে বারে। প্রাণে যে বেঁচেছে এই রক্ষা। গুলিটা পায় না লেগে বুকে লাগলেই ত শেষ হত।

মধুমুখার্জীর বাড়ীর পাশ দিয়ে চলেছে সে—ইটসুরকির স্তূপ, খোয়াভাঙ্গা, ইটের পাঁজা প্রাচীরের ভিতরে। দিনের মজুরী বুঝে নিচ্ছে মজুররা, রাজমিস্ত্রীরা।

কুঞ্চিত চোখে তাকায় সোনা বাড়ীটার দিকে। একজনকে যেন চেনা চেনা লাগছে। মধুবাবুর ঘর থেকে বের হল, ও কালু না ?

একতাড়া নোট ট্যাকে গুঁজে রাখলো সে, সন্ধ্যার আবছাতেও স্পষ্ট বোঝা গেল। হ্যাঁ কালুই। টন করে উঠে যেন মাথার রগগুলি। টাকা খেয়ে গুণ্ডাগিরি করাটা একটু দেখিয়ে দিতে হ'বে ওকে।

সোনা আস্তে সাইকেলটা চালিয়ে নিয়ে চলে পিছু পিছু।

এই সুযোগ। রাস্তায় কেউ কোথাও নেই। তাড়ির নেশায় ক্রমশঃই টলছে কালু।

সোণা রিকসা থেকে নেমে বিষগিশান স্বরে বলে, "কত টাকা মিললো গরীব মানুষের ঘরবাড়ী ভেঙে।"

কালু ফিরে তাকায়। "কে দোস্ত ?" জড়ান গলায় বলে সে, "লোভ হ'চ্ছে বুঝি। বখরা দিতে পারি, যদি তোমার সেই বিবিটিকে একরাত্রির জন্য আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও।"

রাগে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে সোনার। শয়তান !

সামনে এগিয়ে এসে ঘুষি লাগায় নাকে—"শালা ছুঁচোর লেজ। জন্মের মত তোর দাঁত ভেঙে রেখে যাব।" ঘুষির পর ঘুষি চালায়।

তাড়ির নেশায় একেবারেই অবশ হ'য়েছিল দেহ, তাই আচমকা এই ঘুষির টাল সামলাতে না পেরে একটা কাচা নরদমার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় কালু।

"থাক শালা। আজ রাতের মত ঐ নরদমার জল খা।" বলে সাইকেলে উঠে দ্রুত প্যাডেল ঘোরায় সোনা।

"একেবারে শেষ করে এলেই ভাল হত।" মনে ভাবে সোনা। আবার ভাবে, ওকে মেরে আর কি হবে। আসল খোদ কল টিপছে পিছন থেকে। তাকে আর অবিশ্বাস করবে কে? তার মত গরীব মানুষের কথা কে বিশ্বাস করবে। বলতে গেলে সেই মার খাবে। সে নিজের চোখে দেখেছে বলেই ত চিনেছে তাকে। না হ'লে সেই কি জানত মধুমুখার্জীর স্বরূপ।

রাত্রিতে খেতে গিয়ে দেখে পৃথ্বী, কুরী খেতে আসেনি, অথচ বাড়ীতেই আছে সে, খোঁজ নিয়ে জানে ভীমার্জুনের কাছে। পৃথ্বী উঠে যায় কুরীর ঘরে। অসময়ে তাকে শুয়ে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন হ'য়ে প্রশ্ন করে, "অসুখ করেছে নাকি। খেতে গেলি না যে"

"খেতে ইচ্ছে করছে না আজ আর। মাথাটা বড় ধরেছে।"

কপালে হাত দিয়ে দেখে পৃথ্বী, জরও ত হয়নি।

বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে কি একটু অনুমান করে মনে মনে। বোঝে এ মাথার যন্ত্রণার কারণ কি।

হয় ত নিজেও সারাদিন ঘুরেছে রোদে রোদে।

কোমল স্নায়ুরা অপ্রকাশিত মনের এ উত্তেজিত চাপকে সহ্য করতে রাজী হয় নি। তাই যন্ত্রণা শুরু হ'য়েছে মস্তিষ্কের স্নায়ুতে।

পৃথ্বী বসে বোনের কাছে, "ঘুমাতে চেষ্টা কর। আমি টিপে দিচ্ছি মাথাটা।"

"অমনি সেরে যাবে, তুমি খেতে যাও।"

'অমনি সেরে যাবে নিশ্চয়ই। জেলে যদি যাস, দাদা ত আর সাথে যাবে না মাথা টিপতে। আজ না হয় অমনি নাই সার লো দাদা যখন আছেই কাছে।"

কুরী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে, "দাদা, তুমি কি শীতাদিদের বাড়ী গিয়াছিলে বাড়ী আসার আগে।"

বোনের উদ্বিগ্ন স্বরটুকু লক্ষ্য করে পৃথ্বী। বোঝে, কি সংবাদ জানতে চাইছে সে। মায়ের চোখ দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখে পৃথ্বী, কমনীয় মুখশ্রীর উপর গাঢ় ব্যথার ছায়া পড়েছে। স্নেহের সুরে প্রশ্ন করে, "কুরী, তুই ফল্গুকে ভালবাসিস তাই না?"

কুরী জবাব দেয় না—চোখ নত করে চুপ করে থাকে।

পৃথ্বী মনে মনে বলে, বোকা মেয়ে, নূতন অনুভূতির শিহরণকে লুকোতে চাইছ তুমি। কিন্তু তোমার মধুর চোখের পল্লবে যে স্নিগ্ধ ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে, লুকোবে তা কি দিয়ে।

চোখের মুখর ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে পৃথ্বী। মনে মনে বলে, "প্রেমের অঙ্কুর গজিয়েছে মনে, দুঃখ ত তোমাকে পেতেই হ'বে।"

শান্তস্বরে উত্তর দেয় সে, "প্রাণের ভয় নেই। পায়ে গুলি লেগেছে। ভাল ব্যবস্থায়ই রাখা হ'য়েছে—তবে, ভাল নার্সিং-এর উপর নির্ভর করছে অনেকখানি। একবার সেফটিক হলে ফ্যাসাদ বাঁধাবে।"

কি চিন্তা করে বলে পৃথ্বী, "তুই থাকতে চাস সেখানে?" জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় সে।

"কিন্তু আমাদের কাল একটা ডেমোনেস্ট্রেসন বের হ'বে। আমাকে থাকতেই হ'বে সে সাথে।"

বোঝে পৃথ্বী, পূর্ণ সাবালিকার পদে অধিষ্ঠিত করে ফেলেছে নিজেকে পূর্ণ-কিশোরী মেয়ে—কঠিন দায়িত্ববোধের সতর্ক প্রহরী দাঁড়ান ব্যক্তিগত অনুভূতির চৌকাঠে। কোমল হৃদয়াবেগের কাছে পরাজয় ঘটাতে পারে না এ কঠিন সমাজ চেতনাকে।

ধীরে শান্ত হ'য়ে আসে স্নায়ুর উত্তাপ। ঘুমিয়ে পড়ে কুরী।

পরদিন পৃথ্বীও ঘড়ির কাঁটা গুণে সময় মত হাজির হয় ডালহৌসী স্কোয়ারে। জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরে-যাওয়া আন্দোলনকে সমর্থন করে না সে—কিন্তু এদের কাছ থেকে দূরেও ত থাকতে পারে না। আন্দোলনের স্তিমিত নাড়ীকে অনুভব করতে হ'বে আন্দোলনের পাশে থেকেই। দূর থেকে মেয়েলী গলার শ্লোগান শোনা যাচ্ছে—কান পেতে শোনে সে। মেয়েদের মিছিল এগিয়ে আসছে। খুবই ছোট মিছিল। করুণ চোখে তাকায় পৃথ্বী।

কিন্তু পুলিস শান্ত থাকতে পারে না এতেও। সার্জেণ্টের হুইসিল বেজে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ঘুরতে থাকে মেয়েদের উপর।

হিংস্র জিঘাংসায় জ্বল জ্বল করছে সার্জেণ্টের চোখগুলি। প্রকাশ্য দিনের আলোয় মেয়েদের এ নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশকে সহ্য করতে তারা পারছে না। এ স্বৈরাচারকে জন্মের মত শেষ করে দিতে চাইছে যেন তাদের অসহিষ্ণু চোখগুলি। ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে আত্মঘোষণা করছে ধর্ষণমুখী শাসন প্রবৃত্তি।

মিছিল ভাঙা একটি মেয়ের পিছু পিছু লাঠি হাতে ছুটে চলেছে যেন যূথ ভ্রষ্ট আদিম বর্বরেরা। পৃথ্বীর চোখের সামনে একটি স্কুলে পড়া মেয়ের পিছু ছুটে চলেছে লাঠি নিয়ে এক আজ্ঞাবাহী কনেষ্টবল। মুহূর্তে জ্বলে উঠে সর্বাঙ্গ, পৃথ্বী আর চুপ থাকতে পারে না। "এর পিছনে ছুটছো কেন এভাবে।" বাধা দেয় পৃথ্বী।

অদূরে দাঁড়ান সার্জেণ্ট একজন চেঁচিয়ে উঠে, "আপনি বাধা দেবার

কে? তবে আপনিই চলুন।" "নিরস্ত্র মেয়েদের উপর লাঠি চালিয়ে খুব দেশ শাসন করছেন আপনারা।" শ্লেষার্ত স্বরে বলে পৃথ্বী।

মুহূর্তের মধ্যে একটা গোলমাল শুরু হয়ে যায়। কোথা থেকে একটা বোমা এসে পড়ে পুলিসের গাড়ীর উপর।

সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ আরম্ভ হয়। পুলিস সার্জেণ্ট একটু সন্ত্রস্ত হ'তেই চোখের পলকে মিশে যায় পৃথ্বী ভিড়ের মধ্যে।

রাস্তার লোক ছুটে পালাচ্ছে। খালি ট্রাম সব দাঁড়িয়ে পড়েছে। ট্রাম থেকে লোক সব নেমে পড়েছে। বাসগুলি অন্য রুট ঘুরে চলে।

কাঁদুনী গ্যাসের ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে সবারই। রাস্তার একটা টিউব-ওয়েলের ধারে ভিড় জমে উঠে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চোখে মুখে। আবার গুলির শব্দ শোনা যায়।

বিকেলের মধ্যেই সব শান্ত হ'য়ে আসে।

ট্রাম বাস চলা শুরু হয়। ট্রামে ট্রামে অফিস ফেরতা মানুষের মন্তব্য মন দিয়ে শোনে পৃথ্বী।

"গুলি চলেছে নাকি আজও ডালহৌসী স্কোয়ারে।"

"এ ত লেগেই আছে। প্রসেসন আর গুলি।"

"প্রসেসন না করেই বা কি করবে। খাবার আছে কারও ঘরে।"

"কিন্তু করেই বা কি হ'চ্ছে।" তর্ক শুরু হ'য়ে যায়।

রাতে বাড়ী এসে দেখে পৃথ্বী, শীতা বসে আছে সংবাদ নিয়ে—কুরী গ্রেপ্তার হ'য়েছে।

"যাক নিশ্চিন্ত হ'লাম।" বলে চেয়ারটা টেনে বসে পৃথ্বী, "এখন ফল্গুর পা টা বাঁচান যায় তবেই হয়।"

শীতা উঠে পড়ে। পৃথ্বী বলে, "তুমি ত রাতে ও বাড়ীতেই থাকছো। ভোরে এসে কুরীর প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যা লাগে, একটা ব্যাগে

গুছিয়ে দিয়ে যেও, লাল বাজারে দিয়ে আসবো। জামিন টামিন দেয় তবেই হয়।"

মিছিলের ছবিটা মনে ভেবে বলে পৃথ্বী, "এরপর আর মিছিল বের করার ত কেউই বাকি রইল না। এবার শুনছি, আন্দোলন চালাতে হ'বে নাকি জেলখানার ভিতর থেকে।"

শীতা চলে যায়। পৃথ্বী বসে বসে ভাবে, ভাল ভাল ছেলে মেয়েগুলি এত ত্যাগ, এত লাঞ্ছনা সহ্য করছে, অথচ সবই ভুল পথে চালিত হ'য়ে শুধু বিচ্ছিন্নই করছে নিজেদের জনসাধারণের কাছ থেকে। কিন্তু এভাবে চুপ করে বসে এ আত্মঘাতী দৃশ্য আর দেখা চলে না। পুলিসের এক বড়কর্তা নাকি বলেছে, এরপর তাদের আর কম্যুনিষ্টদের মারার জন্য গুলি খরচ করতে হবে না, পাড়ায় পাড়ায়ই সে লোক তৈয়ার হ'চ্ছে।

পৃথ্বী উঠে গিয়ে কুরীর টেবিলের কাগজ পত্রগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে রাখে। হাজত ঘরে কি করছে কুরীরা এখন? মিছিলের মেয়েদের কচি কচি মুখগুলি ভাসে চোখের সামনে। দূর হ'তে ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মুহু মুর্হু। হাত সই করান হ'চ্ছে। পুলিসের

মনে মনে ভাবে পৃথ্বী, হয়তো অহিংস শাসনের তালিম দেওয়া হ'চ্ছে।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ে সে। সারাদিনের শ্রান্তিতে অবসন্ন চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে শোবার সাথে সাথে।

ভোর না হ'তেই আচমকা ঘুম ভেঙে যায়। নীচে দুয়ারে জোর ধাক্কা পড়ছে। "পৃথ্বীবাবু আছেন?"

ভীমার্জুন কম্পিত স্বরে বলে যায় এসে, "দাদাবাবু পুলিস এসেছে।"

তার ভয়ার্ত ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে বলে পৃথ্বী—"খুলে দাও দরজা। ভয় পাবার কি আছে?"

"আপনাকে যদি ধরে নিয়ে যায়।"

হেসে বলে পৃথ্বী, "নিতেই ত এসেছে।"

পৃথ্বীকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে সেই পরিচিত সার্জেণ্ট। পালিয়ে যাওয়া শিকার খুঁজে পাওয়ার বীভৎস আনন্দ চোখ ছাপিয়ে উঠেছে। "তখন ত পালিয়ে গেলেন, এবার চলুন একটু দয়া করে।"

"পালিয়ে গেলাম আমি, না আপনি। একটা ফটকার আওয়াজ হ'তেই আপনিই ত উধাও হ'লেন। আমি কি আর দাঁড়িয়ে তামাসা দেখবো।"

উপরওয়ালার ভীরুতায় কনেষ্টবলরাও মনে মনে হাসছে লক্ষ্য করে রাগে ফুলতে থাকে ভিতরে ভিতরে পুলিস সার্জেণ্ট। "আপনারা ত পুরানো লোক কিনা।" রোষ-চাপা সুরে বলে।

পৃথ্বী মৃদু হেসে জবাব দেয়, "পুরানো লোক বলে সুবিধা ত আপনাদেরই হ'ল। আমাদের আর সুবিধা হ'ল কই। একটা ডেটিনিউ বোনাসও ত ভাগ্যে জুটলো না।"

ফরসা হ'য়ে এসেছে, লক্ষ্য করে বলে পুলিস সার্জেণ্ট, "এবার তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিন, আর দেরি করা চলে না।" তা অবশ্য ঠিক ফরসা হ'য়ে আসছে, লোকজন দেখে ফেলতে পারে। মনে মনে বলে পৃথ্বী।

ভীমার্জুনকে বলে যায়, "শীতাদিদের বাড়ীতে একটা খবর দিয়ে দিও। দিদিমনির কাপড়জামাগুলি যেন থানায় পৌঁছানর ব্যবস্থা করে।"

এ রাস্তায় বড় গাড়ী চলে না। বড় রাস্তায় প্রিজন ভ্যান অপেক্ষা করছে। হেঁটেই রওয়ানা হয় পৃথ্বীকে নিয়ে। আগে পিছে সশস্ত্র পুলিস।

প্রমীলার ঘরখানা দেখা যায় দূর থেকে। পৃথ্বী তাকায় একবার সেই দিকে। শীতা মিঠুকে নিয়ে এগিয়ে এসেছে মাঠের ধারে। আগেই

খবর পেয়েছে সে। চোখে চোখ মিলে যায়। মিঠু একটু এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বলে, "তোমায় কোথায় নিয়ে চলেছে কাকা?" মৃদু হেসে উত্তর দেয় পৃথ্বী "জেলখানায়।"

মিঠুর দিশাহারা ছোট্ট মুখখানার হাসি মিলিয়ে গিয়েছে এক আধা বোঝা ব্যাকুলতায়।

স্মিত হাসি দিয়ে বিদায় দেয় শীতাও। কিন্তু তার ভিতরের চেহারাটা এক নিমেষে দেখে ফেলে পৃথ্বী। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মন ব্যথিয়ে উঠে। একি অসহায় বিদীর্ণ মূর্তি শীতার! একি দুঃখমথিত আকুলতা ফুটে উঠেছে তার প্রশান্ত গভীর দৃষ্টিতে! শীতা যে তার উপর কতখানি নির্ভর করে রয়েছে, এই মুহূর্তটির মত এত গভীরভাবে কোনদিন উপলব্ধি করে নাই পৃথ্বী।

তাকেই জড়িয়ে রয়েছে যে ওর সমস্ত নির্ভর, সমস্ত আশ্রয়, আজ এই বিদায় মুহূর্তে টের পেয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যায় পৃথ্বী।

প্রিজন ভ্যানের কাছে এসে পড়েছে।

"উঠুন পৃথ্বীবাবু।" আদেশ জানায় রূঢ় কণ্ঠে।

বাইরের পৃথিবীর দিকে প্রাণভরা চোখে একটু দেখে নিয়ে লোহার খাঁচার ভিতরে ঢুকে পড়ে সে।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দেয়। লোহার জালের ছোট্ট ফুটো দিয়ে স্থির আয়ত চোখে তাকিয়ে দেখে পৃথ্বী—বহুদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তখনও শীতা। নিশ্চল নির্বাক তপক্লিষ্ট এক বিশীর্ণ মূর্তি।—পেছনে ধূ ধূ করছে হৈমন্তিক ধানের সুদূর বিস্তৃতি।...

পৃথ্বীকে নিয়ে প্রিজনভ্যানটা দূরে মিলিয়ে যায়—শীতার নিষ্পলক দৃষ্টির বহু বহু দূরে।

মিঠুর অবুঝ ব্যাকুল প্রশ্ন একই হৃদয়ের সুর দিয়ে মথিত করছে দুজনকেই "মাগো, কাকাকে নিয়ে গেল কেন?"

শুধু নিয়ে গেল নয়—মনে হয় যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল শীতার একমাত্র ব্যথা বোঝার জনকে।

শীতাকে জানে, চেনে, তার মাতা পিতা ভাই বোন আত্মীয় অনাত্মীয় বন্ধুজন, কিন্তু তার হৃদয়কে চেনে না কেউ।

ঐ দূর ভাঙা জীর্ণ প্রাচীন বাড়ীটার এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে রয়েছে যে মানুষ, সে চেনে শীতার হৃদয়কে, চেনে তার সাথীহারা আত্মার নিঃসঙ্গ মূর্তিকে। যার বহু কর্ম বহু তর্ক বহু আলোচনার গভীর অন্তরালেও লুকায়ে রয়েছে শীতার এই দোসর-হারা হৃদয়ের পরিচয়। একটি সহৃদয় মানুষের উপলব্ধি—এইত উত্তাপ শীতার, এই ত আশ্বাস।

কিন্তু এই একটি মানুষকেও ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওরা। আর্ত সুরে বলে শীতা—হয়তো জন্মের মতই নিয়ে গেল তাকে।

মিঠুর নরম হাতখানা চেপে ধরে শীতা। এই অবুঝ শিশুর কচি হাত দুখানা যেন তার চাইতে বেশী শক্তিমান। নিস্তেজ জীবনের শেষ শক্তি ফিরিয়ে আনতে হ'বে তাকে এই শিশুর হাত দুখানায় ভর করে।

বিশ্বেশ্বর বেরিয়ে এসেছে লাঠিতে ভর দিয়ে—"পৃথ্বীকে ধরে নিয়ে গেল নাকি।" ব্যাকুল, আর্তস্বর জড়াগ্রস্ত কণ্ঠে।

কম্পিত পদবিক্ষেপ দেহের ভার সাম্য রাখতে পারছে না আকস্মিক উত্তেজনায়। শীতা তাড়াতাড়ি ধরে পিতাকে। এই বার্দ্ধক্যদুর্বল পিতা আর এই অসহায় শিশুকন্যা; এদের শক্তির আধার হ'তে হ'বে তাকেই। অথচ মনে হয় একবিন্দু শক্তির অবশেষও নেই তার ভিতরে।

কত অনন্ত শক্তির প্রয়োজন তার পৃথিবীতে। কাজ শুধু কাজের দায়িত্ব দিয়েই মনের অবসন্নতা কাটাতে হ'বে তা'কে। পৃথ্বীর বাড়ীতে

যায়—কুরীর জন্য থানায় জামা কাপড় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। রথীকে সংবাদ দিতে হবে, সংবাদ দিতে হবে সুমিত্রাকে।

কিন্তু একি অশেষ ক্রন্দনের ঢেউ ক্ষীণ নিঃশ্বাসের সাথে আছড়ে আছড়ে পড়ছে অকূল শূন্য চেতনার বেলাভূমিতে। মনে হয় তার যেন নীড় শূন্য এ বিহঙ্গের অনন্ত সাগর বক্ষে একমাত্র আপন পাখায় নির্ভর।

সুন্দর প্রকাশ আসে পৃথ্বীর ঘরে। পৃথ্বীর কাগজপত্রগুলি উল্টে-পাল্টে দেখে। শীতা জানে, কাজ শেষে বিদায় নিয়ে যাবে সুন্দরপ্রকাশ তারও কাছে। তার সত্তা অলক্ষিত নয় এদের কাছে। তাকে শ্রদ্ধাই করে এরা, হয়তো অন্তরেরও স্পর্শ থাকে সে শ্রদ্ধায়। কিন্তু শীতা জানে, এ শ্রদ্ধা তার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ক্লান্তির দুঃসহতাকে ভেদ করবে না কোন দিন। সেখানে ওদের প্রবেশের প্রয়োজন হয় না। একক জীবনের কেন্দ্রিক সুখ দুঃখের ভস্মস্তূপে এদের দৃষ্টির জ্যোতি অবরুদ্ধ হয় না।

শীতা তন্ময় হয়ে ভাবে, যে দাবী নিয়ে ওরা শ্রদ্ধা করে তাকে, সে দাবীর মূল্য দিতে পারছে কি সে। ওরা যে মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানায় শীতাকে সম্বোধন করে, ঠিক সেই মানুষই কি সে। না প্রবঞ্চনাই করে এসেছে সে এদের জ্যোতির্ময় চক্ষুর সম্মানিত প্রত্যাশাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফল্গুর ছাত্রবন্ধুরা একে একে আসতে থাকে পৃথ্বীর ঘরে। একটা মিটিং করার কথা ছিল। কিন্তু পৃথ্বীর গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে মিটিং করা স্থগিত রাখে সেদিন এ বাড়ীতে। হয়তো ওয়াচ রয়েছে বাড়ীর উপর। অনেকেই আবার ফিরে চলে যায়।

দ্রুপদ, সমীর আর বোধন অপেক্ষা করে। মেয়ে কমরেড যারা কাল গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের জন্য জামিনের ব্যবস্থা করতে হ'বে—উকিলের কাছে যাবে এখন।

কঠিন দায়িত্বের সংকেত দৃঢ় সংকল্পময় চোখের তারায়। তবু কত সতেজ সুন্দর প্রাণবন্ত যৌবনের সারা ওদের জীবনের উদ্দীপনায়। শীতাকে দেখে বলে উঠে, "শীতাদি, চেঁচাতে চেঁচাতে গলা কাঠ হ'য়ে রয়েছে।"

শীতা হেসে বলে, "চা চাই ত।"

লক্ষ্য করে সে, রাত্রি জাগরণেব কালি পড়েছে চোখের তলায় তবু একবিন্দু অবসাদের চিহ্ন নেই। বসন্তের আগমনী সুর বয়ে এনেছে যেন ওরা ওদের এই প্রাণের স্পর্শে সতেজ দখিনা হাওয়ায়। শীতের কুয়াশাবৃত আকাশের আড়ালে সূর্যের আভাস দেখা যাচ্ছে। মনের কুয়াশাও কেটে গিয়েছে অনেকখানি। শীতা চা এনে দেয় ছেলেদের। মনে মনে ভাবে, একমাত্র পৃথ্বীই উত্তাপ ঢালছে না তার জীবন প্রেরণায়—একমাত্র প্রেমই নয়। এই প্রাণবন্ত ছেলেদের সংগ্রামী উদ্দীপনার উত্তাপকে ত অস্বীকার করতে পারে না সে। জীবনের লতায় লতায় উত্তাপ ঢালছে ফন্তুর এ সাথীরা—উত্তাপ ঢালছে বহুদূরে ঐ ধান জমির বুকের রৌদ্র-পোড়া মানুষেরা—উওাপ ঢালছে কারখানার ঘামঝরা মানুষেরাও।

পৃথিবী-ছড়ান মানুষের কাছ থেকেই উত্তাপ গ্রহণ করছে শীতা—শুধু পৃথ্বীর কাছ থেকে নয়।

"চলি দিদি।" বলে, চলে যায় সমীররা।

তাদের ক্ষয়ে যাওয়া জুতোর টেনে টেনে চলার শব্দটুকুও যেন প্রাণ ভ'রে গ্রহণ করে শীতা। মনে মনে শপথ লয় আবার, ওদের 'দিদি' ডাকের মর্যাদা রাখতে হ'বে তাকে।

আট বছর পর আবার লাল বাজার থানায়

কম্বলখানা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে পৃথ্বী—যাক কটা দিন একটু আশ মিটিয়ে ঘুমিয়ে নেই আগে, ভাবে মনে। কিন্তু কোথায় ঘুম। সুযোগ যখন মেলে, তখন তার পাত্তাও পাওয়া যায় না।

কুরীরা কি করছে এখন? কপালে দুর্ভোগ আছে কিছু, মিছিল থেকে ধরা পড়েছে যখন।

মিঠুর দিশাহারা ব্যাকুল মুখখানা স্পর্শ করছে বারে বারে। আর তারই সাথে সাথে চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে ধানক্ষেতের উদাস প্রান্তে দাঁড়ান শীতার বিদীর্ণ চেহারাটা। শীতা এমন করে অলক্ষিত অগোচরে জড়িয়ে রয়েছে তাকে! বারে বারে নাড়া দিচ্ছে মনে শীতার সেই অবগুণ্ঠনোন্মুক্ত তামসী মূর্তিখানি। মন শক্ত করতে চেষ্টা করে পৃথ্বী। এটা জেলখানা। পেছনের দিকে তাকিয়ে নিজেকে দুর্বল করা চলে না। শক্তির অনন্ত পরীক্ষা সম্মুখে।

ঘরের কোণায় বমি শুরু করেছে একজন। বমির শব্দে আর দুর্গন্ধে ভরে গেছে ঘরখানা। তাকিয়ে দেখে, মাতালের ঘোর কাটে নাই এখনও। আরও বার কয়েক এই উৎকট বমি সহ্য করতে হ'বে। প্রস্তুত হ'য়ে থাকে পৃথ্বী।

আর একজন ঢুকলো ঘরে। কম্বল থেকে মাথাটা একটু তুলে তাকিয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যায় পৃথ্বী। ছেলেটির রক্তাক্ত চেহারা দেখেই মনে মনে বলে, "এ আমাদেরই একজন। তাছাড়া আর এমন অহিংস অভ্যর্থনা জুটবে কেন।"

মাথা টলছে ছেলেটির। পৃথ্বী উঠে গিয়ে ধরে শুইয়ে দেয়। পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরে ফিনকি দেওয়া রক্তের মুখে। বছর তের চোদ্দ হ'বে হয়ত বয়স। উঃ! এইটুকু ছেলেকেও এমন করে মেরেছে? সমস্ত মন কঠিন হ'য়ে উঠে। ওরা ভাবছে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করবে? মুখ দিয়ে বড় বড় শ্বাস টানছে ছেলেটি প্রাণপণ

শক্তিতে। পৃথ্বী তাড়াতাড়ি কলসী থেকে জল এনে খাওয়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সমস্ত মুখটা ফুলে বিকৃত হ'য়ে উঠে—সহস্র সহস্র বোলতার কামড়ের মত। চোখদুটো আর দেখা যায় না—ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। মাথাটা কোলের উপর নিয়ে একটু আরাম দিতে চেষ্টা করে পৃথ্বী। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, "নাম কি ?"

"পারিজাত।" একটু দম নিয়ে বলে সে।

"আজ ত এই পর্যন্ত। কাল নাকি বরফের কুয়োতে পোঁতা হ'বে।"

মনের বল বাড়াতে চেষ্টা করে পৃথ্বী—"ফুচিক পড়েছো ?"

দৃঢ়তা ব্যঞ্জক হাসি ফুটে উঠে কিশোর বালকের ঠোঁটের কোণায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন পুলিস অফিসার এসে সরিয়ে নিয়ে যায় পারিজাতকে আলাদা 'সেলে'। ভুল করে এঘরে পাঠান হ'য়েছিল তাকে।

পৃথ্বী দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে অভিনন্দন জানায় পারিজাতকে। মনে মনে বলে, "লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করবে ভাবছো, কিন্তু লোহার চাইতেও কঠিন ধাতুতে গড়া এরা।"

রাত ঘন হ'য়ে আসে। মাতালরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়েদের ওয়ার্ড হ'তে ক্রমাগত আওয়াজ আসছে, "লাল ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ।" "ইনক্লাব জিন্দাবাদ।" "সরি-গলি সরকার কো, এক ঠোকর আওর দেও।" থানা যেন ফাটিয়ে ফেলছে মেয়েরা চিৎকারে। স্কুলে পড়া মেয়েই বেশী।

রাত ভ'রে গান করছে মেয়ে বন্দীরা—বিপ্লবের গান। "হম ভুখসে মরণে ওয়ালে······"

"ক্যা মওত্‌সে ডরনে ওয়ালে······"

নারী কণ্ঠের সমবেত উদাত্ত সঙ্গীতের সুর আছড়ে পড়ছে বন্দীশালার উঁচু প্রাচীরের গায়ে।

"আজাদী কা ডংকা বজা

"উঠাও অগ্নি ধ্বজা······"
"বর্গ যুধকি শেষ পুকার
আতি হায় বারংবার"

ফাটক-বন্দী কয়েদীরা গারদের ভিতর থেকে শুনছে গারদ ভাঙার গান। বন্দিনীরা গেয়ে চলেছে—

"হো তৈয়ার, হো তৈয়ার
মজতুর হোসিয়ার
হো কিসান্ হোশিয়ার।"

একদল বারাঙ্গনা ধরে এনেছে পুলিস। ব্যাভিচারী চেহারা। বাঙ্গালী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, চীনা, সব রকম মেয়ে আছে সে দলে।

তাকিয়ে দেখে পৃথ্বী, বারাঙ্গনাদের মেয়েদের ঐ একই ঘরে ঢোকান হ'চ্ছে। আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠে মেয়েরা, "সরি গলি সরকারকো, এক ঠোক্কর আওর দাও।"

পরদিন ভোরে উঠে পৃথ্বী বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়, কোন চেনামুখ চোখে পড়ে কিনা।

মেয়েদের ওয়ার্ড থেকে লাল সেলাম জানাচ্ছে একটি মেয়ে। লক্ষ্য করে দেখে পৃথ্বী—কুরী দাঁড়িয়ে রয়েছে মুঠিবদ্ধ হাত তুলে। পৃথ্বী প্রত্যভিবাদন জানায় বোনকে। চোখে চোখে হাসির বিনিময়।

আবার সংঘধ্বনি শুরু হয়।

ইনক্লাবের ধ্বনি দিয়ে ফাটিয়ে ফেলছে যেন কুখ্যাত লাল বাজার থানার ইটের গাঁথনিগুলি।

পুলিস সার্জেন্ট, ইন্সপেক্টার, অফিসারদের ত্রস্ত ব্যস্ত পদবিক্ষেপ শুরু হ'য়ে গিয়েছে। গাড়ী ভর্তি ভর্তি সশস্ত্র পুলিস চলেছে শিকার ধরতে।

মেয়েদের হল্লা লক্ষ্য করে বলে ওয়ার্ডেন, "আর বলবেন না

মেয়েদের মেজাজের কথা। একচুল এদিক ওদিক হ'লে আর রক্ষা নেই। গ্লাসশুদ্ধ চা ই ছুঁড়ে ফেলে দিল গায়ে। এটা যে জেলখানা সে ভ্রূক্ষেপ নেই। কি বেপরোয়া ভাব—রণচণ্ডীমূর্তি। ভয়ই করে কাছে যেতে।"

পৃথ্বী মৃদু হেসে উত্তর দেয়, "এতকাল ত আপনারাই রণচণ্ডী মূর্তি দেখিয়েছেন—এবার আপনারাও একটু দেখুন।"

"আসুন পৃথ্বীবাবু, আপনাকে রেখে আসি।" জানায় এসে যোগীন বাবু।

"রেখে আসি মানে? কোথায় পাঠাচ্ছেন—জেলখানায়?"

"হ্যাঁ। ঘুরে আসুন কিছুদিন। ক্ষতি কি? আপনার বন্ধুদের সাথে দেখা করে আসুন।"

বিরাট কাল কয়েদ গাড়ীর গহ্বরে ঢুকে বসে পৃথ্বী। আবার সেই পুরাতন জেলগেট। গাড়ীটা মোর 'ঘুরতেই পৃথ্বী বুঝতে পারে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ আট বৎসর পর আবার এই জেল। গাড়ীটা আসতেই ছোট লোহার কপাট খুলে তাদের গেটের ভিতর নিয়ে যায়।

"ইয়া, পৃথ্বীবাবু আপ্ ফিন আগিয়া। আভি ত স্বরাজ হো গিয়া, আভি ক্যায়া।" লাল বাহাদুর পৃথ্বীকে দেখে বলে উঠে। আগের আমলে সে ছিল সাধারণ সিপাই এখন তাকে দেখছে জমাদার হিসেবে।

'আইয়ে বাবু, ইধার আইয়ে।'

পৃথ্বীকে জমার খাতা বুঝিয়ে যোগীন বাবু চলে যায়।

ভিতরের ছোট একটা দরজা খুলে দিয়ে জমাদার পৃথ্বীকে বলে, "যাইয়ে বাবু, ভিতরমে আপকো বহুৎ সাথী মিল যায়গা।"

পৃথ্বী ভিতরে ভিতরে একটু বিব্রত বোধ করে। জেলের ভিতরের

অবস্থা সে ভালভাবেই জানে। বহিষ্কৃতদের অবস্থা বাইরের চাইতে ভিতরে আরও সঙ্গীন।

একটু ইতস্তত মনে তিন নম্বর ওয়ার্ডের দিকে পা বাড়াতেই রবীনের সাথে মুখোমুখী দেখা। রবীন ছিল পুরানো দিনের সহকর্মী। আগের আমলে অনেকদিন তারা পাশাপাশি সেলে কাটিয়েছে। গত সাধারণ ধর্মঘটের সময় সে বজবজে ধরা পড়ে। রবীন তাকে "সাতখাতার" দিকেই নিয়ে যায়। পৃথ্বী মনে মনে রবীনের জন্য চিন্তিত হয়ে ওঠে, হয় ত তার সব খবর রাখে না রবীন।

ধীরে ধীরে চলে পৃথ্বী। মাঝখানে একটা ছোট্ট পুকুর। পুকুরের চারদিকে লাল কাঁকড়ের সাজান রাস্তা। রাস্তার দুই ধারে নানা রঙের ক্যেনা ফুলের বিচিত্র বাহার।

কে বলবে এটা বন্দীশালা। কে বলবে এই রূপসী কলাবতী-দের চারদিকে কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে রয়েছে অত্যাচারের কত অস্থির আর্তনাদ!

রবীনের পিছু পিছু নীরবে হাঁটে পৃথ্বী। আগের আমলের বটগাছ দুটো আর দেখতে পায় না। খেলার মাঠটা এখনও রয়েছে। ঐ মাঠেই ফুটবল খেলা হত। সেই চাম্পিয়ান জগদীশ।

মনে মনে বিস্মিত হয় পৃথ্বী, বন্দীশালার অতীতও এমন করে মনে বাসা বেঁধে রয়েছে। ব্যর্থতার নিঃশ্বাসে ভারী অতীতের প্রতিও মমতা লুকিয়ে থাকে মনে!

একটা ছোট করিডোর পার হ'য়ে তারা 'সাতখাতা'র ভিতরে ঢুকে পড়ে। নূতন লোক দেখে সাধারণত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বন্দীদের মধ্যে। কিন্তু রবীনের সাথে আসতে দেখেই নিস্পৃহভাব দেখায় বন্দীরা। পৃথ্বী লক্ষ্য করে তা'। ওয়ার্ড ম্যানজার সুশীলবাবু পৃথ্বীকে ১৫ নম্বর ঘরে নিয়ে যায়। "আপনি যে-রকম গ্রন্থকীট—

আপনার পক্ষে এ ঘরেই সুবিধা হ'বে। নিরিবিলি আছে। আর পরিচিত লোকও দু'একজন পেয়ে যাবেন আশা করি।" বলে চলে যায় সুশীলবাবু।

কয়দিনের মধ্যেই ভিতরের অবস্থা বুঝে ফেলে পৃথ্বী। এই ১৫ নম্বর ঘর অবাঞ্ছিতদের জন্য। অবাঞ্ছিত অর্থাৎ যাদের মনে পার্টির নীতির সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে মনে। পৃথ্বীর মনে পড়ে সেই পুরানো দিনের কথা। প্রায় ষোল বছর আগেও তাকে একবার থাকতে হয়েছিল এই ঘরে। তখনো ছিল এই ঘর অবাঞ্ছিতদের জন্য। সেদিনও মনে প্রশ্ন জেগেছিল—সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। তখনকার "দাদা"রা ব্যঙ্গ করত তাকে। তার এই জিজ্ঞাসামুখর মনকে। আজও ঠিক তেমনি। আশ্চর্য মিল মনে হয়!

লাল বাহাদুর ভোর বেলায় এসেছে লক আপ খুলতে। পৃথ্বীকে দেখে নমস্কার জানায়—"আপকো তবিয়ৎ আচ্ছা হায়?"

পৃথ্বীও প্রতি নমস্কার জানায়।

সুশীল লক্ষ্য করে। জমাদার চলে গেলে পৃথ্বীকে ডেকে পাঠায়। পৃথ্বী আসতেই আদেশমিশ্রিত সুরে জানায় সুশীল, "পুলিসের সঙ্গে এত মাখামাখি আমরা কিন্তু ভাল মনে করছি না, পৃথ্বীবাবু। এত নমস্কারের প্রয়োজন বা কিসের? জেলফ্রন্টের প্রধান সংগ্রাম ত এখন এদের সাথে। লক্ষ্য করছি, আপনি অন্যান্য সাধারণ সেপাইদের সাথেও অত্যন্ত ভালমানুষী করেন। মনে রাখবেন, আমরা সাম্যবাদী —গান্ধীবাদী নই। আপনার মজ্জায় মজ্জায় গান্ধীবাদ লুকিয়ে আছে। তাই সাবধান করে দিচ্ছি, সংস্কারবাদী চশমা দিয়ে আর এদের দেখলে চলবে না।"

পৃথ্বী আবার তার নিজের কুঠরিতে ঢুকে পড়ে। একে বন্দী-জীবন—তার উপর একেবারেই নিঃসঙ্গ। তবু বই দিয়েই এ

নিঃসঙ্গতাকে ভুলে থাকতে আশ্চর্য রকমের অভ্যস্ত সে। বইয়ের ভিতরেই ডুবে থাকে সারাদিন। আর লক্ষ্য করে জেলখানার রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততা। দিনের মধ্যে প্রায় ছয় সাত ঘণ্টা সভা চলে। শাণিত ইস্পাতের আঘাতের মতই কমরেডদের ত্রুটির সমালোচনা।

একটা সাধারণ সভার আলোচনা পৃথ্বীর কানে আসে। কমরেড মনীষ মাত্র কয়দিন আগে দেশবন্ধু পার্কের বিক্ষোভে ধরা পড়ে। সে এসে বক্তৃতা দেয় :

"দিকে দিকে আজ বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে। লাখে লাখে জনতা আমাদের ডাকে এগিয়ে এসেছে। কারখানার পর কারখানা শ্রমিকরা দখল করছে। শাসক শ্রেণী ভয়ে কম্পমান। কৃষকরা জমি দখল করে নিচ্ছে। জোতদারেরা ভয়ে পালিয়েছে। কোলকাতার রাজপথে বিপ্লবের বান ডেকে উঠেছে—এই হ'চ্ছে বাইরের ছবি।......"

বিকেলে রবীনকে মাঠে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে পৃথ্বী, "আচ্ছা, কি ব্যাপার বল ত? বাইরের পরিস্থিতি সম্বন্ধে এ রকম মিথ্যা পরিবেশনের অর্থ কি?"

রবীন উত্তর দেয় "বিপ্লবের এটাও একটা ফ্রণ্ট। এখানেও সংগ্রাম চাই। তাই এখানকার সৈনিকদের মন চাঙ্গা রাখা দরকার। কোনও মিথ্যাই মিথ্যা নয় যদি তার উদ্দেশ্য খাঁটি হয়। কয়েক জন কমরেড ভিতরের এই সংগ্রামের 'পারস্পেকটিভ' জানতে চেয়েছিল নেতাদের কাছে। তার উত্তরে এক নেতা জানিয়েছেন, —পারস্পেকটিভ জানতে চাইছো? লজ্জা করে না? রুটি মাখন খেয়ে খেয়ে মোটা হচ্ছো সব। মরতে পার না?"

কুবীদের যাদের যাদের ধরেছিল একসাথে—সবাইকে ছেড়ে

দিয়েছে। কুরী বাড়ী এসে দেখে পৃথ্বীকে ছাড়ে নাই এখনও—রথীর সাথে দেখা করতে যায় সে পৃথ্বীর খবর জানতে। রথী ঠাট্টার স্বরে বলে, "শ্রীঘর ঘুরে আসা হল ? যাক হাতের জল শুদ্ধ হ'ল এবার।"

"ছাড়বে না দাদাকে ?" ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসা করে কুরী—পৃথ্বীর সেই থানার বারান্দায় দাঁড়ান-চেহারাটা থেকে থেকে চোখে ভাসছে। "কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এদের মর্জি কখন কি হয় বলা যায় না। চেষ্টা ত করছি জামীনের জন্য। তুমি এই ইণ্টার-ভিউর দরখাস্ত নিয়ে যাও এস, বি অফিসে।" একটা দরখাস্ত লিখে দেয় রথী।

বাড়ী ফেরার পথে বোধনের বাড়ী হ'য়ে যায় কুরী। জানায় তাকে, ফল্গুর সাথে দেখা করতে চায় সে।

"এই সদ্য হাজত থেকে বেরিয়েছে—হাজতের কম্বলের গন্ধও ত যায়নি এখনও। 'ফেউ' নিশ্চয়ই ঘুরছে পিছু পিছু গন্ধ শুঁকে শুঁকে।"

"কেউ চিনতে পারবে না আমাকে, দেখ, তোমরাই চিনতে পারবে না।"

অগত্যা রাজী হয় বোধন।

সন্ধ্যার আগে বোধন ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে অপেক্ষা করে এক সিনেমা হলের সামনে।

কুরী মাদ্রাজী মেয়ের মত চুলের বিন্যাস করে বিনুনিতে ফুলের গুচ্ছ গুঁজে দেয়। ঘন কাজল আঁকা চোখে রীমলেস চশমা। মাদ্রাজী কায়দায় পরা একখানা দামী শাড়ি। কপালে অনুরাধা টীপ। ঠোঁটে আলতভাবে বুলান লিপ্‌স্টীক। নাকে নকল হীরার ফুল।

"টিকিট বুঝি পাওনি ?" মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করে ইংরাজীতে।

বোধন সমর্থনের চোখে একবার তাকিয়ে দেখে নেয়, কুরীকে। একই স্বরে জবাব দেয়—"না, আজ আর হল না চল ফিরে যাই।"

ট্রাউজারের ওপর সুন্দর রংয়ের একটি বুশজ্যাকেট গায়ে তারও। এক সিমপ্যাথাইজার গুজরাটী ছাত্রের বাড়ী।

কোণার দিকে একখানা ছোট্ট ঘরে শুয়ে আছে ফল্গু—পায়ের যন্ত্রণা কমে নাই। জ্বরও আছে।

হঠাৎ একটি মেয়েকে ঘরে ঢুকতে দেখে মুহূর্তের জন্য একটু ত্রস্ত হ'য়েই অবাক হয় ফল্গু।

কুরী হেসে বলে, "দেখো গোঁপও লাগাইনি, গোঁপও কামাইনি তাও ত চিনতে দু'বার তাকিয়ে দেখতে হ'ল।"

প্রথমই বকুনি শুরু করে ফল্গু "ও রকম বোকার মত সবশুদ্ধ ধরা পড়লে কেন। পুলিস আসলেই কি-ভাবে সরে পড়তে হয়—এদ্দিন ধরে শিখিয়েও এই কাণ্ড।"

"শেখানটা সোজা—কিন্তু কাজটা অত সোজা নয়। তার প্রমাণ ত তুমি নিজেই। তোমার পায়ে গুলি লাগলো কেন।"

গুলির কথায় মনটা আবার খারাপ হ'য়ে যায় ফল্গুর, পাটা যদি কেটে ফেলতে হয়। সারা জীবন খুঁড়িয়ে চলতে হ'বে।

বিরক্তি চাপা স্বরে প্রশ্ন করে ফল্গু—"কিন্তু এখানে এসেছো কি কাজে?"

"এমনি এসেছি। তোমাকে দেখতে এলাম।"

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পায়ের বেদনাটা কনকন করে উঠছে থেকে থেকে।

আরও চটে যায় সে—"কেন? আমি কি চিরিয়াখানার জন্তু যে আমাকে দেখতে এসেছো। পাটা খোঁড়া হোক আগে তখন না হয় দেখো কেমন দেখায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে।"

এ অপ্রত্যাশিত হঠাৎ রূঢ় আঘাতে চোখ ভিজে উঠে কুরীর—"কেন যে এসেছি তুমি বুঝবে না তা' কোনদিনই, জানি। তবু এলাম।"

আর কিছু বলতে পারে না সে। অবরুদ্ধ কান্নায় থেমে আসে কথা।

ফল্গু তাকিয়ে দেখে। মনটা ভিজে উঠে। "মিছিমিছিই ওকে আঘাত দিলাম, ওর দোষ কি।" ভাবে মনে। ক্ষমা-চাওয়া সুরে বলে ফল্গু "কুরী, কিছু মনে করো না। কদিন ধরে এ ভাবে শুয়ে থেকে থেকে মেজাজটা বড় রুক্ষ হ'য়ে গিয়েছে।"

স্থির চোখে কুরীকে দেখে কিছুক্ষণ। তারপর আন্তরিক সুরে বলে "উঠে এস কুরী। সামনে এসে বোস।"

কুরী এসে বসে ফল্গুর শয্যার ধারে।

"এইখানে হাত রাখ।" বলে নিজের হাতখানা এগিয়ে ধরে ফল্গু। হাত রাখে কুরী—যেন এ আদেশ অমান্য করার সাধ্য নেই তার।

কুরীর নরম হাতখানা বহু শপথ আঁকা বলিষ্ঠ হাতে চেপে ধরে, বলে ফল্গু প্রগাঢ় স্বরে, "কেন যে এখানে এসেছো তুমি—তা' আমি জানি।"

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পায়ের দিকে চোখ বুলিয়ে কি একটু চিন্তা করে' বলে সে—"কিন্তু একমাত্র এ জানাকেই গ্রহণ করবো দুজনে। তার বেশী আর কিছু প্রত্যাশা করবো না কেউ কারও কাছে কোনদিন—এ প্রতিজ্ঞা করে যাও আমার হাতে এই হাত রেখে।"

মধুর অঙ্গীকারময় হৃদয়ের স্বীকৃতি ধরা দিয়েছে নীরব হাতের গাঢ় স্পর্শে—রৌদ্রস্পর্শ লেগেছে কুমারী হৃদয়ের কুঁড়িতে—প্রত্যাশাময় প্রতিটি লুকানো পাপড়িতে। ছলনা করতে পারবে না কুরী নিজেকে এ নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা দিয়ে। চিরদিনই প্রত্যাশা করবে সে ফল্গুকে, ফল্গু না করলেও তাকে।

নিঃশব্দে হাত সরিয়ে নেয় সে।

পশ্চিমের জানালা দিয়ে রোদের ধারা লুটিয়ে পড়ছে ফল্গুর চোখেমুখে—। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যখানি জমা হ'য়েছে যেন ঐ

রৌদ্র বিচ্ছুরিত চোখের নীলাভ তারায়, ভুরুতে, কপালে, অবিন্যস্ত চুলের প্রতিটি রেখায়। কুরীর অনিমেষ নেত্রে ধরা দেয় অনুচ্চারিত কথা।

তার এ সম্মোহিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে বলে ফল্গু, "আর কখনও এসো না এখানে। কাজ করে যাও। অনেক কাজ বাকি। আমরা অনেক কিছুই করলাম কিন্তু করা হ'ল না কিছুই।"

"আচ্ছা, না হয়, নাই আসলাম। কিন্তু পায়ের যন্ত্রনা ত কমে নাই দেখছি।" বলে কপালে হাত দিয়ে দেখে, "জ্বরও ত আছে।"

নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় কুরী। চোখ ভিজে উঠছে তার। এমন রূঢ় আঘাত ফল্গু শিখলো কোথায়? কিন্তু সত্যি সত্যি পা টা যদি নাই বাঁচান যায়। পরের দিন ভোরে উঠেই আবার আসে কুরী। ফল্গু বিস্মিত হ'য়ে বলে "কি খবর। কাল কি কথা বলে দিয়েছিলাম, ভুলে গেলে একরাতেই।"

"আমি সারাদিন এখানেই থাকবো ঠিক হ'য়েছে, তোমার নার্স করার জন্য।"

"ঠিক করলো কে।"

"দ্রুপদ দা আর বোধন দা"

"ষ্টুপিড সব।" "আর লোক পেল না নার্স করার জন্য। যাও, ওদের গিয়ে বল আমায় নার্স করার জন্য কোনও লোক লাগবে না। আমি হাসপাতালে ভর্তি হ'য়ে যাব।"

"কেন এমন পাগলের মত কথা বলছো? কি হ'য়েছে তোমার বল তো", মৃদু তিরস্কারের সুরে বলে কুরী।" "নিখুঁত নার্সিংয়ের উপর অনেকখানে নির্ভর করছে তোমার পা। কাল আমি গিয়েছিলাম ডাক্তার মিত্রের কাছে। তিনিই বলেছেন, আমাকে থাকতে। তিনি আসবেন দেখতে।"

"তাকে যে আনছো—"

"সে দায়িত্ব আমার।" স্পষ্ট স্বরে জবাব দেয় কুরী।

"আমার বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন তিনি। তাঁর দ্বারা কোনও ক্ষতি হ'বে না তোমার।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার মিত্র ডাক্তারী যন্ত্রপাতির বাক্সো নিয়ে উপস্থিত হয় বোধনের সাথে।

ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখে চিন্তিত হ'য়ে উঠে অভিজ্ঞ ডাক্তার। বড় দেরি করে ফেলেছে তাকে ডাকতে। ক্ষত পরিষ্কার করা আরম্ভ করে। দাঁতে দাঁত চেপে থাকে ফল্গু। তুলো ব্যাণ্ডেজ ওষুধ সব ঠিক করে এগিয়ে দেয় কুরী।

"বিকেলে আবার এসে দেখে যাব। ওষুধগুলো ঠিকমত খাওয়া হয় যেন।" বলে চলে যায় ডাক্তার মিত্র।

যন্ত্রণাটা একটু কমে আসলে বোধনের দিকে তাকিয়ে বলে ফল্গু, "ওর ফির এত টাকা কোথায় যোগাড় করবো। কত কৃষক কমরেড ফাঁসির আসামী হ'য়ে জেলে পচছে, এভাবে এখন টাকা খরচ করার সময় নাকি?"

কুরী ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, "আমি দিয়েছি টাকা।"

"তুমি কি চাকরি কর? পৃথ্বীদার টাকা দিয়ে ডাক্তার ডাকা হ'য়েছে টের পেলে, আমার অবস্থা কি হ'বে জান ত? পা সারলেও মাথা শুদ্ধই গর্দান যাবে আমার।"

"আমার নিজেরই টাকা। একটা চুড়ি বিক্রী করেছি কাল। দাদা ত জেলে।"

"পৃথ্বীদাও অ্যারেষ্ট হ'য়েছে।" হঠাৎ চুপ করে যায় ফল্গু। মনের ভিতরে কিসের একটা উত্তর যেন খুঁজে পায় সে। পৃথ্বীর বিরুদ্ধে বহু ইঙ্গিত কটাক্ষ আর সন্দেহময় দৃষ্টির যোগ্য জবাব' এই।

বোধন চলে যায়।

আর কথা বলে না ফন্তু, অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষতটা জ্বলে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে কড়া ওষুধের প্রক্রিয়ায়।

কুরী উঠে যায় রান্নাঘরের দিকে—ফন্তুর জন্য দুধ সাবু জ্বাল দিতে।

গুজরাটি কমরেডের মায়ের সাথে আলাপ জমায় একটু আধা হিন্দিতে। প্রৌঢ়া মহিলা।

অনুযোগের সুরে বলে পরিষ্কার হিন্দিতে "আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি, বড় ডাক্তার ডাকা উচিত।" কুরীর কচিমুখ খানায় চিন্তার ছায়া লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার কে হয়? ভাই?"

"না, ভাই না।" সংকোচে জড়ানো সুরে উত্তর দেয় কুরী। আর কিছু বলে না। কিন্তু তার চোখে মুখের লালিমায় যে লজ্জা ঘনিয়ে আসে, অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তা'। মনে মনে হাসে একটু কমরেডের মা। অজানিতে শুভাশীর্বাদ ঝরে চোখের কোণায়।

কুরীর সাথে ইনটারভিউএর সময় বলে দেয় পৃথ্বী, কাল সম্ভবত ছেড়ে দেবে তাকে।

পরদিন সকালবেলা উঠেই রথী অপেক্ষা করে ব্রিজের ধারে। প্রায় বেলা দশটার সময় পৃথ্বী জেল গেট থেকে বেরিয়ে আসে।

রথী এগিয়ে গিয়ে সহাস্তে বলে, "স্বরাজী জেলখানা দেখে এলে? অহিংস ব্যবস্থা কেমন লাগলো?"

"অহিংসই বটে।" শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলে পৃথ্বী।

পারিজাতের ক্ষতবিক্ষত কচি মুখখানা চোখে ভাসে। বহু কাজ রয়েছে সামনে। সবার আগে এই ছেলেগুলিকে বের ক'রে আনতে হ'বে।

"ফন্তুর খবর জানিস নাকি কিছু।"

"পা টা বোধ হয় টিকে গেল এই যাত্রায়, তবে প্রাণটাই আবার কোন যাত্রায় হারায় ঠিক কি।"

রথী বাস থেকে নেমে বলে, "শীতাদি কিন্তু অপেক্ষা করছে তোমার জন্য, তোমার বাড়ীতে। আমার অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ ছিল মনে সত্যি ছাড়বে কি না।"

শীতা অপেক্ষা করছে যে তার জন্য, রথী না বললেও সে তা জানে। শীতা যে তারও ভিতরে কতখানি জুড়ে রয়েছে আজও, টের পেয়েছে সে সেই গ্রেপ্তার হওয়ার দিন থেকেই।

রথীও আসে পৃথ্বীর সাথে। "তোমার গৃহ-প্রত্যাবর্তনের ভোজটা একটু চেখেই যাই।"

ভীমার্জুন কেঁদে ফেলে পৃথ্বীকে দেখে।

"কাঁদছো কেন ভীমকাকা? দাদাবাবুকে বাড়ী নিয়ে এলাম। ভাল করে বাজার করে নিয়ে এসো।"

ভীমার্জুন তবু চোখের জল ফেলে, "আমি আর এখানে থাকবো না দাদাবাবু। তীর্থে চলে যাব। এমন শূন্য পুরীতে মানুষ থাকতে পারে?"

রথী বলে, "সেজন্য আর ভাবতে হ'বে না, ভীমকাকা। এর পরের বার যখন আসবে তোমাকে শুদ্ধ নিয়ে যাবে সাথে।" কমিউনিষ্টদের সাথে একদিনও যারা একসাথে বাস করেছে, তাদের উপরেও শমন ঝুলছে অফিসে অফিসে। আর তুমি বারবছর ধরে বাস করছো কম্যুনিষ্টদের সাথে। এক যুগ। তোমাকে আপ্যায়ণ না করে পারে সরকার?"

দিনকয়েক পর রথীকে লিখে পাঠায় পৃথ্বী—কথা আছে তার সাথে। রথী এল বলে পৃথ্বী, "আমার হ'য়ে সুমিত্রাকে অনুরোধ জানাবি সে যেন সুন্দরপ্রকাশকেই বিয়ে করে।" সুচিন্তিত সংকল্পের সুর স্বরে। রথী বিস্মিত হ'য়ে মুখের দিকে তাকায়। পৃথ্বী তার বিস্ময়

লক্ষ্য করে বলে, "সুমিত্রা জানে, সুন্দরপ্রকাশ যে তাকে ভালবাসে। একজন আদর্শবান ও হৃদয় বান কমরেডের ভালবাসার প্রতিদান দেওয়াটা একটি কমরেড মেয়ের পক্ষে শক্ত কাজ নয়। 'প্রেমই প্রেমের ইন্ধন যোগাবে'। আর তাকে বলিস, সে যেন আমার অনুরোধে ভুল বোঝে না আমাকে—আমি তাকে শ্রদ্ধা করি এবং সে আমার শ্রদ্ধার পাত্রী থাকবে চিরদিন।"

রথীর বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে প্রগাঢ় স্বরে বলে পৃথ্বী, "তোর অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না, রথী,—আমি শীতাকেই ভালবাসি। তার এ নিঃসঙ্গ জীবনে আর কিছু না পারি শুধু তাকে জানতে দিতে চাই আমি তার পাশে ই রয়েছি।"

শীতাকেই যে ভালবাসতো পৃথ্বী এ অনুমান করেছিল সেও একদিন। কিন্তু আজও যে ভালবাসে পৃথ্বী শীতাকেই, আর এ কথা এত স্পষ্ট করেই জানাতে পারলো সে লক্ষ্য করে' মনে মনে শ্রদ্ধা করে সে পৃথ্বীর এ স্পষ্ট স্বীকৃতিতে।

মানুষের প্রেম কত বিভিন্ন ধারায় বয়ে বলেছে পৃথিবীতে। ব্যক্তিগত তুচ্ছ ব্যাপার বলে অবজ্ঞা করতে পারে না আজ আর সে এ হৃদয়াবেগকে। সাগরী তাকে এক নূতন অভিজ্ঞতা দিয়ে গিয়েছে। আমরণ জীবনানুভূতির সাথেই জড়িয়ে থাকবে তার এ হৃদয়ানুভূতি।

বাড়ী ফেরার পথে পার্কের একটা বেঞ্চিতে এসে বসে রথী। সাগরীর কথাই বারে বারে মনে পড়ছে আজ। কেমন করে তার জীবনের সাথে একদিন জড়িয়ে পড়লো সে।······কমরেডদের পরিচয় পত্রিকা পাঠাতে হ'বে পার্টির কাছে—নাম ধাম পিতার নাম ইত্যাদি দীর্ঘ এক তালিকার শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ করছে কমরেডরা। সাগরীর কাছেও নিয়ে যায় রথী 'ফরম' পূর্ণ করাতে।

ফরমখানা তুলে নিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করে ফিরিয়ে দেয় হাতে।

রথী কাগজখানায় চোখ বুলিয়ে চূড়ান্ত বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে মুখের দিকে তাকায়। ভাবী স্বামীর নামের স্থানে লিখে রেখেছে তারই নাম—'রথী বানার্জী'।

প্রথম অনুভূত এক বিস্ময়কর পুলকের স্রোত বয়ে চলে তার ভিতরে। সাগরীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে তবু, "ভেবে লিখলেন ত?"

"আমার ভাবনা ত শেষ হ'য়েই রয়েছে—এবার আপনার ভাবাব পালা।" উত্তর দিল সাগরী।

মাত্র কয়টি মিনিটের ঘটনা কেমন করে সমস্ত জীবনের ঘটনাকে নূতন রঙে রূপান্তরিত করে দিল সাগরী। প্রেম যে এত মধুর জানতো না তা' রথী। কিন্তু এত দুঃখও যে রয়েছে প্রেমে তা ও ত জানতো না সে।

পথে চলতে চলতে চোখের সামনে ভেসে উঠে বহুদিনের বহু রাত্রির টুকরো টুকরো ছবি।

অনুশোচনায় বিদ্ধ হয় রথী। ভুলতে পারে না সে, শেষ দিনটিতে রূঢ় ব্যবহার দিয়ে বিদায় দিয়েছে যে সে সাগরীকে। সাগরীর সাথে শেষ দিনটির স্মৃতি জীবন ভ'রে বিঁধবে তার বুকের পাঁজরে।

রথীর মুখে পৃথ্বীর মত পরিবর্তনের কথা শুনে চমকে উঠে শীতা। একি করছে পৃথ্বী। কিসের জন্য সুমিত্রাকে দূরে সরাচ্ছে। সুমিত্রা সহকর্মী, একই আদর্শের ভিতর দিয়ে অনুভূত এ প্রেম মলিন হ'তোনা কোনদিন, পৃথ্বীওত জানে তা'। তবু কেন এ মত পরিবর্তন। আবার সেই আত্মছলনার পুনরাবৃত্তি?

পৃথ্বীর সাথে সেদিনই দেখা করে' শীতা। "আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে", ভূমিকা না করে বলে সে, "সুমিত্রাকে বিয়ে করুন আপনি। জীবন ভ'রে কি শুধু নিজেকে নিয়ে খেলাই খেলবেন?"

পৃথ্বী স্থির দৃষ্টিতে শীতার মুখের দিকে তাকিয়ে হজম করে নেয় কথার কশাঘাতটুকু। তারপর উত্তর দেয় সংযতস্বরে, "এ অনুরোধ আমার রাখা সম্ভব নয়, শীতা।"

"কিন্তু আপনি ত সুমিত্রাকে ভালবাসেন।"

শীতার দৃষ্টির সাথে দৃষ্টি মিলিয়ে দেয় পৃথ্বী। গভীর অতলস্পর্শী প্রেমদৃষ্টি।

অনকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দেয় সে, "কিন্তু শীতাকে যে তার ও বেশী ভালবাসি।"

ভিতর শুদ্ধ কেঁপে উঠে যেন শীতার—একি কথা উচ্চারণ করছে আজ পৃথ্বী। আর সাত বছর আগে যদি এই কথাটুকুও বলে যেত সে—তার জীবনের তার আজ অন্য স্বরে বাঁধা থাকতো।

তবু এক অননুভূত অনুভূতির আলোড়ন অনুভব করে সে শিরায় শিরায়। প্রেম-স্বীকৃতির এ প্রথম উপলব্ধিতে সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলে যেন শীতা। এর চাইতে মধুর, এর চাইতে সান্ত্বনার কথা আর কিছু নেই তার জীবনে—তবু এ সান্ত্বনাকে গ্রহণ করার পথ তার নেই।

মূহুর্তের মধ্যে নিজেকে আয়ত্তে এনে ফেলে সে—এ প্রেম গ্রহণ করার অধিকার তার নেই। দেবজ্যোতির মৃত্যুর জন্য নিজেকেই যে দায়ী মনে করে শীতা। তার এ অপরাধী জীবনের সাথে জড়াতে পারেনা তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে। নতদৃষ্টি দিয়েও অনুভব করে শীতা, পৃথ্বীর দৃষ্টি অনুপ্রবেশ করতে চাইছে তার হৃদয়ের গভীর অভ্যন্তরে। এ দৃষ্টি আচ্ছন্ন না করে পারেনা তাকে।

ধ্রুবতারার মত সমস্ত জীবন ভ'রে অনুসরণ করবে শীতাকে পৃথ্বীর এই অনুরাগী দৃষ্টি। তবু সমস্ত শক্তি একত্রিত করে উত্তর দেয় শীতা, "সুমিত্রাকেই বিয়ে করুন আপনি। শীতার পক্ষে আজ আর ভালবাসা সম্ভব নয় কাউকেই।"

বিস্মিত হয় পৃথ্বী। একি অপ্রত্যাশিত উত্তর!

তার কথায় বেদনার ছায়া নেমে এসেছে পৃথ্বীর চোখের পাতায়, লক্ষ্য করে ভিতর শুদ্ধ থেঁতলে যায় যেন শীতার। তবু এই রূঢ় আঘাতই একমাত্র উত্তর তার।

পৃথ্বী আহত স্বরে বলে, "শীতা, সাত বছর আগে হ'লে এই তোমার শেষ উত্তর বলে' ধরে নিতাম। কিন্তু আজ বুঝেছি, মানুষের কথার উপরেও যে সত্য লুকিয়ে রয়েছে, তা' রয়েছে মানুষের হৃদয়ে, মানুষের মনে। তোমার মনত লুকাতে পারনি তুমি। নিজেকে ছলনা করছো কেন, শীতা।"

আর যেন স্থৈর্য রক্ষা সম্ভব নয় শীতার। আবেশময় আবেগে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে সংযমের শেষ বাঁধ। কিন্তু মরিয়া হ'য়ে আত্মসংবরণ করে বলে সে, "আমি আমার সন্তানকে অবলম্বন করেই বাঁচতে চাই।"

দুঃখিত স্বরে উত্তর দেয় পৃথ্বী, "শীতা, মিঠুকে বাদ দিয়ে ত তার মাকে আমি চাইনি। দু'জনকে ভালবাসার মত প্রশস্ত স্থান রয়েছে আমার মনে।"

মনে মনে ভাবে শীতা, বড় হ'য়ে মিঠুর চোখে যদি ম্লান ছায়া ঘনিয়ে আসে কোনদিন, সে ছায়ায় ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবেনা কি পৃথ্বীরও জীবন।

মনে মনে আর্তস্বরে বলে সে, "আমার মনের অপরাধ-বোধ কোথায় বিঁধেছে, তা'ত আপনি জানেন না। 'একটি মানুষকে পৃথিবীর জীবন থেকে বঞ্চিত করেছি আমি, একটি শিশুকে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি—' এ অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবো আমি নিজেকে বঞ্চিত করে।"

এই অপরাধী মন নিয়ে পৃথ্বীর কাছে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব নয় তার। কিন্তু একথা পৃথ্বীকে জানায় সে কি করে।

ক্লান্ত অনুরোধের সুরে বলে শীতা, "আমাকে দুর্বল করে' দুঃখ দেবেন না আর।"

এ বেদনার্ত সুরে চমকে মুখের দিকে তাকায় পৃথ্বী। মনে মনে অর্থ খুঁজে পায়না—কেন এত দুঃখ পাচ্ছে, কিসের এ আপত্তি। সামাজিক অনুশাসন কি এত তীব্র শীতারও মনে?

ব্যথিত সুরে বলে পৃথ্বী, "তোমাকে দুঃখ দিতে ত চাইনি আমি, শীতা। আর দুঃখ পাও, এমন কিছু করতে বোলবো না আমি কোন দিন। তবে তোমার জন্যই অপেক্ষা করবো আমি চিরদিন। সমস্ত দ্বন্দ্ব কাটিয়ে আসতে পারবে যে দিন, সেদিনের অপেক্ষায় থাকবো আমি।"

চোখের পাতা ভিজে উঠে শীতার। নিঃশব্দে কাঁদে। বুকের ভিতরে ফুলে ফুলে উঠে অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগ। মনে মনে প্রেমার্তস্বরে উচ্চারণ করে, "পৃথ্বী। পৃথ্বী।" সমস্ত জীবন ভ'রে সেও ত ভালবাসবে পৃথ্বীকে, তবু এ প্রেম গ্রহণ করার উপায় নেই তার। এ ব্যবধান যে কত নিদারুণ, তাও পৃথ্বীকে জানান যাবে না আর। সমস্ত মন যার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে প্রতিটি পল, প্রতিটি পলাংশ, তারই প্রতি চরম উদাসীনতা দেখাতে হ'বে তাকে। সমস্ত জীবন কি শুধু অন্তর্দ্বন্দ্বেই খান খান হ'বে সে। দেবদ্যোতির সন্তানকে—তার মিঠুকে স্পর্শ করতে দিতে পারে না সে কোনও দুঃখমলিনতা। কিন্তু পৃথ্বী। পৃথ্বীকে দুঃখ দেবার অধিকারও ত নেই তার। তার জীবনের সাথে জড়িয়ে জড়িয়ে দুঃখ বাড়ান চলবে না আর। নিষ্ঠুর রূঢ় ধাক্কায় সরিয়ে নিয়ে যেতে হ'বে নিজেকে পৃথ্বীর দুয়ার থেকে। এ সুন্দর পৃথিবীতে জীবন স্পন্দন অনুভব করছে কি সে শুধু দুঃখ দেওয়া আর দুঃখ পাওয়ার জন্যই।

পৃথ্বী নিশ্চুপ হ'য়ে তলিয়ে দেখে এ দুঃখ রহস্যকে। বুঝতে চেষ্টা করে শীতার মনের আপত্তির উৎস কোথায়।

সামন্ততান্ত্রিক দেশের অভিশাপ এই ত—এই দুঃখ, এই নিঃশব্দ ক্রন্দন। মজ্জায় মজ্জায় মেশান সামন্ততান্ত্রিক বিবেকানুভূতি। স্নেহ আর প্রেমের সংঘাত। প্রেম আর বুদ্ধির সংঘাত। কিন্তু এ ত চিরন্তনী সমস্যা নয় মানুষের। বুদ্ধি আর বেদনার এই দ্বন্দ্বের একদিন শেষ আসবেই।

কিন্তু তার আগে বহু পৃথ্বী শীতার জীবনের বিয়োগান্ত রচনা রচিত হ'বে অদৃশ্য অক্ষরে লোকচক্ষুর অন্তরালে, আড়লে। প্রেমাশ্রু গোপনে গলে গলে পড়বে নিঃশব্দে, নীরবে।

দিন কয়েকে মধ্যে পৃথ্বী আবার দেখা করে শীতার সাথে। "শুনলাম তুমি নাকি দেশে চলে যাচ্ছ।"

ম্লানস্বরে উত্তর দেয় শীতা—"শাশুড়ীর অসুখ।"

পৃথ্বী শীতার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে—একি চেহারা করেছে শীতা। এক অব্যক্ত যন্ত্রণার ছায়া চোখের কালিতে। বিনিদ্র রজনীর ছাপ সর্বাঙ্গে।

লক্ষ্য করেছে পৃথ্বী, শীতা যে আর যায় না তার বাড়ী। মনে মনে ধিক্কার দেয় পৃথ্বী, "হায়রে সামন্ততন্ত্র, তোমার স্থান নেই আমাদের বিশ্বাসে। আত্মা পর্যন্ত বিদ্রোহ জানিয়েছে। তবু তোমার অদৃশ্য শাসনের কালি পড়বে চোখের তলায় আর কতকাল। তিল তিল করে ক্ষয় করবে ফুসফুসের আর কত যুগ।"

মুখে বলে, "একজন নিসঙ্গ মানুষের সাহায্য করতে যাচ্ছ, তাতে বাধা দেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু সত্যি করে বল ত ফিরবে ত আবার?"

তারপর একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে বলে, "আত্মনির্যাতনকেই অবলম্বন রূপে ধরার এ সুযোগ ছেড়ে আসা সম্ভব হবে ত আবার।"

শানিত চোখে তাকায় শীতা পৃথ্বীর দিকে। উত্তর দেয়, "আত্ম নির্যাতন কেন করে লোকে। তারও ত একটা কারণ আছে। আরও একটু যদি তলিয়ে দেখতেন তবে নিশ্চয়ই বুঝতেন যে সে কারণ আপনিই।"

ভীষণ ভাবে হোঁচট খায় পৃথ্বী এ রূঢ় আঘাতে।

তবু ক্লান্তস্বরে প্রশ্ন করে, "পুরান ক্ষতকে আর কতকাল জিইয়ে রাখবে শীতা! আমার অপরাধ কি অমার্জনীয় হ'য়েই থাকবে চিরকাল?"

লজ্জিত হয় শীতা। তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বলে, "না ফিরে কি উপায় আছে আমার। পৃথিবীর মাধ্য আকর্ষণের চাইতেও বড় আকর্ষণ রয়েছে যে আমার এই কোলকাতায়।"

দেশের অবস্থা শান্ত হ'য়ে আসলে শীতার শাশুড়ী মেনকা কাশী থেকে দেশের বাড়ীতে ফিরে আসে। দেশ বিভাগের ফলে, নানা রকম কায়ক্লেশে আর মানসিক অশান্তিতে শরীরের সে সুন্দর বাঁধ আর ছিল না। বাড়ীতে ফিরে এসে একেবারেই ভেঙে পড়ে মেনকা। তার বাপ ঠাকুরদার আমলের সেই জাঁকালো অট্টালিকা জুড়ে যেন শশ্মানের শান্তি প্রতীক্ষা করছে। যেন শেষ নিদ্রার জন্য ফিরে এসেছে সে এ নীথর নিস্তব্ধ প্রাসাদের মৃত্যু শীতল কুঠরিতে।

একের পর এক ঘরগুলির তালা খোলে মেনকা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাঁপসা গন্ধ দমকা বেরিয়ে আসে দরজা জানালা বন্ধ ঘরগুলি থেকে—গুমট বাঁধা অভিশাপের মত।

ভরা যৌবনে বিধবা হয় মেনকা। কামনা বাসনার মায়া হরিণ যে তাকে বিচলিত করেনি কোনও অশান্ত সন্ধ্যায় বা দিবাস্বপ্নময় মধ্যাহ্নে, একথা আজ পড়ন্ত বেলায় এই জনহীন প্রাসাদের বোবা অভিশাপের কুণ্ডলির মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে পারে নিজের আত্মাকে—

এমন সাহস আর নেই। কিন্তু কোনও মধুর স্মৃতির উত্তাপও নেই আজ জীবনের। পিতৃ পরিচয়ের দম্ভ একমাত্র উত্তাপ ছিল তার জীবনের। কিন্তু সে উত্তাপও আজ এ হিমশীতল প্রকোষ্ঠগুলিকে উষ্ণ করে তুলতে পারছে না আর। বড় শীত। বড় বেশী শীত বোধ করে মেনকা।

বিচিত্র নক্সা আঁকা ঠাকুরদার আমলের সিন্দুকটার ডালাটা খুলে ধরে নিস্তেজ হাতে। তারপর কেমন এক ভ'য়ে ভ'য়ে টেনে বের করে তার বিয়ের লেপখানা। এ লেপখানা সিন্দুকে তোলা ছিল চিরকাল। তবু যুগের অভিসম্পাত যেন তারও গায়ে আঁচর কেটে গিয়েছে। কি মনে করে সেই অতি পুরানো লেপখানা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে মেনকা। শীত, বড় শীত। বিয়ের শৌখীন লেপ গায়ে দিয়েও সে শীত মানে না।

ঘরের ঝি আজ আর কেউ নেই। বাইরের ঝি, মাতঙ্গিনী মাথায় হাওয়া করে, "উঃ জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে। কেমনতর বৌ গো আপনার। শাশুড়ীকে এমন নিরালা বাড়ীতে একা পাঠায়।"

জ্বরার্ত জড়ানো স্বরে বলে মেনকা, "তাকে একখানা চিঠি দিতে বলিস রামুকে।"

রামু দূর জ্ঞাতি সম্পর্কের দেওরের ছেলে। অর্থ, সামর্থ নেই বলে' ওরা মায়ে ছেলে দেশেই আছে।

রামু এসে ডাক্তার বাড়ীতে খবর পাঠায় এ বাড়ীর বুড়ো পাহারাদার কাশীমুদ্দিকে দিয়ে। মাইল দুই দূরে ঐ একটি মাত্র ডাক্তার আছে দেশে। হিন্দু এম, বি ডাক্তাররা সব হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছে।

সকাল বেলা ঘুমে আচ্ছন্ন রোগীর দিকে তাকিয়ে ভাবে মাতঙ্গিনী, কি মানুষের কি দশা।

আত্মীয় কুটুম্ব দাসদাসী ভরা বাপের বিরাট সংসারেও মেনকার সত্যিকারের ব্যথারজন কেউই ছিল না। একমাত্র ঐ স্বাধীনচেতা

ছেলের বৌয়ের চোখেই ধরা পড়েছিল যে তার নিসঙ্গ জীবনের এই করুণ মূর্তিখানি, এ দুঃসময়ে এক অজানা বেদনার সাথে অনুভব করল তা' মেনকা। "তাকে আসতে লিখে দাও রামু, নিশ্চয়ই আসবে সে।" তার সতীনের ছেলের বৌকে নয়, পুত্রবধূকে নয়, শীতাকেই চিঠি দিতে বলছে সে।

মুখে বলে, নিশ্চয়ই আসবে। তবু দুর্বল মনে ভরসা পায় না। যদি না আসে! একা আত্মীয়হীন শেষ শয্যায় মরবে সে এই নিরালা পুরীতে। ভ'য়ে আরও ছোট্ট হ'য়ে আসে যেন বুকটা। একটা ভয়ার্ত প্রাণ যেন ধুক ধুক করছে বুকের ভিতরে, ঠিক বুকের কাছে। চারদিকে যেন অন্ধকার হ'য়ে আসছে—ভীষণ ঠাণ্ডা একটা কুয়াশার গতি এগিয়ে আসছে তারই দিকে।

মাতঙ্গিনী এসে খবর দেয় "ঐ যে ক্ষেতের ওধারে মুটের মাথায় জিনিষপত্র দেখা যাচ্ছে। বৌমারা এলেন বুঝি।"

"এসেছে!" পরম আশ্বাসের নিশ্চিন্ত একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে মেনকার ভিতর থেকে।

শীতা ঘরে ঢুকে বিস্মিত হয়, এই কি তার সেই শাশুড়ী!

দরদ দিয়ে সেবা করে শীতা। সেবা করার ফাঁকে ফাঁকে মৌন হ'য়ে ভাবে, দাম্ভিক গর্বিতা ভূস্বামীর এইত করুণ পরিণতি। বিকৃত সমাজের মূর্তিমতী অভিশাপ। এ সমাজে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শেখায় না। ভালবাসতে শেখায় শুধু মানুষের বাইরের আবরণকে। তাই মানুষ ভিতরে ভিতরে এত নিসঙ্গ, এত একা।

আধুনিক ছেলের বৌকে বিদ্বেষের চোখেই দেখেছে চিরদিন জমিদার পূর্বপুরুষের নিবু নিবু বংশবাতি মেনকা। কিন্তু আজ সেই আধুনিকা মেয়েটিই তার শেষ আশ্রয়। এক করুণ মিনতিময় প্রার্থনায় গাঢ় হ'য়ে উঠে দৃষ্টি। এ প্রত্যাশী দৃষ্টির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে শীতা।

তাই ওষুধটা খাইয়ে দিতে দিতে বলে সে "আমি এখানেই থাকবো।"

এক করুণ অন্তস্পর্শী কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠে মেনকার চোখের তারায়।

স্তব্ধ হ'য়ে দেখে শীতা সে আচ্ছন্ন দৃষ্টি। ঐ রুগ্ন মানুষটি আজ আর তার সৎ শাশুড়ী নয়। এক অসহায় সন্তানের মাতা হ'য়ে বসেছে যেন সে আজ শিয়রে।

দুপুর বেলা মেনকা ঘুমিয়ে পড়লে, শীতা ঘুরে ঘুরে দেখে প্রাচীন অট্টালিকার কুঠরিগুলি। কোনদিন এসবঘরে ঢোকেনি সে। দালানের শেষ মাথায় তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানায় সীমাবদ্ধ করে নিয়েছিল সে তার অবাঞ্ছিত জীবনের সীমানাকে। তিনটি বছর সে এ বাড়ীতে শুধু দিনই কাটিয়েছে, জীবন কাটায়নি। প্রথম যে রাতে দেবজ্যোতি তাকে এ বাড়ীতে নিয়ে আসে, শুধু সেই একটিমাত্র অন্ধকার রাত্রির অপ্রসন্ন স্মৃতি চেতনার কোন এক স্তরে লুকিয়ে রয়েছে আজও।

মাঝে মাঝে অশুভ ঘূর্ণি হাওয়ার মত সেই বিষণ্ণ রাত্রির স্মৃতির দমকা ঝাপটা আছড়ে পড়ে মনের নিস্তেজ তরঙ্গে।

এ বিরাট বাড়ীতে একা তার শাশুড়ী বাস করতো, তাঁর নিজস্ব কর্মচারী, রায়তজন, ঝি চাকর নিয়ে। আর আত্মীয়রা বিদেশেই থাকতো। শুধু পূজোর সময় বাড়ী এসে সমারোহ করতো।

দেবজ্যোতি তার বাড়ীতে কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করেছিল শীতাকে। আজও স্পষ্ট মনে আছে, এক কৃষ্ণপক্ষীয় রাতে দেবজ্যোতির সাথে এ বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ করেছিল সে। অনেক-গুলি অন্ধকার কুঠরির পর কুঠরি পার হ'য়ে লক্ষ্মীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় দেবজ্যোতি বৌকে নিয়ে। "এই যে মা, তোমার বৌ। দেখ পছন্দ হোল কিনা।"

সামান্য ঘোমটা দেওয়া শিক্ষিতা নববধূর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে এক অমনোনীত অনুমানকেই যে হৃদয়স্থ করলেন শাশুড়ী, এক

মুহূর্তে টের পেল তা' শীতা তার আয়ত্ত চোখের বশ্যতা স্বীকার না করা দৃষ্টি দিয়ে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভয়ে আর অজানা শঙ্কায় কুঁকড়ে আসছে তার মন। যেন এক ভৌতিক জগতের হিমস্পর্শ গায়ে লাগছে তার এই চারপাশের জানালাহীন পুরু দেওয়াল থেকে। মনের তলায় কেঁপে উঠছে শুধু একটি কথা—এই প্রাণহীন বিষণ্ণ প্রাসাদেরই এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে তার জীবনের শেষ সীমারেখা আঁকা হ'য়ে গিয়েছে।

শাশুড়ীর ঠোঁটের কুটিল হাস্যরেখাটুকু দেখে রাখে শীতা তার বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি দিয়ে। কানে এসে বিঁধছে কৃত্রিম হাস্যমধুর কথাগুলি, "ছেলের মন যখন ভুলেছে, তখন মার মনও নিশ্চয়ই ভুলবে। রূপসী দিয়ে কি করবো, মনের রূপই আসল রূপ।"

আত্মভোলা দেবজ্যোতি শিশুর মত উচ্চ হাসি দিয়ে গ্রহণ করেছিল মায়ের সে কথা। কিন্তু শীতা বধূসম্ভাষণের সেই প্রথম কথা কয়টি আজও ভুলতে পারেনি। বুঝেছিল সে, তার সৌন্দর্য শাশুড়ীর চোখে অবজ্ঞার যোগ্য, তা' জানিয়ে দিতে কুণ্ঠিত নন তিনি। তাই মনের রূপের পরিচয়ই দিতে হ'বে তাকে সর্বাগ্রে।

দিনের পর দিন শীতা মন দিয়ে দেখেছে, এক বিগতযৌবনা বিধবার দেবসেবার নামে কি নিখুঁত আত্মপ্রবঞ্চনা। হয়তো নিজেকে প্রবঞ্চনা করাও নয়। পোষ্য আর বশ্যদের সম্মোহিত করার নামান্তর এই দেবার্চনা। চারদিকে পূর্বপুরুষদের আমলের সিন্দুকের পর সিন্দুক—তেল সিঁদুরের ফোঁটায় ফোঁটায় জর্জরিত গৃহলক্ষ্মীকে আরাধনা করার নামে ঐ ভারী সিন্দুকগুলিকেই আগলে রাখতে চাইছে যেন এক যক্ষনারী। তার প্রতিটি পুষ্পাঞ্জলির সাথে আর্ত কামনার অঞ্জলি যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে পড়ছে ব্যর্থ বাসনার দীর্ঘ শ্বাসে।

শীতা তার পরবর্তী স্বাধীন জীবনে বহুদিন অবাক হ'য়ে ভেবেছে, এত ভয় সে পেয়েছিল কেন শাশুড়ীর গৃহগমনের সেই প্রথম রাত্রিতে।

সেই কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে প্রথম স্বামীগৃহে প্রবেশের ভয়ার্ত অনুভূতি কোনদিন বিস্মরণে আসবে না শীতার জীবনে।

শীতা ঘুরে ঘুরে দেখে ঘরগুলি আর ভাবে সেই প্রথমারাত্রির ভীতা মেয়েটির কথা।

যেন সেই শীতা আব এই শীতা একই মেয়ে নয়।

কেমন ধারা অদ্ভুত অনুভূতির তড়িৎ আনাগোনা হয় মনের তলায়। সেই বন্দী মেয়েটি তার জেলমুক্ত স্বামীকে বরণ করার উপলক্ষে কেমন করে' শিকল কেটে বেরিয়ে পড়ল আড়াই বছরের মেয়েটির হাত ধরে' —গল্পের মত লাগে আজ।

প্রকাণ্ড চত্বরের দুই দিকে বহু প্রাচীন দুইটি দালান। দালানের ভিতরে পুবানো আমলের ভারী আসবাবে ঠাসা। আধা অন্ধকার দর দালানের দেওয়ালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আয়নার ধূলোমাখা গায়ে নিজের চলাচলের অস্পষ্ট ছায়া দেখে হঠাৎ চমকে উঠে শীতা। তারপর নিজের মনেই হাসে।

পুরানো আসবাবের ধূলোমাখা স্তূপের মাঝে মাঝে কারুকার্যখচিত রূপোর পানপাত্র ছড়ানো রয়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে শীতা, কত মানুষের ক্ষুধার অন্তর্জালা জড়িয়ে রয়েছে ওগুলির গায়ে।

ঐ বাড়ীর মেয়েদের মুখে শুনেছে সে, এসবই নাকি নিলামের সম্পত্তি হয়েছে তার দাদাশ্বশুর জীবিত থাকতেই। দাদাশ্বশুরেরই এক জ্ঞাতি ভাই নিলামে ডেকে নিয়েছেন এসব আসবাবপত্র। কিন্তু তারও আকস্মিক মৃত্যুতে এসবই ঠিক একই ভাবে পড়ে রয়েছে বছরের পর বছর ধরে এই তালাবন্ধ ঘরে। আজ এই জনপ্রাণীহীন একলা ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে শীতা, মানুষের লুণ্ঠন লিপ্সার এই ত করুণ পরিণতি। মানুষের ক্ষুধার অন্নে ভাগ বসিয়ে তৈয়ার হ'য়েছে বিলাসের সামগ্রী, প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ। পাশাখেলার ঘর,

মদ্যপানের ঘর, মধ্যাহ্ন বিশ্রামের ঘর, রাত্রির শয়ন ঘর, তালা আটা ঘরের পর ঘর।

আর একখণ্ড রাত্রির আশ্রয়ের জন্য মানুষের কত নিগ্রহ। এতেও নিবৃত্ত হয় নাই লুণ্ঠন পিপাসা। পেয়াদা দিয়ে কৃষকবধূর অপমানে আর পাতার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে চরিতার্থ করেছে এরা তাদের পশু প্রবৃত্তিকে। কিন্তু কোনও পাপকেই মাথা পেতে গ্রহণ করেনি মানুষ কোনযুগেই। তাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে মানুষ যুগে যুগে। পরাস্ত হ'য়েছে, ব্যর্থ হ'য়েছে। জ্বলেছে, নিবেছে। কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি।

আজও আবার চতুর্দিকে ধূমাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছে সে অগ্নিশিখা। এই জেলারই শেষ প্রান্তে প্রতিরোধের আগুন জ্বলে উঠেছে ধানের গোলায় গোলায়।

রোদে দেওয়া কাপড়গুলি তুলে আনতে যায় শীতা ছাদে। মায়াচ্ছন্ন চোখে চেয়ে দেখে দিগন্তপ্রসারী ক্ষেতের দিকে। ক্ষেতের গায়ে ক্ষেত দিগন্তে বিলীন হ'য়ে গিয়েছে।যতদূর চোখ যায়, শুধু রঙ বেরঙের রবিশস্য। রৌদ্র কণায় কণায় প্রতিফলিত হচ্ছে সরিষা ক্ষেতের হলুদবর্ণ শোভা।

পৃথিবীর উৎসবের সাজ। কিন্তু এ উৎসবকে সম্পূর্ণ করতে কত রক্ত ঝরবে ঐ ফসল বোনা ক্ষেতে।

বিনা রক্তপাতে ধানকাটার গান সম্পূর্ণ হ'বে না, জানে এই জেলারই শেষ সীমানার সংগ্রামী ছেলেরা। জানে কারখানার বিপ্লবী শ্রমিকেরা। তাই প্রস্তুত তারা সবাই।

কিন্তু সে? সে কেন প্রস্তুত হ'তে পারছে না। শান্তি চায় সে।

মানুষের সাথে মানুষের অনন্ত মিতালি খোঁজে। আর কত যুগ? আর কত রক্তপাতের অপেক্ষা? মানুষের সাথে মানুষের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষ হ'বে কবে?

শীতার চমক ভাঙে। মিঠু ডাকছে তাকে।

সবুজ ক্ষেতের দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে। বুকের ভিতরে একটা স্পষ্ট বেদনা অনুভব করছে সে।

নীচে নেমে আসে। ঘড়ি দেখে শাশুড়ীকে ওষুধ দেয় তাড়াতাড়ি। বেলাত একেবারেই নেই। রোদ কোথায় সরে গিয়েছ পুকুরের ওপারে।

মিঠু অভিযোগ জানায়, "মা, আমাকে খেতে দেবে না ?"

সারাদিন বাড়ীর সাথে সম্পর্ক নেই মিঠুর। যেখানেই যায় সে, সঙ্গী খুঁজতে একবিন্দু বেগ পেতে হয় না তাকে। পার্কের কাকা মামা. স্কুলের দারওয়ান, বড়লোকের বাড়ীর মটর ড্রাইভার, পার্কের প্যারা-মবুলেটার টানা ঝিয়েরা, রাস্তার আইসক্রীমওয়ালা, দুধওয়ালা সকলের সাথেই তার বন্ধুত্ব। কাজেই সে মিঠুর এই পাণ্ডব বর্জিত বাড়ীতেও সঙ্গী খুঁজে পাওয়া আশ্চর্যের নয়। গ্রামের দু'চারটি ম্যাট্রিক ফেল ছেলে আরেক গ্রামের কোনও বাড়ী থেকে চেয়ে আনা পত্রিকাটা নিয়ে মধ্যাহ্ন মজলিস বসায় বার-বাড়ীর এক ধূলাকীর্ণ ঘরে। মিঠু প্রথমদিনই পালকি থেকে নেমেই খুঁজে নিয়েছে দলটিকে। জন্ম-দোসর মেয়ে মিঠু, তার সঙ্গীর অভাব হ'তে পারে না। কিন্তু ক্ষিদেটা যখন বেশী নাড়া দেয়, তখন মায়ের স্মরণ না নিলে চলে না।

সেদিন হঠাৎ অসময়ে মিঠু মায়ের স্মরণ নেয়। শীতা হেসে বলে "আজ বুঝি একটু তাড়াতাড়ি ক্ষিধে পেয়েছে ?"

"না সেজন্য নয়। তোমাকে একজন কাকা ডাকছে। ঘাটলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

শীতা উঠে যায়। ছেলেটি নমস্কার করে বলে, "আমাকে আপনার চিনবার কথা নয়। যদিও আপনাকে চিনি আমরা এখানকার সবাই। কোলকাতা থেকে খবর পেয়েছি, আপনি যে এখানে আছেন।

এখানকার পার্টি থেকে তাই জানতে পাঠিয়েছে একটা সেলটার দিতে পারবেন কি না দিন কয়েকের জন্য,"

গভীর রাতে নির্দিষ্ট দুয়ার দিয়ে ঘরে ঢোকে গা-ঢাকা দেওয়া অতিথি। দেবজ্যোতির ঘরখানা খুলে দেয় শীতা। একটি মাত্র উচু জানালা দিয়ে একটা দেবদারু গাছের চূড়া আর একখণ্ড আকাশ ছাড়া আর কোনও বাইরের দৃশ্য চোখে পড়ার উপায় নেই এ ঘরে। লাল কেরোসিনেব হারিকেনের নিষ্প্রভ আলোয় পরস্পর পরস্পরকে দেখে রাখে মুখ চিনবার জন্যই।

একটা টেবিলের ধূলো ঝেড়ে তার উপর রাত্রির আহার রাখে শীতা। জলের গ্লাস, মসলা, ছোট্ট একটি টর্চ, দিয়েশলাই গুছিয়ে রেখে তোষক-হীণ জাজিমের উপরই চাদর বিছিয়ে দেয়। গায়ে দেবার জন্য একটা কম্বল দিয়ে বলে, "লেপ তোষক সব চুরি। তাই কম্বল গায়ে দিয়েই শীত কাটাতে হ'বে।"

অতিথি হেসে উত্তর দেয়, "কম্বল গায়ে না দিয়েও আমরা শীত কাটাতে অভ্যস্ত। কিন্তু কথা হ'চ্ছে, সব যখন চুরি, এটা নিশ্চয়ই আপনার গায়ে দেবার কথা ছিল।"

"আপনারা একটাও গায়ে না দিয়ে শীত কাটাতে অভ্যস্ত। কিন্তু দুনিয়ার ভাগের ব্যবস্থা যে সমান নয়, তা'ত জানেন। দেখছেন না, জমিদার বাড়ীর চিহ্ন ঘরময়" ঠাট্টার সুরে বলে শীতা।

"তবে জমিদার বাড়ী হলেও সুবিধা এই, এ বাড়ীতে এখন লোকজন কেউই থাকে না। আর এ ঘর ত তালা বন্ধই থাকে। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর এই প্রথম এ ঘরে ঢুকলাম।" স্বামীর মৃত্যুর পর! বিস্মিত হ'য়ে শীতার মুখের দিকে তাকায় আরেকবার। এ অঞ্চলের লোক নয় সে। শীতার কোনও পরিচয়ই জানতো না সে।

একমাত্র মনে মনে গুছিয়ে রাখা পরিচয়—আশ্রয়দাত্রী তার সম্পর্কিতা বোন।

শীতা খাবারটা সাজিয়ে দিয়ে বলে, "এবার খাওয়াটা সেরে নিন। প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো তাড়াতাড়ি সেরে রাখাই ভাল। কখন 'ফেউ' ডেকে উঠে, ঠিক কি। কিছুই করতে পারিনি, এত অসময়ে খবর এল। শুধু ডাল ভাত।"

খেতে বসে বলে অতিথি, "এ'ত রাজ ভোগ। জঙ্গলে জঙ্গলে বাস আমাদের। নুনভাত যেদিন জোটে, সেদিনত আমাদের 'ফিস্ট' মনে হয়। ভাতের মাড় টুকুকে একটু ফোঁড়ন সম্বরা দিয়ে ডালের কাজ করে নেই।"

খাওয়া হ'লে এঁটোটা সরিয়ে নিয়ে যায় শীতা।

ঘরে এসে দেখে, শাশুড়ী তাকিয়ে রয়েছে উদগ্রীব হ'য়ে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি। অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করে, "কে ও?"

শাশুড়ী টের পেয়েছে। আর তাই ভুল বুঝেছে, বুঝতে পারে শীতা। ছেলে মেয়েদের মেলামেশাকে যে এক কদর্থপূর্ণ সন্দেহের চোখেই দেখতো চিরকাল মেনকা, শীতা জানতো তা। আজ তাই একমুহূর্তে বুঝতে পারে সে শাশুড়ীর মনের সংশয়। তবু আজ এক বিন্দু বিদ্বেষের ভাব জন্মায় না মনে মুমূর্ষু রোগীর এ ভ্রান্ত সন্দেহে। বরং করুণাই আসে। তাই তাকে আশ্বস্ত করার জন্যই জানিয়ে দেয় অতিথির পরিচয়। ফিস ফিস করে বলে কানের কাছে "পলাতক।"

একজন বিপ্লবী নেতার প্রাণ রক্ষার ভার তার উপর। কত অসীম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হ'বে তাকে। এ ত তুচ্ছ মিথ্যা সন্দেহ।

রাত্রি গভীর। দূরে ঝোপ জঙ্গলে প্রহরে প্রহরে ডেকে উঠছে রাত জাগা পাখীগুলি। শীতার মায়াচ্ছন্ন চোখের তারায় ভেসে উঠছে দুর্জয় সাহসী হাজং মেয়েদের ছবি।......

পাহাড়তলীর আদিম বাসিন্দারা লাঠি সড়কি হাতে কাতারে

কাতারে বেরিয়ে এসেছে তেভাগার লড়াইয়ে। মেসিনগান গর্জে উঠেছে বনের আড়াল থেকে—রক্তের বান বয়ে চলেছে ধান কাটা জমির বুকে—তবু সে লড়াই থামে নাই।

এ লড়াই থামবেও না। ভাবে শীতা। সুকুমার শিশুর বুকে গুলি বিঁধিয়েছে। এ লড়াই থামতে পারে না।

বহুদূর প্রান্তর ভেঙে পাহাড় টিলা ডিঙ্গিয়ে সন্তান হারা মায়েদের সে ক্রন্দন অশান্ত ঝড়ো হাওয়ায় বয়ে আসছে যেন। স্বামী হারা, সন্তান হারা সেই কৃষকবধূর বিলাপ-ধ্বনি গুলি যেন এ বায়ু কণিকার সাথে মিশে আঘাত করছে তার অনুবেদনায়।

শান্তি চায় শীতা। অনন্ত শান্তি। মানুষে মানুষে রক্তক্ষয়ী সংঘাত সহ্য করতে পারে না। কিন্তু এ অশান্ত নৈশ ক্রন্দনের সমাপ্তি আসতে পারে, একমাত্র পৃথিবীর সমস্ত জননীর সন্তানের নিরাপত্তার আশ্বাসে। একটি জননীকেও কাটাতে হ'বে না যেদিন নিদ্রাছিন্ন রজনী, একমাত্র সেদিনই শান্তি আসতে পারে পৃথিবীতে। তার আগে নয়। তার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে লক্ষ লক্ষ মানুষকে। শীতাকেও।······

মাত্র সাত দিন। আবার সেই ছেলেটি এসে এক টুকরো কাগজ দিয়ে যায় শীতার হাতে। অতিথির বিদায়ের নির্দেশ। সন্ধ্যার আগেই রাত্রির রান্না শেষ করে রাখে শীতা।

রাত একটু ঘন হ'য়ে উঠতেই বিদায় নিয়ে যায় অতিথি—তার পায়ের মৃদু শব্দটুকু মিলিয়ে যায় রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারে।

একাগ্রমনে প্রার্থনা করে শীতা মনে মনে, "যাত্রা নির্বিঘ্ন হোক।"

সহজাত নারী মনের স্নেহ ঝরে অপলক দৃষ্টিতে। এক অবুঝ বেদনামাখা শঙ্কা রুদ্ধ স্পন্দনে। মাত্র সাত দিনের পরিচয়। তবু মনে হয় শীতার, যেন যুগ যুগের পরিচিত এরা। যেন জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয় তার এদের সাথে।

সেদিনই মাঝ রাতে রোগীর মৃত্যু হয়। এ রোগ যন্ত্রণা পাওয়ার থেকে মুক্তি পেয়েছে মানুষটি, ভাবে শীতা। তবু চোখ ভিজে উঠে প্রাণহীন কঠিন দেহের দিকে তাকিয়ে। মৃত্যু বড় নির্মম—বড় কঠিন। মৃত্যুর পর ত আর কিছুই ভাববার নেই—আরকোন অপেক্ষা নেই। সব শেষ। এই 'সব শেষের' মত জীবনের অসহায় বোধ আর কিছু নেই।

নিঃশব্দে কাঁদে শীতা। শাশুড়ীর জন্য এ কান্না নয়। একটি মানুষের মৃত্যুর জন্যই এ কান্না।

এ মধুর পৃথিবীতে মানুষের আয়ু কত সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির হাতে কত অসহায় মানুষ। একটা অসাড় বেদনার স্তব্ধতা নেমে এসেছে শীতার সমস্ত সত্তায়।

শীতের মাঝামাঝি। তবু সমস্তটা দিন সূর্যের আভাস নেই মেঘ ঢাকা আকাশে। বিরাট থমথমে অন্ধকার বিরাজ করছে চতুর্দিক ব্যাপি। অকল্যাণের পূর্বাভাসের মত।

যেন লক্ষ লক্ষ দুঃসংবাদ একসাথে এগিয়ে আসছে পৃথিবীর আত্মাকে গ্রাস করতে। এক অনিশ্চিত অমঙ্গল যেন প্রতীক্ষ্যমান সম্মুখে।

শ্মশান বন্ধুরা ফিরে আসছে—হরি ধ্বনি দিয়ে।

চমকে উঠে শীতা উঃ! কি অকল্যাণী ধ্বনি—যেন মূর্তিমতী অভিশাপের চিৎকার এই "হরি ধ্বনি"। রামুর মা এসে সান্ত্বনা দেয়, "উঠ, বৌমা, হবিষ্যির যোগাড় করতে হ'বে ত। কচি মেয়েটা যখন আছে, এত কাবু হলে চলবে না তোমার। ছেলে যখন নেই, তোমাকেই ত শেষ কাজটুকু করতে হ'বে।"

উঠে বসে শীতা। ভাবে, কি শিশু খেলা। তার এ অব্যক্ত দুঃখের এক বিন্দু আভাস ও বুঝবার শক্তি এদের নেই। তবু এদেরই সান্ত্বনাকে স্বীকার করে নিতে হ'বে তাকে। বিনম্র বালিকার মত মানতে হ'বে লৌকিকতার উপদেশ।

শাশুড়ীর শ্রাদ্ধের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যাবে শীতা।

এ গ্রামকে এত নিবিড় ভাবে আর কোনদিন অনুভব করে নাই সে। ছাদে গিয়ে নির্নিমিষ চোখে তাকিয়ে থাকে শীতা, দিগন্ত বিসারী ধানক্ষেতের দিকে। ঐ ঘন বন বনানীর আড়ালে আড়ালে সংগ্রামী কমরেডদের গোপন অভিযানের দূর পদধ্বনি কান পেতে অনুভব করছে যেন সে। দেখা, অদেখা সকল কমরেডদের জন্যই থেকে থেকে ব্যথিয়ে উঠছে মন।

এই একমাস ধরে তার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে বহু কমরেড। দেবজ্যোতির ঘরে গোপন বৈঠক বসেছে। রাত ভ'রে তাদের আলোচনা চলেছে। তাদের সেই চিন্তাকুল স্বর ভুলতে পারছে না শীতা কৃষাণ আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপান্তরিত করার জন্য ওতপেতে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের চরেরা।

বহু কমরেডকে ধরিয়ে দিয়েছে। বহু কমরেডকে ধরিয়ে দিচ্ছে বিভ্রান্ত মুসলমান এলাকা থেকে।

পাঁজর ভাঙ্গা সংবাদ।

আর একদিন সে সব এলাকা থেকে হাজার হাজার সংগ্রামী কৃষক লাঠি, সড়কি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। পাহাড়ে জঙ্গলে শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী, রোগী সব নিয়ে রাত কাটিয়েছে না খেয়ে না ঘুমিয়ে। পুলিস আসার সংবাদের সাথে সাথে একটা গোটা গ্রামের মানুষ—স্ত্রী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ সবশুদ্ধ গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে। পুলিশ এসে দেখছে, একটি জনপ্রাণী ও নেই কোনও ঘরে, একটি ছাগল পর্যন্ত নেই। নিশ্চল আক্রোশে ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে রেখে গিয়েছে।

গ্রামে ফিরে এসে স্তম্ভিত হ'য়ে দেখেছে কৃষকরা, তাদের ঘরের একটি খুঁটির চিহ্নও নেই। শুধু পোড়া ছাইয়ের স্তূপ ভিটায় ভিটায়।...

তবু তাদের মনবল ভাঙতে পারেনি।

তাই আজ শেষ অস্ত্র সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে ভাঙতে চেষ্টা করছে গণচেতনাকে।

সমস্ত চিন্তাস্রোত ছিঁড়ে দিয়ে কানে এসে বেঁধে মিঠুর এক দমে বলা কথা, "মা, জানো, গুলি চলেছে। ঐ যে রামু কাকারা বলছে।" শীতা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসে। "কি হ'য়েছে রামু ?"

"কৃষকদের সাথে পুলিসের লড়াই হ'য়েছে। একজন কমরেড মারাও গেছে শুনছি। নিখিলেশ বাগচী।"

"নিখিলেশ!" অর্দ্ধস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে শীতার ভিতর থেকে।

তার ঘরে আশ্রয় নেওয়া সেই সাতদিনের অতিথি। রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া মানুষটির শেষ উত্তাপটুকু জুড়ে রয়েছে যেন এখনও তার সর্বচেতনায়। মিঠুকে দেখেই চিনতে পেরেছিল তার মণিকাকা। সেই যে পার্বতীর স্বামী, জানিয়েছিল তা শীতাকে, মিঠুকে চিনতে পেরেই।

পার্বতীকে ছাড়ার আশা নেই। তার উপর আবার এ দুঃসংবাদ কেমন করে বহন করবে সে।

পার্বতীর শিশুপুত্রের জন্য দিশাহারা বেদনায় উদ্‌বেলিত হ'য়ে উঠে সমস্ত মন। ছিন্নলতার মত একসূত্র ক্ষীণ আশাকে আঁকড়ে ধরে শীতা, "শুনছি" কথাটাকে। রামুত বললো, "শুনছি"। সত্যি নাও হ'তে পারে।

"সত্যি যেন না হয়। মিথ্যা হোক এ সংবাদ" প্রার্থনায় আকুল হ'য়ে উঠে শীতা।

সন্ধ্যার পরই খবর দিয়ে যায় রামু, "নিখিলেশ মারা যায়নি। তবে গুলি লেগেছে। সেই অবস্থায়ই পালাতে পেরেছে। কিন্তু বহু হাজং কমরেড ধরা পড়েছে।"

পরের দিন ভোর না হ'তে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামে। বাড়ীতে বসেই উপলব্ধি করে শীতা গ্রামের নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন। দুধওয়ালা, গুড়ওয়ালা, কামলাদের সকলেরই মুখে এক কথা—কৃষকদের সাথে লড়াই হয়ে গেছে কাল দুপুরে পুলিসের। মাত্র দুই তিনটা গ্রামের পরই।

আশা আর উত্তেজনার ভীড় চোখে চোখে।

কিন্তু দুপুর না হ'তেই বাকরোধ হয়ে যায় গ্রামবাসীদের। বাতাসে বাতাসে এগিয়ে চলে লোমহর্ষণ সংবাদ।

সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে একদল হাজংদের দড়ি দিয়ে বেঁধে মারতে মারতে টেনে নিয়ে চলেছে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী। গাছের ফাঁকে ফাঁকে স্তব্ধ হয়ে দেখে গ্রামের মেয়েরা এ পৈশাচিক অত্যাচার।

মাতঙ্গিনী এসে কপাল চাপড়িয়ে বলে শীতার কাছে, "কি বলবো, বৌঠারাণ, একটুকরো বস্ত্র নেই কারও শরীরে। দরদর কইরে রক্ত ঝরতাছে সর্বাঙ্গ। পশুপক্ষীরও প্রাণ গইলে যায় দৃশ্যে। আর ওগো চিৎকারে সে কি হাসি পোড়ার মুখোগো। তোগো হাতে গোলা বন্দুক আছে বইলে কি এমন কইরে মারতে হয়। মানষের কইলজাইত সকলেরই। গরু মইষটারেও এমন কইরে মারে না মানষে।"

শীতা স্তব্ধ হ'য়ে শোনেঃ মাতঙ্গিনীর মুখে বর্বর অত্যাচার কাহিনী।

শাসকের হাতে লাঞ্ছিত শোষিতের এ আর্তনাদ বয়ে চলেছে পৃথিবীর বুকে প্রাচীন যুগ হ'তে। যুগ যুগ ধরে স্তনিত হ'চ্ছে পৃথিবীব্যাপী নিরস্ত্রের এ ক্ষুধিত চীৎকার।

তবু আশা রাখে পৃথিবীর মানুষ, এ অত্যাচারের শেষ আসবেই একদিন।

কিন্তু তার আগে বহু দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রয়োজন—বহু আমৃত্যু শপথ। এ অত্যাচারের পরিসমাপ্তি আনার দায়িত্ব নিয়েছে যারা, তাদেরই সাথে হাত মিলাবে সেও, তার শেষ শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করবে এ পশুবৃত্তির বিরুদ্ধে।

এ অপমানিত মুহূর্তে মানুষের একমাত্র প্রতিজ্ঞা এই। আমরণ প্রতিজ্ঞা এই শীতারও।

বাসের গাদাগাদির মধ্যে অদ্ভুতভাবে দেখা হ'য়ে যায় পৃথ্বীর সুন্দর প্রকাশের সাথে। প্রচণ্ড ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে সুন্দর প্রকাশ পৃথ্বীর ঘাড়ের উপর।

"আরে পৃথ্বীদা যে। খবর আছে। কুমারশঙ্কর আপনাকে ভীষণ ভাবে খুঁজছেন। দু'বার ফোন করেছেন আমার অফিসে। চলুন, এখুনি, যেতে হ'বে।"

হেসে উত্তর দেয় পৃথ্বী, "কি ব্যাপার বলুনত। কি এমন জরুরী খবর হ'বে। হয় তো আব কারও গলাকাটার খবর।"

বাস থেকে নেমে আবার বাসে উঠে। দুজনেই একসাথে কুমার শঙ্করের বাড়ী আসে।

পৃথ্বীকে দেখে সোৎসাহে অভিনন্দন জানায় কুমারশঙ্কর, "এই যে সাহিত্যিক, কাজ হ'য়ে গেছে। কর্তাদের ত বারোটা বেজে গেছে। দেখুন কি লেখা এসে গেছে।"

পৃথ্বী অবাক হ'য়ে মুখের দিকে তাকায়। কুমারশঙ্কর ড্রয়ার খুলে অতি সন্তর্পনে পত্রিকার একটি পাতা তুলে ধরে সামনে। পড়ে দেখুন, "শুকুলের থিসিসত নস্যাৎ করে দিয়েছে।"

কয় জোড়া চোখ একসাথে গিলে খায় যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখাগুলি। ঔপনিবেশিক মুক্তি সংগ্রামের কয়েকটি সমস্যা—বিশেষকরে ভারতের সংগ্রামী জনতার সম্মুখে এসেছে নূতন পথের ইঙ্গিত।

উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে সব কয় জোড়া চোখ।

কয়েক সেকেণ্ড নির্বাক হ'য়ে যায় পৃথ্বী। যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না এ আকস্মিক আনন্দের সংবাদ। হঠাৎ মুক্তি পাওয়া ফাঁসির আসামীর মতই বিহ্বল হ'য়ে পড়ে।

"কি চুপ করে গেলেন যে।" বলে কুমার শঙ্কর। আনন্দ ফেটে পড়ছে যেন তার চোখে মুখে, "বলেছিলাম না যে আসবে একদিন। অবশেষে এলো সেই দিন। এইত মাত্র শুরু।"

পৃথ্বী ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করে কি কি পরিবর্তন চিহ্নিত রয়েছে ঐ কয়েকটি কথার মধ্যে। এরা কি এত সহজে মেনে নেবে এই পরিবর্তন। সব কিছুই যে বদলাতে হ'বে তাহ'লে—। শ্রমিকের জায়গায় সংগ্রামী শ্রমিক, ছাত্রর বদলে সংগ্রামী ছাত্র, কৃষাণের স্থানে ক্ষেতমজুর ও সংগ্রামী চাষী, সকল রাজনৈতিক দলের একতার পরিবর্তে সংগ্রামী জনতার সংগ্রামী ঐক্য—এই বাঁধাধরা কথার আবার আমূল পরিবর্তন করতে হ'বে।

কুমারশঙ্কর পৃথ্বীর বিহ্বল মৌনতা লক্ষ্য করে' বলে, "কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, দেখুনই আগে। তবে কর্তারা কি এত সহজে হাল ছাড়বে। এ লেখা নিশ্চয়ই চেপে যেতে চাইবে তারা। তাই আমাদের কাজ এখন, কোন বামপন্থী কাগজে এ লেখা বার করে, দেওয়া আর টাইপ করে, কমরেডদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।"

মনের আনন্দ অপ্রকাশিত রাখতে পারছেনা কেউ। পৃথ্বী মনে মনে ভাবে, "কম ত আর সহ্য করতে হয় নাই কাউকেই। টাকা চুরির অপবাদ থেকে পুলিসের স্পাই পর্যন্ত এমন কোনও দুর্নাম বাকি

ছিলনা—যা এরা রটায়নি। কুৎসার পিঠে কুৎসা। তার জবাব চাইবার দিন এগিয়ে আসছে।"

পৃথ্বীর ঘরে বসে টাইপ করছে সুন্দরপ্রকাশ। চোখে মুখে মনের প্রসন্নতা চুইয়ে উঠছে।

টেবিলের উপর চা রেখে গেছে কুরী। ধোঁয়া উড়ছে চা থেকে। পৃথ্বীও একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে কলম নিয়ে।

টাইপ করতে করতে প্রশ্ন করে সুন্দরপ্রকাশ, "সত্যসন্ধানীতে ছাপাবে ত এটা ?"

"সত্যসন্ধানীর সম্পাদকদের মধ্যে আমাদের লোক আছে। ছাপাবার ব্যবস্থা আমি করবো। আপনি সুমিত্রাকে বলে' তাড়াতাড়ি বাংলা অনুবাদটা করিয়ে নেবেন।"

টাইপ করা হ'য়ে গেলে উঠে পড়ে সুন্দরপ্রকাশ, "চলি। বিকেল পাঁচটায় যাচ্ছেন ত।"

'নিশ্চয়ই যাব।" প্রীতিমাখা সুরে বলে পৃথ্বী। সুস্মিত চোখে ফুটে উঠে বন্ধুত্বের প্রগাঢ় স্পর্শ।

সুমিত্রার সাথে সুন্দরপ্রকাশের বিয়ে স্থির হ'য়েছে। নিমন্ত্রণ করে, পাঠিয়েছে সুমিত্রা তাকে আর রথীকে। কফি পানের নিমন্ত্রণ তাদের সেই পুরানো পাঞ্জাবী দোকানে আজই বিকেল পাঁচটায়।

খুশি হ'য়েছে পৃথ্বী সুমিত্রার এ নিমন্ত্রণে। শুভেচ্ছায় ভ'রে উঠছে মন।

জানে পৃথ্বী, হৃদয়ানুভূতিকে চলার পথের কাঁটা করে তোলার মত মেয়ে নয় সুমিত্রা। জীবনকে উর্বর করার জন্যই এ জাতীয় প্রাণধর্মী মেয়ের হৃদয়াবেগ ; জীবনের সমাধি রচনা করার জন্য নয়। তাই

নির্ঝরের মত সহস্র উপলখণ্ড অতিক্রম করে এগিয়ে চলবে প্রাণের প্রাচুর্যে।

সুমিত্রা, শীতা, সাগরী মিঠুর ছোটমা, ধোপাবৌ আর তাদেরই মত শত শত কল্যাণময়ীরা ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবী জুড়ে। এ পৃথিবীকে ভাল না বেসে পারে না সে।

শীতার খবর এসেছে, শীগগীরই রওয়ানা হ'বে সে। মিলনের সুর বয়ে আনছে যেন সুমন্দ বাতাসে।

ধোপাবাড়ীর উঠোনে কাপড়ে নীল দিচ্ছে ধোপাবউ। রোদে দেওয়া রঙ বেরঙের শাড়ির রঙিন ছায়া পড়েছে দীঘির জলে। ছোট শিশুদের লাল, হলুদ, গোলাপী জামাগুলিতে রোদ জড়িয়ে ধরেছে পরম স্নেহে।

দূরে কারবালাপুকুর থেকে ওদেরই বাড়ীর পুরুষদের কাপড়কাচার শব্দ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে আছড়ে পড়ছে এসে আঙিনায়। জীবন সংগ্রামের মধুর ঘোষণা জানাচ্ছে যেন দিকে দিকে সে প্রতিধ্বনি।

সোহাগী পৃথিবীর বুকে মধুময় উত্তাপ ঢালছে ভোরের সূর্য। আকাশে বাতাসে জীবনের লাবণ্য।

কি সুন্দর এই পৃথিবী আর পৃথিবীর জীবন! আবিষ্ট হ'য়ে ভাবে পৃথ্বী।

পাশের ঘরে কুমারীর লঘুস্বর শোনা যাচ্ছে। ধোপার খাতায় হিসেব লিখতে লিখতে দুষ্টুমীর সুরে বলে সে, "কি রে হাঁশিয়া, তোর নাকি সোনার সাথে বিয়ে?"

মধুর লজ্জায় রাঙিয়ে উঠে হাঁশিয়া। চোখ ভরা সলজ্জ স্নিগ্ধতা।

পৃথ্বী সস্নেহ চোখে দেখে একটু হাঁশিয়াকে। এই সেদিনও পেয়ারা গাছে উঠে ফুলকুড়ি চিবাত। আর আজ বিয়ের কথায় লাল টোল পড়ছে গালে। চোখের কোণায় জমেছে স্বপ্নমদিরা।

যৌবনের নম্র সাড়া দেহ লালিমায়। সুরমা-আঁকা চোখদুটির স্বপ্নময় আবেশ লক্ষ্য করে' শুভকামনা না করে' থাকা যায় না যেন।

প্রাণ থেকেই আশীর্বাদ বেরিয়ে আসে, "সুখী হও হাঁশিয়া। প্রাণভরে' ভোগ কর পৃথিবীকে।"

অদ্ভুত সুন্দর লাগছে সব কিছু কুরীর কাছে আজ। বড় বেশী সুন্দর। অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছে সে, আর যেতে হ'বে অনেকদূরে। তবু ক্লান্ত লাগছে না।

রোদও উঠছে প্রচুর। একেবারে স্পষ্ট রোদ। ছিটে ফোঁটা কুয়াসা নেই কোথায়ও। বাবলা গাছের ঝাকড়া মাথাটাতেও আটকে নেই একফালি ছেঁড়া কুয়াসা।

খুশি মনে হাঁটে কুমারী। শিশির শুকান ঘাসের উপর মিলিয়ে যায় লঘু পায়ের শব্দ।

অকর্ষিত মাঠের বুকে অসংখ্য গরু মোষ ভেড়ার পাল রোমন্থনরত।

শাখা প্রশাখা বিসারী বড় বড় গাছের সারি। তলায় আলো আর ছায়ায় আঁকা চিত্ররেখা।

স্নিগ্ধ প্রশান্তি ধরিত্রীর বুকে। অপূর্ব সুন্দর। ঘুমন্ত শিশুর মতই সুন্দর।

হেঁটেই চলেছে কুমারী। পথ যেন ফুরাচ্ছে না। বারে বারে অনুভব করছে সে, ব্লাউজের ভিতরে লুকান ভাঁজকরা একখানা সদ্য টাইপকরা কাগজ—কাগজের গায়ের কাল অক্ষরগুলি। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ভারতীয় কর্মীদের সম্বন্ধে লেখা এক কপি পৃথ্বীর কাছথেকে সংগ্রহ করেছে সে।

এতবড় সুসংবাদ বহন করে চলেছে সে ফল্গুর কাছে। মনে মনে কল্পনা করে মুখর হ'য়ে উঠে কুরী, আবার তাহ'লে মিলিত হ'বে সবাই—মিলিত হ'বে পৃথ্বী, ফল্গুও।

এক অতর্কিত সংবাদে নির্বাক হ'য়ে যায় পৃথ্বী। ফেটেপড়া বোমার টুকরোর মত কানে এসে বেঁধে—পাকিস্তানে আবার গোলমাল শুরু হ'য়েছে।

আবার দাঙ্গা! '৪৬ সালের রক্তগঙ্গায়ও এদের রক্তপিপাসা মিটলো না। আবার সেই। সারা কোলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্কিত গুঞ্জন। সমস্ত শহরের উপর এক বিরাট কালছায়া থমথম করে। অকল্যাণের পাগলাঘণ্টা বেজে উঠেছে যেন। ট্রামে বাসে, পথে, বাজারে, ঘরে একই চাঞ্চল্য। বরিশাল এক্স্‌প্রেসের হতভাগ্য যাত্রীদের মুখে শোনা মর্মান্তিক কাহিনী সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে।

সংক্রামক ব্যাধির মত জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে দাঙ্গা। বাজার করতে করতে স্তব্ধ হ'য়ে শোনে সংসারী মানুষেরা অত্যাচার কাহিনী। চোখেমুখে বিষাদের ছায়া নামে। শিশুসন্তানদের কচি মুখগুলিই ভাসে চোখে। অসহায়, কত অসহায় মানুষ আজ মানুষেরই হাতে।

রান্নাবান্নায় মন বসে না মেয়েদের। বারে বারে কাজ ফেলে কোলের সন্তানদের বুকে চেপে ধরে। দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে আসে—হায় ভগবান, তুমি কি নেই? আবার সেই' ৪৬ সালের দাঙ্গা?

পাকিস্তানে যাদের আত্মীয় স্বজন রয়েছে, তাদের দিশেহারা চোখ মুখ শুকিয়ে গিয়েছে দুশ্চিন্তায়। দৃষ্টির গভীরে প্রবাসী পরিবারের নিরাপত্তার ব্যাকুল কামনা।

পোষ্ট অফিসে অসম্ভব ভীড়। হতাশায় ভেঙ্গে পড়া মুখ। বরিশালের ডাক আসেনি আজ। টেলীগ্রামও বন্ধ। অথচ পত্রিকায় বিধ্বস্ত এলাকার কোন খবরই ছাপতে দেওয়া হ'চ্ছে না। নিষিদ্ধ করে দিয়েছে সরকার। পাগলের মত ছুটোছুটি করে তারা সংবাদের জন্য।

সরকারের বিরুদ্ধে চাপা আক্রোশে ফুঁষে উঠে মন।

কয়দিনের মধ্যেই সমস্ত শহর গর্জে উঠে। বিদ্রোহ জানায় পত্রিকাগুলি। সংবাদ গোপন রাখা অসম্ভব।

আগুন জ্বলে উঠে যেন প্রতি পাতায়, প্রতি কোলামে। রক্ত ঝরে পড়ছে যেন প্রতি অক্ষরে।

কি নিদারুণ রোমহর্ষণ কাহিনী! শত শত হিন্দুরমণী নিখোঁজ। মুখ কালী করে ফিরে এসেছে যেসব আত্মীয় অর্দ্ধ উন্মাদ অবস্থায়, তাদের ভয়াবহ অপ্রকৃতিস্থ মুখের দিকে তাকান যায় না। কারও বোন, কারও স্ত্রী কারও ভাতৃবধূকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে মুসলমান দুর্বিত্তরা।

অফিসগামী ভদ্রলোকেদের প্রত্যেকেরই হাতে পত্রিকা। চোখেমুখে অদমনীয় ক্রোধ। সরকার চুপ করে' এ অত্যাচার সহ্য করলেও দেশের মানুষ তা' সহ্য করতে পারে না। এর প্রতিশোধ নেওয়া দরকার এখানকার মুসলমানদের উপর—বলাবলি করে তারা।

কমরেডদের চোখে নেমে এসেছে ৪৬ সনের হতাশা। বুকের পাঁজরই দুমড়ে দিচ্ছে যেন দুশ্চিন্তায়। একখানা জাতীয়তাবাদী পত্রিকা কিনে চোখ বুলায় পৃথ্বী। বিষ-ঝরা পঙতির পর পঙতি। অসহ্য যাতনায় ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন তার শিরাগুলি। বোবা মানুষের আর্তনাদ উঠেছে ভিতরে—। দেশের মানুষের এই বিভ্রান্তি, এই কানা গলিতে ঘুরে মরা দেখতে হবে আর কতকাল।

মনের কোণায় মেঘ জমে উঠে—শীতা রয়েছে পাকিস্তানে। দুর্ভাবনা জমাট বাঁধতে থাকে।

পোষ্টঅফিস থেকে দীপু ফিরে আসে চিন্তিত মুখে। না, আজও কোন চিঠি নেই শীতার।

প্রমীলা প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে শুনে আসে হৃদয় বিদীর্ণ কাহিনী সব। পদ্মার একটা নেড়া চরের মধ্যে জোর করে একদল যাত্রীদের ষ্টীমার থেকে নামিয়ে রেখে দিয়ে গিয়েছে। তাদের সাথে খাবার কিছুই নেই।

ছেলেপুলে, মেয়ে, বুড়ো, রোগী সবই আছে সেই যাত্রীদের মধ্যে। কতকালে যে তাদের উদ্ধার করা হ'বে, তার কোনও স্থিরতা নেই। হয় ত না খেয়েই মরবে তারা সেই রৌদ্র-ফাটা নেড়া চরের মধ্যে। একজন যাত্রী মুসলমান সেজে অতিকষ্টে পালিয়ে এসেছে; তার মুখেই শোনা এ সংবাদ। আর এক ভদ্রলোক এসেছে। তার ষোল বছরের মেয়েকে নিজে সে পদ্মার জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে এসেছে। বাপের সাথে শখ করে দেশের বাড়ী দেখতে গিয়েছিল মেয়ে। ফিরে এসে স্ত্রীকে বলেছে ভদ্রলোক—"তোমার মেয়ের মান আমি বাঁচাইছি। যবনের হাতে দেই নাই—পদ্মার জলে দিয়া আসছি।"

একেবারে উন্মাদ অবস্থা এখন ভদ্রলোকের। শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। মানুষ দেখলেই বিকট ভাবে হেসে উঠে। বুকফাটা অট্টহাসি। চিৎকার করে' বলছে, "ঐ যে, বকুল আমার ভাইসা গেল। ঐ যে ঢেউয়ের তলায় চুলগুলি ভাসতাছে। দেখছো না তোমরা! ঐত আমার বকুলের চুল। কুচবরণ কন্যার আমার মেঘবরণ চুল—পদ্মানদীর কাল জলে ঝিলমিল করে। হাঃ হাঃ হাঃ। উঃ! কত বড় ঢেউ। সাতার জানে না বকুল। পারলো না—আর ধরতে পারলো না।"

ভদ্রলোকের স্ত্রী শয্যা নিয়েছে। জীবন ভ'রে কাঁদলেও বুঝি এ শোক তার নিববে না।

প্রমীলা চোখ মুছত মুছতে বাড়ী ফিরে আসে। শীতা রয়েছে পাকিস্তানে। কি অবস্থায় আছে সে, কে জানে। দীপু বিষণ্ণ মুখে পোষ্টাফিস থেকে ফিরে এসে দাঁড়ায় মায়ের কাছে।

এত খানি বেলা হ'য়েছে, এ পর্যন্ত পেটে কিছু পড়েনি। মুখ খানা শুকিয়ে গিয়েছে। ছেলের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে প্রমীলা উঠে বসে। রান্নার যোগাড় করতে হয়। হাত পা অবশ লাগে। তবু না খাইয়ে ত রাখা যায় না এদের।

অথর্ব মানুষটি আরও স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছে।

বার্দ্ধক্য পীড়িত অবশ নাড়ীগুলিও অনুভব করছে বোধ-শক্তির এই দুঃসহ পীড়ন।

প্রমীলা উঠে গিয়ে কোন মতে একটা ভাত ডাল নামায়। ভাত নামাতে গিয়ে হাত কাঁপে, খানিকটা গরম 'ফ্যান' পড়ে যায়'পায়ের উপর।

কুরী আসে ঘুরে ফিরে। প্রমীলার অবস্থা দেখে ব্যথিয়ে উঠে মন। বুড়ো মানুষ, একসাথে এত দুঃখ সইবে কি করে।

কুরী এগিয়ে আসে, "আমি আপনার রান্নাটা করে দিচ্ছি।"

প্রমীলা অবাক হ'য়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকায়। মনে হয়, কোথায় যেন একটা আত্মীয়তার বাঁধুনি লুকিয়ে রয়েছে। স্নেহে উদ্‌বেল হ'য়ে উঠে মন। ভিজে আসে চোখের পাতা। "তার দুঃখ ত কেউ এমন করে বোঝেনি কোনদিন। কি করে জানলো মেয়েটি তার মনের এই অসাড় অবস্থা।"

সোনার রিকশা করে রাত্রিতে ফল্গু আসে লুকিয়ে—পায়ের ক্ষত এখনও সারে নাই। ব্যাণ্ডিজ বাঁধা পা।

প্রমীলার চোখ ভিজে আসে—"ফল্গু, আবার কি অবস্থা হ'ল দেশের।"

ফল্গু বলে, "আমি দিদিকে আনতে চলে যাই।"

প্রমীলার সহজাত মাতৃমন ব্যাকুল হ'য়ে উঠে—একজনকে আনতে গিয়ে দুজনকেই যদি হারাতে হয়।

বাধা দিতেও আবার থমকে যায়। মানসম্ভ্রম! ছেলের প্রাণের চাইতে বড় কথা মেয়ের মান।

অবশ হ'য়ে আসে মাথাটা। ভাববার আর ক্ষমতা নেই।

"আমিত কিছুই আর ভাবতে পারছি না, ফল্গু। পৃথ্বীর সাথে পরামর্শ করে যা করবি, ঠিক কর।"

বলতে বলতেই পৃথ্বী এসে দাঁড়োয়। কুরীর মুখে ফল্গু পাকিস্তানে যাচ্ছে শুনে, বাধা দিতে এসেছে সে। "পায়ের এ ক্ষতবাঁধা অবস্থায় ফল্গুর সেখানে যাওয়া কিছুতেই ঠিক নয়। শুনলাম ষ্টীমার বন্ধ। শায় শ'য়ে লোক সব ষ্টীমার ঘাটে পড়ে রয়েছে। কালকের ডাকটাও দেখি; না হয় আমিই চলে যাব শীতাকে আনতে। ওদিককার কমরেডদের কাছে খোঁজ নিয়েছি আমি—ও অঞ্চলে গোলমাল হয়নি।"

মুখে সান্ত্বনা দিয়ে আসে পৃথ্বী। কিন্তু মনে তারও চিন্তার সমুদ্র। গোলমাল নেই—কিন্তু হ'তে কতক্ষণ।

পরদিন ভোরে উঠেই শিয়ালদহে খোঁজ করতে যায়।

সব গাড়ীই দশ, বার ঘণ্টা লেট্। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে এসে প্লাটফর্মের এক কোণায় গিয়ে আবার অপেক্ষা করে।

সুরমা মেইল 'ইন' করলো। এগিয়ে যায় পৃথ্বী। যদি কোন চেনা মুখ চোখে পড়ে। কাতারে কাতারে যাত্রীরা বেরিয়ে আসছে। হাতে, কোলে কাঁথে শিশু। মাথায় মালের লটবহর, ছিন্নভিন্ন বিধ্বস্ত। দুর্গন্ধ ময়লা কাপড় পরনে। আতঙ্কে বসে যাওয়া পাংশু বিবর্ণ চোখমুখ। যেন একটা মূর্তিমান শোকের ছায়া এগিয়ে আসছে। রক্তহীন প্রেত ছায়া। দম দেওয়া কল যেন ঠেলে নিয়ে চলেছে যন্ত্রেব মত পা গুলিকে।

পৃথ্বী আরও এগিয়ে যায় ভীড়ের ভিতরে। একটি ছেলের সঙ্গে আর কেউ নেই। হাতে শুধু একটা সুট কেশ। কাঁথে ছোট একটা বিছানা। চেনা চেনা লাগে মুখ।

"এই মেইলেই এলেন? খবর কি ওদিককার?"

ছেলেটি মুখের দিকে চেয়ে দেখে নেয়। তারপর যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে উত্তর দেয়—"আমাদের ওদিকে এখনও কোন গোলমাল নেই। কিন্তু হ'তে কতক্ষণ।"

"কোথা থেকে এলেন?"

"কিশোর গঞ্জ।"

আবার আরেক জনকে একই প্রশ্ন করে, "কোথা থেকে এলেন ?

"নেত্রকণা।"

একই উত্তর— "না কোনও গোলমাল নেই। কিন্তু হ'তে কতক্ষণ। ও শালাদের বিশ্বাস নেই কিছু।"

ভীড়ের ভিতর থেকে বেছে বেছে বহু লোককেই প্রশ্ন করে পৃথ্বী— দেশ কোন গ্রামে, গ্রাম কোন জেলায়। কিন্তু শীতার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের নাম বলে না কেউই।

পৃথ্বীর মতই আরও বহু সংবাদ প্রার্থী লোকের ভীড় ষ্টেশনে। সকলেই চোখে একই চিন্তার গাঢ় ছায়া।

ঢাকা মেইল 'ইন' করল। ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে দাঁড়ায় সবাই। সমস্ত রোমকূপ দিয়ে প্রতীক্ষা করছে যেন যার যার আত্মীয়ের মুখ দেখার প্রত্যাশায়।

কারও ভাই, কারও বোন, কারও শ্বশুর, কারও স্ত্রীপুত্র কন্যা।

তিল স্থান নেই গাড়ীতে। গাড়ীর ছাদে পর্যন্ত যাত্রীর ভীড়। পিল পিল করে লোক গাড়ী থেকে নামছেই শুধু। প্লাটফর্মে অপেক্ষ-মান ভীড়ের ভিতরে কারও কারও চোখে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠে। বাকি সকলের চোখে আরও অন্ধকার ছায়া নেমে আসে। হতাশায় অবশ হয়ে আসে দেহমন। আবার কাল পর্যন্ত চলবে এই সূচীতীক্ষ্ণ প্রতীক্ষা।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে আসে পৃথ্বী। শীতাকে একটা টেলী করতে যায়। "wire health"—এর বেশী কিছু জানতে চাওয়া সম্ভব নয়। পাকিস্তানেও নিশ্চয় সেনসার্ড করে পাঠান হ'চ্ছে সংবাদ।

এক্সপ্রেস ডেলীভারীতে একটা চিঠিও পোষ্ট করে।

পোষ্টাফিসের দুয়ারেও ভীড়। সকলেরই চোখে মুখে একই উদ্বেগের

ছায়া। একটা করে ভারী পাথর বাঁধা রয়েছে যেন প্রত্যেকেরই বুকে।

পোষ্টাফিস থেকে কিছুদূরে ভীড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পাকিস্তান থেকে সদ্যপ্রাপ্ত বোনের চিঠি পড়ে' শোনাচ্ছে সবাইকে। পড়তে পড়তে গলা জড়িয়ে আসে, অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে গণ্ডস্থল বেয়ে। কাঁপা গলায় পড়ে যায় ভদ্রোলোক—"দাদা, তুমি মনে করো, তোমার তুলি মরে গিয়েছে।"

চোখের জলে আবছা হ'য়ে আসে পেনসিলে লেখা অক্ষরগুলি। চিঠিখানা আর শেষ করতে পারে না। দিশে হারা ব্যাকুল দৃষ্টি।

চার পাশের বেদনা বিহ্বল শ্রোতারা দেখে পুরুষ মানুষের চোখের জল। জলত নয়— যেন আগুনের ফুলকি। চোখে চোখে ছড়িয়ে পড়ে এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

একটি জুয়ান ছেলে হাত থেকে চিঠিখানা টেনে নিয়ে একটা রোয়াকের উপর উঠে দাঁড়ায়। গর্জে উঠে সে:—"পাকিস্তানের সংবাদের জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ছুটোছুটি করছেন আপনারা। কিন্তু আপনাদের এই উৎকণ্ঠার প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন আমাদের সরকার। কিন্তু সরকার উদাসীন থাকলেও সংবাদ চাপা থাকবে না। এই ভদ্রলোকের বিধবা ভগ্নীর কাছথেকে একখানা চিঠি এসেছে। অতি কষ্টে লুকিয়ে চিঠিখানা পাঠিয়েছেন তিনি। আপনারা তা' শুনে লজ্জায় মুখ ঢাকবেন, আমি জানি। কারণ তিনি শুধু এই ভদ্রলোকের ভগ্নী নন, ইনি আমাদের প্রত্যেকের ভগ্নী। হিন্দু নারী মাত্রই আমাদের মা, বোন। শত শত মা বোনের মান ইজ্জৎ নষ্ট করার এই ঘৃণিত সংবাদ কি করে চুপ করে সহ্য করছে সরকার, আমরা ভেবে পাই না। ভদ্রলোকের এই লজ্জা—এত শুধু ওর একার লজ্জা নয়—এ আমাদের জাতির লজ্জা, হিন্দুর লজ্জা।"

ছেলেটি চিঠিখানা পড়তে শুরু করে। শ্রোতাদের মুখে দেখা দেয় কঠিন আক্রোশ, চোখে ঘৃণা।

ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠে—"বড় বড় হোমরাচোমরাদের আত্মীয় স্বজন ত আর কেউই নেই পাকিস্তানে—তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে না কেন।"

"আর কেউ থাকলেও এরোপ্লেনে করে সরিয়ে আনতে কতক্ষণ।"

ক্রমশই চিন্তা বেড়ে চলে পৃথ্বীর, অবস্থা সুবিধায় নয়। দেওয়ালে দেওয়ালে পাকিস্তান থেকে সদ্যপ্রাপ্ত চিঠি এঁটে দেওয়া হয়েছে। চিঠির চারদিকে উত্তেজিত জনতার ভীড়।

ক্লান্ত মনে ফিরে চলে পৃথ্বী। ফেরার পথে বাস থেকে দেখে, দেশপ্রিয় পার্কে এক জনসভা বসেছে। কোন দলীয় সভা লক্ষ্য করেই বোঝে। পার্কের চারদিকে মটরের সারি। সবই প্রাইভেট কার। সভামঞ্চে অবাঙ্গালী মুখই বেশী। নানা বর্ণের শিরস্ত্রাণ মাথায়।

বাস থেকে নেমে পড়ে পৃথ্বী। ছোট্ট একটা কাপড়ের 'স্টলে' বসে' শোনে একটু বক্তৃতা। মাইকের ভিতর দিয়ে চারদিকের অট্টালিকার গায়ে আছড়ে পড়ছে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা :—

"অত্যাচারিতা হিন্দুনারীর মর্মভেদী আর্তনাদে কলঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে আবার পাকিস্তানের আকাশ বাতাস। সে আর্তনাদ আমাদের সরকারের বধির কর্ণকুহরে প্রবেশ করার আশায় আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। দুঃশাসনের রক্তই একমাত্র জবাব ধর্ষিতা দ্রৌপদীদের এই অপমানের। ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে কংগ্রেসী সরকার যা করছে তা' তোষণমূলক সাম্প্রদায়িকতারই নামান্তর।"

পার্কের চারদিকে পোষ্টার পড়ে গিয়েছে—"রক্তের বদলে রক্ত চাই। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাই।"

শহরের তাপযন্ত্র লক্ষ্য করে পৃথ্বী। উৎকণ্ঠার পরিবর্তে এ বেলা

উত্তেজনাই বেশী। ক্ষুব্ধ আলোচনা চলেছে চায়ের দোকানগুলিতে—"এখানেও দু'একটা কোতল না করলে পাকিস্তানের এ গোলমাল থামবে না।"

মনে মনে প্রমাদ গনে পৃথ্বী। 'স্বাগতমে' সুন্দরপ্রকাশের সাথে দেখা হয়। চোখে পাঁজর ভাঙ্গা বেদনা। 'কি করা যায় বলুন দেখি।'

"আপাততঃ যার যার পাড়ায় শান্তি কমিটি তৈয়ার করে' পাড়ায় নজর রাখা ছাড়া ত আর কোনও পথ দেখি না।" ক্লান্তস্বরে জবাব দেয় পৃথ্বী।

সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফেরে পৃথ্বী। পাড়ার ছেলেদের ডেকে আলাপ করে' রাখতে হ'বে আজই।

লেভেল ক্রসিংএর কাছে পৃথ্বীর জন্য অপেক্ষা করছে সোনা। পৃথ্বীকে বাস থেকে নামতে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সে। চোখে মুখে চিন্তার ছায়া।

"কি খবর সোনা!"

"খবর ত বিশেষ সুবিধার নয়। আপনার জন্যই বসে আছি। আমাদের পাড়ার মুসলমানরা ত সব ঘাবড়ে গেছে। বালিগঞ্জে নাকি মস্ত সভা হ'য়েছে। সভার বক্তৃতা শুনে এসেছে মুনশী। তার মুখে বক্তৃতার কথা শুনে কেউত আর এখানে থাকতে ভরসা পাচ্ছে না।"

পৃথ্বী ভারাক্রান্ত স্বরে উত্তর দেয়, "আমি পাড়ার ছেলেদের সাথে কথা বলে' পাহারা দেবার ব্যবস্থা করবো। কলেজের প্রিনসিপালের সাথেও দেখা করবো। ছাত্রদের সাহায্য যা'তে পাওয়া যায়। তুমি ওদের বুঝিয়ে বল, এখানকার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি।"

"আমি বললে কিছু হ'বে না। তা ছাড়া আপনি নাকি পাকিস্তানে যাচ্ছেন? এ সময়ে আপনাকে ওরা কিছুতেই যেতে দেবে না। আপনি চলে গেলে এদের মন আরও ভেঙে পড়বে।"

পৃথ্বী বোঝে তা'। এখন শীতাকে আনতে যাওয়া সম্ভব হ'বে না তার। অন্য কোনও ব্যবস্থা করতে হ'বে।

পৃথ্বী সন্ধ্যার পরই পাড়ার বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের সাথে দেখা করে। একটা বৈঠক ডাকে। মুসলমানদেরও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডাকা হয় বৈঠকে।

পাড়ারই একটি মাতব্বর ছেলে—নাম সতু। আধাভবঘুরে ছেলে। কিন্তু মানুষের বিপদে আপদে এক ডাকে হাজির হয় সে। মুরব্বির সুরে বলে সে, "কোনও ভয় নেই আপনাদের সতু থাকতে। কোনও শালার শাধ্য নেই এই লেভেল ক্রসিং পার হয়।"

আলোচনা শেষ করে বাড়ী ফেরবার পথেই দেখে পৃথ্বী, রাস্তার দু'ধারের মুসলমানদের দোকান পাট সব বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে।

মুনশীও তার দোকানে তালা লাগাচ্ছে।

"কি ব্যাপার—এই সন্ধ্যারাতেই দোকানে তালা লাগাচ্ছেন?"

একটু ইতস্তত করে বলে মুনশী, "কে যেন বলে গেল—আজ রাতে নাকি দোকান পাট সব লুট করা হ'বে।"

পৃথ্বী উদ্বিগ্ন চিত্তে বাড়ী আসে। এই মাত্র শুনে এল সেও, হাওড়ায় নাকি গোলমাল আরম্ভ হ'য়েছে। দু'টো খুনও হ'য়েছে।

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে দেখে, নমাজ ঘরে টিমটিমে একটা বাতি জ্বলছে। ভিতরে নমাজ পড়া হ'চ্ছে। মৃতের মত ফ্যাকাসে মূর্তি সব। সমাধি ক্ষেত্রের নিঃশব্দতা বিরাজ করছে নামাজ ঘরে।

সকালবেলা টিউবওয়েলের জল নিতে এসেছে হাঁশিয়া—মুখখানা একেবারে সাদা। যেন প্রাণহীন।

হাঁশিয়ার ভীত মুখখানা দেখে' মনটা দুঃখিয়ে উঠে পৃথ্বীর। স্নেহের সুরে বলে, "কোনও ভয় নেই। আমরা এতজন আছি"

দূর থেকে লক্ষ্য করে পৃথ্বী, ধোপাবৌর মুখখানা ও ভয়ে ত্রাসে এতটুকু হ'য়ে আছে।

মেয়েদের এই ভীত আতঙ্কিত চেহারায় পৃথ্বীর বুকের পাঁজরে কশাঘাত করছে অণুক্ষণ। এদের এই ভীতি, এই ত্রাস—এ ত অমূলক নয়। বর্বরেরা এমন করে শান্তি কেড়ে নিয়েছে নিরিহ মানুষের।

ভোর হ'তেই পর্দা দিয়ে ঢাকা ঘোড়ার গাড়ী ভর্তি করে' মেয়েদের পার্কসার্কাসে পাঠিয়ে দেয় অনেকে। কেউ কেউ যায় ডায়মণ্ডহারবারের দিকে।

/ জটা এসে বলে পৃথ্বীকে, "আমাদের এদিককার সবাই ত প্রায় এদিক ওদিকে সরিয়ে দিচ্ছে মেয়েদের। মুনশী ও তার বাড়ীর মেয়েদের সরিয়ে দেবে, ঘোড়ার গাড়ী ডাকতে পাঠিয়েছে। এদের সব আত্মীয় রয়েছে পার্কসার্কাসে। কিন্তু আমরা গরীব মানুষ কোথায় যে দাঁড়াব, ভেবে পাচ্ছি না। ঘর ছেড়ে যেতেও ভয় করে।" মনে মনে ভাবে, ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেয় যদি।

পৃথ্বী বাধা, দিয়ে বলে, "এখানে কোনও ভয় নেই। অবশ্য তোমরা সবাই যদি একসাথে হ'য়ে থাকতে চাও সে, আলাদা কথা।"

পৃথ্বী বেরিয়ে যায় কল্যাণের সাথে দেখা করতে। জটা কাপড়ের পুটলি নিয়ে কারবালাপুকুরে চলে যায় কাপড় কাচতে। শরীরে জোর পাচ্ছে না। তবু ভাটি দেওয়া কাপড়গুলি না কেচেও উপায় নেই। দু'দিন ঘরে পড়ে রয়েছে। রুজি বন্ধ করলে খাবে কি? সত্যি যদি কিছু হয় মাথাই বা গুজবে কোথায় ছেলে মেয়ে নিয়ে। চিন্তার শেষ খুঁজে পায় না।

সোনাও রিকশা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। দিনের বেলায়ও কেমন যেন ভয় করছে হাঁশিয়ার। বাইরে শুকনো পাতায় উপর সামান্য

শব্দেও চমকে চমকে উঠছে ধোপা বৌ। কান খাঁড়া করে থাকে বাইরের দিকে।

চারদিকে গুমট নিস্তব্ধতা। প্রায় বাড়ীরই পুরুষরা কাজে বেরিয়ে গিয়েছে।

এরই মধ্যে জনা কয়েক অপরিচিত ভবঘুরে ছেলে এসে ঢোকে ধোপাদের বাড়ীর ভিতরে। উঠোন থেকে সব কয়টা মুরগি ধরে নিয়ে যায়। হাঁশিয়ারই মুরগি। তার চোখের সামনে থেকে নিয়ে গেল মুরগিগুলি। কিন্তু ভয়ে টু শব্দটি করতে পারে না সে। মুখ যেন শেলাই করে দিয়েছে কে। ভদ্রলোকের মতই পোষাক পরা তবু হাঁটার কি কুৎসিত নমুনা। হাঁশিয়াকে দেখে ইচ্ছে করেই কোমর ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে চলে ছেলেগুলো ঠিক যাত্রার দলের সঙের মত।

হাঁশিয়া নিশ্চুপ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখে, চোখের সামনা থেকে দিনে দুপুরে তার মুরগিগুলি নিয়ে যাচ্ছে। মুরগিগুলিও একবার অসহায় আপত্তি জানায় আর্তনাদ করে। কিন্তু হাঁশিয়ার জব বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। নিষ্পলক বোবা দৃষ্টিতে দিশেহারা স্তব্ধতা।

কিন্তু পথের মাঝেই ধবে ফেলে সতু একজনকে।

সাইকেলে বাড়ী আসছিল সে। দূর থেকে লক্ষ্য করেছে সে এই ভবঘুরে ছেলেদের অসভ্যতা। সাইকেল থেকে নেমে বাধা দেয় —"কার হুকুমে তোমরা এ পাড়ায় ঢুকে মুরগি চুরি করছো"।

এ হঠাৎ আক্রমণে প্রস্তুত ছিল না তারা। মুরগিগুলি ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায় সবাই। সতু লাফিয়ে ঝাপটে ধরে একজনকে, "খবরদার কথার জবাব না দিয়ে এক পাও নড়া চলবে না এখান থেকে।"

মুহূর্তের মধ্যে আরও কয়টি ছেলে এসে ঘিরে ফেলে তাকে। আধঘণ্টার মধ্যেই পাড়ার বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের বিচার বসে। কুকুরের

মত পায়ে লুটিয়ে পড়া স্বরে অপরাধ স্বীকার করে অপরাধী, "ক্ষমা করুন। আর কখনও একাজ করবো না। ঈশ্বরের নামে শপথ করছি।"

বয়স্ক ভদ্রলোকেরা ছেড়ে দেয় তাকে। "ভদ্রলোকের ছেলে, এ নিয়ে আর বেশী ঘাটাঘাটি ঠিক নয়।" কিন্তু সতু মনে মনে সন্তুষ্ট হয় না এ নিরামিষ বিচারে। কিছু উত্তম মধ্যম দেওয়া উচিত ছিল। ফরসা জামা কাপড় পড়লেই ভদ্রলোক হয় না।

ছাড়া পাওয়ার সাথেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দেয় সে। বাসে উঠে একেবারে সোজা চলে আসে 'স্বস্তিকা' ক্লাবে। সঙ্গীরা আগেই এসে পৌঁছেছে। "কি হে বিদ্যুৎ এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেলে।"

"তোদের মত কাপুরুষদের সাথে জীবনে আর মিশবো না। একজন সঙ্গীকে একা ফেলে ও ভাবে পালিয়ে এলি তোরা। আমাকে যদি মেরে ফেলতো।" "এসময়ে তোকে ওরা মারতো যদি, তবে ত আমাদেরই জয় হ'ত। রাজনীতির বুদ্ধি যদি থাকে তোর মাথায়।"

"একজনের প্রাণ যেতো আর ওরা করতো রাজনীতি!" রাগে গুম হ'য়ে থাকে বিদ্যুৎ।

তার পিঠ চাপড়ে আরেকজন সঙ্গী বলে, "মনের বেদনা সব জুড়িয়ে যাবে সন্ধ্যার পর। আজ আর ভেজাল টেজাল নয়—একেবারে খাস বিলীতি মদ অর্ডার দেওয়া হ'য়েছে। তবে মুরগি হ'লে আরও ভাল হ'ত।"

কালু এসে উপস্থিত হয়। কালু তার তাড়ির আড্ডা ভেঙে দিয়েছে। নিজের বসত ঘরখানায় বেশী সময়ই তালা দেওয়া থাকে। পোষাকেও পরিবর্তন এসেছে কালুর। মধু মুখার্জীর পরিত্যক্ত একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে। কাঁধের কাছে বড় একটা তালি দেওয়া। খদ্দরের জামাটা গায়ে পরতে কালুর অবশ্য লজ্জাই করতো প্রথম

প্রথম, "হাজার হ'লেও ডেটিনিউ বাবুদের ভূষণ আমরা খুনী দাগী মানুষ কি করে গায়ে তুলি।"

চুলের ছাঁটেও কিছুটা ভদ্রলোকী আভাস। একমাত্র গোঁপ জোড়াটা তার শ্রেণী-ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছে। গোঁপ কামানর ঘোর বিরোধী সে। গোঁপ না থাকলে পুরুষ মানুষকে পুরুষ বলেই মনে হয় না তার কাছে।

কালু মন দিয়ে শোনে ক্লাবের বাবুদের মুরগি শিকারের ব্যর্থতার করুণ কাহিনী।

মধু মুখার্জী গোপনে ডেকে পাঠায় কালুকে—"শুনলাম শান্তি কমিটি করেছে ওরা। মুসলমানদের দালাল এরা। না হ'লে পাকিস্তানে আমাদের মা বোনদের এই অপমানের পরও কোন মুখে শান্তির কথা বলে। পাকিস্তানের নিপীড়িতা নারীর লজ্জা কি সমস্ত হিন্দুস্থানের লজ্জা নয়।"

কালু সসম্ভ্রমে তাকায় প্রাক্তন ডেটিনিউ বাবুর মুখের দিকে। চোখে ঝরে ভক্তি। বীর রসে ফুলে ফুলে উঠে নাসারন্ধ্র।

উত্তর দেয় সে, "ওদের তেজ কিছু ভাঙা দরকার।" তারপর নীচু গলায় বলে, "একটা মেয়ে ধরে নিয়ে আসবো তিনদিনের মধ্যেই ওপাড়া থেকে। যদি না পারি জন্মের মত এ কাজ ছেড়ে দেবো।" মনে মনে স্থির করে সোনার বিবিকেই ধরে আনবে।

জ্বলে উঠে মধু মুখার্জীর চোখ দুটো। মনের ক্ষতটা আবার চর চর করে উঠে—দিনেদুপুরে তারই দলের লোককে অপদস্ত করে নাজেহাল করেছে বিপক্ষ দলীয় লোকেরা!

রাজনীতির লাগাম টেনেই তার আজ এতবড় প্রতিষ্ঠা। ঘোড়া চালাতে হ'লে ঘোড়ার লাগামটি টানার কায়দা জানা চাই। রাজ-নীতি করতে হ'লেও রাজনীতির লাগামটি ঠিকমত টানা চাই।

বিশেষ করে বেগে ছোটার সময় রাশ ঢিলা করার অর্থ খাদে উল্টে পড়া।

কালুর কথার কোন জবাব দেয় না মধুমুখার্জী। নিঃশব্দে ড্রয়ার খুলে নোট বের করে' হাতে দেয় কালুর।

মুরগি চুরির ঘটনার ঠিক তিনদিনের দিন ধোপা-বৌ এসে খবর দেয় সোনাকে, "হাঁশিয়া সেই বেলা থাকতে গেছে ছাগল আনতে, এখনও ত ফিরলো না।"

আকাশের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দেয় সোনা, "হয়তো ছাগল ছুটে গিয়েছে তাই খুঁজতে দেরি হ'চ্ছে। নিত্যিই ত ওর ছাগলের দড়ি ছিঁড়ে যায়।"

মুখে বলে। তবু উঠে যায় কারবালা পুকুরের দিকে—দিন কাল ভাল নয়। বেলাবেলিই ঘরে আসা উচিত। পুকুরের ধারে এসে দেখে, বহুদূরে হাঁশিয়ার ছাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করছে। কিন্তু হাঁশিয়া কই? আর এত দূরেই বা বেঁধেছে কেন ছাগলটাকে!

চারদিকে ধূ ধূ করছে শূন্য মাঠ। মাঠের বুকে সন্ধ্যার ধোঁয়াটে ছায়া নেমে আসছে।

পুকুরের আরেক পাড়ে হিন্দু বসতি। টালির চালার ফাঁক দিয়ে উনানের ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে উর্দ্ধে উঠছে।

রাত্রি নেমে আসছে ধীরে। যতদূর চোখ যায়, কোনও জনপ্রাণী চোখে পড়ে না কোথাও। গা ছম ছম করা আবছা আঁধার।

"মেয়েটার সাহস কম না, এত দূরে এসেছে চাগল দিতে। আর জায়গা পেল না ও।" মনে মনে বলে। এগিয়ে যায় সে ছাগল টাকে তুলে আনতে।

একটু অবাকও হয়—এখানে ত ঘাসের চিহ্নও নেই—এখানে ছাগল বাঁধবেই বা কেন? ভিতরে ভিতরে ক্রমশই ভীত হ'য়ে উঠছে সোনা।

কেমন যেন ঘোরাল লাগছে ব্যাপারটা। সোনা ছাগলটাকে তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে ডাকে "হাঁশিয়া। হাঁশিয়া।"

বহুদূর অকর্ষিত জমির বুক ছুঁয়ে সে ডাক মিলিয়ে যায় দূর শূন্যে। মাটির বুকে মিশে যায় কাঁপা গলার আর্ত ডাক। কিন্তু কোনও জবাব আসে না। বুক কেঁপে উঠে সোনার।

"যদি ছাগল খুঁজে না পেয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে থাকে হাঁশিয়া।"

তাই হয় ত গিয়েছে। দ্রুত পায়ে বাড়ী ফিরে আসে সোনা।

কিন্তু দূর থেকেই ধোপাবৌ চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে, "কি, হাঁশিয়াকে পেলে না ?"

বাড়ীও আসে নাই তবে ? সোনায় বুকের ভিতর যেন অবশ হ'য়ে আসে। কি হ'ল তবে মেয়েটার। দিনের বেলায় হারিয়ে যাবে। এও কি সম্ভব। রাত্রি ঘন হয়ে আসে—হাঁশিয়ার দেখা নাই।

পৃথ্বী স্তব্ধ হ'য়ে শোনে। সোনা সন্দেহ করছে কালুকে। সোনার সাথে পৃথ্বী যায় কয়েকটি ছেলেকে সাথে নিয়ে কালুর আড্ডায়। কালুর তাড়ির আড্ডার অবস্থা দেখে অবাক হ'য়ে যায় সোনা। তালা ঝুলছে ঘরে। উঠোনময় জঙ্গল আর আগাছা। একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। স্পষ্টই বোঝা যায়, এখান থেকে পাট উঠিয়ে ফেলেছে কালু।

ফিরে আসে সবাই। বৃথা চেষ্টা। রাত কেটে আকাশ ফরসা হ'য়ে আসে। হাঁশিয়ার কোনও পাত্তাই পাওয়া যায় না। পাড়াশুদ্ধ লোক চঞ্চল হ'য়ে উঠে। ঘুটে বিক্রীর জন্য হাঁশিয়ার সাথে পরিচয় ছিল পাড়ার সকলেরই। হাঁশিয়ার ছাগলের কৃপায় ডাঁটা গাছটা, লঙ্কা গাছটার মাথা নেড়া হ'য়েছে। রাগ, দ্বেষ, স্নেহ মমতা সব মিলিয়েই একটা সম্পর্কে ছিল হাশিয়ার সাথে পাড়াপড়শী হিন্দু বৌ ঝি দের।

পৃথ্বীর বুকের ভিতরটা যেন একটা ভারী পাথরের চাপে একেবারে থেঁতলে গিয়েছে।

একটা সভা বসবে এখুনি তার ঘরে—পাড়ার আর কলোনীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে। আরও ভাল পাহারার ব্যবস্থা করতে হ'বে। সমস্ত কোলকাতায় বিস্তৃত জাল ফেলা রয়েছে যে শত্রুপক্ষের, তারই প্রমাণ এই। শুধু কোলকাতায় নয়, দেশব্যাপিই এই ষড়যন্ত্রের বেড়া জাল পাতা রয়েছে। কতবড় সর্বনাশ যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এই দাঙ্গার আড়ালে আড়ালে, দেশবাসী তার আভাস পাচ্ছে কি।

দূর থেকে চোখে পড়ে, সোনা তার ঘরের দুয়ারে বসে আছে ম্লান মুখে। চোখে চোখ পড়ে। পৃথ্বী লজ্জায় মুখ নত করে। কিসের জোরে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, "এখানে কোনও গোলমাল হবে না।"

গোলমাল হ'লে তবু ত শেষ রক্ত দিয়ে রোখা যেত। কিন্তু একটা জ্যান্ত মেয়ে চুরি। হাঁশিয়ার উপর কি অত্যাচার ঘটছে এখন কোথায় কোন অঞ্চলে! মনে মনে শিউরে উঠে পৃথ্বী।

ম্লানমুখে অপেক্ষা করে পৃথ্বী কলোনীর নেতাদের জন্য। ভিতর শুদ্ধ নির্বাক হ'য়ে রয়েছে তার। বেদনায় বিমূঢ়, অবশ হাত পা গুলি। হঠাৎ মুনশীর মায়ের চিৎকারে চমকে উঠে পৃথ্বী। কাঁপা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে মুনশীর মা, "ও গো-তোমরা আস শীগগীর। হাঁশিয়াকে ত মেরে রেখে গেছে কারবালা পুকুরের ধারে।"

কান্নায় ভেঙে পড়ে বুড়ী।

পৃথ্বী-সোনা-জটা-সতু-আরও অনেকে বুড়ীর পিছু পিছু ছুটে চলে কারবালা পুকুরের দিকে। দূর থেকেই চোখে পড়ে, রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে হাঁশিয়ার। একেবারে নগ্ন। জটা তাড়াতাড়ি তার কোমর থেকে গামছাটা খুলে দেয় মুনশীর মায়ের হাতে। মুনশীর মা ছুটে গিয়ে ঢেকে

দেয় হাঁশিয়াকে গামছা দিয়ে। ঠক ঠক করে হাত কাঁপছে তার। বিকৃত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে "প্রাণ আছে ত! শীগগীর ঘরে নিয়ে যা।"

পৃথ্বী নাড়ী দেখে', সতুকে বলে, "এখুনি ডাক্তার মিত্রের বাড়ী চলে যাও সাইকেলে। আমি একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি।"

জটা আর সোনা ধরাধরি করে তুলে নিয়ে আসে হাঁশিয়াকে। পৃথ্বী তার ঘরে এনে উঠায়—"সুস্থ না হ'ওয়া পর্যন্ত আমার এখানেই থাক।"

বিছনার উপর শুইয়ে দেয় হাঁশিয়ার অচৈতন্য দেহ।

জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। চোখ মুখ ফুলে বীভৎস হ'য়ে উঠেছে। জ্ঞান আসার কোনও লক্ষণই দেখা যায় না।

ডাক্তার মিত্র এসে রোগী দেখে, বলে, "রেইপিং কেস"

পরীক্ষা করতে করতে একবার প্রশ্ন করে—"অবিবাহিতা?"

চিন্তিত ছায়া নামে চোখে।

ইনজেকসন ফুঁড়ে দিতে দিতে পৃথ্বীকে বলে ডাক্তার, "শক খুব বেশী লেগেছে। ভয়ের কারণ আছে। উঠতে যেন দেওয়া না হয়। আমি বিকেলে আবার আসবো।"

দুপুরের দিক থেকেই অবস্থা আরও খারাপ হ'য়ে উঠে। ভুল বকা শুরু হয়। আর কেবলি লাফিয়ে উঠতে চায়—"ছেড়ে দাও, পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও।"

শক্ত করে, ধরে' থাকে ধোপাবৌ আর সোনা। দুজনেও যেন ওকে ধরে রাখতে পারছে না। বারে বারে চেঁচিয়ে উঠে, যেতে চায়। "আরও একজন—ঐ যে আরও তিনজন—চার জন পাঁচ জন। পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও। আমাকে ঢেকে দাও—ঢেকে দাও। আমার কাপড় ফিরিয়ে দাও।"

ঠিক সন্ধ্যার সময় সব শেষ হ'য়ে যায়।

নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে পৃথ্বী। নিষ্প্রাণ দেহের দিকে তাকিয়ে

মনে মনে আর্তস্বরে বলে পৃথ্বী, "আর লজ্জা ঢাকবার কোনও প্রয়োজন নেই তোমার হাঁশিয়া। কিন্তু আমাদের এ লজ্জা ঢাকবো আমরা কি দিয়ে?"

স্তব্ধ হ'য়ে ভাবে শীতা, দালালদেরই জয় হ'ল। কমরেডদের এত আপ্রাণ চেষ্টায়ও রোধ করা গেল না এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আবার সেই পৈশাচিক নিষ্ঠুর রক্তপাত।

মাইলখানিক দূরে একটা কুঠিতে একমাত্র রেডিও অবশিষ্ট রয়েছে গ্রামে গত দাঙ্গার পর। গ্রামবাসীরা ভীড় করে দাঁড়ায় কুঠির প্রাঙ্গণে সংবাদ শোনার জন্য—কোলকাতার সংবাদ।

কিন্তু নূতন আইন জারী হ'য়ে যায়—কোলকাতার সংবাদ ধরা নিষিদ্ধ। সেখানকার পত্রিকাও নিষিদ্ধ। আরও ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে।

কোলকাতাগামী যাত্রীরা মাঝপথ থেকে ফিরে আসে লোমহর্ষক সংবাদ নিয়ে। রেলগাড়ী থেকে হিন্দুদের টেনে নামিয়ে কোন অচেনা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে। তাদের ভাগ্যে কি আছে, ভাবতেও পারছে না কেউ। আবার সেই '৪৬ সালের ভয়ঙ্কর কাহিনীর পুনরাবৃত্তি।

ভোর না হ'তেই একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে, এ গ্রামই নাকি আক্রমণ করবে রাতে। আতঙ্কে, ত্রাসে মুখ শুকিয়ে যায় গ্রামের হিন্দুদের। সড়ক দিয়ে হিন্দুদের আনাগোনা বন্ধ হ'য়ে যায় দুই প্রহর বেলা থাকতেই। জনপ্রাণী দেখা যায় না পথে। কচিৎ দুই একটি লুঙিপরা লোক চোখে পড়ে। নিঝুম নিস্তব্ধতা চারদিকে।

যেন একসাথে এক মহামৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে নিশ্চুপ হ'য়ে গ্রামের সমস্ত হিন্দুরা।

গাছের কাক পক্ষীটি পর্যন্ত যেন স্থির হ'য়ে অপেক্ষা করছে একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার জন্য।

সন্ধ্যা না হ'তেই নম, বাগদি, মাঝিপাড়া থেকে দলে দলে পোটলাপুটলি, ছেলেমেয়ে কোলে কাঁখে নিয়ে আশ্রয় নেয় খামার বাড়ীতে। শীতা দরদালানের তালা খুলে দেয় বসতে।

কাশীমুদ্দি এগিয়ে আসে বাড়ীর মধ্যে, হাতের লাঠিখানা শক্ত করে ধরে' বলে, "কোনও ভয় নেই মা। আমাদের হাতে লাঠি থাকতে কারও সাধ্য নেই এ গ্রামে ঢোকে।"

গ্রামের জন পঁচিশ জুয়ান ছেলে বেছে নিয়ে রাত জেগে পাহারা দেয়। চৌমাথায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে নজর রাখে কাশীমুদ্দির দুই ভাই।

দালানের ভিতরে ঠাসাঠাসি করে বসে আছে মেয়েরা। ভয়ে, আতঙ্কে হিম হয়ে আছে বুকের ভিতরে। কোলের উপর ঘুমিয়ে আছে শিশুরা। সোমত্ত বয়সের মেয়েদের মুখচোখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে ভয়ে। বলির পশুর মত চোখমুখে বাকরুদ্ধ আতঙ্ক।

"কি হবে বৌঠারাণ?" বিকৃত কণ্ঠে প্রশ্ন করে শীতাকে। বিশ্বাস করতে পারছে না যেন তারা মুসলমান পাহারাদারদের।

শীতা অভয় দিতে চেষ্টা করে, "আমরা এতজন আছি। একটা কিছু করা যাবেই। মনে জোর রাখ।"

মুখে সাহস দেয়। কিন্তু ভিতরে মূক ক্রন্দন বয়ে চলেছে শিরায় শিরায়।

মিঠুরও চোখেমুখে প্রতিচ্ছায়া পড়েছে বড়দের এ ভয়ার্ত চোখের। বোঝে না কিছু। বারে বারে মায়ের মুখের দিকে তাকায়।

বহুদূরে কয়েকটা কুকুর একসাথে ডেকে উঠে। সাথে সাথে কান সজাগ করে থাকে বাইরে বসা পুরুষেরা। প্রতীক্ষ্যমান প্রতিটি মুহূর্ত। এই বোধ হয় এল।

গাছের পাতাটি খসার শব্দে পর্যন্ত চমকে উঠছে মেয়েরা।

গ্রামের এক মাতব্বর আবারও এসে অভয় দেয়, "গ্রামশুদ্ধ লোক গিয়া বাধা দিমু আমরা, সত্যি যদি এ গ্রামে কেউ ঢোকে বিদেশ থেইকা আইসা।"

কাশীমুদ্দি জোর দিয়ে বলে, "আমাদের হাতেও লাঠি আছে।"

দুই তিনটি কম বয়সের মুসলমান ছেলে বাঁকা চোখে লক্ষ্য করে কাশীমুদ্দিকে। কিন্তু মুখে এ বিরূপভাব প্রকাশ করার সাহস পাচ্ছে না এখনও। কোলকাতার সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছে তাদের দল।

অসহায়, নিরস্ত্র মানুষের সুদৃঢ় নিরাপত্তার প্রয়োজনকে এমন করে পাথর চাপা মুহূর্তের অনুভূতি দিয়ে টের পায় নাই এর আগে শীতা। ঘরের কোণায় গুছিয়ে রাখা লোহার খাটের ঠাসা গুলি দেখে' রাখে। আর নিঃসীম নিস্তব্ধ ধানী জমির দিকে কান পেতে থাকে।

মাত্র দু'টো বাজলো। আরও দুই প্রহর বাকী রাত্রি শেষ হ'তে।

ঘরের ভিতরে কার শিশু কেঁদে উঠে কঁকিয়ে। অস্ফুট স্বরে সান্ত্বনা দেয় তার মা, "চুপ, চুপ কাঁদে না।" ভীত হ'য়ে উঠে সে, হয়তো তার এ ছেলের কান্নাই তাদের নিশানা জানিয়ে দেবে দূরের আক্রমণকারীদের। তাড়াতাড়ি স্তন ঢুকিয়ে দেয় ছেলের মুখে।

বাইরে পাহারা দেওয়া মুসলমান ছেলেরা বিড়ি ফুঁকে ফুঁকে ঘুমের আমেজ কাটাচ্ছে।

বাতিতে তেল ফুরিয়ে আসে। কাশীমুদ্দি উঠে আসে শীতার কাছে, "বৌ-ঠারাণ, কেরোসিন আছে ত ঘরে?"

তেল ভরতে গিয়ে হাত কাঁপে মাতঙ্গিনীর। হাত থেকে কাচের চিমনিটা পড়ে ভেঙে যায়। শীতা উঠে তেল ভ'রে দেয় আরেকটা হারিকেনে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে মাত্র তিনটা বেজেছে।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে নদী থেকে। মায়ের কোলে ঘুমন্ত শিশুরা মাঝে মাঝে চমকে উঠে শক্ত করে জড়িয়ে ধরছে মায়েদের।

ভোর হ'য়ে আসে। তাকিয়ে দেখে উঠোনে বসা মানুষেরা, আকাশ ফরসা হ'য়ে আসছে। স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে গাছপালা ঝাড় জঙ্গল। পূব আকাশে দিনের আভাস দেখা যাচ্ছে, একটি আতঙ্কিত বিভীষিকাময় রাত্রি শেষে।...

দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হ'য়ে আসছে। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'য়েছে। কিন্তু চলতে ফিরতে চোখে পড়ে পৃথ্বীর হাঁশিয়াকে গোর দেওয়া মাটির ঢিবিটা। হাঁশিয়ার কবর!

মোচর দিয়ে উঠে বুকের ভিতরে।

হাঁশিয়ার মৃত্যু এমন করে বিবশ করে দিয়ে গিয়েছে তাকে। নিজেকে অপরাধী মনে হয় সবসময়ই।

মনে পড়ে ভীত হাঁশিয়াকে অভয় দিয়েছিল সে—"কিছু ভয় নেই—আমরা এতজন থাকতে।"

এ লজ্জা পৃথ্বী লুকাবে কোথায়। তারই প্রতিবেশী একটি অসহায় মেয়েকে রক্ষা করতে পারলো না তারা এ কাল চক্রান্তের হাত থেকে।

চুপ করে ছাদে একা বসে থাকে পৃথ্বী—আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে সে। শোকার্ত করুণ দৃষ্টিটা ঘুরে ফিরে স্পর্শ করে হাঁশিয়ার কবর। কামিনী গাছের ফাঁক দিয়ে—সূর্যাস্তের শ্রান্ত রৌদ্র রেখান্বিত হ'য়ে নেমে এসেছে কবরের গায়ে। কিন্তু ঐ রোদ আর কোনদিন স্পর্শ করবে না মাটির নীচের দেহকে। সমাধির নীচে ধীরে ধীরে মাটিতে মিশে চলেছে হাঁশিয়ার দেহ।

অশ্রান্ত শ্রাবণের ধারায় এ মাটির কবরও মিশে যাবে ধরণীর সাথে—মিলিয়ে যাবে শেষ চিহ্নও। শত বৎসর পরের মানুষেরা জানবে না কোনদিন—এইখানে, ঠিক এই বাদাম গাছের তলায় রচিত সমাধির কথা। তাদেরই মত রক্ত মাংসে গড়া একটি দেহ কেমন করে' মিশে গেল এই মাটির তলায়—অজানিতে থাকবে সে সংবাদ। হাঁশিয়ার কথা জানবে না ভবিষ্যত পৃথিবীর মানুষ। কিন্তু তার এই অকাল মৃত্যুর সাক্ষ্য দেখে ইতিহাসের কবর খোঁড়া 'ফসিলেরা'। পৃথিবীর মাটির তলায় শতাব্দীর পর শতাব্দীর লাঞ্ছিত মানুষের কঙ্কালের স্তূপের সাথে জমা হ'য়ে থাকবে হাঁশিয়ার দেহ গলিত মাথার খুলি।

কুরী চা নিয়ে এসে পৃথ্বীকে লক্ষ্য করে' প্রশ্ন করে, "অসুখ করেছে নাকি। এত খারাপ দেখাচ্ছে চেহারা"

কপালে হাত দিয়ে বলে, "জ্বরই ত। আর এই ঠাণ্ডায় বাইরে বসে আছ? ঋতু পরিবর্তনের সময় এখন।"

কুরী থার্মোমিটার আনতে যায় ঘরে।

পৃথ্বী ম্লান চোখে তাকায় আকাশের দিকে। ঋতু পরিবর্তনের সময়।

বিহঙ্গদের শীতাবসানের দীর্ঘ যাত্রা শুরু হ'য়েছে। গোধূলি আকাশ থেকে দিগবধূদের ইশারা জানাচ্ছে সপ্তর্ষীমণ্ডল। নববধূর মন্থরতা বাতাসের মৃদু হিল্লোলে।

অরণ্যের মধুমাস। "সাজ, সাজ"—উৎসবের সাড়া চতুর্দিকে।

পৃথ্বীর চিন্তাবধির কানে কানে কখন জানিয়ে গিয়েছে ফুলগন্ধ ভারী বাতাসেরা ঋতুপরিবর্তনের এই মধু-সংবাদ, টেরও পায়নি সে। তার অনুরাগী দৃষ্টিও আজ শুধু দুঃখ-কুয়াশায়ই আচ্ছন্ন। মনে মনে আর্তস্বরে বলে, এমন সুন্দর পৃথিবীকেও আণবিক বোমা দিয়ে ধ্বংসে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে পৃথিবীর একাংশে। নিজেকে সম্বোধন করে

বলে উঠে পৃথ্বী মনে মনে, "লেখক, তোমার কলম তুলে ধর। কলমে, তুলিতে আর গানে—নূতন সুর বাঁধা স্বরলিপিতে রচনা করে কল্যাণী মানুষের ঐক্যের আহ্বান। জানাও দিকে দিকে অনন্ত শান্তির ডাক।"

কুরী জ্বরের তাপ দেখে চমকে উঠে, "এতজ্বর! বিছানা করে দিচ্ছি শুয়ে পড়।"

পৃথ্বী নিজেও অনুভব করে, জ্বরের তাপে ভারী হ'য়ে আসছে নিঃশ্বাস। শীত বোধ করছে ভিতরে। একটা বই নিয়ে ঘরে এসে বসে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। মস্তিষ্কের কামারশালায় সহস্র হাতুড়ির পিটুনি শুরু করে দিয়েছে যেন রোগ দানবীরা। বহুকাল পর বলিষ্ঠ স্নায়ুদের হাতের মুঠোয় পেয়েছে ; সহজে রেহাই দেবে না।

বাতিটা নিবিয়ে শুয়ে পড়ে সে বই বন্ধ করে।

জ্বরে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে থাকে পৃথ্বী। কুরী ভয় পেয়ে যায়, "দাদা ডাক্তার বাবুকে খবর দেই।"

"তিনদিন থাকবে এ জ্বর—ডাক্তার ডাকতে হ'বে না। তুই বরং রথীকে একটা খবর দে আসতে। বলিস, খুব জরুরী কাজ আছে তার সাথে। আর বলিস একটা ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রেসক্রিপসন লিখিয়ে আনে যেন কোনও ডাক্তারের কাছ থেকে।"

তিনদিন কেটে যায়—জ্বর উপশম হয় না। জ্বরে আচ্ছন্ন মন কোন দূর প্রবাসিনী প্রিয়তমার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠে। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে' ডাকে পৃথ্বী, "শীতা, আর কতকাল দূরে থাকবে তুমি ?"

চোখ মেলে চেয়ে দেখে পৃথ্বী, কুরী টেম্পারেচার নিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে।

লজ্জা পেয়ে রাঙিয়ে উঠে পৃথ্বী মনে মনে।

একটা লাল ছোপ দ্রুত মিলিয়ে যায় মুখের উপর। তাও লক্ষ্য

করে কুরী। মুহূর্তে বহুদিনের বহু ঘটনার অর্থ ঘোমটা খুলে দাঁড়ায় তার সামনে।

সাতদিন পর জ্বর উপশম হয়েছে পৃথ্বীর আজ। আজই ভোরের ডাকে শীতার একখানা চিঠি এসেছে। পৃথ্বীর সেই চিন্তিত চিঠির জবাব।

চিঠিটা মনে মনে ভাবে সারাদিন পৃথ্বী। "শ্রদ্ধাস্পদেষু···।" মধুর হস্তাক্ষরে লেখা ছোট্ট কয়টি ছত্র।

প্রশ্রয়ের সুর নেই কোথায়ও। তবু প্রতি ছত্রের আড়ালে কোথায় যেন একটা ব্যথার সুর বেজে উঠেছে। "সামাজিক আমির" ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যেন লুকাতে চাওয়া একখানি মন—ছলছল দুটি আঁখি।

বেদনায় নীরব হ'য়ে যায় পৃথ্বী। প্রতি রক্তবিন্দুতে ছড়িয়ে পড়েছে তার আত্ম নিবেদনের আকুল কামনা।

সারাদিন মনের ভিতরে একটি সুর গুনগুন করছে—"হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়—বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা' কিছু সঞ্চয়।"

সায়াহ্ন আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর মিছিল তীরের বেগে ছুটে চলেছে। ডানায় ডানায় ওদের একসাথে ছুটে চলার মুখর গতি।

সবশেষে পিছিয়ে পড়া একটি একা পাখী ডানা টেনে টেনে চলেছে ধূসর গম্ভীর আকাশসমুদ্র পাড়ি দিয়ে। করুণ চোখে তাকায় পৃথ্বী পাখীটার দিকে। যেন তারই মত একলা চলার শ্রান্ত অবসাদ এলিয়ে পড়েছে ঐ অকাশ-সঞ্চারী বিহঙ্গের ক্লান্ত পাখায়।

কয়দিনের ঘর বন্দী জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছে পৃথ্বী। রোদ পড়ে' যেতেই ধোপাবাড়ীর জামার খোঁজে যায় কুরীর কাছে, "জামা কাপড় গুলো সব কোথায় সরিয়ে রেখেছিস?"

"জামা দিয়ে কি হ'বে?" দাদার মতলব বুঝে প্রশ্ন করে কুরী।

"একটু ঘুরে আসি।"

শাসনের সুরে বলে কুরী, "আজই ত মাত্র পেটে ভাত পড়েছে, এরই মধ্যে বের হ'বার জন্য এত ব্যস্ত হ'লে চলবে না। ডাক্তার বাবুর কড়া নিষেধ আছে—ঘোরাঘুরি বন্ধ করতে হ'বে।" পৃথ্বী হাসে বোনের শাসন দেখে। "আচ্ছা আজ তোমার কথা রাখছি—কাল কিন্তু আমার কথা রাখতে হ'বে।"

অগত্যা ছাদে এসে বসে। ছাদ থেকে চোখে পড়ে—সোনা বসে রয়েছে ধোপাবাড়ীর উঠোনে। বিরস বিষণ্ণ মূর্তি। চোখে চোখ মেলে। সমব্যথায় চোখ নত করে পৃথ্বী। সমস্ত মনখানিতে ব্যথার ঝংকার দিয়ে উঠে।

হাঁশিয়ার অভাবে ঢেলোকে নিয়ে কাপড় পাট করছে ধোপাবৌ। অদূরেই হাঁশিয়ার কবরের উপর শীত শেষের সবকটি ঝরা পাতা খসে পড়েছে।

পৃথ্বী চা খেয়ে কলম নিয়ে বসে। জানালা দিয়ে চোখে পড়ে প'ড়ো জমিটা। মরা ঘাসে ঢাকা পতিত জমিটার বুকে জমে আছে বন্ধ্যাজীবনের কত ক্লান্ত নিঃশ্বাস।

একদিন দূর বসুন্ধরার সোনালী স্বপ্ন জড়িয়ে ছিল ওর প্রতিটি ঘাসের মাথায়। কিন্তু আজ যেন স্বপ্ন দেখে দেখে ও ক্লান্ত। কল্পনা-শ্রয়ী মনের শেষ অবসাদ যেন ঘনিয়ে এসেছে কঠিন জমির রিক্ত বেদনায়।

পৃথ্বী অলস চোখে তাকায়। পতিত জমির বুকের এ ঘন অবসাদ

এ ক্লান্তি, একি তার নিজেরই মনের প্রতিচ্ছবি? সে কি আজ ক্লান্ত? হতাশার শেষ ক্রন্দন শুরু হ'য়ে গিয়েছে কি অন্তরের গোপন বেদনায়?

মানুষের কাছে তার আশা ছিল প্রচুর। ছিল অনন্ত বিশ্বাস। আশা আর বিশ্বাস—জীবনের মেরুদণ্ড। কিন্তু সে আশা, সে বিশ্বাস আজ কোথায়!

মানুষের বুকে মানুষ ছুরি বসিয়েছে—জীবনের শেষ আর্তনাদে পিশাচের অট্টহাসি ঝলসে উঠেছে মানুষেরই হিংস্র চোখের ক্রূর ইশারায়।

ভুলতে পারে না পৃথ্বী গৃহে-ফেরা মানুষের চোখে মুখের সেই অবিশ্বাসের কালছায়ায় ঢাকা আতঙ্ক আর দিশেহারা শিশুর কাতর চাউনি। ঐ বাস চলা মেঠোপথের ধারে পড়ে থাকা প্রাণহীন কঠিন শীতল দেহের ছবি। ঘুম ভাঙা চোখে শেষ রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতই দিনভরা অবসাদ এনে দিয়েছে তার মনে মেঠো পথের সে কুস্মৃতি।

ক্লান্ত চোখে তাকায় পৃথ্বী—দূরে প্রান্তর সীমানায় নিবিড় হ'য়ে জড়িয়ে রয়েছে যেন দেশী টালির ছোট ছোট চালাগুলি।

ক্ষুদ্র একটি টালির চালা—যেন একটা জাতির সহস্র কামনার ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস।

লিখে যায় পৃথ্বী অক্ষরহীন দিন পঞ্জিকায়:—

পৃথ্বী, তুমি ত শুধু দর্শকই নও এই বিয়োগান্ত নাটকের। তোমার আত্মার অদৃশ্য সংযোগ রয়েছে মেঘনা, পদ্মা, যমুনার সাথে। তাইত তোমার নাড়ীতে নাড়ীতে, মনের তন্ত্রীতে এত বেদনানুভূতি। পদ্মা মেঘনা যমুনা, জীবনের স্তরে স্তরে সাজান তোমাদের স্মৃতির ভাণ্ডার। তোমাদেরই জল, বাতাস, আলো আর আকাশের অকৃপণ দানে মহিমান্বিত জীবনস্মৃতি।

রোমাঞ্চময় জীবনের গাথা রচিত হ'য়েছিল তোমাদেয় নর্ম পলিতে পলিতে। প্রেমের প্রথম নিঃশ্বাস আর বিপ্লবীর প্রথম দীক্ষা।

আজ উজান স্রোতে সে সবই কি ধুয়ে মুছে গেছে? কালের গাঢ় পর্দা নেমে এসেছে কি সেই দূর শ্যামলিমার বুকে। নূতন যুগের ভেরী বেজে উঠেছে আগামী দিনের তোরণ স্তম্ভে—আর পেছনে তাকাবার আদেশ নেই, পদাতিকের। শুধু এগিয়ে চলতে হ'বে সম্মুখে?

কিন্তু অতীতের যে জলবায়ুকণা মিশে আছে তোমার রক্তের অণুতে অণুতে, তাকে অস্বীকার করবে তুমি কি করে'। ঐ যে ঘরের জানালা দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে মেঝের উপর রৌদ্র কণিকারা, স্নিগ্ধ উত্তাপ ঢেলে দিচ্ছে তোমার অবসন্ন দেহে, এ কি শুধু রৌদ্র? শুধু সূর্যকর তাপ? আর কিছু নয়?

তোমার ফেলে আসা দিবসের চূর্ণিত স্মৃতি কণিকারাও কি মিশে নেই এই প্রভাতী রোদে? মিশে নেই প্রথম অনুভূত প্রেম উত্তাপ? পদ্মা মেঘনার স্মৃতিময় বায়ুস্পর্শ অনুভব করনি কি কখনও বর্ষারম্ভের শস্যহীন পথে চলতে চলতে, কোনও ক্লান্ত মধ্যাহ্নে বা শ্রান্ত প্রদোষে?

তোমার যৌবনের মধুরাগিণী অনুরণিত সেই পদ্মাতীর্থকে ভুলবার সাধ্য নেই।···

কলম রেখে উঠে পড়ে পৃথ্বী। নাঃ, আজ আর লেখা হ'বে না। মনের অবসন্নতা কিছুতেই কাটে না।

সুন্দর প্রকাশ ঘরে ঢোকে। প্রফেসার প্রেমাংশুর জন্য একটা কাজ ঠিক করেছে সে তার পত্রিকা অফিসে। কালই ভোরে অফিসে দেখা করতে হবে প্রেমাংশুকে। পৃথ্বী বিকেলের দিকে যায় প্রেমাংশুর বাড়ী। বিবেকানন্দ রোডের কাছে বাসা।

অধ্যাপক ধর্মঘটের সময় কলেজে পিকেটিং করার অপরাধে তার চাকরি যায়। সেই থেকে বেকার। ছেলেমেয়ে নিয়ে শোচনীয় অবস্থা

চলছে। তার উপর বৌয়ের যক্ষ্মা—কয়দিন হ'ল ধরা পড়েছে এ রোগ।

ছাঁটাইয়ের যুগ। কম্যুনিষ্টের গন্ধ পেলে ত কথাই নেই। ছাঁটাই—ছাঁটাই—চতুর্দিকে শুধু ছাঁটাই। এ ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে যে সংঘবদ্ধ একতা দরকার, তা' আজ নেতাদের দলীয় স্বার্থগত বিভ্রান্তিতে ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে। তাই আজ এত নির্দ্বিধায় ফ্যাক্টারীগুলিতে ছাঁটাই চালিয়ে যেতে পারছে উপর-ওয়ালারা। শ্রমিকদের মধ্যে একতার অভাব। ধর্মঘটগুলির জোর কমে গিয়েছে। দেশব্যাপি ছেয়ে গিয়েছে বেকার সমস্যায়। খাদ্য সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, বাস্তু সমস্যা। সমস্যাই শুধু সম্মুখে। সমাধানের পথ দূরে।

প্রেমাংশুর সঙ্গে দেখা করে' ফিরতে ফিরতে রাত হ'য়ে যায়। বাস স্টপের কাছে অপেক্ষমান লোকের ভীড়। বাস আর আসে না। ট্রামও না। পাশের প্রাসাদ থেকে বেতারে রবীন্দ্র সঙ্গীত ভেসে আসছে। কোন সুগায়িকা গাইছে। আবেশ জড়ান সুর। তবু এ সুর স্পর্শ করে না অফিস ফেরতা মানুষের মনকে। অধৈর্য হ'য়ে উঠেছে তারা। চারপাশে বাসের জন্য অপেক্ষমান মানুষের ভীড় ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বড় ক্লান্ত, পিষ্ট মুখছবি। ক্ষুধাতুর সন্তানের কাতর কাকুতিময় মুখের ছবি ভাসছে, দৃষ্টির বিষণ্ণতায়।

প্রেমাংশুর স্ত্রীর উদ্বিগ্ন, ম্লান চোখ দুটি ভীড়ের ভিতর থেকে বারে বারে ছায়া ফেলছে পৃথ্বীর চোখের তারায়।

বেতার সঙ্গীত শেষ হ'য়ে যায়। সঙ্গীতের সুর মিলিয়ে যেতে না যেতেই মহিলা ঘোষণাকারীর কণ্ঠস্বর শূন্যের বুক ফুঁড়ে ভেসে উঠে :—
"এবার 'পুর্ণবাসন ও তার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলছেন, মাননীয়—"

রাস্তার গোলমালে তলিয়ে যায় নামটা। "প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল তবু বাস আসছে না কেন।" অসহিষ্ণু প্রশ্ন শোনা যায় ভীড়ের ভিতর থেকে।

"একটা শোভাযাত্রায় নাকি ট্রাম বাস সব আটকে পড়েছে।" উত্তর দেয় আরেক জন।

পৃথ্বী সামনের স্টপের দিকে হাঁটতে থাকে। আবার আরেকটি প্রাসাদ থেকে বেতার বাণী ছড়িয়ে পড়ছে। কোনও শ্রদ্ধেয় মহোদয়ের ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর। কে বলছেন? চেনা চেনা লাগছে যেন গলার স্বর। কান পেতে একটু কথাগুলি শুনতে চেষ্টা করে পৃথ্বী। স্খলিত কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে বলছে :— "যে পাপে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহ-হারা, সে পাপকে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব আজ হিন্দু মুসলমান দু'য়েরই। বাঙালী তরুণ তরুণীর নির্মল বুদ্ধি আর উদার হৃদয়ই একমাত্র পারে এই সব ভিটা ত্যাগী মানুষের দুঃখ ঘোচাতে......।"

বেতারবাণী মিলিয়ে যায়—সহস্রাধিক মেয়েলী কণ্ঠের ক্ষুব্ধ আওয়াজে।

"বাস্তু হারাদের—" "বাস্তু দাও।"

"না হয় গদি—" "ছেড়ে যাও।"

"রেশন ছাটাই—" "চলবে না।"

"রেশন ছাটাই—"

লিড দেওয়া মেয়ের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সহস্র কণ্ঠে গর্জে উঠছে—"চলবে না।"

পৃথ্বী রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে বাস্তুহারাদের দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিন্নবসনা উদ্বাস্তু মেয়েদের সারি। কোলে কাঁখে অর্ধ উলঙ্গ কঙ্কাল-সার শিশু। চোখে পুঞ্জ পুঞ্জ বিদ্বেষ আর স্নেহের কাঁকুতি। পাদুকাহীন পায়ে পল্লীবধুর বিহ্বল জড়তা।

আকর্ণ ঘোমটা টানা পূর্ববঙ্গের বধূরা মিছিলে আওয়াজ দিতে দিতে চলছে প্রকাশ্য রাজপথে। তাদের কোলের শিশুদের মুখগুলি ক্ষুধায় শুকিয়ে গিয়েছে—কাতর করুণ চাউনি চোখে।

থুন থুনে বুড়ীরাও লাঠিতে ভর দিয়ে চলেছে আগে পিছে। বয়সের ভারে পিঠ নুয়ে পড়েছে। বিদ্যুতের প্রখর আলোয় তাদের তালি দেওয়া কপেড়ের বড় বড় ফোঁড়গুলি জ্বল জ্বল করছে।

সরকারের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমতী প্রতিবাদ যেন এগিয়ে চলেছে।

সপ্রশ্ন মনে ভাবে পৃথ্বী, পুরুষসত্তা সমাজের চিরধরা কাঠামোর ফাঁক দিয়ে এমনি করেই কি উঁকি মারে ইতিহাস ?

…আড়ষ্ট পায়ের মিছিল ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সামনে। পেছনে আটকেপড়া ট্রামবাসের দীর্ঘ সারি।

আবার নাকি গুলি চলেছে কোন বাস্তুহারা কলোনীতে। বিক্ষুব্ধ বিস্ময়ে হতভম্ভ হ'য়ে যায় প্রমীলা। এ যেন জুলুম রাজত্ব শুরু হয়ে গেল। কথায় কথায় গুলি। মানুষের প্রাণ কি এতই তুচ্ছ ওদের কাছে ?

কাজে কর্মে আর মন লাগে না প্রমীলার—সংসারের প্রতিও আর সে আকর্ষণ নেই। কোনমতে দায় সারা কাজ দু'হাতে ঠেলে সাঙ্গ করে।

উনানে আগুন দিচ্ছে প্রমীলা, হঠাৎ কানে আসে একটা গ্রামোফোনের চোঙের ভিতর দিয়ে কি যেন বলছে কে।

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসে।

শূন্যের বুক ছিঁড়ে গম্ভীর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে চোঙের ভিতর দিয়ে :— "আজ বিকেলে উদ্বাস্তুদের উপর পুলিসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক বিরাট জনসভা হ'বে বালীগঞ্জে। আমরা বাস্তুহারা নির্যাতন বিরোধী কমিটি থেকে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি—আপনারা সবাই স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে, বাস্তুহারা মাঠে জড়ো হ'বেন। সেখান থেকে মিছিল করে সভায় যাওয়া হ'বে।"

খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে আবার বলছে সেই একই কথা। ঘর থেকে বেরিয়ে সবাই শোনে— সভায় যোগ দেবার এ আহ্বান।

স্তিমিত চোখগুলি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে। কোথায় যেন একটা যোগ সম্বন্ধ রয়েছে ঐ লাউড্ স্পীকারের গম্ভীর আওয়াজের সাথে তাদের জীবনের সুখদুঃখের তারে।

তুলসীর বৌও তার তিনমাসের ছেলেটুকুকে বুকে চেপে শোনে এ আহ্বান। নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখে দূরে বিলীয়মান বাস্তুহারা নির্যাতন বিরোধী ছেলেদের। তারই ব্যথার জন সব।

বাস্তুহারা নির্যাতন! চোখের কোণা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তুলসীর ছায়ামূর্তিই যেন এগিয়ে চলেছে ঐ মিছিলের সাথে। সেই রক্ত মাখা প্রাণহীন মূর্তি।

বিকেলবেলা ক্ষেত্রমণিকে ডেকে নিয়ে চলে প্রমীলা সভায়।

"আপনিও যাইবেন?"

"যামু না কও কি? আমাগো স্বামীপুত্রের বুকে গুলি ছুড়বে, এ কি সহ্য করা যায়?"

তুলসীর বৌও ছেলেটুকুকে একটা কাঁথায় জড়িয়ে নিয়ে চলে সাথে। ক্ষেত্রমণি একটু আপত্তি করে, "এই দুধের বাচ্চা লইয়া—" প্রমীলা বাধা দিয়ে বলে, "চলুক। ঘরে কি আর শান্তি আছে ওর। তবু পাঁচজন ব্যথার জনের পাশে বসে একটু যদি শান্তি পায়।"

উর্মিদের কলোনীতেও গ্রামোফোনের চোঙ নিয়ে ঘুরে ঘুরে একই ঘোষণা জানিয়ে গিয়েছে।

বিকেল বেলা উর্মি ডাকে প্রতিবেশিনী কমলাকে, "সভায় যাবেন না?"

কমলা উত্তর দেবার আগেই তার শাশুড়ী উত্তর দেয়, "না, ছেলেরা

নিষেধ করে গেছে এ সভায় যেতে, এটা নাকি কম্যুনিষ্টদের সভা।"

ঊর্মি উত্তর দেয়, "সভা কারা ডেকেছে সেটাই ত বড় কথা নয়। সভা ডাকার উদ্দেশ্যটা বড় কথা। আমাদের দাবী জানাবার জন্যই এ সভাডাকা। যত বেশী একজোট হয়ে দাবী জানান যায়, ততই জোর বেশী হয়।"

মহিলাটি বিরক্ত স্বরে উত্তর দেয়, "আমরা মেয়েমানুষ, অত কেতাবী কথা বুঝি না। আমরা বুঝি হিন্দু বাস্তুহারার দুঃখ। এই কলোনীর মধ্যে এত ত সভাসমিতি হ'চ্ছে—কিন্তু সত্যি সত্যি হিন্দুর দুঃখ নিয়ে ভাবে কয়জন? একমাত্র লোক দেখি মধুমুখার্জী, যে তবু হিন্দুদের জন্য ভাবে, দু'চার কথা বলে।" পাশের ঘরের মহিলাটিও সমর্থন করে, "হিন্দুদের মধ্যে সে একতা যদি থাকবেই, তবে কি আর মুসলমানরা পারে এমন করে অত্যাচার চালাতে। সোজা অত্যাচার না, গায়ের লোম কাটা দিয়ে উঠে শুনলে। এতেও হিন্দুদের চোখ খুললো না।"

ঊর্মি একাই চলে যায় বাস্তুহারা মাঠে। মহিলা দু'জন চোখে চোখে কি একটু কটাক্ষ করে।

আবার পূর্ব কথার স্বর টেনে বলে কমলার শাশুড়ী, "শুনছি মধু মুখার্জী শীগগীরই এক মস্ত সভা ডাকবে। কলোনীর ছেলেদের সব একজোট করার চেষ্টায় আছে। তবে ঐ কম্যুনিষ্টরাই নাকি যত গোলমাল আরম্ভ করেছে কলোনীর মধ্যে। গোলমাল করাটাই একমাত্র কাজ নাকি তাদের।

"আমরা মেয়ে মানুষ এসবের বুঝিই বা কি। আমার ছেলেদের মুখেই শুনি, কম্যুনিস্টরা মুসলমানদের দালাল।"

স্বর একটু নামিয়ে বলে পাশের ঘরের মহিলাটি, "আমার মনে হয়, কল্যাণের বৌও ঐ দলেরই।"

"তা' বুঝি জান না—ওর ভাইয়ের বৌয়ের খবর। মস্ত একজন পাণ্ডা ছিল সে। পুলিসের গুলিতে মারা গেছে। অথৈ জলের মাছ এরা। তবে এখানে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না, মধু মুখার্জীর দল থাকতে। আমরা অবশ্য এসব দলাদলি টলি কিছু বুঝি না—আমরা বুঝি হিন্দুর স্বার্থ। হিন্দুর স্বার্থের কথা যে বলবে আমরা তারই দিকে।"

বাস্তহারা মাঠ থেকে মিছিল বের হয়। মাথার উপরে প্রখর সূর্য—পায়ের তলায় তাঁতান পিচ।

ছেলেকে বুকের কাপড়ের তলায় ঢেকে স্তন মুখে ঢুকিয়ে, মিছিলের সাথে আড়ষ্ট পায়ে এগিয়ে চলেছে তুলসীর বৌ। তারই পিছে পিছে চলেছে প্রমীলা ধীরে ধীরে পা ফেলে—জীবনের প্রথম মিছিলে॥

ছাত্রদের এক ঘরোয়া মিটিং ডাকা হ'য়েছে পৃথ্বীর বাড়ীতে। 'বিগ বুর্জোয়া' এই ছোট্ট কথাটির মধ্যে এমন পাহাড় প্রমাণ অর্থ লুকিয়ে রয়েছে! তাদের এই দুই বছরের এত তর্ক বিতর্ক সবই ভুল প্রমাণিত হ'য়ে গেল। আর এ দু'বছর ধরে' কত মধ্যবিত্ত কমরেডকে, কত মাঝারী কৃষককে সন্দেহ করে' দূরে সরিয়েছে। সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকেও কত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে আজ তারা। নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কথাই ভাবছে সর্বক্ষণ।

খুব বড় অসুখের পর রোগমুক্ত দুর্বল দেহের অবসাদ জড়িয়ে রয়েছে যেন দেহে, মনে।

ফন্তুকেও ডাকা হ'য়েছে এ মিটিং এ। 'গা-ঢাকা' দিয়ে আসে সে আই-বির নজর এড়িয়ে, বহুদিন পর আবার ছাত্রদের মিটিংয়ে। কিন্তু মনের সে উদ্দীপক উত্তেজনা আর নেই। অবসাদে আচ্ছন্ন মন। সাগরীর রক্ত ভেজা মৃতদেহের ছবি ভাসছে অনবরত চোখের সামনে। প্রতিবাদ করেছিল সে ত বহু আগেই। লক্ষ্যভ্রষ্ট শিকারীর মত ক্ষিপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল সে শেষের কয়টা দিন।

পার্শ্বনাথের বৌয়ের গর্ভনষ্ট বীভৎস ভয়াবহ চেহারাটা কোনদিন তুলতে পারবে না ফন্তু।

কিন্তু এর জবাব কি দেবে তারা—এদের মৃত আত্মার কাছে।

একবিন্দু জোর পাচ্ছে না যেন ফন্তু। জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে নিজেকে কর্তব্যের ডাকে।

প্রায় এক বছর পর পৃথ্বীর বাড়ীতে এল ফন্তু। কুরী হাসিমুখে এগিয়ে আসে। প্রসন্ন অভিনন্দন ঝরে' পড়ছে তার চোখে মুখে। পৃথ্বী দূর থেকে লক্ষ্য করে' আশীর্বাদ করে মনে মনে দুজনকে।

গৃহ প্রত্যাগত সৈনিকের দুঃস্বপ্নময় রণক্ষেত্রের স্মৃতির মতই এক ঘন অবসাদ থেকে থেকে ছায়া ফেলে যাচ্ছে ফন্তুর ক্লান্ত চোখে—লক্ষ্য করে পৃথ্বী।

এগিয়ে আসে সে। হাতখানা চেপে ধরে স্বাগত হাতের স্পর্শে। হৃদয়ের গভীরে অনুভব করে সে ফন্তুদের মনের অবস্থা। পৃথ্বীরা দুঃখ পেয়েছে, বন্ধুদের কাছ থেকে অবিশ্বাস, সন্দেহ সহ্য করেছে। কিন্তু অপরাধী মনের আত্মনিপীড়ন সহ্য করতে হয়নি পৃথ্বীদের।

কিন্তু এদের মনের নিস্তরঙ্গ প্রবাহে বয়ে চলেছে দিগভ্রষ্ট-পথশ্রমের শ্রান্ত ক্লান্তি।

কুরীকে বলে পৃথ্বী—"ভাল করে চা খাওয়াও আজ কুরী কমরেডদের, তোমার গৃহে-প্রত্যাবর্তনের অনারে।"

মৃদু হাস্যে বলে ফল্গুকে, "ইতিহাসে লিখা থাকবে এ দিনটি। বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে ছাত্র কমরেডদের প্রথম প্রতিবাদের খসরা রচনা হ'বে আজ।"

বাকি সবাই এসে পড়ে। বোধন সমীরকে দেখিয়ে বলে, "পৃথ্বীদা, সমীর ভয়ানক লজ্জা পাচ্ছে আপনাকে মুখ দেখাতে।"

পৃথ্বী সমীরের হাতখানায় চেপে ধরে' মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, "Past is past"

নিজ হাতে চা তৈয়ার করে আনে কুরী।

ফল্গু কুরীর মুখশ্রীর কমনীয়তা লক্ষ্য করে। নীরব হাতে গ্রহণ করে প্রেমোষ্ণ হাতের প্রথম পেয়ালা। ক্লান্ত দিনের সাথীর মত বন্ধুত্বের মধুর হৃদয়স্পর্শ দিয়ে জুড়াতে চাইছে যেন কুরী তার এ হৃত উৎসাহ মনকে। নিবিড় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে একবার কুরীর অতল-খোঁজা গভীর কাল চোখ দুইটি। তারপর হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে ফেলে এ অনুরাগী দৃষ্টি। বন্ধুদের দিকে ঘুরিয়ে আনে সবখানি মন।

আলোচনা শুরু করে, "আমরা সবাই জানি, যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌঁছাতে দু'টো ধাপ লাগে। প্রথম ধাপে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদও সাম্রাজ্যবাদ পক্ষপুষ্ট বণিকশ্রেণী ও জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে। প্রথম ধাপের বিপ্লব শেষ হ'লেই সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হ'বে জাতীয় ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু গত দুই বছর, আমরা গোড়াতেই মস্ত এক ভুল ধারণা নিয়ে সংগ্রাম শুরু করলাম—বিপ্লবের দুই ধাপই এক লাফে পার হ'তে চাইলাম।"

"তার ফলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে যাদের মিত্র রূপে

পাওয়ার কথা, তাদেরও শত্রুর পর্যায়ে ফেলা হ'ল। অর্থাৎ মাঝারী কৃষক, জোতদার ও জাতীয় বণিকশ্রেণীকে আমরা সংগ্রামী সৈনিক হিসেবে পেতে চেষ্টা না করে' তাদেরও বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেলাম।"

সন্ধ্যা হ'য়ে আসে। বাতি ধরিয়ে নিয়ে আসে কুমারী। বহুদিন পর আবার আলোচনার জোয়ার এসেছে ঘরে।

বাইরে কর্মসাঙ্গের ইঙ্গিত গোধূলি আকাশে। গাঙ্গেয় পাখীরা দিনান্তের শেষ কলরব করে' ফিরে চলেছে নীড়ে।

ঘরের ভিতরে নূতন স্বর লিপিতে সুর মিলাবার আয়োজন চলেছে নূতন তারে।...

দূরের সড়ক দিয়ে পিয়ন হেঁটে চলেছে। স্নিগ্ধ হয়ে আসে শীতার আকুল দৃষ্টি। পিয়নের ঐ চিঠির থলিটির ভিতরে কার এক আশীর্বাদ বাণীর প্রত্যাশায় উন্মুখ হ'য়ে উঠে সমস্ত মন। এক কল্যাণলিপির নিবিড় কামনা।

চোখের পাতায় উপছে পড়ছে ক্ষমাস্নিগ্ধ প্রেম। অনুচ্চারিত স্বরে আহ্বান জানায় শীতা কোন দূরের এক বলিষ্ঠ হৃদয়কে। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে সেই প্রিয় নাম।

শীতা জানে, যে চিঠি কামনা করছে সে এমন নিবিড় ভাবে, সে চিঠি আসা সম্ভব নয় তার কাছে। সে নিজেই ত এমন করে দূরে সরিয়েছে তাকে। তবুও বহুদূরের এক প্রিয় সংযোগ গভীর ভাবে কামনা করছে সে আজ ঐ চিঠির থলিটির মাঝে।

তার পল্লবিত চোখের ছায়ায় ছায়া ফেলে দাঁড়ায় এক প্রশান্ত মূর্তি। পৃথ্বী। পৃথ্বীর সাথীহারা গোপন মূর্তিই কয়দিন ধরে নাড়া

দিচ্ছে মনে। কানে ভাসে তার সেই শেষ উত্তর, "তোমার জন্যই অপেক্ষায় থাকবো আমি।"

পৃথ্বীও কি এমন করেই অনুভব করছে তাকে। তার কাজের ছন্দে বাঁধা জীবনের ফাঁকে। এমনই ব্যথাতুর অনুভূতি মথিত করছে কি তারও নিভৃত চেতনাকে।

এই পাল্টা হাওয়ায় পালতোলা জীবন তরীকে টেনে নেওয়ার সার্থকতা কোথায়? ভাবে শীতা। কয়দিন ধরেই এ কথা ভাবছে শীতা। টের পেয়েছে সে, অতীতের উজান স্রোতে দাঁড় টেনে মেরুদণ্ড নুয়ে ফেলার দিন আজ নয়। সংগ্রাম করতে হ'বে আজ সম্মুখ শত্রুর সাথেই সমস্ত শক্তি দিয়ে। সে শক্তির উৎস তার পৃথ্বীই। তার বেদনাশ্রয়ী মনকে ত এতকাল ধরে' লালন করেছে সে, যেন পরমস্নেহেই। কিন্তু ভবিষ্যৎ সমাজের পক্ষে ক্ষতিই করছে না কি সে? বিনিদ্র রাত্রিভরে' ভাবে শীতা।

আবার দ্বিধা মৌনে হারিয়ে যায় যুক্তি স্রোত। নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের মত যেন হঠাৎ গাঢ় কাল পর্দা পড়ে যায় তার জীবন সন্ধানী মনের সকল জিজ্ঞাসায়। না, না, আর তা' সম্ভব নয়। সাত বছর আগের সেই পূর্ণচ্ছেদ টানা জীবনকে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় এই অতীত বেদনার স্মৃতি মাখা মনে।

জল শুকিয়ে আসা তরঙ্গহীন জীবনের উপর জোর করে তরী টেনে নেওয়ার মতই করুণ প্রয়াস এ যে। সাত বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে ডিঙ্গিয়ে যাবে কেমন করে' সে? দিনাবসানের বৃন্তচ্যুত শীর্ণ করবীর বেদনা দিয়ে কেমন করে' প্রেমের অঞ্জলি সাজাবে সে এই ভাঙা মনে, ভাঙা দেউলে।

বেদনায় বিদীর্ণ হ'য়ে চলেছে যেন শীতার দেহ, মন আত্মা।

বুকের কাছে শোওয়া মিঠুকে অনুভব করে' মনে মনে আবার

আওড়ায়, "কিন্তু মিঠু, মিঠু সোনা একি করছি আমি। এ আত্মছলনায় তোমাদের পথকেই ত বন্ধুর করে' তুলছি।"

"স্বর্গীয় প্রেমের পূজারীরা, আর কতকাল পৃথিবীর প্রেমকে কুয়াশায় আবৃত রাখবে তোমরা।" নিজেকে বিদ্রূপের কষাঘাত করে' বলে' উঠে শীতা মনে মনে।···

···ভোরের আলো দেখা দেয় পূর্বাকাশে। বিহঙ্গের প্রভাত কাকলি যেন আগামী যুগের জয়ধ্বনি জানায় দিকে দিকে।

তৃপ্ত চোখে তাকায় শীতা উষাকাশের পানে। সমস্ত সংবেদনা দিয়ে গ্রহণ করে সে প্রকৃতির জীবনস্বরকে।

আকাশ বাতাস যেন এক মধুর ইঙ্গিতের অপেক্ষায় কমনীয়, রমনীয়। স্নিগ্ধ ললিত গীতিময় হ'য়ে উঠেছে যেন চতুর্দিক।

কোন সুদূর দেবতার উদ্দেশ্যে আপনি নত হয়ে আসছে সবখানি মন—আত্মসমর্পণে, আত্মনিবেদনে।

মনে মনে উচ্চারণ করে শীতা, আজকের এ প্রভাতকে ব্যর্থ হ'তে দেবে না সে। সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হ'য়ে যাক আজ এই গৃহ থেকে বিদায় নেওয়া মুহূর্তে। সংকল্প স্থির করে ফেলে শীতা।

মিঠুকে জামা পরিয়ে তার চুলে বেঁধে দেয় সূর্যমুখী রঙের একটি রেশমীফিতা।

তারপর চিঠি লেখার কাগজ কলম নিয়ে আসে। ঘাটলায় বসে চিঠি সুরু করে—"শ্রদ্ধাস্পদেষু,"

প্রথম সম্বোধনটি লিখে কয়েকমুহূর্ত কি চিন্তা করে শীতা। ছিঁড়ে ফেলে সে লেখা। যেন জোর করেই মনের সমস্ত জড়তা সমস্ত সংকোচ সরিয়ে ফেলে নূতন কাগজ নিয়ে আরম্ভ করে।

জীবনের প্রথম প্রেমলিপি।

লেখে, "প্রিয়, আমার শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ের প্রণাম জানাই এ ব্রাহ্ম মুহূর্তে। অন্তরে গভীর উচ্চারিত এক মধুর অঙ্গীকার দিয়ে শুরু করছি আমার চিঠি আজ শুভপ্রভাতে। যদিদং হৃদয়ম্ মম, তদিদং হৃদয়ম্ তব।"

আমার অঙ্গীকারের সাক্ষী, এ সুন্দর সবুজ পৃথিবী, আর সুনীল আকাশ।……

আগামীকালের প্রেম, হোক দুঃখমুক্ত, দ্বন্দ্বমুক্ত, এই কামনা নিয়ে গ্রহণ করছি আমার প্রিয়শ্রেষ্ঠকে। —শীতা।"

শীতা রওয়ানা হ'বে আজ রাতে। একটি একটি করে দিন গুণে' পাড়ি দিয়েছে সে পুরো একটি মাস।

কিন্তু আজ এ যাবার দিনে, স্থানীয় কমরেডদের হতাশায় ম্লান মুখ-গুলি কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে।

ঘাটলার সিঁড়িতে গিয়ে বসে থাকে শীতা। পুকুরের চারপাশে মরা ঘাসের বুকে জমে উঠেছে যেন আরও কোন আশঙ্কিত দুঃসংবাদের বেদনশীল অনুভূতি।

এ দু'মাস ধরে বহু কমরেড আশ্রয় নিয়েছে তার ঘরে। তাই বাঁধুনি পড়ে' গিয়েছে মনে। কমরেডদের এই আশ্রয়চ্যুত অসহায় অবস্থাকে উপলব্ধি করেছে সে হৃদয় নিঙরান অনুভূতি দিয়ে।

অক্ষতই আছে তাদের দেহ, কিন্তু মন অক্ষত নেই কারও। অক্ষত নেই তাদের আন্দোলন। বিশ্বাসঘাতকতা শুরু হ'য়েছে কৃষকদের মধ্যে। এ যে কতবড় আঘাত, সমস্ত অন্তর মথিত করে' টের পাচ্ছে তা' একমাত্র কমরেডরাই।

কিছুই গোছান হয়নি এখনও। নৌকো ঠিক করতে হ'বে।

বিশ্বাসী মাঝি চাই। ঘরের ভিতর জিনিষপত্র বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো।

একমাত্র অতটুকু ছেলে রামুকে নিয়ে রাত্রি করে' নদী পার হ'তে হ'বে নৌকায়। মিঠু থাকবে সাথে। গোলমালত হঠাৎই হয়। উদ্বেগ আর চিন্তায় শ্রান্ত লাগছে মন।

তবু সমস্ত শ্রান্তি, ক্লান্তির আড়ালে একটি আশার সুর বয়ে চলেছে মনের ফল্গু প্রবাহে—পৃথ্বী অপেক্ষায় রয়েছে তার।

রাত্রিতে নৌকায় নদী পার হ'তে হ'বে। প্রতি বছরই শীতের সময় জল কমে যায় নদীর, স্টীমার এ পাড়ে আসে না।

রামু এসে বলে, "বৌদি, হিন্দু মাঝিত কেউ সাহস করছে না নৌকা ছাড়তে রাতে। আবার রাত থাকতেই নদী পার হ'য়ে না থাকলে স্টীমার ধরা যাবে না অত ভোরে।"

কাশীমুদ্দি বাড়ীর ভিতর আসে। বুড়ো হ'য়ে গেছে, চুল দাড়ি সব পেকে গেছে। তবু মনের সে তেজ এখনও ঠিক আগের মতই আছে।

শীতা মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে সসম্ভ্রমে তার আদাব গ্রহণ করে।

এদের সাথে বধূদের কথা বলার প্রথা ছিল না। কিন্তু আজ আর সে নিয়ম মানা চলে না। এগিয়ে এসে বলে কাশীমুদ্দি হাতের লাঠিখানা দেখিয়ে, "কোনও ভয় নেই বৌমা। আমি সাথে যামু ইস্টিমার ঘাট পর্যন্ত। আর এ দিককার মানুষ সে রকম না। একটা বেইজ্জতীর কথা কানে আসছে কি এই পর্যন্ত এদিকে? সব দেশের মানুষরে এক চোখে বিচার করলে চলে না। আপনি সব গুছাইয়া লন। সন্ধ্যাসন্ধি নাও ছাড়ন লাগবো।"

ঘণ্টাখানিক পরই রামু ফিরে আসে আবার।

"কি খবর, রামু?" শীতা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। "সুহৃদ দা খবর পাঠিয়েছেন, আপনার সাথে তিনিও যাবেন কোলকাতায়।

সোনার গাঙের মুখে তিনি আমাদের নৌকায় উঠবেন। আর তাঁদেরই চেনা মাঝি বদরুদ্দিন মিঞার নৌকায় যেতে বলেছেন আমাদের।”

ছোট্ট একটুকরো কাগজ দেয় শীতার হাতে রামু। তা'তে লেখা—“একা রওয়ানা হ'বেন না কিছুতেই।”

সুহৃদেরই হাতের লেখা। এখানে এসে পরিচয় হয়েছে তার এদের সাথে। এরই মধ্যে তার জন্য এতটা চিন্তা করছে কমরেডরা—মনে মনে অভিভূত না হ'য়ে পারে না শীতা।

সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তার ছায়া নামে মনে—তার জন্য আবার এদের কোনও বিপদ না হয়। বারে বারেই মনে হয় শীতার, এ ব্যবস্থা যেন ঠিক হ'ল না, কিন্তু আর সংবাদ পাঠানও সম্ভব নয় এত তাড়াতাড়ি।

সন্ধ্যার পর নৌকো ছাড়ে। অন্ধকার রাত। রামু আর কাশীমুদ্দি নৌকোর পাটাতনে বসে গল্প করে। আগের কালের ডাকাতদের গল্প।

বড় নদীতে এসে পড়েছে নৌকো। হিম উঠছে নদীর বুক থেকে।

শীতা ডেকে বলে' “কাশীমুদ্দিভাই, আপনারা ছইয়ের ভিতর এসে বসুন। হিম লাগাবেন না।”

মাঝিও একখানা সুতির চাদর দিয়ে ঢেকে নিয়েছে মাথা। বৈঠা কাটতে কাটতে গল্প শোনে সে।

!মিঠু একটু ভড়কে গিয়েছে—এত বড় নদী তার উপর এই অন্ধকার।

কাশীমুদ্দি অভয় দেওয়া স্বরে বলে, “আপনারা শুইয়া পড়ুন। কোন ডর নাই।”

কিন্তু ঘুমাতে পারে না শীতা—সুহৃদ নৌকোয় উঠবে সোনার গাঙের মুখে। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়েছে তারা ভরা আকাশের একটা ফালি।

ছোট ছোট ঢেউয়ের শব্দ আর বৈঠাকাটার শব্দ এগিয়ে চলেছে।

একটা অজানা ভীতি চেপে বসেছে শীতার বুকে।

দূরে মাঝে মাঝে মাছ ধরা নৌকোর বাতি চোখে পড়ছে।

"ঐত সোনার গাঙের মুখ দেখা যাচ্ছে।" বলে মাঝে। একটু নদীর পাড় ঘেষিয়ে নৌকো বেয়ে যায়। তামাক সাজার জন্য কুপি জ্বালায় রামুর হাতে বৈঠাটা দিয়ে।

"স্টীমার ঘাটে যাইব নাকি নাও? কেরায়া নিবেন?" পাড় থেকে ডাক আসে।

কাশীমুদ্দি আপত্তি জানায়, "না, মেয়েছেলে আছে নাওএ, অন্য নাওয়ের খোঁজ কইরেন।"

শীতা মুখটা একটু বের করে দেখে, সুহৃদই রয়েছে দাঁড়িয়ে। কাশীমুদ্দিকে বলে, "আর ত সামান্য পথ বাকি, নিয়ে নিন ওনাকে। আমার কোনও অসুবিধা হবে না।"

মাঝিও সায় দেয়, "ওনা গো স্বজাতিই।"

সুহৃদ পা ধুয়ে নৌকোয় উঠে বসে। চোখে চোখেই যে টুকু কথা বলে শীতার সাথে।

অথৈ অন্ধকার। বাতি থাকলে অসুবিধা হয় মাঝির, তাই বাতি নিবিয়ে দিয়েছে।

কথা বলছে না কেউ আর। এই বাকি পথটুকু ভাল ভাবে পাড়ি দিতে পারলেই হয়। মিঠু পর্যন্ত চুপ করে রয়েছে।

নৌকা এগিয়ে চলেছে।

"মাঝি কদ্দুর।" রামু একবার জিজ্ঞাসা করে।

"বিলের চর দেখা যায়—ঐ যে ধূ ধূ করে দূরে বাতি দেখা যায় ঐটা থানার বাতি।"

শীতা লক্ষ্য করে দেখে বাতিটা—যেন এক অশুভ ইঙ্গিতময় আলোর বিন্দু।

হঠাৎ কি যেন লক্ষ্য করে মাঝি মনযোগ দিয়ে—

"দারোগার নাও মনে হইতেছে যেন।" বলে মাঝি মৃদুস্বরে।

একসঙ্গে চমকে উঠে তিনজনে। একসঙ্গে চেয়ে দেখে—সত্যি আরেকখানা নৌকো দ্রুত এগিয়ে আসছে—তাদের নৌকোই যেন লক্ষ্য করে'। দারোগার নৌকাই। লালপাগড়ীগুলি মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট হ'য়ে উঠে কয়জোড়া তীক্ষ্ণ চোখের সামনে।

"নৌকা থামাও।" গম্ভীর চিৎকার শোনা যায়, "নৌকা খানাতল্লাসী করা হইব—নৌকা থামাও।"

আর পালাবার সময় নেই। শীতার বুকের ভিতরে যেন লক্ষ হাতুড়ির পিটুনি শুরু হ'য়েছে—তার জন্যই এ বিপদ ঘাড়ে নিল একজন পলাতক কমরেড।

চেয়ে দেখে সুহৃদ—পরিচিত দারোগা। আর পথ নেই।

নৌকায় উঠে এসেছে পুলিস দারোগা—"আপনাকে ত চিনি সুহৃদ বাবু। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। কিন্তু সঙ্গে এরা কারা?"

"এরা কেউ পরিচিত নয় আমার। খেয়া পার হবার জন্য এ নৌকায় উঠেছি।" জবাব দেয় সুহৃদ। অকম্পিত নির্ভিক কণ্ঠস্বর।

মনে মনে বোঝে সে, হঠাৎ অ্যাকসিডেণ্ট নয়—আগেই টের পেয়ে পিছু নিয়েছে

মাঝিদের জেরা করে' আসামীর কথা মিলিয়ে দেখে দারোগা। কাশীমুদ্দি বারে বারে বলতে থাকে—"ইনি আমাদের কেউ না।"

শীতাকে লক্ষ্য করে' বিশ্বাস করতে পারে না দারোগা সে কথা। হাতছাড়া করতে রাজী নয় সে—নিশ্চয়ই কোনও গা ঢাকা মেয়ে কম্যুনিষ্ট।

কাশীমুদ্দি আবারও বলে—"ইনি আমাদের কেউ না।"

"তা'হলে তোমাদের নৌকায় চলছিল কি সম্বন্ধী হ'তে?"

রাগে চোখ লাল হ'য়ে উঠে কাশীমুদীর। আর কোনও কথা বলে না। হাত কড়া পড়ে গিয়েছে সুহৃদের হাতে।

বিপদ সংকেতকারী নিস্পন্দন মুহূর্ত।

শীতাকে লক্ষ্য করে' বলে দারোগা—"আপনাকেও যেতে হ'বে আমাদের সাথে থানায়।"

মিঠুর হাতে ধরে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে শীতা, "চলুন।"

বাধা দিয়ে বলে দারোগা—"কিন্তু মেয়েকে সাথে নেওয়া যাবে না এখন।"

"এইটুকু মেয়ে তাহ'লে থাকবে কার কাছে। নদীর মধ্যে গ্রেপ্তার পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করছেন আমাকে—এ অবস্থায় এই বাকী পথ এতটুকু মেয়ে একা কি করে যাবে?" দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় শীতা। বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে গেছে সকলের। কিন্তু দারোগা তবু উত্তর দেয়—"সন্দেহজনক মনে হ'লে আমরা যে কোনও সময় যে কোনও ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াও গ্রেপ্তার করতে পারি—সে অধিকার আমাদের আছে। আর মেয়ে সাথে থাকতে পারবে কি না—এবিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করতে হ'বে। আমাদের কোনও হাত নেই। কাজেই সময় নষ্ট করে আর লাভ নেই—একে সাথে নিতে পারবেন না।" বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর আমলাতান্ত্রিক আদেশ ফুটে উঠে কণ্ঠে।

মিঠু ভয়ে আরও শক্ত করে চেপে ধরে মাকে।

মিঠুর ভীত মুখখানা দেখে বুকের সকল বাঁধ ভেঙ্গে যেতে চাইছে যেন শীতার। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংবরণ করে নেয় সে ভিতরে।

রামুকে বলে, "তুমি ওকে ওর মামার বাড়ীতে পৌছে দিও রামু।"

"আর কাশীমুদ্দী ভাই।" সজল অনুরোধ ঝরে কণ্ঠে। বাড়ীর পুরানো পাহারাদারকে বলে শীতা, "আপনি যদি দর্শনা পর্যন্ত যেতেন, ওদের সাথে—।"

এক বাক্যে উত্তর দেয় বৃদ্ধ—"নিশ্চয়ই যাব। আপনি কোনও চিন্তা করবে না খুকিরাণীর জন্য। কোলকাতা পর্যন্তই যাব—তার দিদিমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবো।"

কাশীমুদ্দীর জীবনে ঘটে নাই এমন কল্পনাতীত হঠাৎ ঘটনা। অভাবনীয় বিস্ময়ে বিদ্বেষে শংকায়, মমতায় বৃদ্ধের বাকরোধ হ'য়ে এসেছে।

স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছে সে দারোগার কথা শুনে—এই কচি মেয়ে মা ছাড়া থাকবে কি করে?

তাদের বৌ-রাণীর এই বিপদে এতটুকু দায়িত্ব নিতে পেরে একটু যেন সান্ত্বনা পায় মনে—"আপনি কিছু চিন্তা করবেন না।" আবার ও বলে সে।

কিন্তু মিঠু কিছুতেই ছাড়বে না মাকে। মিঠুর দিশেহারা অসহায় ভীত মুখখানা দেখে সুহৃদ—মমতায় ভিজে উঠেছে তার মন।

"মিঠু মা তোমার ফল্গুমামা পৃথ্বীকাকার কাছে থাকবে তুমি। আমাকে ছেড়ে দাও লক্ষ্মী মেয়ে।"

অবুঝ শিশুকে সান্ত্বনা দেয় শীতা নিজের বুকখানা চৌচির করে। মিঠু একটা ভয়ঙ্কর বিপদের ভয়ে আরও শক্ত করে মায়ের আঁচলটা ধরে' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে। "তোমার সাথে যাব আমি।"

"আমাদের আর দেরী করার সময় নেই।" অনুভূতিহীন এক যন্ত্রের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে যেন দারোগার কথাটা।

"রামু ওকে ধর।" বলে' মিঠুকে জোর করেই ছাড়িয়ে দেয় শীতা। কঠিন হ'য়ে উঠেছে সমস্ত সত্তা—কিছুতেই দুর্বল হ'লে চলবেনা তার স্বৈরতন্ত্রের এই আজ্ঞাবাহকদের কাছে। বিদ্বেষে আর ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে চোখ?

বদরুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে আদেশের সুরে বলে, "আপনাদের নৌকো ছেড়ে দিন। স্টীমার ধরতে পারবেন না, না হ'লে।" বলে' দারোগার নৌকোতে উঠে যায়।

মিঠুর নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। তরঙ্গায়িত নদীর বুকে মিঠুর বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না ভেসে চলেছে :—"ওমা, মাগো, আমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে। তোমার জন্য বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে মাগো। আমায় নিয়ে যাও মা।"

বুকের পাঁজর ভাঙ্গা শিশুর বিলাপ আর ত সহ্য করতে পারছে না শীতা। ভিতরের শক্তিকে মুঠিবদ্ধ হাতে যেন আঁকড়ে ধরে' আকুল, আর্তস্বরে মনে মনে বলে সে, "মিঠু, আমায় আর দুর্বল করো না, মিঠু মা। আরও বল দাও, আরও শক্তি দাও পৃথ্বী, ফল্গু, দুনিয়ার বিপ্লবী বন্ধুরা।"

বহুদূরে চলে গিয়েছে নৌকোটা। তাদের নৌকোও বেয়ে চলেছে বিপরীত দিকে। মিঠুর বিলাপের কথাগুলি আর বোঝা যায় না। শুধু অবুঝ শিশুর বুকফাটা কান্নাগুলি ধেয়ে আসছে, আছড়ে পড়ছে অন্ধকার স্রোতে। শীতার বুকের ভিতরে ফুলে ফুলে উঠছে নীরব ক্রন্দনাবেগ—"মিঠু এমন করে' অবশ করে' দিচ্ছ কেন আমার বুকটা।" আকুল দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে শীতা সে কান্নার শব্দ লক্ষ্য করে।

নৌকো বেয়ে চলেছে।

আর শোনা যায় না কান্না। কিন্তু কান্নার নিঃশব্দ গতি ছুটে আসছে যেন নিথর নিঃস্তব্ধ নদীর স্রোত ভেঙ্গে তারই দিকে।

লক্ষকোটি যোজনব্যাপী শব্দ তরঙ্গে তরঙ্গে মিশে চলেছে এক অসহায় শিশুর অফুরন্ত কান্না। এ অশান্ত শিশুর ক্রন্দন মহাশূন্যের বুকে বিলীন হ'য়ে যেতে পারে না।

মহাকাশের বুকে মিশে থাকা এ শিশুর কান্নাকে কোনদিন ভুলতে পারবে না পৃথিবীর মানুষ। মনে মনে আশার সুরকে ধরতে চায় শীতা।

হারিকেনের অস্পষ্ট আলোতে চেয়ে দেখে শীতা সুহৃদের মুখের

দিকে—শেষ আশ্রয়কে আকড়ে ধরার মত কি যেন তল্লাস করে তার দৃষ্টিতে। লক্ষ্য করে সুহৃদ। প্রগাঢ় চোখে তাকায় সে শীতার দিকে। তার নীরব চোখে ধরা দেয় সাহস, সান্ত্বনা আর মনবল বাড়াবার সমব্যথী অনুরোধ। প্রতিটি নীরব দৃষ্টি বিনিময়ে ঔষধি প্রলেপের মত শীতার অবশ পাঁজরগুলিতে বুলিয়ে দেয় আশার উত্তাপ। শক্তি স্রোত বয়ে আনে যেন শিরায় শিরায়।

মিঠু কাঁদছে হয়তো এখনও। হয়তো কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে কাশীমুদ্দির কোলে।

মিঠুর কথা ভাববে না আর—নিজেকে বোঝায় শীতা। তার জন্য এ বিপদ ঘাড়ে নিল একজন সংগ্রামী কমরেড। তার নির্ভীক হৃদয়কে অসম্মান করতে পারে না শীতা, নিজেকে দুর্বল করে'।

ঘন অন্ধকার চতুর্দিকে। কুয়াশাভারী শীতার্ত রাত্রি। নৌকো এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ আবার চমকে উঠে শীতা—আবার কার এ কান্না! কার আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে দূর থেকে। শিশুর কান্না ত নয়, বয়স্ক মানুষের আর্তনাদ।

দারোগাটি খুশি হ'য়ে উঠে চিৎকার লক্ষ্য করে' "আজ তাহ'লে অনেক শালাই ধরা পড়েছে। আমাদের নজর এড়িয়ে কোথায় পালাবে চাঁদেরা।"

দেখে শীতা, কুটিল জিঘাংসা চরিতার্থ কামাতুর হাসি ঝলসে উঠেছে গোঁফের আড়ালে—তৃষিত ব্যাধিগ্রস্থ মানুষের লালসার মত লালাস্রোত বয়ে চলেছে যেন মাংসল দেহের প্রতি অঙ্গে।

এক মুহূর্তে বুঝতে পারে শীতা, এ কাদের আর্তনাদ! সুইচটেপা বিদ্যুৎ-চুল্লির মত প্রতিহিংসার 'ফারনেস' যেন জ্বলে উঠে মস্তিষ্কের শিরা উপশিরায়। ঋজু হ'য়ে উঠে দেহ।

ক্ষেতের গায়ে থানার একটা ছোট্ট ঘর থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে

আসছে। দারোগা খুশির স্বরে বলে উঠে, "বাঁশডলা হ'চ্ছে।"

নৌকো পাড়ে ভেড়ে। সুহৃদকে নামান হ'বে এখানেই। শীতার সমস্ত চেতনায় আকুল বেদনার যেন এক বৈদ্যুতিক শিহরণ বয়ে চলেছে। কি নিদারুণ পৈশাচিক অত্যাচার অপেক্ষা করছে তার দুঃসময়ের শেষ সাথীর জন্য, অনুমান করে' শিউরে উঠে সে ভিতরে ভিতরে। বিদ্বেষে মুঠিবদ্ধ হ'য়ে আসে হাত।

হাতকড়া দেওয়া পলাতক আসামীকে নামিয়ে নিয়ে যায় উৎফুল্ল আনন্দে, যেন আদিম বর্বরেরা। অশ্রু লুকান চোখে মুখ তোলে শীতা। দৃঢ় মুঠি হাত তুলে লাল সেলাম জানিয়ে দেয় সাথীকে দারোগার অলক্ষ্যে। চোখদুটি দীপ্ত হ'য়ে উঠে হাতকড়া দেওয়া আসামীর। নীরব চোখেই গ্রহণ করে সে তার এক রাত্রির আশ্রয়দাত্রীর এ লাল অভিনন্দন।

নৌকো ছেড়ে দেয়। শীতাকে নিয়ে যাওয়া হ'বে সদরে। চোখের আড়ালে হ'য়ে গিয়েছে সুহৃদ। চোখে লেগে রয়েছে তার নীরব চোখের লাল অভিনন্দন। অন্ধকার নদীর বুক চিরে চিরে ভেসে আসছে কৃষকদের আর্ত চিৎকার। আর চোখের সামনে রয়েছে দারোগার পরিতৃপ্ত বীভৎস মুখটা।

দারোগাটি হঠাৎ শীতাকে লক্ষ্য করে কুৎসিত ভঙ্গিতে বলে উঠে, "বেটী সব জানে। ন্যাকামো হ'চ্ছে।"

আপাদমস্তক জ্বলে উঠে শীতার। "ভদ্রভাবে কথা বলুন। স্ত্রীলোকের সাথে কি ভাবে কথা বলতে হয় জানেন না।"

"নিশ্চয়ই জানি। কি ভাবে কথা বলতে হয় তাও জানি, কি ভাবে কথা আদায় করতে হ'য় তাও জানি।"

মনে হয় শীতার, জান্তব হাসির চেষ্টায় ফাঁক হ'য়ে গিয়েছে যেন এক হাঙ্গরের মুখ গহ্বর।

অগ্নিস্রোত বয়ে চলেছে যেন শীতার সমস্ত চেতনায়। চোখের কোণার শেষ অশ্রুর আভাসটুকুও শুকিয়ে গিয়েছে।

লক্ষ লক্ষ মিঠুর কান্নাও বুঝি আর দুর্বল করতে পারবে না শীতাকে। অপমানিত আত্মা ফুঁসে উঠছে ভিতরে—"চোখের জল ফেলার দিন এ নয়।"

নৌকো এগিয়ে চলে সদরের দিকে।

মিঠু ফিরে এসেছে—মাঝ নদী হ'তে বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে তার মাকে। পাঁচ বছরের মেয়ের ফুলের মত সেই সতেজ হাসি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। মিঠুকে কাছে টেনে নেয় পৃথ্বী। স্নেহসিক্ত হাত বুলায় মাথায়।

এই কচি মন অনুভূতির এত পেষণ সইবে কি করে।

আসতে যেতে দূর থেকে চোখে পড়ে ঘরের বারান্দায় বসা শীতার পিতার বিদীর্ণ চেহারা। জ্যোতিহীন চোখের তারায় নেমে এসেছে মূক স্তব্ধতা।

মনে হয়, যেন শেষ প্রলয়ংকরী ঝড়ের আশঙ্কায় ধীর স্থির স্তব্ধ হয়ে রয়েছে বহু ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত, ক্ষত বিক্ষত এক মহীরুহ।

দীপক খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে ভাগ্নিকে।

মন দিয়ে দেখে মিঠু মামাদের পোষ্টার লেখা। কুতুহলী শিশু মন জিজ্ঞাসায় মুখর হ'য়ে উঠে, "মামা, এগুলো দিয়ে ইনক্লাব জিন্দাবাদ হ'বে।"

মিঠুর কথা শুনে হাসে ক্ষত্তর ছাত্রবন্ধুরা। সমর্থনের হাসি। বোধন বলে, "এগুলো নিয়েই ত যাব একদিন তোমার মাকে বের করে আনতে জেলখানা ভেঙে।"

মিঠু বিশ্বাস করে। সমস্ত মন ঢেলে দেখে সে মামাদের তুলির টান। তার পরিচিত অক্ষরগুলি মিলিয়ে শব্দ রচনা করে। কিন্তু কোনও অর্থের হদিস পায় না। তবু আকুল প্রত্যাশায় স্থির হ'য়ে যাওয়া চোখদুটি আটকে থাকে যেন পোষ্টারের বড় বড় অক্ষরগুলিতে।

পৃথ্বী তার বিবৃতি লেখার ফাঁকে ফাঁকে শোনে এদের মন্তব্য। চেয়ে দেখে, অবুঝ প্রত্যাশাময় শিশুর গভীর কাল চোখদুটি।

আরও দরদ দিয়ে কলম ঘুরায়। আরও দ্রুত হাত চালায় পৃথ্বী। শৃঙ্খলিত আজ মানবতার মর্যাদা।

ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হ'বে স্বাধীন মানুষের স্বাধীন দাবী। আবেদন পত্রে সাক্ষর নিতে হ'বে জ্ঞানী, গুণী, সুধী মানুষের। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের সহজাত প্রতিবাদের স্বাক্ষর।

দুই বছর ধরে একঘরে করা পুরানো বন্ধুদের কাছে আবার উপস্থিত হয় পৃথ্বীরা নূতন রচনার আবেদন নিয়ে। পত্রিকা অফিসের দুয়ারে দুয়ারে ঘোরে পৃথ্বী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার সাংবাদিকের হাতে। বিচারের নামে এ স্বৈরাচার সহ্য করতে পারে না সাংবাদিকরা।

সকাল থেকে রোদে ঘুরে ঘুরে বাড়ী ফিরছে পৃথ্বী। তীব্র রৌদ্রের ছটা। এপ্রিলের প্রখর মধ্যাহ্ন। আগুনের হলকার মত বাতাস বিঁধছে চোখেমুখে। অসহ্য গরম।

কাজ, অনন্ত কাজ সম্মুখে। সাহিত্যিকদের একটা সভা ডাকা হ'য়েছে বেলা তিনটার সময় তার বাড়ীতে।

তার আগেই পৌঁছুতে হ'বে বাড়ী। হাত ঘড়িটায় একবার হাত বুলায়। এসপ্লানেডে এসে আবার ট্রাম বদল করে। ট্রাম চলেছে

গড়ের মাঠের ধা'র দিয়ে। চৈত্র মাসের চোখ তাঁতান রোদ নিস্তব্ধ মাঠের বুকে।

ব্যাগের ভিতরে শীতার শেষ চিঠিখানা। গ্রহণ করছে তাকে শীতা এক মধুর লগ্নে। দূর থেকে দেখে পৃথ্বী এক মধুর পরিচিতির ছাপ আঁকা শিশুগাছ তলাটা। দু বছর আগে এখানে বসেই ফল্গুর মুখে শুনেছিল সে শীতার জীবনের বিয়োগান্ত কথা। আবার ওখানে বসেই অন্তরের গভীরে অন্তরিত এ মন্ত্র উচ্চারণ করেছে পৃথ্বীও—"যদিদং হৃদয়ম মম, তদিদং হৃদয়ং তব।" বেদনায় নিবিড় হ'য়ে আসে দৃষ্টি। রোদ্র ফাটা মাঠের বুকে স্নিগ্ধ একটুকরো ছায়া শিশুগাছের তলায়।

কোন অশ্রুত সুর দিয়ে গ্রথিত করেছিল পৃথ্বী, তার জীবনকে ঐ গাছতলায় বসে' এক অদৃশ্য লগ্নে, সে সুর এমন করে মথিত করছে তাকে, দিনে রাতে প্রতিটি মুহূর্তে।

এক অবিস্মৃত মহাকাব্যের বিরহ-গীতি বয়ে চলেছে আকাশে বাতাসে—"কোথায় সীতা—কোথায় সীতা।" একি আকুল করুণ সুর ছড়িয়ে রেখেছে অনন্তকালের বুকে, তাপস বাল্মিকী!

মনের তলায় থেকে থেকে আকুলিত হ'য়ে উঠ্‌ছে বিদ্রোহীকবির সেই বেদনার সুর—"কোন সে সুদূর অশোক কাননে বন্দিনী তুমি, সীতা।"

স্তিমিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে পৃথ্বী ভিতরের মনকে।

তার বহু কাজের দায়িত্বে ঠাসা মনকেও এমন করে বিবশ করে ফেলেছে আজ শীতা।

সচেতন হ'য়ে ওঠে পৃথ্বী। ক্রন্দনের সময় এ নয়। আত্মার ক্রন্দন নয়, আত্মার কঠিন ঘোষণা জানাতে হ'বে দিকে দিকে।

রাবণ নিধন যজ্ঞের সেতুবন্ধের কাজ শুরু কর দ্রুত লয়ে। সমাজ

শক্তিকে অপমান করতে চেয়েছে যারা নারীত্বের এই অপমান করে' তাদের জানাতে হ'বে কঠিন কণ্ঠে, শত শত বন্দী বন্দিনীদের মুক্ত করতে এগিয়ে আসছে লাখে লাখে দৃঢ় বাহু।

এই লক্ষ লক্ষ দৃঢ় বাহুই একদিন ধূলিসাৎ করেছে বাস্তিল কারাগার। ধূলিসাৎ করেছে কুখ্যাত হিটলারের বন্দীশালা। পৃথিবী ব্যাপী সকল বন্দীশালাই ধূলিসাৎ করার দিন আসবে একদিন। আজ তারই প্রস্তুতির রথের চাকায় চিহ্নিত করে' এগিয়ে যাও ধূলিকে।

ট্রাম থেকে নেমে পড়ে পৃথ্বী। তলিয়ে দেয় মনের অতল খাদে বিবস মনকে। হারিয়ে ফেলে ভিতরের একলা মানুষটাকে বহু মানুষের ভীড়ে।

পার্বতীদের বিচারের রায় বের হ'বে আজ।

নিখিলেশ মুসলমানের বেশ ধরে শহরে ঢোকে। সেরওরানী আর ফেজের ছদ্মবেশে ঢুকে যায় কোর্টের ভিতরে।

সমস্ত শহর চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। মেয়ে স্কুলের কম্যুনিষ্ট শিক্ষয়িত্রী পার্বতীর বিচার আজ। কোর্টের প্রাঙ্গনে সশস্ত্র পুলিস অফিসারদের ত্রস্তব্যস্ত আনাগোনা শুরু হ'য়ে যায়। কাল সেরওয়ানী পরা ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে দলে দলে ছুটে আসে কোর্টের দিকে।

আদালতের এজলাসে গিজ গিজ করছে ছাত্ররা। উৎকণ্ঠিত উত্তেজনা ভেঙে পড়ছে চোখেমুখে। মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে অর্থহীন দৃষ্টি বিনিময় করছে—কোনও আশা নেই কারও চোখেই।

আত্মীয়দের চোখেমুখে গভীর উদ্বেগের ম্লান ছায়ার দিকে তাকিয়ে কুটিল হাসির রেখা চেপে রাখতে পারছে না আই বি পুলিসের লোকেরা।

মেয়ে কম্যুনিষ্টের চরম শাস্তির রায় শুনবার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে রয়েছে তারা।

বেলা পড়তে থাকে। বিচার কক্ষে নিশ্চল নিস্তব্ধতা। দেওয়ালে টাঙান বড় ঘড়ির কাঁটাটা পর্বতচাপা মুহূর্তগুলিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

বিচারের সময় ঘণীভূত হ'য়ে আসে।

সন্ধ্যা সাতটা। জুরিরা তাদের মত ঘোষণা করবে। জুরিদের নেতা উঠে দাঁড়ায়। স্তব্ধ প্রতীক্ষায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। চোখের পাতাটিও পড়ছে না।

ঠোঁট নড়ে উঠছে জুরীর। কি রায় দেবে? ৩০২ ধারা নয়ত? নিশ্বাস জমে আসছে ছাত্রদের।

প্রস্তরীভূত দৃষ্টি।

জুরীর নেতা চারদিকে তাকিয়ে দেখলো একবার। তারপর বলতে শুরু করে, "আমরা সবাই একমত—"

নিস্তব্ধ ঘরের ভিতরে গুম গুম করে উঠে প্রতিটি উচ্চারণ।

বুকের ভিতরে হাতুড়ির বাড়ী পড়ছে ছাত্রদের। পলক পড়ে না চোখগুলির।

বিস্ফোরক বোমার মত ফেটে পড়ে বিচার কক্ষের জুরিদের ঘোষনা—

"৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছি আমরা আসামীদের।"

ফাঁসি! ক্ষুব্ধ গুঞ্জনে ফেটে পড়ে বিচার কক্ষ। একেবারে স্বৈরাচারী শাসন। মোগল বাদসাহী জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয় এ বিচার প্রহসন।

পরদিন সকালে ছাত্ররা আবার ছুটে এসেছে কোর্টের দুয়ারে! আসামীদের কোর্টে আনা হ'বে আজ। কিন্তু আজ আর ছাত্রদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

সশস্ত্র' সঙ্গীন ধারীদের আগেই মোতায়েন রাখা হ'য়েছে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা কোর্টের প্রাঙ্গণে।

সাংবাদিকরাও হুকুম পেল না ভিতরে ঢুকতে। দেহ সার্চ করে ভিতরে ঢুকতে হ'বে আজ উকীল মোক্তারদেরও।

ভ্রু কুঁচকে উঠে গণতন্ত্রের দাবীদার সাংবাদিকদের। ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ায় তারাও স্তব্ধ প্রতীক্ষায়। গুমোট আবহাওয়া। হঠাৎ গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়—আসামীদের নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে।

মামুদপুর মামলার বীর কৃষক নেতারা! সবার পিছনে হাত কড়া বাঁধা মেয়ে কম্যুনিষ্ঠ—পার্বতী।

জনতার পাশ দিয়ে মন্থর পদক্ষেপে চলেছে দীপ্তিমান মূর্তিসব। পার্বতী ধীরে ধীরে হাঁটে। প্রত্যাশী চোখজোড়া কি যেন সন্ধান করছে ভিড়ের ভিতরে। কোনও অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহের ইঙ্গিত? কোনও আশার স্ফুলিঙ্গ?

মুহূর্তের জন্য এক ক্ষুধাতুর দৃষ্টি ঝলসে উঠে তার নিষ্পলক চোখের তারায়। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের ভিতর গর্জে উঠে এক গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর "এর জবাব পাকিস্তানের মানুষেরাই দেবে।"

উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে মেয়ে কমুনিষ্টের চোখদুটি। চঞ্চল হয়ে উঠে জনতা। সচেতন হয়ে উঠে সশস্ত্র বাহিনী।

সঙ্গীন উঁচিয়ে ধরে। অনেক গুলি সন্ধানী কুটিল চোখ পিছন ফিরে দেখে। কিন্তু ভীড়ের ভিতর থেকে বক্তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

জনতার বুকের পাঁজরে যেন শানিত ছুরির ফলক বসিয়ে রেখে লৌহ পিঞ্জরের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে যায় আসামীদের। অনিচ্ছুক বিদায় দেওয়া ঝাপসা চোখের বহু বহু দূরে মিলিয়ে যায় প্রিজন ভ্যানটা।

প্রতিহিংসার ক্ষমাহীন চেতনা ক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতের মত অবিরাম উদবেলিত করে চলেছে পৃথ্বীকে। পনর বছরের কিষান ছেলের উপর ও ফাঁসির রশি ঝুলছে।

পার্বতীদের রায় বেরিয়েছে—যাবজ্জীবন কারাবাস। নিখিলেশ আবার এসেছে টাকা সংগ্রহ করতে—হাইকোর্টে আপিল করা হ'বে। দুই বছরের শিশু পুত্রকেও দেখা করতে দেওয়া হয়নি তার মার সাথে।

ঘরে ফিরে দেখে পৃথ্বী, ঘরের কোণায় বসে লুকিয়ে কাঁদছে মিঠু। মামা মার জন্য কাঁদতে নিষেধ করেছে। বলেছে, জেলখানা ভেঙে মাকে বের করে আনবে তারা।

কিন্তু মার কাছে যেতে ইচ্ছে করে যে তার।

"কিরে মিঠু। মার জন্য কষ্ট হ'চ্ছে?" মাথায় হাত বুলায় পৃথ্বী। স্নেহ স্নিগ্ধ স্পর্শ। মিঠু আরও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

শিশুর এ অবুঝ কান্নায় চোখের কোণায় ব্যথার বাষ্প ঘনিয়ে উঠে পৃথ্বীরও। এই ছোট্ট বুক খানা চিরে বয়ে চলেছে কি গভীর ব্যথা, কি গভীর বেদনার ধাবা, জানে তা' পৃথ্বী।

তার নিজের বুকের ক্ষত থেকেও যে জ্বালা উঠছে অহর্নিশি। হৃদয় দিয়েই অনুভব করছে তাই পৃথ্বী মিঠুর ঐ ছোট্ট বুকটার ব্যথা।

মিঠুকে ডেকে বলে, "মিঠু, উঠে জামা পরে' এস। দেখবে আজ কত বড় মিটিং হ'বে মাঠে।"

মনে মনে ভাবে পৃথ্বী, দেবজ্যোতি পিতা হ'য়েও সন্তানের ব্যথা কি জানেনি। কিন্তু পিতা না হ'য়েও এ কি স্নেহের রক্ত ঝরছে অনুক্ষণ তার বুকের ক্ষত থেকে।

মিঠু মিটিংএর নামে তাড়াতাড়ি উঠে আসে—এই মিটিং করা মানুষেরাই যে তার মাকে বের করে আনবে জেলখানা থেকে, কেমন করে তার শিশু অনুভূতি দিয়েও টের পেয়েছে সে তা'।

রাস্তায় চলতে চলতে আবার প্রশ্ন করে মিঠু, "কাকা, মাকে আর ছোটমাকে কবে বের করে আনবে জেলখানা ভেঙে।"

নরম ছোট্ট হাত খানা চেপে ধরে পৃথ্বী।

আর কোনদিন পাবে না কি মিঠু তার মাকে? জন্মের মতই কি মাতৃহারা হ'ল পার্বতীর শিশু সন্তান? নিবু নিবু দুরাশার যন্ত্রণা যে কি, এমন করে অনুভব করে নাই কখনও পৃথ্বী।

তারই মত সহস্র সহস্র আকুল প্রত্যাশী মন আজ এ যন্ত্রণা অনুভব করছে বক্ষ পঞ্জরে—তিলে তিলে অনুভূত এই আশার দুরাশা।

তবুও একান্ত একলারই এ ব্যথা।

সমবেত শোকসঙ্গীত থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সুরধারার মত বয়ে চলেছে একটি ব্যথার সুর এক নিরালা-অন্তরীক্ষ্য পথে।

সেখানে স্থান নেই বহু মানুষের। সমব্যথী, সুহৃদ, পরম আত্মীয়ের ও প্রবেশের পথ নেই সেই একটি মাত্র হৃদয়ের অনুভবময় গভীরতম অন্তস্থলে।

একা তাই কাঁদবে মিঠু গোপন গৃহ কোণে, একাই অশ্রু গোপন করবে পৃথ্বী। এক নিরবিচ্ছিন্ন চিরবিদারের সুর বয়ে চলেছে অনুক্ষণ তার হৃদয়ের অন্তঃপ্রবাহে।

কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ক্রন্দন সুরই শেষ লহরী নয় শোকসঙ্গীতের। এ শুধু পূর্বালাপ মহাসঙ্গীতের। এ করুণ সঙ্গীতের ভিতর থেকেই প্রলয় ঝংকার শুরু হবে গারদ ভাঙা গানের। জানে সে, কোটি কণ্ঠে বজ্রসঙ্গীত শুরু হ'বে যেদিন, সেদিন হারিয়ে যাবে মিঠুর নিভৃত গৃহ ক্রন্দন। হারিয়ে যাবে পৃথ্বীর একান্ত একলার এই ভূপালীর সুর।

হয়তো শীতার সাথে দেখা হ'বে না আর কোনদিন। হয়তো গারদ ভেঙে মায়ের মৃতদেহই খুঁজে পাবে পার্বতীর সন্তান।

কিন্তু তারপরও আছে বহু অধ্যায়। এই শেষ নয়। শোক গাথার এই শেষ রেশ নয়।

মিঠুর শুকনো মুখখানার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে পৃথ্বী, "এখনও বহু বিপ্লব অপেক্ষায় রয়েছে তোমাদের সামনে।"

বহুদূর থেকে চোখে পড়ে, মাঠের শেষে বাঁশের মাথায় লাল পতাকাটা বাতাসে উড়ছে।

মিঠুর চোখদুটি উজ্জল হ'য়ে উঠে—"কাকা, ঐ যে ইনক্লাব জিন্দাবাদের ফ্লাগ উড়ছে।"

সমর্থন করে পৃথ্বী, "ইনক্লাব জিন্দাবাদেরই পতাকা।"

বিরাট ময়দানের বুকে নূতন করে যে দিবসের শপথ নিতে আসা জনতার ভীড়—গ্রাম ভাঙা, শহর ভাঙা মানুষের ভীড়।

সভার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে পৃথ্বী মনে মনে অনুমান করে কত হাজার হ'বে।

বহুদিন পর আবার নূতন আশার রোমাঞ্চ ছুঁয়ে যায় ভাঙা মনে।

চোখ দুটি উজ্জল হ'য়ে উঠেছে মিঠুরও। ঐ সমবেত জনতা অযুত কণ্ঠে জানাচ্ছে যেন মিঠুকে তার মাকে বের করে আনার প্রতিশ্রুতি।

একটি ছেলে দূর থেকে এগিয়ে আসে পৃথ্বীকে দেখে'। সুদর্শন। চোখে মুখে ছাপিয়ে উঠেছে প্রসন্ন হাসি। জড়িয়ে ধরে সে পৃথ্বীকে, "ভাবতেই পারিনি, পৃথ্বীদা, আজকের এই দিনটি যে আবার ফিরে আসবে।"

তার এ স্বতস্ফূর্ত আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে পৃথ্বীও। কোথায় আছে, কি করছে সুদর্শন এখন,—কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারে না এ বিহ্বলতায়। মনে হয়, কত যুগ পর হারানো বন্ধুদের সাথে দেখা।

দুই বছরের বহু ভুল, বহু বেদনার ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসে আবার জড়ো হ'য়েছে সবাই ময়দানে। এই ময়দানেরই বুক কাঁপিয়ে শপথ নিয়ে গিয়েছিল প্রত্যেকটি নওজোয়ান—নব আশার রোমাঞ্চ

ফুটে উঠেছিল সেদিন তাদের চোখেমুখে। আজ সে রোমাঞ্চ ধুয়ে মুছে গিয়েছে। খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের অবসাদ এসেছে দেহে, সাময়িক ক্লান্তির কালী পড়েছে চোখে, কিন্তু অপরাজেয় সৈনিকের সে আমৃত্যু প্রতীজ্ঞা বিলীন হ'য়ে যায় নি। আমরণ শপথের ফল্গু প্রবাহ বয়ে চলেছে ধমনীতে ধমনীতে। নূতন অঙ্গীকারে দৃঢ়তর হ'য়ে উঠেছে মুষ্টিবদ্ধ বাহু।

সহস্র নওজোয়ানের পাশে আবার জড়ো হ'য়েছে বিকাশ, রথী, ফল্গু, সুজয়, নন্দিতা, সুমিত্রা। দূর গ্রাম থেকে ছুটে এসেছে বসন্ত, পার্শ্বনাথ।

কিন্তু আর আসতে পারলো না সাগরী।

সাগরীর শেষ চিঠিটা। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত না করে ফিরবে না সে।

"প্রায়শ্চিত্তই"—মনে মনে আওরায় পৃথ্বী। হৃদয়ের গ্রন্থীতে গ্রন্থীতে অনুভব করছে এ ক্ষতির দাম।

সভা মঞ্চে বক্তারা উঠে দাঁড়িয়েছেন। বেদনার ছায়া পড়েছে তাদের সংগ্রামী চেতনার সতেজ দীপ্তির আড়ালে। শত শত সাগরীর ধূলায় লুণ্ঠিত দেহগুলি ভেসে উঠেছে যেন তাদের চোখের গভীরে, আর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তিরিশ হাজার বলিষ্ঠ বাহুর উদ্দীপক আশা।

সুমিত্রা সভামঞ্চের দিকে চলেছে পার্বতীর শিশুপুত্রের হাত ধরে'। সেই বক্তৃতা দেবে প্রথমে। সুন্দরপ্রকাশ এসে শিশুটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে দাঁড়ায়। সুমিত্রা ভীড় ঠেলে সামনে যায়।

মাথার উপরে বাতাসে উড়ছে অনন্ত সাম্য ও শান্তির তারকাচিহ্নিত লাল পতাকা। দিকে দিকে মুক্তির আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যেন।

সুমিত্রা শপথ আঁকা চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পতাকার দিকে। তারপর সে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনে জনতার দিকে।

মাইকটা এগিয়ে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করে,—"সমবেত ভাই ও বোনেরা—"

তেজোসঞ্চারী শিহরণ বয়ে চলে পৃথ্বীর রক্তস্রোতে। মনে হয় যেন কতকাল পর, কত দীর্ঘ কাল পর আবার প্রত্যেকটি সংগ্রামী নরনারীকে আহ্বান জানাচ্ছে এক বিপ্লবী মেয়ে।

আহ্বান জানাচ্ছে যারা দূরে সরে গিয়েছিল তাদের, যারা কাছে ছিল তাদেরও, আহ্বান জানাচ্ছে যারা ঘরে ছিল তাদের—যারা বাইরে ছিল তাদেরও।

পৃথিবী ব্যাপী একই আকাশের চন্দ্রাতপের তলায় জড়ো হ'বার এক উদাত্ত আহ্বান কেঁপে উঠেছে অন্তরীক্ষ্যের বুক চিরে। প্রতিটি সৈনিকের দুয়ারে আঘাত হেনেছে এক তেজোস্কর আহ্বান।

জ্যোতিষ্ক রশ্মি বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে যেন আহ্বানকারীর ভিতর থেকে। যেন বারুদবহ্নির ভিতর থেকে লেলিহান হ'য়ে উঠেছে একটি অগ্নিশিখা।

মিঠুর হাত ধরে' মঞ্চের কাছে' গিয়ে দাঁড়ায় পৃথ্বী। দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বক্তার দিকে। অগ্নিশিখার মতই প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে আজ সুমিত্রা। ভিতরের বহ্নিতে জ্বলে উঠছে থেকে থেকে যেন সাগরীর মৃতদেহের স্মৃতি, আর চোখের তারায়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে' উঠছে পার্বতীর শিশুপুত্রের মাতৃ সন্ধানী চোখদুটি।

গর্জে উঠেছে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে বেদনার ফেনিলপুঞ্জ।

সুমিত্রা বলে চলেছে :—"বহু দুঃখ, বহু বেদনার ভিতর দিয়ে আমরা আজ উপলব্ধি করছি যে প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের লৌহ দানবের সাথে শুধু মাত্র একটি দল সংগ্রাম করে সফল হ'তে পারে না।··· সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়া বিরোধী প্রত্যেকটি দল, প্রত্যেকটি নর-নারীকে সংযুক্ত হ'তে হ'বে, সংগ্রামী ফ্রন্ট গঠন করতে। আজ এই একতায় যিনি বিশ্বাসী নন, তাঁর স্থান জনগণের শিবিরে নাই।

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের পথ সুগম করতে হ'বে আমাদেরই—শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য পথে।"

পৃথ্বীর দৃষ্টি চলে যায় বহুদূরে। যে দিবসের এই অঙ্গীকার প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে দূর পৃথিবীর দিগন্ত প্রান্তে, ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে কারাগৃহের রুদ্ধ দুয়ারে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতস্বর—"Arise! ye starvelings from your slumbers!"

শীতা, পার্বতীও এখন গারদের ভিতর থেকে সে সঙ্গীতের সুরে সুর মিলিয়ে গান করছে—"জাগো, জাগো, জাগো সর্বহারা অনশন বন্দী ক্রীতদাস।"...

দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে পৃথ্বী সভামঞ্চের দিকে। দেখে, বক্তার দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে সম্মুখের কোন চুম্বকের আকর্ষণে। আশার রক্তিমায় রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে তার মুখকান্তি।

দূর থেকে ভেসে আসছে 'ধ্বনি'। এগিয়ে আসছে লাল পতাকার মিছিল—নূতন শপথ, নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনা।

দুলে উঠে শ্রোতারা। মেঘ গর্জনের মত গর্জে গর্জে ধেয়ে আসছে ময়দান কাঁপান সজ্যধ্বনি :—

"দুনিয়াকে মজদুর এক হো।" "মেহানতী জনতা এক হও।"

পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচারিত মানুষের কণ্ঠনিনাদ সে 'আওয়াজে'।

সভায় বসা জনতা আশার চোখে চেয়ে দেখে—'আওয়াজ' দিতে দিতে এগিয়ে আসছে উর্দিপরা জাহাজী শ্রমিকদের দীর্ঘ এক মিছিল।

২৮।৩।৫১

'কুসুমিকা'

যাদবপুর